ত্রিমূর্তি

ভূতের গল্প

ভয় শুধু ভয় নয়

শ্রিমূর্তি

ভয় শুধু ভয় নয়

BHOY SHUDHU BHOY NOY

E.d *By* : Joy Banerjee, Shubhajit Chatterjee & Avijit Panja

প্রথম প্রকাশ
ভূত চতুর্দশী ১৪২৮

গ্রন্থসত্ত্ব
সম্পাদক

প্রচ্ছদ
কৃষ্ণেন্দু মণ্ডল

প্রকাশক
সৃষ্টি পাবলিকেশন
২০৩/১ পশ্চিম মাসুন্দা
নববারাকপুর
কলকাতা ৭০০১৩১

বিনিময়
২৯৯

কিছু কথা

কথায় বলে অধিকাংশ বড়ো সৃজনশীল কাজের শুরুটা হুট করে হয়। সেরকমই কোনো এক মুহূর্তে খুব সাধারণ কথাবার্তাতে সিদ্ধান্ত হয় একটি বই সম্পাদনা করার। তারই ফসল "সব ভয় সমান নয়"।

"সব ভয় সমান নয়" শুধু একটা সংকলন নয়। এ বন্ধুত্বের সাক্ষী। এই সংকলন অনেক কাছের মানুষদের এক জায়গায় হওয়ার পরিসর। এক মলাটের ভিতর সমস্ত চেনা মানুষগুলোকে নিয়ে আসার স্বপ্নের ফল এই সংকলন। সাহিত্যগুণে এই সংকলন যতটা উৎকৃষ্ট ঠিক ততটাই অনুভূতির জায়গা থেকে।

এই সংকলনের অধিকাংশ লেখক লেখিকা একে অপরকে চেনেন। তাঁদের এক জায়গায় নিয়ে আসার কাজটা সহজ ছিল না। কিন্তু ইচ্ছে থাকলে সম্পাদনা খুব বিষম বস্তু নয় তা আমরা বুঝেছি।

অনেক অনুরোধ,উপরোধ, দাবী আবদারের সংমিশ্রন এই সংকলন। আশা করি ত্রিমুর্তির এই প্রথম পদক্ষেপ আপনাদের ভালবাসা পাবে। ভবিষ্যতে আবার এরকম স্বপ্ন দেখার সুযোগ আপনারা আমাদের করে দেবেন কিনা সেটা আপনারা জানেন,কিন্তু এবারের মতই কথা দিতে পারি সুযোগ দিলে ঠকবেন না।

"ত্রিমূর্তি"র তরফ থেকে আপনাদের সকলকে ভয়াল শুভেচ্ছা।

ভয় শুধু ভয় নয়

ভয়ের ঠিকানা ১

চিলেকোঠা ❦ ঐষিক মজুমদার ৭
অটবী ❦ মোহনা দেবরায় ১৫
ঘাতক ❦ মানসী রায় চট্টোপাধ্যায় ১৯
দেড়শো সাল পিছিয়ে ❦ শুভময় মণ্ডল ২৭
মাতৃশক্তি ❦ পল্লব হালদার ৩৩
পাহারাদার ❦ সৌমেন ঠাকুর ৪১
অভিশপ্ত বাড়ি ❦ শঙ্কর চ্যাটার্জী ৪৯
রক্ষক ❦ সৌমিত্র কুনাল ৫৭
সেই রাতে ফাঁকা ফ্ল্যাটে ❦ উপাসনা রায় ৬৪
ডিওজেনের শিকার ❦ অমৃতা ঘোষ ৭০
বলি ❦ অমু অর্ণব মুখার্জী ৭৫
আমরা হারি নি ❦ দেবাশিস ভট্টাচার্য্য ৮১
গরমিল ❦ অভিজ্ঞান সেন ৮৬
জানা অজানার পৃথিবীতে ❦ আকাশ দত্ত ৯১
ব্যাপারটা ভৌতিক ❦ অনুশ্রী মন্ডল ৯৭
ওক বিভীষিকা ❦ অভীক পোদ্দার ১০৭
ভালোবাসি ❦ বাপ্পাদিত্য দাস ১১২
শাস্তি ❦ বিদিশা মুখার্জি ১১৮
ভূত যখন বন্ধু ❦ বিজ্ঞান বন্ধু ভট্টাচার্য্য ১২৩
মেরীর প্রেত ❦ দিব্যেন্দু ঘোষ ১২৭
রক্তপিশাচ ❦ হিমবন্ত দত্ত ১৩৩
ল্যান্ড অফ্ ব্ল্যাক ম্যাজিক ❦ ঝিলিক মুখার্জী গোস্বামী ১৩৯
পুনরাবৃত্তি ❦ কঙ্কণা দাস ১৪৬
অতীন্দ্রিয় ও দিব্যদৃষ্টি ❦ মৌ চ্যাটার্জী ভট্টাচার্য্য ১৫১
মৃত্যুগন্ধী ❦ মৌমিতা ভৌমিক চৌধুরী ১৫৬
শেষবেলায় ❦ সৌমিতা চ্যাটার্জী ১৬৭
নেকড়ের ডাক ❦ ময়না মুখোপাধ্যায় ১৭১
কলির কঙ্কাল ❦ প্রিতম সাহা ১৭৭

ভয় শুধু ভয় নয়

ভয়ের ঠিকানা ২

বন্ধ দরজার রহস্য ❦ রাখী জানা ঘোড়াই ১৮৪
আত্মার মুক্তি ❦ রীনা চক্রবর্তী ১৯১
কবর থেকে উঠে ❦ রিয়া মিত্র ১৯৬
আমাজনের গভীরে ❦ রূপালী সামন্ত ২০৩
ওরা কারা ❦ সঞ্চিতা দে ২০৯
ও আমার ভিনদেশী তারা ❦ সায়ন্তী সাহা ২১৪
পোট্রেট ❦ শুভব্রত বসু ২১৮
পাহাড়ি পথে ❦ শুভঙ্কর সাহ ২২১
পাহাড় ডেকেছিল ❦ শুভ্রা বেজ ২২৬
সন্তান ❦ স্নিগ্ধা চক্রবর্তী ২৩০
ঘুণপোকা ❦ শুচিস্মিতা চক্রবর্তী ২৩৫
পারাপার ❦ সুলেখা তরয়াল ২৪১
সে ফিরে এসেছে ❦ ইয়াসমিনা পারভীন ২৪৮
তৃষ্ণা ❦ মোনালিসা সাহা দে ২৫৫
শপিং হান্টিং ❦ অনন্যা দাস মন্ডল ২৬০
বিস্মরণ ❦ সুদীপ হাজরা ২৬৭
কুজাম্মা ❦ মৌলী কুণ্ডু ২৭২
শেষ দৃশ্য ❦ সায়নী ঘোষ ২৭৭
ইউ প্রমিসড ❦ প্রদীপ্তা রায় চৌধুরী সেন ২৮৪
জি-টক ❦ শান্তনু চ্যাটার্জী ২৯২
সাবু ❦ দেবাশিস ভট্টাচার্য্য 'শিবাজি' ২৯৯
থেরাপিস্ট ❦ লিপিকা দে ৩০৫

চিলেকোঠা

ঐষিক মজুমদার

"এইটুকু ঘরে থাকিস কী করে, নীলাভ?"- চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে কিছুটা দ্বিধার সাথেই প্রশ্নটা করল তন্ময়, "তোর দম আটকে আসে না?"

"আসত। প্রথম-প্রথম দম বন্ধ হয়ে আসত।" তার কথার উত্তর দিতে গিয়ে একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল নীলাভ, "আর শুধু কি তাই? ভয় করত রীতিমত, ভয়!" এবার তন্ময় সহানুভূতির দৃষ্টিতে তার কলেজের সহপাঠীর দিকে তাকাল। নীলাভর জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত তার অজানা নয়।

নীলাভর যখন দশ বছর বয়েস, তখন এক পথ-দুর্ঘটনায় তার বাবা-মার মৃত্যু হয়। বাবার দিকে আত্মীয়-স্বজন বলতে বিশেষ কেউ ছিলেন না, তাই নীলাভ আশ্রয় পায় মামাবাড়িতে। দোতলা বাড়িতে তিন মামার যৌথ সংসার; এই অবাঞ্ছিত অতিথির জন্য কারুর ঘর ছেড়ে দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তাই তার ঠাঁই হয় ছাদের ওপরের ছোট্ট এই চিলেকোঠায়। একটু ইতস্ততঃ করে তন্ময় নীলাভর পিঠে একটা হাত রাখল। "ভয় পাওয়াটা তো অস্বাভাবিক কিছু নয়! দশ বছর বয়েসের একটা ছেলে, হঠাৎ করেই বাবা নেই, মা নেই, একা-একা থাকতে হচ্ছে...।"

"উঁহু, সেজন্য নয়।"নীলাভ এখনও অন্যমনস্ক, "ভয় পেতাম এই ঘরটাকেই!"

"এই ঘরটাকে?" এবারে তন্ময় একটু হকচকিয়ে গিয়ে চারদিকে আরেকবার ভালো করে তাকাল। সাধারণ গৃহস্থ বাড়ির চিলেকোঠার ঘর যেমন হয়, এ ঘরও তার ব্যতিক্রম নয়। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে বড়জোর আট ফুট বাই আট ফুট। অ্যাসবেস্টসের ছাদ; ফলে এই সেপ্টেম্বর মাসেও ঘরের ভেতরটা বেশ গরম। মাথার ওপরে লোহার রড থেকে ঝুলন্ত একটা ইলেকট্রিক বাল্ব।

ঘরের একদিকে প্রায় অর্ধেকটা জুড়ে একটা তক্তপোষ। তার নীচে একটা টিনের তোরঙ্গ ছাড়াও কিছু হাবিজাবি জিনিস। নীলাভর গেরস্থালী। তক্তপোষের লাগোয়া একটা টেবিলে ডাঁই করে রাখা বইপত্র। ছোট একটা নড়বড়ে টেবিল ফ্যান হাঁপাতে-হাঁপাতে সশব্দে ঘুরছে, যদিও তাতে গরম বিশেষ কমছে না। দরজায় লাগানো কয়েকটা হুক থেকে স্তূপীকৃত এবং অগোছালো ভঙ্গীতে ঝুলছে

নীলাভর জামাকাপড়। নিঃসন্দেহে অত্যন্ত ঘিঞ্জি এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, কিন্তু...

"কিন্তু এই ঘরে ভয় পাওয়ার মত আছেটা কী?" - তন্ময় প্রশ্নটা না করে পারল না।

"দেওয়াল। দেওয়ালগুলো দ্যাখ্!"

তন্ময় দেওয়ালের দিকে চোখ ফেরাল। এই ঘর কোনোদিনই রঙ করা হয়নি। শেষ কবে চুনকাম হয়েছিল, তা-ও বলা কঠিন। সেই প্রাচীন চুনের প্রলেপ এখন বিবর্ণ ও ম্লান। অধিকাংশ জায়গায় পলেস্তারা খসে গিয়ে সামান্য সাদা ছাপটুকু কেবল পড়ে আছে। নীচের সিমেন্টের স্তরে নোনার দাগ। "দশ বছর আগেও প্রায় এরকমই ছিল।" নীলাভর কথা কানে এল, "ভালো করে দ্যাখ্, ওই সাদা ছোপগুলোকে দেখে দাঁত মনে হচ্ছে না? যেন সাদা-সাদা দাঁতের সারি?" দাঁত? সচকিত তন্ময় আবার তাকাল। দাঁত... দাঁত... হ্যাঁ, মনে হলেও হতে পারে বটে! বিশেষ করে সেই মন যদি হয় কোনো কল্পনাপ্রবণ বালকের।

"সন্ধ্যা নামলেই আমার ভয় করত!" - নীলাভর গলা যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে, "কমজোরী ইলেকট্রিক বাল্বের টিমটিমে আলোয় মনে হত, যেন বিরাট একটা হিংস্র জন্তুর বিশাল হাঁ-মুখের ভেতরে আমি বসে আছি! যে কোনো মুহূর্তে বন্ধ হয়ে যাবে ওই চোয়াল, ধারালো দাঁতগুলো পিষে ফেলবে আমাকে!" এক নিঃসঙ্গ বালকের এরকম আতঙ্ক একেবারেই অস্বাভাবিক নয়, তন্ময় মনে-মনে ভাবল। সহপাঠীর প্রতি তার অনুকম্পার মাত্রা আরো বাড়ল।

"তারপর?" - সে মুখে বলল, "সেই ভয় ভাঙল কীভাবে?"

"একদিন ঘরটা কথা বলল!"

"অ্যাঁ?"

"হ্যাঁ!" স্থির দৃষ্টিতে তন্ময়ের দিকে তাকিয়ে নীলাভ জানাল, "অবশ্য কথাটা ঠিক কানে নয়, শুনতে পেলাম আমার মাথার ভেতর। ঘরটা আমাকে বলল - ভয় পেও না!"

"ভয় পেও না?" - বিমূঢ় তন্ময় কোনোমতে সতীর্থর কথার পুনরাবৃত্তি করল, "এই কথা বলল এই... এই ঘর?"

"হ্যাঁ, তাই বলল। বলল - আমি তো তোমার বন্ধু! বন্ধুকে আবার কেউ ভয় পায় নাকি?" - নীলাভ এক নিঃশ্বাসে বলে চলল, "আরো বলল- তোমার যদি কোনো শত্রু থাকে, তাকেই বরং আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাকে খেয়ে ফেলব! আছে নাকি এমন কোনো শত্রু?"

একাকিত্ব কি একটা বাচ্চা ছেলের মনে এরকম বিভ্রমের সৃষ্টি করতে পারে? হতভম্ব তন্ময় নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারছিল না। "তুই কী বললি?" তবুও সে কোনোক্রমে জিজ্ঞেস করল, "তোর কি আদৌ কোনো শত্রু ছিল?"

"ছিল তো! ছোটমামা!"

"ছোটমামা?"

"হ্যাঁ, ছোটমামা।" নীলাভর গলায় আবার সেই অদ্ভুত অন্যমনস্কতা, "বছর পঁয়ত্রিশ বয়েস। বিয়ে-থা করেননি, একতলার কোণার ঘরে একা-একা থাকতেন।" এরপরে থেমে-থেমে, কিছুটা অসংলগ্নভাবে সে যে আখ্যান শোনাল, তা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এবং শিউরে ওঠার মত। নীলাভ এ বাড়িতে এসে ওঠার পর কেউ যদি তাকে প্রীতির দৃষ্টিতে দেখে থাকেন, তাহলে তিনি তার ছোটমামা। কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি ঘোষণা করেন, সন্ধ্যাবেলা নীলাভর পড়াশোনা দেখিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব তিনিই নেবেন।

সেই সময় নীলাভ তাঁর এই অযাচিত বদান্যতার কারণ ঠিকমত বুঝতে পারেনি, কিন্তু সন্ধ্যাবেলার পঠনপাঠনের ওই দু'ঘন্টা তার কাছে অচিরেই হয়ে উঠল চূড়ান্ত অস্বস্তিকর ও দুর্বিষহ। কারণ ছোটমামার পড়ানোর ধরণটা ছিল অদ্ভুত। নিজে বিছানায় আসনপিঁড়ি হয়ে বসে তিনি বালক নীলাভকে বসাতেন তাঁর কোলে। তারপর পড়ানোর ফাঁকে-ফাঁকে আদরের অছিলায় হাত বোলাতেন তার সর্বাঙ্গে।

"এসব... এসব কী বলছিস?" কোনোমতে প্রশ্ন করল বজ্রাহত তন্ময়, "তারপর?"

"তারপর একদিন উনি আমাকে শাস্তি দিলেন!" নীলাভ করুণ হাসল, "যতদূর মনে পড়ে, একটা অঙ্ক ভুল করেছিলাম। উনি ধমক দিয়ে বললেন জামাপ্যান্ট খুলে বিছানায় শুয়ে পড়ো!" তন্ময়ের মুখে আর কথা জোগাল না। সেদিনের অত্যাচারের পর চিলেকোঠায় ফিরে সারারাত যন্ত্রণায় কেঁপেছিল, কেঁদেছিল নীলাভ। আর শুধু সেদিন নয়, এরপর থেকে এ ধরণের 'শাস্তি' নিত্যনৈমিত্তিক হয়ে উঠেছিল।

"কী সাঙ্ঘাতিক!" তন্ময়ের গলার স্বর কেঁপে গেল, "তুই... তুই কাউকে বলিসনি?" ...না, এই লাঞ্ছনার কথা কাউকে জানাতে পারেনি নীলাভ। তার প্রথম কারণ, জানাবার মত সহৃদয় মানুষ কেউ ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, সেই অপরিণত বুদ্ধিতেও সে বুঝেছিল কাউকে বললে এই 'শাস্তি'-র পরিমাণ আরো

বাড়বে। তাই সারারাত চিলেকোঠায় ঘরে মুখ লুকিয়ে কাতরাত, কাঁদত সে। আর তখনই একদিন কথা বলে উঠল ঘরটা! প্রশ্ন করল, তার কোনো শত্রু আছে কিনা। ছোটমামাই সেই শত্রু, নির্দ্বিধায় জানাল নীলাভ! "তারপর?"- রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করল তন্ময়।

"ঘরটা আমাকে বলল - ছোটমামাকে আমার কাছে নিয়ে এসো!" - নীলাভর কিছুক্ষণ আগের বিষণ্ণতা কেটে গিয়ে এখন চোখে-মুখে যেন একটা চাপা উত্তেজনা, "আমি পরের দিন সন্ধ্যায় ছোটমামাকে বললাম - নীচের তলায় তো মাঝেমধ্যে লোকজনের যাতায়াত, তাই পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটে। এর চেয়ে আমার চিলেকোঠার ঘরটা অনেক নিরিবিলি, কারণ সন্ধ্যাবেলা কেউ ছাদে ওঠে না। উনি যদি সেখানে গিয়ে আমাকে পড়ান..."

"উনি কী বললেন?"

"খুব খুশী হলেন। বললেন, সে-ই ভালো! তার পরদিন সন্ধ্যা হতেই উনি ছাদে উঠে এলেন!"

"তারপর?" তন্ময়ের উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন।

"আমি ওঁকে এই ঘরে বসালাম। এই বিছানায়।" - নীলাভ জানাল, "তারপরে বললাম, আমি একটু খাওয়ার জল নিয়ে আসছি। এই বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।"

একটু থেমে সে যোগ করল, "দেখেছিস হয়তো, এই ঘরের দরজার বাইরের দিকে একটা শিকল আছে। ওটা দিয়ে বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করা যায়। সেই সন্ধ্যায় ঘরের বাইরে বেরিয়েই আমি চট করে দরজা বন্ধ করে শিকলটা তুলে দিলাম। ভেতর থেকে ছোটমামা রাগত সুরে কিছু একটা বললেন। আর তারপরেই..."

"কী হল তারপর?" অধৈর্য তন্ময় তাড়া লাগাল।

"ঘরের ভেতর থেকে একটা অদ্ভুত আওয়াজ ভেসে এল! কড়মড়-কড়মড়! যেন কোনো প্রকাণ্ড মাংসাশী প্রাণী তার শিকারের হাড়-মাংস চিবিয়ে-চিবিয়ে খাচ্ছে!" ধীরে-ধীরে বলল নীলাভ, "এক লহমার জন্য মনে হল, যেন ছোটমামার আর্তনাদ শুনতে পেলাম। ঠিক তখনই একটা ঢোঁক গেলার শব্দ! তারপর সব চুপচাপ! মিনিট-পাঁচেক অপেক্ষার পর আমি শিকল খুলে ঘরে ঢুকলাম।"

"ঢুকে কী দেখলি?" - তন্ময়ের রুদ্ধশ্বাস প্রশ্ন।

"কিছুই না!"

"কিছুই না?"

"না।" নীলাভ একই সুরে বলে চলল, "দেখলাম, ঘর খালি। ছোটমামা নেই। তাঁর কোনো চিহ্নও নেই, যেমন রক্ত বা হাড়গোড়। জলজ্যান্ত মানুষটা যেন স্রেফ ভ্যানিশ হয়ে গেলেন! তারপর তাঁর আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। সবাই ভেবেছিল, উনি একফাঁকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছেন। বড়মামা-মেজমামা অনেক সন্ধান করেছিলেন।"

"যাঃ, হতেই পারে না!" - তীব্র অবিশ্বাসের সাথে তন্ময় বলল। যদিও সে বুঝতে পারল, তার গলা শুকিয়ে কাঠ। "হতে না পারার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, কারণ এমনটাই হয়েছিল!" নীলাভ একটুও উত্তেজিত হল না, "আর এর পরের ঘটনায় আমি আরো অকাট্য প্রমাণ পেয়েছি।" তন্ময় হাঁ করে বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। এখন তার মনে হচ্ছে, ছোটবেলার একাকিত্ব, বঞ্চনা, এবং পরবর্তীতে এক বিকৃতমনা পশুর অত্যাচারে নীলাভর মানসিক স্থিতি অনেকদিন আগেই কিছুটা নষ্ট হয়ে গেছে। এতদিন তন্ময় বা তার অন্য সহপাঠীরা বুঝে উঠতে পারেনি।

আচ্ছা, ব্যাপারটা যখন ধরাই পড়েছে, তাহলে নীলাভকে কি এখন কোনো মনোবিদের কাছে নিয়ে গিয়ে কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করা উচিত? হয়তো। কিন্তু কথাটা এই মুহূর্তে নীলাভকে সরাসরি বলা যাবে না। তাতে হিতে বিপরীত হতে পারে। মনের ভাব মনেই চেপে রেখে তন্ময় সহজ সুরে বলল, "এর পরের ঘটনায় আরো প্রমাণ পেয়েছিলি বলছিস? কী ঘটেছিল এর পরে?"

"অমিতাভ।" নীলাভর গলা ততোধিক স্বাভাবিক, "অমিতাভকেও খেয়েছিল এই ঘর! অবশ্য বছর চারেক পরে।"

"অমিতাভ? সে আবার কে?" - তন্ময় অবাক হল।

অমিতাভ রায়। নীলাভর স্কুলের সহপাঠী। বড়লোকের ছেলে, চেহারাতেও বেশ বড়োসড়ো। এবং আদর্শ 'বুলি' বলতে যা বোঝায়, ঠিক তাই। ক্লাসের ছেলেরা তার ভয়ে তটস্থ। নীলাভ নিরীহ এবং মুখচোরা বলেই বোধহয় তার ওপরে অমিতাভর দৌরাত্ম্য আরো বেশী। যখন-তখন তার খাতা ছিঁড়ে দেয়, ভেঙে দেয় সবেধন নীলমণি পেনসিল। শারীরিক নিগ্রহও বাকি থাকে না। ক্লাস এইটে পড়ার সময় একদিন নীলাভর সহ্যের সীমা অতিক্রান্ত হল। সেদিন তার তিল-তিল করে টিফিনের পয়সা জমিয়ে কেনা সুপারম্যানের কমিকস ছিনিয়ে নিল অমিতাভ। সেদিনই নীলাভ সিদ্ধান্ত নিল, অমিতাভ তার শত্রু। তার একমাত্র বন্ধু সেই চিলেকোঠার ঘর; তার কাছেই সে উগরে দিল সেই কথা।

অমিতাভকে নিয়ে এসো আমার কাছে, বিধান দিল ঘর!...

"তারপর?" - উৎকণ্ঠিত আগ্রহে প্রশ্ন করল তন্ময়।

"পরদিন আমি অমিতাভকে বললাম, আমার কাছে এরকম অনেক কমিকস আছে।" নীলাভর মুখে এখন ষড়যন্ত্র আর উৎকট উল্লাসের ছাপ, "তবে সেগুলো পেতে হলে স্কুল ছুটির পর আমার সাথে আমার বাড়িতে যেতে হবে। অমিতাভ রাজি হয়ে গেল।"

"আর তুই তাকে এই ঘরে নিয়ে এলি?"

"ঠিক তাই! আর একইভাবে তাকে ভেতরে রেখে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিলাম!" তন্ময়ের প্রশ্নের উত্তরে নীলাভ শান্তভাবে জানাল, "তারপরে সেই একই ঘটনায় পুনরাবৃত্তি! একটা আর্তনাদ, কড়মড় করে চিবোনোর শব্দ, ঢোঁক গেলার আওয়াজ!"

"আর দরজা খুলে তুই দেখলি..."

"অমিতাভ উধাও! কোথাও তার রক্তের দাগটুকুও নেই!"

এ তো বদ্ধ উন্মাদ! নীলাভর দিকে আতঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভাবল তন্ময়। কিন্তু নীলাভর কোনো হেলদোল নেই।

"তবে অমিতাভর বাবা-মা প্রচুর ঝামেলা করেছিলেন।" সে ধীরে-ধীরে বলল, "বন্ধুদের কেউ-কেউ অমিতাভকে আমার সাথে আসতে দেখেছিল। এই বাড়ির লোকেজনও তাকে ঢুকতে দেখেছিল। তাই পুলিশ বারবার এসে আমাকে জেরা করে। শেষমেশ অনেক খুঁজেও ডেডবডি বা তার কোনো অংশ না পেয়ে বাছাধনেরা রণে ভঙ্গ দেয়!"

তন্ময়ের মনে হঠাৎ একটা ভয়ঙ্কর সম্ভাবনা উঁকি দিয়ে গেল। উন্মাদের পাশাপাশি নীলাভ খুনী নয় তো? হয়তো তার ছোটমামা আর অমিতাভকে সে-ই কোনো উপায়ে খুন করেছে, তারপর লুকিয়ে ফেলেছে তাদের দেহ...। পরক্ষণেই সে এই ধারণা ঝেড়ে ফেলতে বাধ্য হল। এই চিলেকোঠার মানুষের দেহাংশ গোপন করা সম্ভব নয়। আর এক বালক বা কিশোরের পক্ষে একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ বা বড়োসড়ো একটা ছেলের দেহ কোথাও সরিয়ে ফেলা আরো অসম্ভব। অতএব... অতএব পুরোটাই মনগড়া কাহিনী! নীলাভর উত্তপ্ত মনের ভিত্তিহীন কল্পনা! কিন্তু সে কথা মুখের ওপর জানানোটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। আপাততঃ এই অপ্রকৃতিস্থ মানুষের কথায় তাল মিলিয়ে চলাই ভালো।

ঠোঁটের কোণে একটা হাসির আভাস টেনে নিতান্তই হালকা চালে তন্ময়

বলল, "ব্যস, তাহলে তো আর কোনো সমস্যাই রইল না! তোর সব শত্রুই শেষ হয়ে গেল!"

"কোথায় আর শেষ হল?" অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল নীলাভ।

"তার মানে?" তন্ময় হতভম্ব।

"এই কলেজের কথাটাই ধর না!" সরাসরি তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল নীলাভ, "বিশাখা সারাবছর ধরে পড়াশোনা করল আমার সাথে, নোটস নিল আমার কাছ থেকে, কিন্তু পছন্দ করার বেলায় করল কাকে? না, আমার প্রিয় বন্ধুকে!"

ওঃ, এই কথা? সচকিত তন্ময় নড়েচড়ে বসল। নীলাভ, বিশাখা আর সে বরাবরই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কলেজের সহপাঠীরা ঠাট্টা করে তাদের বলে ট্রায়ো। এটা ঠিক যে, নীলাভ সরল-সাদাসিধে হলেও মেধাবী ছাত্র। পড়াশোনার জন্য বিশাখা আর তন্ময় তার ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল। একেবারে সম্প্রতি বিশাখা যে তন্ময়কে মন দিয়েছে, মিথ্যা নয় তা-ও। কিন্তু তাদের কারুরই জানা ছিল না যে, নীলাভ গোপনে বিশাখার প্রতি অনুরক্ত! প্রাথমিক অস্বস্তিটা কাটিয়ে উঠে তন্ময় গলাখাঁকারি দিল।

"দ্যাখ্ ভাই, তুই কি কোনোদিন বিশাখাকে বলেছিলি?"

"বলতে পারিনি তো!" নীলাভ ঈষৎ ম্রিয়মান, "ভেবেছিলাম ও নিজেই বুঝতে পারবে!"

"সুতরাং তুই বলিসনি, আর ও-ও বুঝতে পারেনি!" তন্ময় বোঝানোর চেষ্টা করল, "আমিও তোর মনের কথা জানতাম না! তাহলে আমার দোষ কোথায়?"

"এখন তো জানলি!" অনেকক্ষণ পরে নীলাভ আবার সামান্য হাসল, "এখন কি তুই বিশাখাকে ছেড়ে দিবি?" কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তন্ময় দু'দিকে মাথা নাড়ল। "নাঃ, তা সম্ভব নয়! কিন্তু..."

"তাহলে তুই কি আমার শত্রু হলি না?" নীলাভর ঠোঁটে সেই রহস্যময় হাসি।

"দ্যাখ্ নীলু, ব্যাপারটা স্পোর্টিংলি নে!" মরিয়া তন্ময় বলার চেষ্টা করল, "এই সামান্য কারণে নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি..."

"ওহো, তাই তো! তোকে বাড়িতে ডেকে এনে ঝগড়া করছি!" যেন হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেয়ে নীলাভ ব্যস্ত হয়ে উঠল, "দাঁড়া, একটু চা-টার জোগাড় করি!"

তন্ময় বাধা দেওয়ার আগেই সে দ্রুতপায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আর

তারপরেই ঝটিতি দরজা বন্ধ করে বাইরে থেকে শিকল তুলে দিল সে। নিঃসীম ঔৎসুক্যে কান পাতল দরজার গায়ে। কোনো ভুল নেই! ভেতরে তন্ময়ের আপত্তি হঠাৎ পরিণত হল অস্ফূট আর্তনাদে! তারপরেই সেই পরিচিত কড়মড়-কড়মড়! শত্রুর হাড়-মাংস চিবোনোর আওয়াজ! অতঃপর স্পষ্ট গলাধঃকরণের শব্দ!

মিনিট-পাঁচেক রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষার পর দরজা খুলল নীলাভ। ঘর ফাঁকা। তন্ময়ের চিহ্নমাত্র নেই। নেই কোনো রক্তের দাগও। নীলাভ একটা নিঃশ্বাস ফেলল। আবার একটা ঝামেলা আসন্ন। তবে তার কিছু হবে না। প্রমাণাভাবে তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে পুলিশ। সবকিছু থিতিয়ে গেলে একদিন কোনো অছিলায় বিশাখাকেও এই চিলেকোঠার ঘরে নেমন্তন্ন করে আনবে সে। প্রোপোজ করবে এখানেই। বিশাখা যদি মেনে নেয়, ভালো। নাহলে সে-ও শত্রু! এই ঘর তাকেও ক্ষমা করবে না!

অটবী

মোহনা দেবরায়

"বাহ্! দারুণ হয়েছে তো এই ছবিটা। তোর হাতটা সত্যিই বাঁধিয়ে রাখার মতো, পলাশ।" পলাশের ষ্টুডিওয় ঢুকে এই প্রথম কথা বলল নির্মাল্য। এতক্ষণ সে ঘুরে ঘুরে ওর সমাপ্ত আর অর্ধসমাপ্ত ছবিগুলো নিরীক্ষণ করছিল। এই ছবিটার সামনে এসে স্ট্যাচু হয়ে গেছে। ছবিটা সত্যিই যাকে বলে মেস্মারাইজিং, মন্ত্রমুগ্ধকর। জ্যোৎস্নার জঙ্গল। চকচকে পাতায় ঠিকরে যাচ্ছে মরা আলো। শতাব্দী-প্রাচীন বীটপ-রাজির অতন্দ্র প্রহরা এড়িয়ে যেটুকু ফ্যাকাশে, চোরাগোপ্তা আলো মাটিতে এসে পড়ছে, সে অন্ধকারকে শুধু ঘনীভূত করা ছাড়া আর কিছু করছে বলে মনে হয় না। তবু গোটা ক্যানভাসটার লাইটিং এমনই, যে কোথায় কী আছে বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না। আর সেই অদ্ভুত ব্যাখ্যাতীত আলোতেই দেখা যাচ্ছে একটা মনুষ্যাবয়ব।

পলাশ একটু দূরে দাঁড়িয়ে ওর নতুন ছবিটাতে ফিনিশিং টাচ দিচ্ছিল। এগিয়ে এলো নির্মাল্যর কথা শুনে।

"কোনটা? ওঃ ওটা? ওটা আওকিগাহারা ফরেস্টের একটা দুরন্ত স্টিল দেখে কনসেপচুয়ালি কিছুটা ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে আঁকা। তবে এই জঙ্গলটার পেছনে কিন্তু একটা গল্প আছে, জানিস?"

"আওকিগাহারা নিয়ে তো? হ্যাঁ জানি!"

"আরে ধুর! ওটা তো সবাই জানে। আমি বলছি এই জঙ্গলটা। এই যেটা আমি এঁকেছি।"

"এটা কোনো রিয়েল লাইফ জঙ্গল নাকি? এই তো বললি আওকিগাহারা থেকে ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে..."

"ধুর নিলু! তুই না দিন দিন করঞ্জা রাণাওয়ত হয়ে যাচ্ছিস!"

"ও বুঝেছি বুঝেছি... মানে তুই একটা ব্যাকগ্রাউন্ড স্টোরি দিয়েছিস এই ছবিটার, তাই তো?"

"ওমা সত্যি? এর মধ্যে বুঝে গেলি? থ্যাঙ্ক গড! আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম তো!

এনিওয়েজ়, কনগ্রাচুলেশন্স ব্রো!"

"এবার দাঁতটা বন্ধ করে গল্পটা বলবি?"

"বলছি বলছি। এই জঙ্গলটার ধারে একটা গ্রামে একটা ছেলে থাকতো। তার নাম... ধুর নামে কী আসে যায়! গ্রামটার আশেপাশে আরও জঙ্গল ছিল। গ্রামবাসীরা সেইসব জঙ্গল থেকে কাঠ মধু মোম এইসব সংগ্রহ করে এনে পেট চালাত। কিন্তু এই জঙ্গলটা সবাই এড়িয়ে চলত। ওটা নাকি অভিশপ্ত। হঠাৎ একদিন এইসব জিনিসের বিরাট আকাল দেখা দিল। লোকজন মরতে শুরু করলো না খেতে পেয়ে। এর মাঝে সেই ছেলেটা এক রাত্রে স্বপ্ন দেখলো একটা অচেনা জঙ্গলের মধ্যে সে ঘুরছে। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। চারিদিকের গাছ থেকে থরেথরে ঝুলছে মৌচাক। ছেলেটা দেখছে আর ভাবছে, 'এ-ই কি স্বর্গ?' ঘুম ভেঙে সে বুঝতে পারল ওই অভিশপ্ত জঙ্গলেরই স্বপ্ন দেখেছে সে। ওই জঙ্গলই একমাত্র তাদের বাঁচাতে পারে এই দুর্ভিক্ষ থেকে– ছেলেটা নিজেকে কনভিন্স করে ফেলে। সেই মতো, একদিন রাত থাকতে উঠে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। বাকিটা তুই বল।"

"অ্যাঁ?"

"হ্যাঁ মানে এতদূরই ভেবেছি আমি। কিন্তু এখানে তো শেষ করা যাবে না। রাইজ়িং অ্যাকশন দিয়েছি, এবার একটা ক্লাইম্যাক্স দিতে হবে।"

কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে চেয়ে থাকে নির্মাল্য। তারপর বেশ কিছুক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে দেখে ছবিটাকে। তারপর বলে, "জঙ্গলে পা দিয়েই একটা অদ্ভুত অনুভূতি হলো ছেলেটার। মাটিটা যেন খুব নরম। একটু জোরে পা ফেললেই পা বসে যাবে। তবু ছেলেটা সাবধানে এগোতে লাগলো। কাছেই কোথাও একটা রাতচরা পাখি ডেকে উঠল বিশ্রী সুরে। বুকটা ছম ছম করে উঠলো ছেলেটার। একবার ভাবল, ফিরে যায়। পরক্ষণেই মনে হলো, ফিরে গিয়ে তো সেই আবার কান্না দুর্ভিক্ষ হাহাকার। তার চেয়ে যদি এখানে মরতেও হয়... ক্রমেই ঘন জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়েছিল ছেলেটা। এখনো পর্যন্ত একটাও মৌচাক চোখে পড়েনি। তবে পড়বে– এই স্থির বিশ্বাস নিয়ে এগোচ্ছিল ও। হঠাৎ ওর মনে হলো যেন পেছন থেকে কেউ চাপাস্বরে ওর নাম ধরে ডেকে উঠলো– এই ভাই ছেলেটার একটা নাম না দিলে চলছে না!"

"পনিপু!"

চমকে দরজার দিকে তাকালো দুজনেই। পুষ্প-দি দাঁড়িয়ে। মহিলা আক্ষরিক অর্থেই অশীতিপর। পলাশের সর্বক্ষণের কাজের মানুষ। কিন্তু ইদানিং, বয়সের

কারণেই সম্ভবত, কিছু মাথার গোলমাল দেখা দিয়েছে তাঁর। তিনি এতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে ওদের কথাবার্তা শুনছিলেন কিনা, বুঝতে পারে না দুজনের কেউই।

"পনিপু," পুষ্প-দি আবার বলে, "জঙ্গলের ভেতর খানিকটা ঢুকেই সে দেখতে পেল, একেকটা গাছের পেছনে আবছা আবছা মূর্তি যেন স্যাঁত স্যাঁত করে সরে যাচ্ছে। ঠিক পলু দাদাবাবুর ছবিটার মতো। ভয়ে দমবন্ধ হয়ে আসতে লাগলো পনিপুর। আবার সাথে সাথে এটাও মনে হতে লাগলো, যেন জঙ্গলের অনেক গভীর থেকে কেউ ডেকে চলেছে ওকে। ডেকেই চলেছে। যেন সেখানেই পৌঁছতে হবে ওকে। আবার সাথে সাথে এটাও মনে হচ্ছিল, এই জঙ্গল থেকে এক্ষুণি বেরিয়ে যাওয়া দরকার। এর মধ্যে আর বেশিক্ষণ থাকলে নিজেকে হারিয়ে ফেলবে ও। এই দুইরকম চাওয়ার মাঝে অস্থির হয়ে উঠছিল তার মনের ভেতরটা। অবশেষে বেরোনোর পথটাই খুঁজতে চাইলো ও। কিন্তু কিছুতেই আর খুঁজে পেলো না সেটা। যত গভীরে যেতে লাগলো, জঙ্গলটা যেন ততই গিলে নিতে লাগলো ওকে। প্রথম ইচ্ছেটাই প্রবল হয়ে উঠতে লাগলো ক্রমশ। মৌচাকের কথা মনে আর নেই, তবু আরো গভীরে ঢুকতে লাগলো পনিপু। জঙ্গলটা অন্ধকার হতে শুরু করল। চলতে চলতেই জ্ঞান হারিয়ে ফেললো ছেলেটা।"

পলাশ একটা দুঃখের হাসি হাসলো। তারপর বললো, "পুষ্প-দি, আর চাপ নিও না। শেষটা আমি বলছি। যখন ওর জ্ঞান এলো, প্রচুর আলোর মধ্যে– ওর নাম আর পনিপু ছিল না। সবাই ওকে একটা অন্য নামে ডাকত। সবার কোলে আদর খেয়ে বেড়াতো ওর ছোট্ট শরীরটা। শুধু মাঝে মাঝে সেই জঙ্গলটা ওর স্বপ্নে আসতো। কিন্তু এখন... এক-একটা গাছের চেহারা যেন কেমন লাগতো, কোনোটা কোনোটা হতো অদ্ভুত স্যাঁতস্যাঁতে। কোনোটার গা থেকে আবার অদ্ভুত গা-গুলোনো মিষ্টি গন্ধ বেরোত। সেই গাছগুলো ছুঁলে, একটা অদ্ভুত শিরশিরে অনুভূতি হতো শরীরে। খুব ভালো লাগতো। বড়ো বেশি ভালো লাগতো। থেকে যেতে ইচ্ছে করতো সেই জঙ্গলে। তারপরই ভেঙে যেত ঘুমটা। সারাদিন কাটতো সেই জঙ্গলের ভাবনায়। নিজের চারপাশে শুধু সেই জঙ্গলটাই দেখতে চাইতো ও। আর স্বপ্নের মধ্যে প্রতিদিন সেই গাছগুলো একটু বেশি করে ঘন হয়ে আসতো ওর চারপাশে। কিন্তু সকালে উঠে সেই স্বপ্নের কথা আর কিচ্ছু মনে থাকত না। শুধু তার নামে নালিশ বেড়ে যেত দিন দিন। কোনোদিন পেন্সিল চুরির, কোনোদিন বা সহপাঠীকে মেরে রক্তারক্তি ঘটানোর... একটু বড়ো হওয়ার পর, ওর ভয়ে সন্ধ্যের পর পাড়ার মেয়েরা আর রাস্তায়

বেরোতো না। বেশ কয়েকটা মেয়ে অভিযোগ করেছিল, কিন্তু তারপর হঠাৎ একদিন বেবাক অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল তারা। তাদের মা-বাবারা প্রথমে থানার তারপর ঠাকুরের সামনে বসে থাকতো সজল চোখে। আর সেই জঙ্গলটা একটু একটু করে ঘন হতো ওর স্বপ্নে। তারপর... একটা দিন এলো... দেখা গেল, ঠাণ্ডা মাথায় একটা ঘরে বসে একটা গণহত্যা প্ল্যান করছে ছেলেটা, ক্ষমতায় আসার জন্য। একবার এটা করে মানুষের সহানুভূতি আদায় করতে পারলেই... সিংহাসন আর কেউ আটকাতে পারবে না। সে কথা বলছে, আর অনুভব করছে তার চারপাশে ঘন হয়ে আসছে সেই জঙ্গল। সেই পচাটে মিষ্টি গন্ধটায় একটু একটু করে ভারী হয়ে উঠছে বাতাস। সে যত কথা বলছে, একটা একটা করে নতুন পাতা গজাচ্ছে গাছগুলোয়। আস্তে আস্তে সেই জঙ্গলটাকেই ঘরবাড়ি বানিয়ে নিয়েছে সে।"

চুপ করে গেল পলাশ। হঠাৎ পুষ্প-দি হাহাকার করে উঠলো, "তবে এমন ছবি কেন আঁকলে, পলু দাদাবাবু? কেন?" তার হাহাকারের সাথেই যেন তাল মিলিয়ে স্টুডিও জানালা দিয়ে ঘরে ধেয়ে এলো এক ঝলক হাওয়া। কেঁপে উঠলো তিনজনেই। একটা হালকা মিষ্টি সুবাসও যেন ভেসে এলো কোথা থেকে।

"কী করবো পুষ্প-দি, ছবি আঁকা ছাড়া আর কী করতে পারি বলো? ওইটুকুই তো আছে।"

"গন্ধটা পাচ্ছিস?" সিরিয়াস গলায় প্রশ্ন করলো নির্মাল্য।

"পাচ্ছি। সবসময়ই পাই। আমল দিই না। তোরাও দিস না। জঙ্গলটা আশেপাশেই আছে। গাছগুলোকে বাড়তে দেওয়া চলে না।"

একটুক্ষণ চুপ থাকার পর নির্মাল্য আবার বলে উঠলো, "পরের ছবিটায় আলোটা আরেকটু বেশি রাখিস, পলাশ। আর রাক্ষুসে গাছগুলো আরেকটু স্পষ্ট করিস, যাতে দেখে চিনতে পারা যায় সহজেই। আমাদের একটু সুবিধে হয় তাহলে।"

ঘাতক

মানসী রায় চট্টোপাধ্যায়

বাথরুম থেকে বেডরুমে আসার সময় রাত বাতির নিভু নিভু আলোয়, করিডোরের দেওয়াল ঘড়িতে চোখ পড়ল ডোরার। দেখল রাত দুটো পনেরো।

অরুণ দুদিনের জন্য জরুরী কাজে কলকাতা গেছে। আজকাল একা থাকতে বড্ড অস্বস্তি হয় ডোরার। কিছুতেই ঘুম আসেনা রাতে। অরুণের এই জায়গাটায় পোস্টিং হবার পর থেকেই, কেমন একটা অচেনা ভয় যেন চেপে ধরেছে ওকে। আগেও যে ভয়টা ছিলনা তেমন নয়, তবে দিন দিন যেন সেটা আরো বেড়ে চলেছে। এই জায়গাটা একেবারেই শান্ত। এমনিতে কুচবিহারের ছোট্ট সুন্দর এই শহরতলীর দূষণমুক্ত পরিবেশ একেবারেই মন্দ নয়, তবে আজকাল আষ্টেপৃষ্ঠে প্রতিদিন যেন ওকে চেপে ধরছে ভয়টা।

নিস্তব্ধ রাত্রিতে ঘরের বাতাস বড্ড ভারী হয়ে আছে আজ। বালিশের নীচে রাখা বইটা হাতে নিয়ে টেবিলের সামনে এসে, ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে দিল ডোরা। গভীর রাত পর্যন্ত টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে বই পড়া ডোরার বরাবরের অভ্যাস। সকালে ঝুনুর থেকে একপ্রকার জোর করেই ডোরা কেড়ে নিয়েছে বইটা। ডোরাদের বাড়ি নতুন কাজে ঢুকেছে ঝুনু। ওর বয়স খুব জোর বছর পনেরো ষোলো। প্রথম দিনেই হাসিখুশি, প্রাণচঞ্চল, মিষ্টি মেয়েটাকে ভীষণ ভালো লেগেছিল ডোরার।

* * *

ডোরা লক্ষ্য করছে, আজকাল কেমন যেন একটু বদলে যাচ্ছে ঝুনু। ওর মুখে চোখে সব সময় একটা আতঙ্কের ছাপ। দিন দিন ওর আচরণ কেমন যেন অদ্ভূত হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝেই ফ্যালফ্যাল করে, শুন্য দৃষ্টিতে দেওয়ালের দিকে চেয়ে থাকে। সব সময় অন্যমনস্ক, কাজে তো একেবারেই মন নেই।

আজ সকালে ওর আচরণটা একটু বেশি রকমের অস্বাভাবিক লাগছিল ডোরার। হঠাৎ করে ঝড়ের গতিতে এসে, কাজ না করেই কেন যে আবার হঠাৎ ঝড়ের গতিতে চলে গেল সেটা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না।

বইটা পড়তে শুরু করার পর থেকেই যেন আরো বেশি অস্থির লাগছে। মাথায় একটু যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। বইটাতে ব্ল্যাক ম্যাজিক নিয়ে উদ্ভট সব তথ্য লেখা। ডোরার কাছে ব্যাপারটা একেবারেই অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছে । শুধু ভেবে চলেছে এগুলো কখনোই সত্যি হতে পারে না, অথচ এই অঞ্চলের আবাল বৃদ্ধ বনিতা চোখ বুজে কেন যে এইসবে বিশ্বাস করে, কে জানে ! এই অঞ্চলের কারোর একজনের ঘরেই নাকি ডাইনির ছায়া আছে। কিছুতেই সেই ভয়ানক ডাইনি কে নাকি কাবু করা সম্ভব নয়। ছোট ছোট বাচ্চারা সন্ধ্যার পর ভয়ে ঘরের বাইরে যায়না। খুব দরকার ছাড়া রাতের অন্ধকারে এলাকার লোক নাকি বাড়ি থেকে বার হতেই ভয় পাচ্ছে আজকাল। অরুণ প্রথম দিন থেকেই আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে ডাইনির মুখোশ খুলে দিয়ে, আসল আততায়ী কে হাতে নাতে ধরার জন্য।

এলাকাবাসীদের অবশ্য বিশ্বাস এই কাজ পুলিশের নয়। একমাত্র শক্তিশালী এক তান্ত্রিকই নাকি ওদের ডাইনির কবল থেকে বাঁচাতে পারে। তার থেকেই বইটা চুরি করে এনে লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ছিল ঝুনু। ডোরা দেখে ফেলতেই, ভয়ে ওর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল। কিছুতেই দিতে চাইছিল না বইটা। ডোরা পুলিশের ভয় দেখাতেই, কাঁপতে কাঁপতে চুরির কথা স্বীকার করেছিল নিজের মুখে। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বড় অদ্ভুত কথা বলছিল। তান্ত্রিক নাকি কয়েকদিন থাকবে না। এবার নাকি ওর পালা। ডাইনির হাত থেকে কিছুতেই ওর নিস্তার নেই। তাই বাঁচার জন্য বইটা চুরি করে এনেছে। এটাতেই নাকি ডাইনির হাত থেকে রক্ষা পাবার একমাত্র উপায় লেখা আছে।

* * *

নিজের সঙ্গে একপ্রকার লড়াই শুরু হয়েছে ডোরার। বিজ্ঞান আর অন্ধ বিশ্বাসের মধ্যে লড়াই। কে জানে, এই পৃথিবীতে কত কিছুরই তো যথার্থ ব্যাখ্যা মেলেনি। এলাকার মানুষের যেটা বিশ্বাস তা হয়ত সব ব্যাখ্যার ঊর্ধ্বে। ডাইনি সম্পর্কে প্রথম দিন থেকে ঝুনু সাবধান করে গেছে ডোরাকে। রাত জাগতে বারণ করেছে। রাতের অন্ধকারেই নাকি প্রতিদিন ডাইনি বার হয় তার শিকারের খোঁজে। এলাকায় পর পর নিখোঁজ হচ্ছে লোকজন। হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল ডোরা। বলেছিল, "তুই রাতে কি করিস? আমি জেগে আছি না ঘুমোচ্ছি তাই নিয়ে তোর এত মাথা ব্যথা কেন? তোর ডাইনি আমার কিচ্ছু করতে পারবে না। টিকিও ছুঁতে পারবে না বুঝলি!" ভীষণ করুণ দেখাচ্ছিল তখন ঝুনুর মুখটা। বেচারা এই কদিনেই ডোরাকে বড্ড ভালবেসে ফেলেছে।

ভাবনায় ছেদ পড়ল কলিং বেলের শব্দে। এত রাতে কে এল ? নিশ্চই মনের ভুল। নিস্পন্দ কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল। না, না, মনের ভুল নয়। আবার বেজে উঠল বেল। কেমন যেন একটা অস্বস্তি শুরু হয়েছে শরীরে। এমন তো হবার কথা নয়। তবে কি এই বইটায় যা লেখা আছে, সব সত্যি ! ডাইনির আগমন হলে হাত, পা ধীরে ধীরে অবশ হতে শুরু করে! বাইরে আবার ঝিরঝির করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে, প্রচণ্ড জোরে খুব কাছেই কোথাও আবার বাজ পড়ল। বুকটা ধড়াস করে উঠল। নিজের ওপর কিছুতেই নিয়ন্ত্রণ হারালে চলবে না। ধীর পায়ে ডোরা এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

* * *

আগন্তুকের মুখ দেখে মনে হল মহিলার বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ পঞ্চান্ন। ফ্যাকাসে রক্ত শুন্য মুখ, দাঁত গুলো যেন খোলা ঠোঁটের ফাঁকে একটু বেশি রকম চকচক করে উঠল হঠাৎ। অরুণ নেই, এই অবস্থায় এত রাতে দরজা খোলা হয়ত উচিত হয়নি। কিন্তু নিজের হাতের ওপরে সত্যি যেন কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিলনা ডোরার। কিছু বুঝে ওঠার আগেই, এবার যেন, ঝড়ের গতিতে ভিতরে ঢুকে এল মহিলা।

"বিশ্বাস করুন আমি খুব বিপদে পড়েছি, নাহলে এত রাতে বিরক্ত করতাম না।" অসম্ভব কাঁপছে মহিলা। এবার ওর অসহায় অবস্থা চোখে পড়ল ডোরার। ভয়ে, উৎকণ্ঠায় বিবর্ণ হয়ে গেছে মুখটা, ডোরা শান্ত স্বরে বলল, "কি হয়েছে? শরীর খারাপ লাগছে আপনার?" মহিলা ডুকরে কেঁদে উঠল, "আমার খুব বিপদ, কেউ আমাকে খুন করতে চায়... প্লিজ আমাকে বাঁচান..."

"আচ্ছা এত রাতে আপনি হঠাৎ আমার ঘরেই বা এলেন কেন?"

"বাড়ি ফেরার পথে, কোনোমতে মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে এখানে ছুটে এসেছি, বিশ্বাস করুন।"

"খুলে বলুন কি হয়েছে, আমার হাজব্যান্ড একজন পুলিশ অফিসার। যদিও উনি নেই এখন, তবে কোনো ভয় নেই আপনার।"

মহিলা ডুকরে উঠল... "আমার নাম সবিতা। সবিতা সেন। কিছুদিন হল কলকাতা থেকে ট্রান্সফার হয়ে এদিকে এসেছি। আসলে আমি একজন সোশ্যাল ওয়ার্কার। দুএকটা গ্রাম ঘুরে, ফিরতে ফিরতে এত রাত হয়ে যাবে, বুঝতে পারিনি।"

"তারপর?"

"যে রাস্তাটা দিয়ে আসছিলাম, সেটা একেবারেই নির্জন। যা ঘটল আমার সঙ্গে...।"

"কি হয়েছিল?"

"অন্ধকারে, একটা দীর্ঘ ছায়ামূর্তি এসে পড়ল গাড়ির একবারে সামনে। খুব জোরে ব্রেক চেপে কোনোমতে গাড়ি দাঁড় করালাম। ঠিক তখনই সে গাড়ির জানলায় এসে দাঁড়াল। বিপদে পড়েছে ভেবে কাঁচ নামাতেই দেখলাম ছুরি হাতে একজন মহিলা। আবছা অন্ধকারে ছুরিটা চকচক করে উঠল। মহিলার মুখটা ওড়নায় ঢাকা ছিল... কিছু বুঝে ওঠার আগেই সে, সোজা ছুরি চালিয়ে দিল আমায় লক্ষ্য করে।"

"বলছেন টা কি?"

"ঠিকই বলছি, তখন আর মাথা কাজ করছিল না। স্টিয়ারিং যে কোনদিকে ঘুরে গেল, প্রচন্ড জোরে ধাক্কা লাগল একটা গাছে। বিশ্বাস করুন তখনো সেই মহিলা মুহূর্তে চলে এসেছে জানলায়। ওর হাতে উদ্যত ছুরি...।"

"তারপর?"

"কোনোমতে রক্ষা পেয়েছি। উল্টোদিকের দরজা খুলে বার হলাম কোনোমতে। প্রাণ বাঁচিয়ে ছুটতে ছুটতে..."। শেষের কথা গুলো আর কথা বলতে পারলেন না ভদ্রমহিলা। জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন মেঝের ওপর।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ডোরা রান্নাঘরের দিকে ছুটে গেল, জলের পাত্রটা এনে, ভদ্রমহিলার মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিতে লাগল। একটু পরেই চোখ খুলল ভদ্রমহিলা।

"আপনি ঠিক আছেন?" ডোরা উত্তেজিত স্বরে প্রশ্ন করে।

"হ্যাঁ, একটু বাথরুমে যেতে পারলে ভালো হয়। বড্ড বমি আসছে।"

"নিশ্চই, আসুন আমার সঙ্গে" বাথরুমে ওকে পৌঁছে দিয়ে, বাইরের সোফায় এসে বসে ডোরা। তখনও মন টা অস্থির হয়ে আছে। ওই ব্ল্যাক ম্যাজিকের বইটা যেন চুম্বকের মত টানছে ওকে। উঠে ঘরে চলে গেল ডোরা। বইটা হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখতে লাগল আবার। ঠিক তখনই বাথরুম থেকে একটা আর্ত চিৎকার ভেসে এল। ডোরা দৌড়ে বাথরুমের দরজায় এসে দেখল দরজা সামান্য খোলা। ভদ্রমহিলা দরজার সামনেই পড়ে আছেন। অসহ্য যন্ত্রণায় একটা গোঙানির মত শব্দ বার হয়ে আসছে ওর মুখ থেকে।

"কি হয়েছে?" ডোরা অবাক হয়ে প্রশ্ন করে।

"বাথরুমের জানলায় কেউ উকিঁ দিচ্ছিল। কাঁচের বাইরে কেউ ছিল... সত্যি বলছি। আমি দেখতে গিয়ে পা পিছলে খুব জোরে আছড়ে পড়লাম।

ভীষণ ব্যথা করছে..." কোনমতে ওকে হাত ধরে তুলে সোফার ওপরে বসিয়ে দিল ডোরা। তারপরই এক দৌড়ে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল। যা ভেবেছিল ঠিক তাই, মহিলা ভুল দেখেন নি। জানলা দিয়ে উকিঁ দেবার চেষ্টা করেছিল কেউ। জানলায় কাঁচটা নামানো। ওখানে চোখ রাখতেই ডোরা একটু চমকে উঠল। বেশ জোরে যে ছুটে পালাচ্ছে... সে আর কেউ নয়, ঝুনু। এত রাতেও এসে ডোরার বাথরুমে উকিঁ দিচ্ছিল। ওর মতলব টা কি! মিসেস সেন তখনো ব্যথায় কাতরাচ্ছেন।

"আপনি আর একটু সহ্য করুন, আমি বরফ দিয়ে দিচ্ছি পায়ে। একটা পেনকিলার দিচ্ছি, খেয়ে নিন। আজ রাতটা এখানেই একটু রেস্ট নিন। কাল না হয় বাড়ি গিয়ে একবার ডক্টর দেখিয়ে নেবেন।" মনে মনে ডোরা ভাবে, অরুণ কে কাল সকালেই ঝুনুর ব্যাপারটা জানাতে হবে। আর ওকে বিশ্বাস করাটাই মুশকিল হয়ে যাচ্ছে।

ঠিক তখনই বাইরে থেকে আসা চিৎকার চেঁচামেচি শুনে দরজা খুলে বাইরে এল ডোরা। মনে হল কিছুটা দূর থেকে ভেসে আসছে আওয়াজ টা। তাড়াতাড়ি মিস সেনকে বরফ লাগিয়ে, মেডিসিন দিয়ে বাইরে থেকে দরজা লক করে দিল ডোরা। তারপর হাঁটতে শুরু করল শব্দ লক্ষ্য করে।

মোবাইল টর্চের আলোয় পথ চলতে চলতে ডোরার বিক্ষিপ্ত মনটা যেন আরো অস্থির হয়ে উঠতে লাগল। ঝুনুর বাড়ির কাছাকাছি এসে, ভয়টা যেন আরো চেপে ধরল ডোরাকে। কারণ ঝুনুর বাড়ির সামনে একটা ছোটখাটো জটলা চোখে পড়ল। "কি হয়েছে?" প্রায় দৌড়ে গেল ডোরা। ঝুনুর মা উদ্ভ্রান্তের মত বলল "আপনি আওয়াজটা শুনেছিলেন দিদিমণি?"

"কিসের আওয়াজ বলত?"

"কিছুক্ষণ আগেই, বিরাট এক্সিডেন্ট হয়ে গেছে। এই সামনের মোড়টাতেই..." তারপর ফিসফিস করে আবার বলল, "সবই ওই ডাইনির কারসাজি"

"ঝুনু কোথায়?"

ওর মা এদিক ওদিক তাকিয়ে একটু অন্যমনস্কভাবে বলল, "আমার সঙ্গেই তো খানিকক্ষণ আগে ছিল, এখন আবার কোথায় গেল? এত চঞ্চল না মেয়েটা।" সত্যি মোড়ের মাথায় বিরাট জটলা, পুলিশ, সঙ্গে স্থানীয় লোকজনের ভিড়। ডোরাকে দেখেই পুলিশ ইন্সপেক্টর এগিয়ে এলেন, "ম্যাডাম আপনি ?" ওকে একটু আড়ালে ডেকে ফিসফিস করে ডোরা বলল, "আরে, কি বলব আপনাকে, বড্ড বিপদে পড়ে গেছি। একজন অপরিচিত মহিলা আমার ঘরে

এসে হাজির হলেন হঠাৎ বললেন মারাত্মক বিপদ। সম্ভবত সত্যিই কেউ ফলো করছিল উনাকে।" ইন্সপেক্টর বাগচী বিস্মিত হয়ে যান, "বলেন কি ? কিছুক্ষণ আগে এখানে তো বিরাট এক্সিডেন্ট হয়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্য গাড়ির ড্রাইভার কে কিন্তু আশেপাশে তল্লাশি চালিয়ে কোথাও খুঁজে পাইনি আমরা। তবে, এত রাতে, অপরিচিত কাউকে দরজা খোলা আপনার কিন্তু ঠিক হয়নি ম্যাডাম। স্যার থাকলে কোনো ব্যাপার নয়, উনি নেই যখন।"

"আরে উপায় ছিলোনা। একজন অসহায় মহিলা বিপদে পড়েছেন! তাড়িয়ে দেব কিকরে!" চিন্তিত মুখে ইন্সপেক্টর বললেন, "দিনকাল ভালো নয়, একের পর এক এলাকার লোকজন নিখোঁজ হচ্ছে ম্যাডাম। এদের তো সেই ডাইনির ভূত চেপেই আছে মাথায়, যাকগে, চলুন আমি যাচ্ছি আপনার সঙ্গে। ওই মহিলাকে কিছু জেরা করে, প্রয়োজন হলে না হয় থানায় নিয়ে যাব।"

তখনো বিভিন্ন আলোচনা ডোরার কানে আসছিল, বেশ কিছুক্ষণ আগেই নাকি, কানফাটানো শব্দে দু একজনের ঘুম ভেঙে যায়। বাড়ির বাইরে বেড়িয়ে একটু এগোতেই, তারা বুঝতে পারে, বিরাট দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটা বড় গাড়ি সোজা এসে ধাক্কা দিয়েছে, মোড়ের বটগাছের গুঁড়িতে। এমন ভাবে দরজাটা দুমড়ে গেছে যে, হাজার চেষ্টা করেও সেটা খোলা যায়নি। লোকাল থানার পুলিশ এসে, অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করে যে, গাড়ির ভেতরে কিন্তু কেউ নেই। পুলিশ দেখেই স্থানীয় লোকজন আরো ভিড় বাড়ায়। ইতিমধ্যেই ইন্সপেক্টর বাগচীর দিকে উদ্বিগ্ন মুখে এগিয়ে আসে একজন, "বাবু, কিছু করুন। একেও নিশ্চই ডাইনি খেয়েছে। আর কত লোক যে মরবে।"

ঠিক তখনই বেজে উঠল ইন্সপেক্টর বাগচীর মোবাইল। অরুণ স্যার কলিং এত রাতে? স্যার ফোন করছেন কেন! একটু চমকে উঠলেন ইন্সপেক্টর।

"হ্যালো, স্যার"

ওপর প্রান্ত থেকে গম্ভীর কণ্ঠ ভেসে এল, "এত রাতে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। খুব মন দিয়ে শুনুন যেটা আমি বলছি আপনাকে। যে কারণে কলকাতা এসেছিলাম, সেই কাজ মোটামুটি হয়ে গেছে। সেই মারাত্মক সিরিয়াল কিলার কে ধরে ফেলবই আমরা। তাছাড়া ওপর মহল থেকে যথেষ্ট চাপ আছে।"

"স্যার, কিছুক্ষণ আগে একটা মারাত্মক এক্সিডেন্ট হয়েছে, আপনার বাড়ির কাছেই। আমি এখানেই আছি।"

"তাই নাকি, আপনি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন তো?" কথা গুলো সত্যিই যেন আর ঠিকমতো শোনা যাচ্ছিল না।

ততক্ষণে ডোরার সঙ্গে বাড়ির দরজায় প্রায় পৌঁছে গিয়েছেন ইন্সপেক্টর। হঠাৎ লাইন টা কেটে গেল। বাকি কথা গুলো একেবারেই শুনতে পেলেন না। ডোরা ততক্ষণে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে পড়েছে। ইন্সপেক্টর বাগচী একটু অবাক হলেন। ঘরের ভেতর এত অন্ধকার কেন? উদ্বিগ্ন গলায় বললেন,

"ম্যাডাম এত অন্ধকার কেন?"

"সেটাই তো আশ্চর্য! আমি তো লাইট জ্বালিয়ে গিয়েছিলাম। এখন সুইচ তো অন করাই রয়েছে, কি হল?"

"ফিউজ উড়ে গেছে কি? আমি দেখছি।"

মোবাইল টর্চের আলোটা ঠিক তখনই সোফার ওপর পড়তেই আর্তনাদ করে উঠলেন ইন্সপেক্টর। সেখানে পড়ে আছে একজন মহিলার রক্তাক্ত দেহ। তার গলার নলি কেউ ধারালো কোনো অস্ত্র দিয়ে কেটে ফেলেছে, সেখান থেকে ক্রমাগত রক্তক্ষরণ হয়ে ভিজে গেছে মহিলার দেহের পোশাক। চোখ বিস্ফারিত। উঃ! কি মারাত্মক সেই দৃশ্য!

"ম্যাডাম, কোথায় আপনি? শুনতে পাচ্ছেন? ম্যাডাম কোথাও যাবেন না। খুব সাবধান। সেই মারাত্মক খুনি কিন্তু এই ঘরেই ঢুকেছে বলে মনে হচ্ছে।" কোনো সাড়া এলোনা ওপর প্রান্ত থেকে।

"ম্যাডাম, শুনতে পাচ্ছেন? যেকোনো মুহূর্তে কিছু ঘটে যেতে পারে। বি কেয়ারফুল! ম্যাডাম..." শুধু কিছু বুঝে ওঠার আগেই চকিতে কেউ ঝাঁপিয়ে পড়ল ইন্সপেক্টর বাগচীর ওপর। তার গলার নলি কেটে দিল মুহূর্তের মধ্যে! ভেসে এল একটা হিসহিসে কণ্ঠ স্বর, "আমাকে ধরা অত সহজ নয় ইন্সপেক্টর, তাহলে যার সঙ্গে এত বছর সংসার করছি, সে অন্ততঃ আমাকে ধরে ফেলত।

হা... হা....হা....."

* * *

পরদিন ভোরেই ডোরার ফোন পেয়ে, ইন্সপেক্টর অরুণ রীতিমতো চমকে উঠলেন। সারারাত কাজের পর, একটু চোখ লেগে এসেছিল ভোরের দিকে, ঘুম জড়ানো স্বরে বললেন, "ডোরা, কি হয়েছে, এত সকালে ফোন করছ কেন?"

ডোরা ফুঁপিয়ে ওঠে... "সর্বনাশ হয়ে গেছে অরুণ। পিছনের মাঠে প্রচুর লোকজনের চিৎকার শুনে ঘুম ভেঙে ছুটলাম, ইন্সপেক্টর বাগচীকে কেউ খুন করেছে। সবাই তো বলছে ডাইনি একসাথে তিন তিনটে শিকার করেছে কাল রাতে। ঝুনু কে পর্যন্ত..."

কথা শেষ করতে পারে না... কান্নায় ভেঙে পড়ল ডোরা। অরুণের গলা ভেসে এল... "প্লিজ, নিজের খেয়াল রাখো, আমি না ফেরা অবধি একটু সাবধানে থেকো...।"

"তাড়াতাড়ি ফেরো প্লিজ....ভয়ে হাত পা ঠান্ডা হয়ে আসছে আমার"

ফোনটা রাখার পরেই একটা পৈশাচিক হাসি ফুটে উঠল ডোরার মুখে। ঝুনু ওকেই ডাইনি বলে সন্দেহ করতে শুরু করেছিল। দু একদিন রাতে ফলো পর্যন্ত করেছিল ডোরা কে। যদিও ডোরাকে ধরা অত সহজ নয়। শেষ পর্যন্ত মিসেস সেন কে সাবধান করতে পৌঁছে গিয়েছিল বাথরুমের জানলায়। আর ওকে বাঁচিয়ে রাখা ডোরার সম্ভব ছিলনা। বাথরুমের খোলা জানলার ওপর থেকেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নীচে। ঝুনু পালানোর চেষ্টা করেও পারেনি।

তাছাড়া এটা তো নতুন কিছু নয়। রোজ রাতেই তো লুকিয়ে শিকারে বার হয় ডোরা। দুধে ঘুমের ওষুধ মেশানো থাকে বলে, অরুণ টের পর্যন্ত পায়না। তবে গতকালের মত একসাথে তিন তিনটে শিকার! উঃ! কি যে পরম তৃপ্তি ! এই মানুষ খুনের নেশাই তো ওর একমাত্র নেশা। সেটা তো নতুন নয়। বরাবর ছিল। শুধু উপযুক্ত সময় আর সুযোগের অপেক্ষায় থাকে সে।

ডাইনির ভয়ে এলাকার লোক কাঁপছে দিনরাত। তারা কি কোনোদিন জানবে ঘাতক তাদের চোখের সামনেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। যে কোনো দিন তারা যে কেউ পরিণত হবে সেই ঘাতকের শিকারে। তাদের খুন করে নিজের লালসা নিবৃত্ত করবে এক মারাত্মক আততায়ী। মানুষের জীবন বড়ই অনিশ্চিত। কখন যে কার পালা আসে কে বলতে পারে!

দেড়শো সাল পিছিয়ে

শুভময় মন্ডল

কলকাতার একটি সরকারি অফিসের বড়িষ্ঠ করনিক আমি। সরকার বদল হলো, নিয়ম নীতিও বদলালো। এক এক করে শহরের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অফিসগুলোরও স্থান বদল করানো হলো। প্রাইভেট প্রপার্টিতে ভাড়ায় থাকা অফিসগুলোকে সরিয়ে এনে সরকারি আওতায় থাকা বাড়িগুলোতেই এ্যাডজাস্ট করানো শুরু হলো। এই ঘটনাটা সেই সময়ের, মানে আজ থেকে বছর সাতেক আগেকার কথা বলছি।

যথারীতি আমাদের অফিসও সেই স্থানবদলের আদেশের আওতায় পড়ল। আমরা যে বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়ে আসবো বলে স্থির হল সেটা বহু প্রাচীন, ইংরেজ আমলের তৈরী একটি বাড়ি। সম্ভবত সেটা একটি সরকারি অফিস বিল্ডিং হিসেবেই তৈরি করা হয়েছিল।

খুব সঙ্গত কারণেই, আমি সেই অতি পরিচিত ঐতিহ্যবাহি বাড়িটার সম্পর্কে জনমনে কোনও অপশ্রুতি প্রচার পাক চাইছি না। তাই তার নাম ঠিকানা এখানে বলতে পারছিনা, মাফ করবেন। তবে এটুকু বলি, সেখানে আমাদের প্রায় সকলেরই খুবই পরিচিত এবং জানা এক গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের অফিস ছিল। অবশ্য নামে কি এসে যায়, এই ঘটনাটা সে যে বাড়িতেই ঘটুক না কেন, সম্মুখীন যেই হবে তারই বুক কেঁপে উঠবে এটা নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি। যাই হোক, আর কোনো গৌরচন্দ্রিকা না করে বরং মূল ঘটনাটায় আসি।

আমরা এই বাড়িতে সমূলে উঠে আসার আগে সামান্য কিছু রিপেয়ার মেইনটেনেন্স করানো হয়েছিল। তাই অফিস শিফ্ট করার প্রথম দিন আমরা কয়েক জন গিয়েছিলাম সেই প্রাচীন অফিস বিল্ডিংটা সরেজমিনে দেখতে আর খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয় এমন কিছু ফাইলপত্র এবং অন্যান্য জিনিসপত্র সেদিন সেখানে রেখে আসবো বলে। তখন বিকেলও প্রায় শেষ পর্বে, আর অফিসে ফেরারও তাড়া নেই। জিনিসপত্র সব সেই নতুন অফিসের একটা ঘরে গুছিয়ে রেখে সটান যে যার বাড়ির দিকে রওনা দেবো ওখান থেকেই। আমাদের সেই

গ্রুপটায় সেদিন আমিই পদাধিকারবলে সিনিয়র মোস্ট ছিলাম, তাই আমাকেই আগে ঢুকতে হলো বাড়িটিতে।

বাড়িটি তিন তলা, ভিতরে প্রবেশ করেই উল্টো দিকের বারান্দা থেকে উপরে ওঠার চওড়া সিঁড়ি। আমরা ঢোকার পরেই দোতলার বারান্দায় যেখানে সিঁড়িটা উঠেছে সে দিক পানে চোখ গেল আমার। দেখি, এক লাল মুখো ইংরেজ, পরনে সাবেকি পুলিশের লাল সাদা পোশাক, মাথায় হ্যাট, সেখানে দাঁড়িয়ে স্যালুট করলো আমাদের পানে চেয়ে।

প্রথমে বিষয়টা আমার চোখে লাগেনি, কারণ আমাদের সরকারি দপ্তরটিতেও বড় সাহেবদের স্যালুট করার রীতি এখনও মেন্টেনড্ হয়। কিন্তু কয়েক মুহূর্তেই আমার মাথায় এলো যে, এই অফিসে তো আমরা আজ প্রথম এলাম! এর আগে তো আমাদের কেউই এখানে আসেনি, তাহলে স্যালুট করলো কে? আর কেনই বা করল? তাও আবার প্রাচীন কালের ইংরেজ সৈন্যদের পোশাকে?

চিন্তাটা মাথায় আসতেই আবার উপর পানে চাইলাম কিন্তু দেখি সেখানে কেউ কোথাও নেই! একটু আশ্চর্য লাগলেও আমারই মনের ভুল ভেবে, কাউকে কিছু না বলে বিষয়টা চেপে গেলাম। কয়দিন ধরেই এই প্রাচীন বাড়ি, সেখানে ইংরেজ আমলে ঘটা নানা ঘটনা নিয়ে কত জনশ্রুতি, অপপ্রচার এইসব নিয়ে আলোচনা চলছিল আমাদের অফিসে, তাই ভাবলাম নিশ্চয়ই তারই ফলে অবচেতন মনে ঐরকম খেয়াল এসেছিল আমার।

দোতলার একটা ঘরে ফাইল ও অন্যান্য জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা হচ্ছিল। আমাদের দু'তিনজন কন্টিনজেন্ট স্টাফ মিলে গাড়ি থেকে সেগুলো বের করে এনে সেখানে সাজিয়ে রাখছিল। আমি ঘরটার সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে চারিদিকটা চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম আর ভাবছিলাম –

...প্রবল ইংরেজ, বিকীর্ণ করেছে তার তেজ...

...শূন্যপথে চাই, আজ তার কোন চিহ্ন নাই...

-এক্সকিউজ মী।

একটি মৃদু সুরেলা নারীকণ্ঠের আওয়াজে রবীন্দ্র ভাবনায় ছেদ পড়ল আমার। সাড়া দেব বলে ফিরতেই দেখি এক সাদা গাউনে সর্বাঙ্গ ঢেকে দাঁড়িয়ে এক বিদেশিনী! গোধূলির মৃদু আলোয়, আর সেই বারান্দায় পর্যাপ্ত বৈদ্যুতিক আলোর অভাবে তার মুখটা স্পষ্ট দেখতে পেলাম না। আমাকে জিজ্ঞেস করলো – উইল ইউ প্লীজ ইনফর্ম মী হয়্যার ইজ দ্য ল্যাভাটরী হিয়্যার?

আমি কলমপেশা কেরানি, ভাষার দৌড় বাংলার বাইরে ভাঙাচোরা হিন্দি অবধি, সেও টিভিতে খেলার ধারা বিবরণী শুনে শুনে যেটুকু রপ্ত করতে পেরেছি ততটুকুই। এমন চোখা উচ্চারণে ইংরেজি বলতে কাউকে বাপের জন্মে দেখিওনি, শুনিওনি, তায় এ আবার খোদ মেম! আমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে তিনি যেচে ইংরেজিতে কথা বলছেন! সেই অকল্পনীয় ঘটনার আকস্মিকতায় ভ্যাবাচাকা খেয়ে যাওয়া আমার মুখ দিয়ে আর তখন কথা সরলো না, শুধু আঙুলের ইশারায় তাঁকে শৌচাগারটা দেখিয়ে দিলাম। মেমসাহেব দ্রুত গতিতে সেই শৌচাগারে গিয়ে ঢুকলেন। আমি অবাক বিস্ময়ে সেদিক পানে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম নিশ্চুপ।

কতক্ষণ ঐভাবে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখানে জানি না, হাতের সিগারেটটা ফুরিয়ে এসে আমার আঙুলে আগুনের ছ্যাঁকা লাগতে তবে আমার হুঁশ ফিরলো। তাকিয়ে দেখি জিনিসপত্র সব গুছিয়ে রেখে দরজায় তালা ঝুলিয়ে দিয়ে নিচে নেমে গেছে বাকিরা। গাড়িটার সামনে জটলা পাকিয়ে গল্পগুজব করছে তারা। তাদের দলে আর সবাইকে দেখলেও অভিজিৎকে দেখলাম না!

অভিজিৎ আমার অধস্তন কলীগ, তার বাড়িও আমার বাড়ির দিকে একই রেল লাইনে, আর কয়েকটি স্টেশন পরেই। আমরা যাতায়াতও করি এক সঙ্গেই, আমার সঙ্গে ট্রেনে গল্প করতে করতে ফিরবে বলেই সেও এসেছে এখানে, নাহলে তার আসার দরকার ছিল না। এই বাড়িটাতে আমার পিছুপিছু সেও ঢুকেছিল, আমার ভালোই মনে আছে।

ভালো করে এদিক ওদিক চেয়েও অভিজিৎকে দেখতে পেলাম না। একটু চিন্তা হলো, তাই ওখান থেকেই আওয়াজ দিলাম আমাদের সেই কনটিন্জেন্ট স্টাফেদের একজনের উদ্দেশ্যে – এই সুমিত, অভিজিৎ কোথায় গেল রে?

সুমিত একটু জোর গলায় সাড়া দিলো – স্যার, অভিজিৎ স্যার বোধ হয় তিনতলায় গিয়েছেন। আপনার সঙ্গেই তো উপরে উঠলেন দেখলাম। নাহলে বাথরুমে হবেন বোধ হয়, দেখুন।

বাথরুমে? কিন্তু ওখানে তো মেমসাহেব গেলেন! আরে বাপরে! দ্রুত সেদিকে পৌঁছে দেখি তার দরজায় তালা ঝুলছে, তাহলে? বাথরুমটায় বোধ হয় প্লাম্বারগুলো কাজ করে নিজেদের যন্ত্রপাতি সব রেখে গেছে বলে তালা... তবে যে সেই মেমসাহেব এসে ঢুকলেন! তালাটা ভালো করে পরখ করলাম – সেভেন লিভারের আলিগড়ের তালা, এত সহজে তো কেউ খুলতে পারবে না! তাছাড়া, আমি তো এদিকে তাকিয়েই দাঁড়িয়ে ছিলাম... তাহলে কি আবার মনের

ভুল! কিন্তু তা' কি করে হবে? সেই মেমসাহেবের অমন ইংরেজি ভাষায় বলা কথাগুলো যে এখনও কানে বাজছে আমার!

এইসব ভাবতে ভাবতেই কানে এলো কিছু তবলা আর হারমোনিয়ামের আওয়াজ। শব্দটা উপর থেকে, মানে তিনতলার কোন ঘর থেকে আসছিল মনে হলো। তাই সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলাম। তিনতলায় একটা বড় রিক্রিয়েশন রুম রয়েছে স্টাফেদের জন্য, তার পাশেই একটা ক্যান্টিনও আছে, আর আছে দু' তিন জন সিনিয়র অফিসারদের কাজের জন্য বানানো ক্যুপ। আওয়াজটা রিক্রিয়েশন রুম থেকে আসছিল। তাই আমি সেখানেই গেলাম।

রিক্রিয়েশন রুমে একটা কাঠের পাটাতন দিয়ে বানানো স্থায়ী স্টেজ রয়েছে দেখলাম। সেখানে সাজিয়ে রাখা হারমোনিয়াম, তবলা, সানাই দেখে মনে হচ্ছে এখনই বুঝি শুরু হতে চলেছে পরবর্তী শো। আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম সেই সব বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ, কিন্তু বাজনদার কাউকেই নজরে পড়ল না। ভালো করে চেয়ে দেখি স্টেজের ওপর সামনেই পা ঝুলিয়ে বসে আছে অভিজিৎ। একমনে সে যেন সেই অদ্ভুত আবহ সঙ্গীত শুনছে আর মৃদু মৃদু দুলে দুলে তাল ঠুকছে! তার পাশেই রাখা আছে একটা বিকট দর্শন মুখোশ। স্টেজের মৃদুমন্দ আলোয় দেখে মনে হল সেই মুখোশটাও যেন সুরের তালে তালে দোল খাচ্ছে স্টেজের ওপর। আমি কাছে গিয়ে ডাক দিলাম – অভিজিৎ, অভিজিৎ, চলো সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, বাড়ি ফিরতে হবে তো! সে কেমন ঘোলাটে দৃষ্টিতে, যেন অনেক কষ্টে, পরিশ্রম করে ধীরে ধীরে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো আমার দিকে। সেই মুখোশটা কিন্তু চট করে ঘুরে গেল আমার দিকে। মা কালীর হাতে রক্তবীজের যে কাটা মুণ্ডুটা দেখি ঠিক যেন সেটাই ছিল ঐ মুখোশটা! অভিজিৎ খুব ক্ষীণ স্বরে বললো – আমায় কিছু বলছেন?

তার গলার আওয়াজ শুনে চমকে উঠলাম – এ কোন বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর শুনছি আমি? তরুণ অভিজিৎ-এর গলার আওয়াজ তো এটা নয়!

চমকে উঠে প্রশ্ন করলাম – কে আপনি!

আমি? কে? দেখবে?

বলতে বলতে মুখোশটা তুলে মাথায় পরতে গেল অভিজিৎ। কেমন যেন আসন্ন বিপদের সংকেত পেয়ে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল – না অভিজিৎ, না, ওটা পরো না তুমি, চলে এসো। এই বলে তাকে আমি হাত ধরে টেনে স্টেজ থেকে নামিয়ে আনার চেষ্টা করতেই ছিটকে পড়ে গেল মুখোশটা। কিন্তু পরক্ষণেই দেখি সেটা আপনার থেকেই ছিটকে ফিরে আসছে আমার দিকে।

ভয় পেয়ে অভিজিৎকে ওখানেই ছেড়ে দৌড়ে বেরিয়ে এলাম সেই রিক্রিয়েশন রুম থেকে। সেই মুখোশটা দেখি ঠোক্কর খেতে খেতে দিয়ে আসছে আমার দিকেই। পড়ি-মরি করে সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকি নিচের দিকে।

দোতলার বারান্দায় দেখি দাঁড়িয়ে আছে সেই লালমুখো ইংরেজটা, আর তার পাশে আমার সঙ্গে কথা বলা সেই মেমসাহেব! আমার দিকে আঙুল তুলে দু'জনে হো হো করে হাসছে আর সেই হাসির শব্দটা মোটেই মানুষের হাসির মত স্বাভাবিক শব্দ নয়, যেন হাড়ে হাড়ে ঠোকা লেগে উৎপন্ন হচ্ছে সেই বিদ্রুপাত্মক হাসি। আমার ভয়ের মাত্রা যেন দশগুণ বাড়িয়ে দিল তাদের সেই হাসি।

আরও দ্রুত বেগে ছুটে নেমে আসি নিচে। সদর দরজার পাশে বেসিনের ট্যাপ থেকে যেন কলকল করে জল পড়ার আওয়াজ পেলাম। রাস্তায় বেরিয়ে যাবার আগে একটু চোখে মুখে জল দেবো বলে সেদিকে এগিয়ে গিয়ে দেখি কোনো জলের লাইন করাই হয়নি তখনও সেখানে অথচ ছড়ছড় করে জল পড়ছে বেসিনের কল থেকে!

"সুমিত" বলে জোর গলায় একটা আওয়াজ দিয়ে চেতনা হারিয়ে লুটিয়ে পড়লাম আমি সেখানেই। দরজার সামনেই রাস্তায় গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অফিসের সবাই ছুটে এল আমার দিকে। সম্পূর্ণ চেতনা হারানোর আগে তিনতলার দিকে আঙুল দেখিয়ে "অভিজিৎ" বলে জ্ঞান হারালাম আমি।

চেতনা ফিরলো যখন, আমি তখন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বেডে শুয়ে। পাশে চিন্তিত মুখে বসে আমার সহকর্মীরা। আমার জ্ঞান ফেরার সংকেত পেয়ে তারা এগিয়ে এসে ধরে বসিয়ে দিল আমায় – শরীরটা কেমন বোধ করছেন? চোট টোট লাগেনি সম্ভবত, তবু কোথাও ব্যথা করছে কি আপনার? আমি একটু ধাতস্থ হয়ে বললাম, না, কোনো ব্যথা ট্যাথা তো লাগছে না। তারপরেই তাদের জিজ্ঞাসা করলাম – অভিজিৎ? সে কেমন আছে? সুমিত বললো – অভিজিৎ স্যারের তো জ্ঞান ফেরেনি এখনও। আমরা তিনতলায় গিয়ে দেখি তালাবন্ধ রিক্রিয়েশন রুমের দরজায় একটা রাক্ষসের মুখোশ পরে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। মুখোশটা কিভাবে পরেছেন কি জানি, কিছুতেই খুলতে পারা গেল না। ঐ অবস্থাতেই হসপিটালে নিয়ে আসতে হলো। এই তো পাশের বেডেই আছেন তো স্যার, দেখুন না।

আমি চেয়ে দেখি, অভিজিৎ অচেতন অবস্থায় শুয়ে আছে বেডে, তার মাথার পাশেই তার মুখ থেকে ডাক্তারের কাঁচি দিয়ে কেটে খুলে রাখা হয়েছে সেই মুখোশটা। আমার অবচেতন মনে কে যেন বললো, ঐ মুখোশটাই যত নষ্টের

গোড়া। ওটাকে ধ্বংস না করলে সুস্থ হবে না অভিজিৎ।

আমি পকেটে হাত দিয়ে দেখি সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার দু'টোই আছে সেখানে। লাইটারটা পকেট থেকে বের করে অভিজিৎ-এর বেডের পাশে এসে মুখোশটাকে তুলে নিলাম অন্য হাতে। তারপর জানালার পাশে দাঁড়িয়ে লাইটারের আগুনে পুড়িয়ে ফেললাম মুখোশটা। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল মুখোশটা।

বারান্দায় একটা পানীয় জলের ডিসপেন্সার রাখা ছিল। সেখানে গিয়ে জলে ধুলাম হাতটা, নিজের মুখে চোখে একটু জলের ঝাপটা দিলাম। তারপর এক আঁচলা জল এনে ঝাপটা দিলাম অভিজিৎ-এর মুখে। সঙ্গে সঙ্গে চেতনা ফিরে পেয়ে উঠে বসলো সে।

মাতৃশক্তি

পল্লব হালদার

সেদিন সারাদিন বিভিন্ন মানুষের হাত দেখে, কুষ্ঠিবিচার করে বেশ ক্লান্ত হয়ে নিজের বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছিলেন বিখ্যাত জ্যোতিষ ও তন্ত্রবিশারদ বিশ্বনাথ আচার্য। এই ক্লান্তিটা যতটা না শারীরিক তার থেকে অনেকটাই মানসিক। বিশ্বনাথ আচার্য কোনদিনই ভালোবেসে এই হাতদেখা আর কুষ্ঠিবিচার করেন না। যেটুকু করেন পেটের দায়ে। তার বরাবরের ভালোলাগা অসহায় মানুষদের অলৌকিক বিপদের হাত থেকে রক্ষা করা। কাজটাতে বিপদ থাকলেও একটা কেমন যেন রোমাঞ্চ থাকে। সেই বিপদযুক্ত কাজ কবে যে তার ভালোলাগায় পরিণত হয়েছিল তা তিনি নিজেই জানেন না। আজ প্রায় তিন মাস হয়ে গেল এমন কোন কেস তার হাতে এলো না। তাই এমন মনমরা।

একটু আগে সর্বক্ষণের কাজের লোক বিনোদ এক কাপ চা দিয়ে গেছে। সেটা খেতেখেতে আনমনা দৃষ্টিতে খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিলেন তিনি। মনটা কেমন যেন আজ তার নিজের গ্রামের প্রতি বারবার টানছে। বারবার মনে পড়ে যাচ্ছে ছোটবেলার সুখস্মৃতি। গ্রামের মাঠ,ঘাট,পুকুর। নিজের বাবা মা কাকা কাকিমা ঠাকুরদা ঠাকুরমা সব সবকিছু তার স্মৃতির মনিকোঠায় হঠাৎ যেন আজ অতি উজ্জ্বল। যখন বিশ্বনাথ আচার্য ঘর ছাড়েন তখন তিনি সদ্য কৈশোরে পা দিয়েছেন। আজ তিনি বিগত যৌবনা। এত বছরে তিনি কোনদিনই নিজের গ্রাম পরিবারকে নিয়ে ভাবেন নি, হয়তো মনেই আসেনি। এমনকি আজ তার পরিবার কেমন আছে তাও জানেন না। বাবা-মা আজ জীবিত কিনা সে বিষয়েও সম্পূর্ণ অজ্ঞ তিনি। কিন্তু আজ কেন? কেন এই বিহ্বলতা? তবে কি তার গ্রাম তার পরিবার বিপদে আছে? কে জানে?

হঠাৎ কলিংবেলের শব্দে তিনি চমকে উঠলেন। কাজের লোকের উদ্দেশ্যে দরজা খোলার নির্দেশ দিয়েই তিনি তৈরি হয়ে বৈঠকখানায় গিয়ে বসলেন। "বাবু অনেক লোক এসেছে! বলছে আপনার সাথে দেখা করবে! খুব দরকার! কি নাকি বিপদ! আর বলল ওরা নাকি আপনার গ্রামের লোক!" বিনোদের

কথাগুলো শেষ হয় না, তার আগেই বিশ্বনাথ আচার্য লাফিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন। তবে কি তার আশঙ্কায় সত্যিই? বিপদ আসন্ন?

ঘরে প্রথমে যিনি প্রবেশ করলেন তাকে বিশ্বনাথ আচার্য চেনেন। বয়স হলেও বুঝতে অসুবিধা হয় না ইনি পাড়ার সবথেকে গণ্যমান্য লোক অধীরবাবু। ছোটবেলায় দেখলেও চিনতে অসুবিধা হয় না বিশ্বনাথের। এক ছুটে তাকে প্রণাম করেন বিশ্বনাথ। ততক্ষণে গ্রামের বাকি সব লোক তার বৈঠকখানায় প্রবেশ করেছে। বেশিরভাগ তার অচেনা হলেও কয়েকজনকে চেনেন বিশ্বনাথ। বিশেষ করে তার বাল্যবন্ধু বিকাশকে। নানান কথাবার্তার মাঝে বিশ্বনাথ জানতে পারে তার পিতামাতা বহু আগে গত হয়েছেন। কয়েক মাস আগে তার কাকা কাকিমাও কলেরায় মারা গিয়েছেন। এখন তাদের জমি জায়গা বিষয়সম্পত্তি সবটুকুই তার ভাইপোরা দেখাশোনা করে। কথাগুলো কেমন যেন তীক্ষ্ণ ফলার মত বিদীর্ণ করে বিশ্বনাথের হৃদয়কে। হোক সে সাধু, হোক সে ব্রহ্মচারী! পিতামাতা নিজের আপন পরিবার-পরিজনকে হারানোর কঠিন যন্ত্রণা অনুভব করে না, এমন পাষণ্ড মানুষ যে অস্তিত্বহীন।

সামান্য জলযোগের পরে গ্রামের সবাই বিশ্বনাথকে ঘিরে বসে। এগিয়ে আসেন বৃদ্ধ অধীরবাবু। তিনিই শুরু করেন। "বিশ্বনাথ আজ আমাদের গ্রাম বড়ই বিপদে! বাঁচাও বাবা! তুমিই আমাদের শেষ ভরসা। অনেক খুঁজে তোমাকে পেয়েছি। আমরা জানি ওই ভয়ানক বিপদের হাত থেকে আমাদের যদি কেউ বাঁচাতে পারে, সে হলো তুমি!" কথাগুলো শেষ করতে পারেন না বৃদ্ধ অধীরবাবু তার আগেই এক অজানা ভয় তার শরীরকে জাপটে ধরে।

এবার শুরু করে বিশ্বনাথের বাল্যবন্ধু বিকাশ, "তোর আবুল সাহেবের দরগার কথা মনে আছে?"

"হাঁ রে! কেন মনে থাকবে না। সেবার আমার জ্বর হলো! কিছুতেই সারছিল না! কবিরাজের পাচন খেয়েখেয়ে তখন আমার নাভিশ্বাস উঠেছে। বাবা, মা ধরেই নিয়েছিল আমি আর বাঁচবো না। শেষে ওই দরগার আবুল সাহেবের মন্ত্রপূত জল খেয়ে সুস্থ হয়েছিলাম।" কথাগুলো বলতে বলতে আবারও স্মৃতির অতল গহবরে হারিয়ে যায় বিশ্বনাথ। সেই জ্ঞান হওয়া থেকে বিশ্বনাথ দেখে আসছে ওই আবুল সাহেবের দরগা। নদীর ধারে ছোট্ট একটা কাঁচামাটির খড়ের ঘর। বড় ভালো আর ধার্মিক মানুষ ছিলেন আবুল সাহেব। তখন গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসাব্যবস্থা বলতে ছিল কেবল গ্রাম্য কবিরাজের গাছগাছড়া। কবিরাজমশায়ের পাচন যখন ফেল করত, তখন ওই পীরবাবা আবুল সাহেবই

শেষ ভরসা ছিলেন। গ্রামের কত শত অসহায় নিরীহ মরণাপন্ন মানুষকে তিনি সুস্থ করেছিলেন, তার ইয়ত্তা নেই। গ্রামের লোক ওনাকে সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি হিসেবে মানতেন। পীরবাবার এই কাজে সাহায্য করত তার একমাত্র শিষ্য সুলতান।

ওদিকে বিকাশ বলতে থাকে, "তুই যে বছর সাধু হওয়ার জন্য গ্রামছাড়া হলি, সেইবছর শীতের এক সন্ধ্যায় আবুল সাহেব নদীতে কোন একটা কাজে গিয়েছিলেন। হঠাৎ একটা কুমীর ওনাকে নদীতে টেনে নিয়ে যায়। তখন সুলতান ওখানে ছিল না। কোনো কাজে বাইরে গিয়েছিল। যখন সে ফেরে তখন সব শেষ। কেবল পীরবাবার খুবলে খাওয়া রক্তাক্ত দেহাবশেষ নদীর চড়ায় পড়ে। সেই সন্ধ্যায় সমস্ত বিধি মেনে পীরসাহেবকে ওই দরগার মধ্যেই কবর দেওয়া হয়। ঘটনার পরে সুলতানও কোথায় যেন হারিয়ে যায়।"

এই অব্দি বলে খানিক চুপ করে বিকাশ। তারপর একটু দম নিয়ে আবারও শুরু করে, "গতবছর আমার ছেলে ডাক্তারী পাশ করে! ছেলের ছোট থেকেই ইচ্ছে ছিলো গ্রামের মানুষের সেবা করার। তাই আমি একজন নেতাকে ধরে গ্রামে একটা হাসপাতাল তৈরির ব্যবস্থা করি। ওই পীরবাবার দরগার পাশেই। কিন্তু কাজ করতে করতে জায়গা বেশ খানিকটা কম পড়ে। তাই বাধ্য হয়ে আমাদেরকে ওই আবুল সাহেবের কবর ভেঙে হাসপাতাল তৈরি করতে হয়। হয়তো এটাই আমাদের সবথেকে বড় ভুল ছিল,তাইতো আজ গোটা গ্রাম ভয়ানক বিপদে।" বিশ্বনাথ যতই শুনছে ততই অবাক হচ্ছে।

"সেদিন ছিল গ্রামের মানুষদের জন্য এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত! হাসপাতালের উদ্বোধন! প্রায় তিরিশজন রোগী চারজন ডাক্তারকে নিয়ে শুরু হয়েছিল আমাদের পথচলা। নিজের ডাক্তার ছেলেকে গ্রামের মানুষদের সেবা করতে দেখে গর্বে বুকটা ফুলে উঠেছিল। ভেবেছিলাম এই তো সুখের শুরু। কিন্তু সুখ দীর্ঘমেয়াদি হলো কই? তার আগেই আমার ছেলেটা...।" ডুকরে কেঁদে ওঠে বিকাশ।

বিশ্বনাথ চেঁচিয়ে ওঠে, "কেনরে বিকাশ? কি হয়েছিল তোর ছেলের?"

এবার অধীরবাবু বলতে শুরু করলেন, "ওই দিন রাত্রে হঠাৎ গ্রামের মধ্যে এক ভয়ানক পৈশাচিক হুঙ্কার শোনা যায়। "ছাড়বো না! আমি কাউকে ছাড়বো না!" প্রথমে আমরা ভয় পেলেও একে একে সাহসে ভর করে সবাই একসাথে বাইরে বেরিয়ে আসি। দেখি এক বিকট দর্শনধারী ছায়ামূর্তি হুঙ্কার দিতে দিতে আমাদের হাসপাতালের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরাও তাকে অনুসরণ করলাম। দেখলাম সেই ছায়ামূর্তি ঠিক হসপিটালের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। আর গর্জন

করে উঠল, "আমি কয়েকদিন বাইরে গিয়েছি আর তোরা এর মধ্যেই আমার গুরুর সমাধির উপর হাসপাতাল বানিয়েছিস! এখনই ভেঙে ফেল তোদের এই হাসপাতাল। গুরুকে শান্তিতে ঘুমাতে দে। নাহলে মরবি! সবাই মরবি! আমি কাউকে ছাড়বো না!" বুঝলাম ওটা পীরবাবার শিষ্য সুলতানের প্রেতাত্মা। আমরা তখন ভয়ে আধমরা। দেখলাম হাসপাতালের ডাক্তাররা বাইরে বেরিয়ে এসেছেন। বিকাশের ছেলেও ছিল তার মধ্যে। তারাও এই অতিপ্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে আর হুংকার শুনে ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে।

যা হোক আমরা ব্যাপারটাকে বেশি গুরুত্ব দিলাম না। কিন্তু পরেরদিনই অঘটনটা ঘটে গেল। ওই হাসপাতালে সমস্ত রোগী আর বিকাশের ছেলে সমেত বাকি তিন ডাক্তার সকাল থেকেই রক্তবমি শুরু করলো। শহর থেকে ডাক্তারের দল ছুটে এলেন। মেডিক্যাল ক্যাম্প বসলো। কিন্তু তাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে দুপুরের আগেই ওরা মারা গেল। ওই শহুরে ডাক্তাররা বুঝতেই পারলো না এতগুলো মানুষের মৃত্যুর কারণ। সেই শুরু, এরপর ওই হসপিটালে যে রাত কাটিয়েছে, সে মরেছে। কত ডাক্তার, কত নার্স, কত রোগী বিনা কারণে রক্তবমি করতে করতে মরেছে তার হিসাব নেই। এখনতো হসপিটাল বন্ধ করে রাখা হয়েছে। কিন্তু এভাবে কতদিন? গ্রামের লোক যে বিনা চিকিৎসায় মরছে!"

এবার অধীরবাবু অজানা ভবিষ্যতের আশঙ্কায় কেঁদে ফেললেন। অধীরবাবু একটু ধাতস্থ হতে বিশ্বনাথ জিজ্ঞাসা করেন, "আচ্ছা আপনারা গ্রামে পুজোপাঠ বা হোমযজ্ঞ কিছু করেননি?"

"সে আর করিনি! কতশত ব্রাহ্মণ, কতশত পূজারী, সাধক পুজো করে গেলেন, হোম করলেন, যজ্ঞ করলেন। কিন্তু লাভ কিছুই হলো না। উল্টে পরেরদিন সেইসব হতভাগ্য পুজারীর দল রক্তবমি করতে করতে মারা গেলেন। এখন তো আর ভয়ে কোন পূজারী আমাদের গ্রামে আসতে চান না।"

এবার বিশ্বনাথের সমস্ত ব্যাপারটা বোধগম্য হলো। বিপদ যে আগত সেটাও অনুভব করলেন। এখনই গ্রামে ফেরা দরকার।

বিশ্বনাথ যখন গ্রামে ফিরলেন তখন সূর্য পশ্চিম আকাশে গাছগাছালির আড়ালে ঢলতে শুরু করেছে। বকের দল দ্রুত বাসায় ফেরার তাগিদে ব্যাকুল। গ্রামে ঢোকার মুহূর্তে বিশ্বনাথ একবার থমকে দাঁড়ালেন। তার অভিজ্ঞ চোখে দেখলেন, একটা সূক্ষ্ম কালো চাদর গোটা গ্রামকে অভিশাপের মতো ঢেকে রেখেছে। দেখলেই বোঝা যায়, কোন এক অজানা শক্তির প্রতিশোধ স্পৃহায় গোটাগ্রাম আবিষ্ট। পুরোগ্রামে এক ভয়ানক "কালরাত্রি" মৃত্যুর ফরমান নিয়ে

নেমে এসেছে। লড়াইটা যে বেশ কঠিন সেটা খুব প্রবলভাবে অনুভব করেন বিখ্যাত জ্যোতিষ ও তন্ত্রবিশারদ বিশ্বনাথ আচার্য। একটা বিশ্রী কটুগন্ধ তার অন্তর পর্যন্ত ঝাঁঝিয়ে দেয়। এ গন্ধ যে তার বড়ই চেনা। এ হল আসন্ন বিপদের আগাম সতর্কবার্তা।

পরেরদিন সকালটা নিজের ভাইপো ও জ্ঞাতিগুষ্টির সাথে কাটালেও সন্ধ্যায় বিশ্বনাথ হাজির হয় হসপিটালের সামনে। আজ কৌশিকী অমাবস্যা। তার উপরে বৃহস্পতি রাহুর উত্তরে। এ যে অতি প্রশস্ত সময়। আজ শুভশক্তি, মাতৃশক্তি প্রবলভাবে জাগ্রত হবে। যদি ওই ভয়ানক বিভীষিকাময় পিশাচকে হারাতেই হয় তবে সেটা আজই। আজই তার শক্তি দেবীর আগমনে খর্বকায় হবে।

হসপিটালের সামনে পৌঁছাতেই বিশ্বনাথ সেই বিশ্রী কটু গন্ধটা আবারো অনুভব করলেন। এখন গন্ধটা আরো তীব্র। ঘাড় উঁচু করে একবার হসপিটালের দিকে তাকালেন তিনি। আর ঠিক তখনই একরাশ আতঙ্ক তার গোটা শরীরকে সাময়িক পঙ্গু করে দিল। এ কাকে দেখছে সে? ও যে শয়তান! মূর্তিমান বিভীষিকা! মৃত্যুর দূত। সাক্ষাৎ যম। এক বিশালদেহী বীভৎস দর্শনধারী সূক্ষ্ম কালো ছায়া গোটা হসপিটালকে তার বিশাল দুইহাত দিয়ে জাপ্টে ধরে আছে। তার সাপের ফনার মতো লম্বা চুল হিসহিস শব্দে আকাশে উড়ছে। মুখে অজস্র চেরা দাগ তাকে আরো বিভীষিকাময় করে তুলেছে। ঠোঁটের পাশ থেকে তাজারক্ত টপটপ শব্দে বিন্দুবৎ মাটিতে পড়ছে। কি বীভৎস। জগতের সমস্ত রাগ, হিংসা তার চোখে জ্বলন্ত কয়লার মতো দাউদাউ করে জ্বলছে। সেই চোখ ঘুরেফিরে বারবার বিশ্বনাথের দিকেই ফিরছে। যেন সে বারবার ভয় দেখিয়ে সাবধান করতে চাইছে বিশ্বনাথকে।

ওইদিক থেকে চোখ ঘুরিয়ে পিছন ফিরে বিশ্বনাথ, দেখে গ্রামের লোক তার বলে দেওয়া যজ্ঞের বিভিন্ন উপকরণ নিয়ে ইতিমধ্যেই সেই হসপিটালের সামনে হাজির হয়েছে। চোখেমুখে তাদের আতঙ্ক থাকলেও মুখের একচিলতে হাসি বলে দিচ্ছে তারা আশাবাদী। তারা পারবে, পারবে তারা ওই ভয়ানক অভিশাপ থেকে তাদের গ্রামকে বাঁচাতে। আবারও হসপিটালে তাদের পরিবার-পরিজনের শুশ্রূষা করতে পারবে। আর এই আশাটা গ্রামের ছেলে বিখ্যাত জ্যোতিষ ও তন্ত্রবিশারদ বিশ্বনাথ আচার্যকে ঘিরে সেটা ভালোই উপলব্ধি করেন বিশ্বনাথ।

যখন সমস্ত যজ্ঞের উপকরণ সাজিয়ে বিশ্বনাথ তৈরি হয় তখন রাত দশটা। আকাশ মেঘমুক্ত। প্রকৃতি কেন কিসের ভয়ে স্তব্ধ। এমনকি ঝিঝির ডাকও শোনা যাচ্ছে না। সমস্ত কিছু উপেক্ষা করে বিশ্বনাথ যজ্ঞ শুরু করেন। পাশে

গ্রামের মানুষ অলৌকিকের আশায় আকুল নয়নে তার দিকে তাকিয়ে। সময় নদীর স্রোতের মতো বইতে থাকে। গ্রামের মানুষ বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে সেই হোমকুণ্ডের আগুনের দিকে নিস্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে। মনে ভয়, শঙ্কা। এই বুঝি বিপদ ঘটে গেল। যজ্ঞ যখন ঠিক শেষের দিকে হঠাৎ এক তীব্র এলোমেলো হাওয়া গোটা যজ্ঞ প্রাঙ্গণকে তছনছ করে দিয়ে যায়। হাওয়ার তীব্রতায় কিছু মানুষ এদিক ওদিক ছিটকে পড়ে।

আকাশ মেঘমুক্ত! তবে এমন হাওয়া কোথা থেকে? চিন্তা করার অবকাশ পায় না বিশ্বনাথ, তার আগে সেই ছায়ামূর্তি গর্জে ওঠে, "মরবি! তোরা সবাই মরবি! আমি কাউকে ছাড়বো না!" সেই ভয়ানক দর্শনধারী পিশাচের গর্জনের তীব্রতায় মানুষজন সাময়িক বধির হয়ে যায়। ভয়ে কিছু মানুষ এদিক ওদিক ছোটাছুটি শুরু করে। ওদিকে বিশ্বনাথ নির্বিকারভাবে যজ্ঞ করতে থাকেন। এইরকম পরিস্থিতিতে মাথা ঠান্ডা রাখাটাই প্রধান সেটা ভালোমতোই জানেন বিশ্বনাথ আচার্য। হঠাৎ একটা বিশাল পাথর হোমকুন্ডু লক্ষ্য করে ঠিকরে আসে। আর তার আঘাতেই জ্বলন্ত মাটির প্রদীপ আর রক্ত রাখা মাটির সরাটি সশব্দে ভেঙে যায়।

মেঘমুক্ত আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি শুরু হয়। সেই সঙ্গে নিভে যায় যজ্ঞের আগুন। হায় হায় করে ওঠেন বিশ্বনাথ আচার্য। এ যে ঘোর অনর্থ, অমঙ্গল। এখন যজ্ঞ থামা মানেই বিপদ। আর বিপদ যে মৃত্যু হয়ে নেমে আসবে সেটা নিশ্চিত। ভয় পায় বিশ্বনাথ। জীবনে প্রথমবার মৃত্যুভয় তাকে গ্রাস করে। ভয়টা তার নিজের জন্য নয়, ভয়টা তার প্রাণাধিক প্রিয় গ্রামবাসীর জন্য। এক বীভৎস পৈচাশিক অট্টহাসিতে গোটা হাসপাতাল চত্বর কেঁপে ওঠে। বিশ্বনাথ সভয়ে দেখে সেই বীভৎস বিশাল ছায়ামূর্তি এখন মাটিতে পা রেখে হোমকুণ্ডের দিকে হেঁটে আসছে। তার প্রতিটা পদক্ষেপে মাটি থরথর করে কেঁপে উঠছে। ওই আসছে সে। আসছে মৃত্যুর ফরমান নিয়ে। মৃত্যু নিশ্চিত। চোখ বন্ধ করেন বিশ্বনাথ। জীবনে প্রথমবারের ব্যর্থতায় তার চোখে জল চলে আসে।

হঠাৎ সেই পৈচাশিক হুঙ্কার থামতে অবাক হয়ে চোখ খোলে বিশ্বনাথ। অবাক হয়ে সে দেখে হোমকুন্ডের সামনে সেই ছায়ামূর্তির পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে খেঁপি ডাইনি, যাকে গ্রামের লোক ডাইনি অপবাদে গ্রাম থেকে বের করে দিয়েছিল। তার চোখে-মুখে দৃঢ়তা। গর্জন করে ওঠে ছায়ামূর্তি, "ওরে! তুচ্ছ মেয়ে, তুই আটকাবি আমাকে? আগে তোদের আশা-ভরসা ওই বিশ্বনাথকে মারি! তারপর তোদেরকে মারবো! আমার গুরুদেবকে তোরা শান্তিতে ঘুমাতে

দিস নি। তার কবরের উপর হাসপাতাল বানিয়েছিস। এই গ্রাম আমি শ্মশান করে ছাড়বো। সব্বাইকে মারবো।" নিশ্চিত অথচ ধীর পদক্ষেপে সামনের দিকে এগোতে থাকে সেই ছায়ামূর্তি। ভাবটা এমন, এই তুচ্ছ মানবগণ তার কি করবে? বিস্ময় যে প্রতি মুহূর্তে অপেক্ষারত!

বিশ্বনাথ আরো লক্ষ্য করে এবার খেঁপি একা নয়, তার হাত ধরে দাঁড়িয়েছে গ্রামের বিধবা সহায় সম্বলহীন রমা। আবারও থমকে দাঁড়ালো সেই ছায়ামূর্তি। চোখে- মুখে তখনও তাচ্ছিল্যের হাসি। এরপর একে একে সরলা, বিমলা, অমলা, সুবলা, শতাব্দী,নাসরিন, ফিরোজা...। গ্রামের সমস্ত মেয়েরা খেঁপি আর রমার হাতে হাত ধরে একটা অভেদ্য বলয় বিশ্বনাথকে ঘিরে তৈরি করল। সেই প্রমিলা বাহিনীর চোখেমুখে তখন প্রবল কাঠিন্য। ওই ছায়ারুপি শয়তান কে হারানোর দুর্বার স্পৃহা। সেদিন কোথা থেকে ওই মেয়েদের মধ্যে এই আত্মবিশ্বাস এসেছিল তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন।

গর্জন করে ওঠে গ্রামের মাতৃরূপি সকল মহিলাগন, "এই বিশ্বনাথ আমাদের পূত্রসম। মা বেঁচে থাকতে মায়ের সামনে তার পুত্রকে মারবে? হয়েছে কোনদিন? বিধাতা হতে দিয়েছে? তোমাকে যে ওর কাছে পৌঁছনোর আগে, আমাদেরকে মারতে হবে। বিশ্বনাথ যে আমাদের গ্রামের শেষ আশা, শেষ ভরসা। তাই আমরা বেঁচে থাকতে সেই আশা, ভরসাকে মরতে দেখতে পারি না। ক্ষমতা থাকে মার আমাদেরকে। দেখি তোমার কত জোর।"

হো হো হো করে হেসে ওঠে সেই ছায়ারুপি বিভীষিকা, "তবে তাই হোক"! এগিয়ে আসতে থাকে সে, কাছে আরও কাছে। এরপর একটা বীভৎস নখযুক্ত হাত সেই প্রমিলা বাহিনীর বন্ধনকে ছিন্নভিন্ন করতে চায়। কিন্তু পারে না। পারেনা সেই শয়তান। বিশ্বনাথ সভয়ে দেখে কোন এক অলৌকিক জাদুর স্পর্শে সেই ছায়ামূর্তি ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মত দূরে ছিটকে পড়েছে। অদৃশ্য কোন বন্ধন তাকে বিশ্বনাথের কাছে আসতে দিচ্ছে না। আবারো প্রবল গর্জন করে ওঠে সেই শয়তান, দ্বিগুণ আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় প্রমিলা বাহিনীর উপর। এবারও ব্যর্থ হয় সে। কোন এক অদৃশ্য শক্তি তাকে টেনে হিঁচড়ে দূরে ফেলে দেয়।

বিশ্বনাথ দেখে এখন সেই ছায়ামূর্তিটি বেশ দুর্বল। কেমন কাঁপছে। চোখে সেই জ্বলন্ত কয়লার মত আগুন এখন অনেকটাই স্তিমিত। এবার টলতে টলতে ছায়ামূর্তি আবারো এগোনোর চেষ্টা করে। কিন্তু পারেনা। আবারও মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। সে যে বড় ক্লান্ত। তার ঘুমের প্রয়োজন।

ব্যাপারটা কিছুটা হলেও বোধগম্য হয় বিশ্বনাথের। মাতৃশক্তি। এই মাতৃশক্তির কাছেই ওই প্রবল পরাক্রমি প্রেতাত্মাও পরাভূত। পরাভূত তার ভয়ঙ্কর আক্রোশ ও অভিশাপ। কে বলে মাতৃশক্তি কেবল মাদুর্গা আর মাকালীর মধ্যে রয়েছে? মাকালী আর মাদুর্গার সমস্ত শক্তি রয়েছে জগতের প্রতিটা মেয়ের মধ্যে। তারাও যে মাতৃরুপে জগত জননী। আজ বিশ্বনাথের সবথেকে বড় শিক্ষা হয়ে গেল," পৃথিবীর সবথেকে শক্তিশালী শক্তি হল মাতৃশক্তি"! যে শক্তির কাছে সমস্ত তন্ত্র,মন্ত্র,ভূত পিশাচ খুবই দূর্বল... তুচ্ছ। মাতৃজ্ঞানে মহিলাদের পুজো করলে স্বর্গের দেবীও যে ধরা দেন।

হঠাৎ আকাশের এক কোণে একটি অতি উজ্জল আলোকচ্ছটা দেখা যায়। আর সেই আলোকচ্ছটা থেকে বেরিয়ে আসেন ইমাম আবুল সাহেব। ধীরেধীরে আবুল সাহেবের ছায়ামূর্তি নিচে নেমে আসেন, তারপর তিনি ক্লান্ত অবসন্ন ছায়ামূর্তি সুলতানের উদ্দেশ্যে বলে ওঠেন, "সুলতান! চল এবার আমাদের যাওয়ার সময় হয়েছে। ওই বিশ্বনাথ আমাদেরকে মুক্ত করেছে। এবার যে আমাদের ফিরতে হবে। আমিও তো চেয়েছিলাম গ্রামের লোক সুস্থ ও নীরোগ থাকুক। ওরাও তো তাই করছে রে...। এই হাসপাতাল ওদেরকে সুস্থ ও নীরোগ রাখবে।"

বাধ্য ছেলের মত সুলতানের প্রেতাত্মা পুণ্যাত্মা আবুল সাহেবের হাত ধরে অনন্তের উদ্দেশ্যে ধীরে ধীরে পাড়ি দেয়। সুলতান আর ইমাম সাহেবের আত্মা বিলীন হতেই গ্রামের সেই সুন্দর প্রাকৃতিক কোলাহল আবারো ফিরে আসে, ঝিঝির ডাক অনুভূত হয়। দূর হয় কালরাত্রি। সেই বিশ্রী কটু গন্ধটা আর বিশ্বনাথের নাকে আসে না। গ্রাম যে বিপদমুক্ত।

বাড়ি ফেরার সময় বিশ্বনাথের পাশেপাশে হাঁটছিল বন্ধু বিকাশ, তার চোখে-মুখে তখন ছেলে হারানোর গ্লানি কেটে অশেষ প্রশান্তি। একরাশ হাসি মুখে এনে সে বিশ্বনাথের উদ্দেশ্যে বলে উঠলো, "বিশ্বনাথ! ভাবছি হসপিটালের নাম রাখবো "ইমাম আবুল সাহেব হসপিটাল"! কি বলিস? নামটা ঠিক হবে তো ?

পাহারাদার

সৌমেন ঠাকুর

রণদীপ সামন্তকে মনে আছে ? সেই যে বিখ্যাত ব্যাবসায়ী রণদীপ সামন্ত উত্তরবঙ্গে গিয়ে হারিয়ে গিয়েছিল! সেসময় সবাই সন্দেহ করেছিল হয়তো কোনো পাহাড়ি উগ্রপন্থী দল তাকে অপহরণ করেছে। খবরের কাগজে এই নিয়ে দিনের পর দিন লেখালেখি চলতো। কিন্তু শেষপর্যন্ত কেসটা অমিমাংসিতই থেকে যায়। সেসব অবশ্য পনেরো-ষোলো বছর আগেকার কথা, ভুলে যাওয়ায় স্বাভাবিক। সেই রণদীপ সামন্তের রহস্য আমি মনে হয় উদ্ধার করতে পেরেছি। কি অবাক লাগছে তো?

সাংবাদিকতার সূত্রে, আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের সিমান্তবর্তী এলাকায় পাহাড়ি গ্রামবাসীদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন নিয়ে একটি প্রতিবেদন লেখার জন্য আমাকে কয়েকমাস আগে উত্তরবঙ্গে যেতে হয়েছিল। প্রতিদিন শহর থেকে বাসে কিংবা ভাড়ার গাড়ি করে যেতে গেলে বেশ অনেকটাই সময় অপচয় হবে, তাই আমি শহরের কোনো লজ বা গেস্টহাউসের বদলে উঠেছিলাম সরকারি ডাকবাংলোতে।

ডাকবাংলোটা ছিল স্থানীয় গ্রাম থেকে বেশ কিছুটা দূরে; সাদা কুয়াশা ঢাকা শাল, সেগুন, খয়ের, শিমুল গাছের বনজ ঘ্রাণ মাখা আদিম নিরন্ধ্র জঙ্গলের লাগোয়া। যদিও দার্জিলিং জলপাইগুড়ি আমি আগেও গিয়েছি, কিন্তু বর্ডারের জঙ্গলের দিকে সেই আমার প্রথম যাওয়া।

বাংলোর কেয়ারটেকার রেংজা ছিল স্থানীয় গ্রামের বাসিন্দা। ও প্রতিদিন সকালে এসে সমস্ত কাজকর্ম করে সন্ধ্যের দিকে রাতের খাবার বানিয়ে চলে যেত। আর আমি সারাদিন পাহাড়ের কোলে উঁচুনিচু গ্রামগুলোতে ঘুরে ঘুরে আমার তথ্য সংগ্রহ করতাম। বাংলোয় ফিরে একটু লেখালিখি করে আটটা সাড়ে আটটা নাগাদ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়তাম। যাই হোক, দিন চার পাঁচের মধ্যেই আমার কাজ হয়ে গেল।

যেদিন ফিরে আসবো ঠিক তার আগের রাতে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটলো। অ্যাসাইনমেন্ট ভালোভাবেই সম্পূর্ণ হওয়ার আনন্দে মনটা বেশ ফুরফুরে ছিল।

রাতের খাবার খেয়ে কিছুতেই ঘুম আসছিল না বলে আমি মোবাইলে গান শুনছিলাম। হঠাৎই অসাবধানতাবশত কীভাবে যেন মোবাইলটা বিছানার ফাঁক দিয়ে বক্সখাটের ভেতরে পড়ে যায়। তা দেখে মেজাজটা প্রচন্ড বিগড়ে গেল। একটু বিরক্ত হয়েই মোবাইলটা বের করার জন্য বিছানা তুলে বক্সখাটের ঢাকনাটা যখন খুললাম, তখনই আমি দেখতে পেলাম জিনিসটা। ভেতরে লেপ কম্বলের ফাঁকে আমার মোবাইলের ঠিক পাশেই একটা ধূলোমাখা পুরোনো নীল রঙের ডায়রি!

এই সরকারি ডাকবাংলোর বক্সখাটে ডায়রি? একটা কৌতুহল অনুভব করলাম! না বলে অন্যের ডায়রি পড়া অন্যায় জানি, কিন্তু আমি সেই মুহূর্তে কোনোভাবেই নিজের কৌতুহলটা দমন করতে পরলাম না। কৌতুহলী মন নিয়ে ডায়রির প্রথম পাতাটা খুলতেই দেখলাম ইংরাজিতে একটা নাম লেখা আছে; রণদীপ সামন্ত।

নামটা ভীষণ চেনা চেনা লাগলেও প্রথমদিকে ঠিক মনে করতে পারছিলামনা নামটা কোথায় শুনেছি। আনমনে ডায়রিটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছি এমন সময় হঠাৎ সারাটা শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল! মনে পড়ে গেল আমাদের কাগজের অফিসের লাইব্রেরীতে পুরোনো কাগজে এই নামটা দেখার কথা। সারাটা শরীরে শিহরণ অনুভব করলাম।

বিছানার বসে কম্বলটা বুক পর্যন্ত টেনে নিয়ে ডায়রিটা খুলে বসলাম। ঝরঝরে বাংলায় লেখা ডায়রির প্রথম লাইনটা পড়তেই আমি রহস্যের গন্ধ পেলাম। সেখানে লেখা আছে, "দূরে আলো ঝলমলে শহরে বসে যে ঘটনাকে যুক্তি দিয়ে খন্ডন করে গালগল্প বলা যায় তা যখন নিজের সঙ্গে ঘটে তখন কোনো বুদ্ধি, কোনো যুক্তি দিয়ে তার ব্যাখ্যা করা যায় কি? আমি নিজে কোনোদিন কোনো কুসংস্কার বা অলৌকিকত্ব কিছুই মানি না তবে আমার সঙ্গে যে ঘটনাগুলো ঘটছে তার ব্যাখ্যা করবো কীভাবে?"

ডায়রিতে অনেকেই প্রতিদিনের দৈনন্দিন দিনলিপি লিপিবদ্ধ করে রাখেন, তবে এ ডায়রি তেমন নয়, বরং বলা ভালো ডায়রিটা অনেকটা গল্পের ছলেই লেখা। লেখার কোনো তারিখ দেওয়া নেই। যাই হোক ডায়রিতে যা লেখা আছে তা আমি হুবহু তুলে ধরলাম।

"ব্যাবসার কাজে কয়েকদিন আগে উত্তরবঙ্গে এসেছি। শিলিগুড়ি ও মালবাজারে আমাদের কাজ সময়ের কিছুটা আগেই শেষ হয়ে যাওয়ায় এদিকটা একটু ঘুরে দেখার পরিকল্পনা করলাম। আমার জায়গায় অন্য কেউ হলে হয়তো

এইভাবে অকারণ সময় নষ্ট না করে কলকাতা ফিরে যেত। কিন্তু আমি মনে করি, কাজ করার পাশাপাশি মাঝে মাঝে শরীর ও মনকে কিছুটা বিশ্রাম দেওয়াও জরুরী। সুদীপ্তকে কথাটা বলতে সেও আনন্দে লাফিয়ে উঠলো। সুদীপ্ত আমার ম্যানেজার হলেও সে কিন্তু আমার খুব ভালো একজন বন্ধু। ক'দিন আগে প্রেসক্লাবের অরুণদা ফ্যামেলি নিয়ে এদিকটায় বেড়াতে এসেছিল। তাই এখানে আসারই প্লান করলাম। কিন্তু তখন যদি ঘুনাক্ষরেও বুঝতে পারতাম এখানে এসে এরকম একটা ঘটনার সম্মুখীন হতে হবে, তাহলে হয়তো...।

স্থানীয় লোকালয় থেকে বেশ কিছুটা দূরে পাহাড়ি রাস্তা যেখান শেষ হয়েছে সেখান থেকেই শুরু হয়েছে জঙ্গল। ঘন সবুজ অরণ্য। সেই ঘন অরণ্যের নিস্তব্ধ মাধুর্যের আড়ালে এক ভয়ঙ্কর অভিশাপ অপেক্ষা করে ছিল শুধুমাত্র আমাদের জন্যেই তা আর কে জানতো!

এখানে আসার পর দুটো দিন বেশ ভালোভাবেই কাটলো। তবে এই দু'দিন ধরে কয়েকটা মেটে রঙের খরগোশ, সজারু আর গোটা কয়েক হরিণ ছাড়া আর কোনো জন্তু চোখে পড়লো না। সেদিন দুপুরে কথায় কথায় সিকিউরিটি গার্ড গগনকে সেকথা জিজ্ঞেস করতে সে বললো, " জঙ্গলের ভেতরের দিকে গন্ডার, জংলি শুয়োর আছে তবে এদিকে তারা খুব একটা আসেনা..."

"আর বাঘ! বাঘ নেই জঙ্গলে?"-সুদীপ্ত জিজ্ঞেস করল। গগন একটা ঢোক গিলে দুদিকে ঘাড় নেড়ে না বললো। ওকে দেখে মনে হলো ও কিছু গোপন করতে চাইছে।

"মানে টা কি? কাল রাতে যে আমি নিজের কানে বাঘের ডাক শুনলাম! বাঘের গর্জন আমি চিনবো না!"

সুদীপ্তর কথাটা শুনে মুহূর্তের জন্য গগনের মুখটা ভয়ে আতঙ্কে বিবর্ণ হয়ে গেলেও সে তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিলো। তারপর গলার স্বর কিছুটা নামিয়ে নিয়ে বললো, " ওটা কোনো সাধারণ বাঘ নয় বাবু। ওটা... ওটা যে কী তা কেউ জানে না! কেউ বলে অপদেবতা কেউ বলে দেবীর বাহন। তবে ওটা রক্ত মাংসের প্রাণী নয়! ও এই জঙ্গলের পাহারাদার!"

গগনের কথা শুনে সুদীপ্ত আর আমি জোরে হেসে উঠলাম। আমাদের হাসি শুনে গগন কিন্তু হাসলো না। গগনের কাছে শুনলাম এই মায়াবী বাঘ প্রতিদিন রাত গভীর হলে সারা জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে বিশেষ করে জঙ্গলের মধ্যে ভাঙাচোরা এক বিগ্রহ শূন্য মন্দিরের আশেপাশে পাহারা দেয়। তাকে ধরা বা মারা যায় না। চোরা পাচারকারীরা বহুবার বহু চেষ্টা করেও তাকে মারতে পারেনি।

"দেখাতে পারবো তোমার সেই বাঘকে ?" - পকেট থেকে বেশ কিছু টাকা বের করে গগনের সামনে ধরতে ও চুপ করে থাকলো। গগন গরীব মানুষ। সামান্য বেতনের উপর নির্ভর করে তার সংসার চলে। বেতনও যখন বাংলোয় কাজ থাকে, টুরিস্ট সিজন তখনই। সেখানে হঠাৎ করে এতোগুলো টাকা বাড়তি বকশিস হিসেবে পাওয়ায় ওর চোখদুটো চকচক করে উঠলো।

দিনের আলো সম্পূর্ণ মুছে যাওয়ার আগেই আমরা রওনা দিলাম আমাদের লক্ষ্যপূরণের উদ্দেশ্যে। অস্তমিত সূর্যের আলো স্তিমিত। এমনিতেই ঘন জঙ্গলে দুপুরের রোদ ঢোকেনা এখনতো গুঁড়ো-গুঁড়ো অন্ধকার জমাট বাঁধতে শুরু করেছে। ছোট্ট একটা নদী পার হয়ে আমরা পৌঁছে গেলাম সেই ভাঙা মন্দিরটার কাছে। গগন একটা মোটা উঁচু গাছ নির্বাচন করলো। সেই গাছের উঁচু একটা ডালে আমি আর গগন অন্য একটা ডালে সুদীপ্ত। দড়ি দিয়ে নিজেদের শক্ত করে বেঁধে নেওয়ার পর শুরু হলো আমাদের প্রতীক্ষা।

ধীরে ধীরে অন্ধকার গাঢ় হলো। ঝোপে ঝোপে জোনাকি আর ঝিঁঝিঁর দল জেগে উঠলো। দিনের জঙ্গলের থেকে রাতের জঙ্গল যে কতটা ভয়ঙ্কর আর রহস্যময় তা ধীরে ধীরে উপলব্ধি করতে লাগলাম। গগনের দিকে তাকিয়ে মনে হলো টাকার লোভে সে তখন রাজি হলেও এখন হয়তো সে অনুশোচনা করছে। ভয় যে আমার লাগছে না তা হয় তবে এটাই ভরসা পকেটে আমার সর্বক্ষণের সঙ্গী রিভালবার আছে।

রাত তখন কত বলতে পারবো না... চোখে একটু তন্দ্রা লেগে এসেছিল, হঠাৎ একটা পেঁচার কর্কশ ডাকে ধরমড় করে সোজা হয়ে বসলাম। এখন আর অতোটা অন্ধকার নেই বা বলা ভালো অন্ধকারটা চোখ-সওয়া হয়ে গিয়ে সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। চাঁদের শুভ্র স্বচ্ছ আলোয় উদ্ভাষিত সামনের ঝোপ-ঝাড়-ঘাসবন-নদীর তীর। সময় এগিয়ে যেতে লাগলো। হঠাৎ গগন আঁতকে উঠলো, "বাবু! হে ভগবান...!"

সামনের জ্যোৎস্না ধোয়া বন্য চরাচরের দিকে তাকাতেই বুকটা ছ্যাত করে উঠলো! দেখলাম ঝোপটা নড়ছে। একটু পরেই ধীরে ধীরে রাজকীয় চালে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এলো একটা বাঘ। চাঁদের আলো তার সারা শরীর বেয়ে চুঁইয়ে পরছে। বাঘটা ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে ফাঁকা জায়গায় দাঁড়ালো। একবার ইতস্তত ভাবে চারপাশে তাকিয়ে সটান তাকালো গাছের ডালে বসে থাকা আমাদের দিকে। চোখদুটো সবুজ মার্বেলের মতো। জ্বলছে! বড়ো বড়ো দাঁতের ফাঁক দিয়ে লাল টকটকে জিভটা বাইরে বেরিয়ে আছে। নেকড়ে গাছে

উঠতে পারে বাঘ নয়, কিন্তু তবুও বাঘটাকে দেখে মনে হলো আমার হৃৎপিণ্ডটা বোধায় থেমে গেছে।

বাঘটা পায়ে করে কয়েকবার মাটিতে আঁচড় কেটে নিচু হয়ে ফোঁস ফোঁস করে ক্রমাগত শ্বাস ফেলতে লাগলো। তাতে মাটিতে পড়ে থাকা শুকনো পাতাগুলো ইতস্তত উড়ছে। কয়েকমুহূর্ত... তারপর সারা জঙ্গলের নিরবতা ভেঙ্গে হুঙ্কার দিয়ে বাঘটা ক্রুদ্ধ চোখে আমাদের দিকে তাকালো। মনে হলো যেন সে লাফিয়ে এগিয়ে আসতে চাইছে আমাদের দিকেই। সঙ্গে সঙ্গে গুলি করলাম! গুলিটা ঠিক দুই চোখের মাঝখানে কপালে গিয়ে লাগলো। একটা মরণপণ চিৎকার করে হাওয়ায় পাক খেয়ে বাঘটা মাটির উপর পড়লো। আমার হাতটা কেঁপে উঠলো। পরপর আরো দুটো গুলি একটা বাঘটার পাঁজরে আর একটা ঘাড়ে গিয়ে লাগলো। কয়েকটা নিশাচর পাখি আসেপাশের গাছ থেকে শব্দ করে আকাশে উড়ে গেল।

"এ আপনি কী করলেন বাবু? এযে পাপ?"- গগন চিৎকার করে উঠলো।

"সত্যি রণ! এভাবে... কাজটা তুই ঠিক করলি না... " -পাশের ডাল থেকে সুদীপ্ত বলে উঠলো।

"আরে আমি... আমি কীভাবে বোঝাবো! আমি মারতে চাইনি! মুহূর্তের জন্য ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। তাছাড়া ওটা যদি আমাদের আক্রমণ করতো..." আমার হাজার বোঝানো সত্ত্বেও গগন নানান কথা বলে হাহুতাশ করতে লাগলো। আমার নিজেরও খারাপ লাগছিল, সত্যি আমি মুহূর্তের জন্য ভয় পেয়ে...

সুদীপ্ত বিষয়টা স্বাভাবিক করার জন্য বললো, "তবে একটা বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া গেল... কি গগন! তুমি যে বলছিলে ওকে নাকি মারা যায় না ওটা অপদেবতা! এখন দেখলে তো..." কথা বলতে বলতেই আচমকা সে চিৎকার করে উঠলো, "র...রণ!"

সুদীপ্তর হাতের ইশারার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম! কোথাও বাঘ নেই! অথচ কিছুক্ষণ আগেই সেটা তিনটে গুলি খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল। গলগল করে রক্ত বেরচ্ছিল শরীর থেকে।

"আমি আগেই বলেছিলাম ওটা সাধারণ বাঘ নয়! কাজটা ঠিক হলোনা..." গগন আরো কতো কিছু বলে যাচ্ছিল। যার কিছুকথা কানে ঢুকছে কিছুকথা ঢুকছেনা। কিছুই ভালো লাগছে না। সারাটা জঙ্গলে কেমন যেন একটা অদ্ভুত বিষন্নতা বিরাজ করছে। একসময় অন্ধকার মুছে গিয়ে দিনের আলো ফুটলো। ভোর হলো।

পরের সারাটা দিন একরকম কেটে গেল। ডাকবাংলো সহ পাশের সারাটা জঙ্গল কেমন যেন গুম ধরে আছে। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা জঙ্গল থেকে বাংলোয় ফিরে আসি। তখন ভেবেছিলাম সেদিনই ফিরে যাবো কিন্তু নদী পেরনোর সময় একটা পাথরে পা পিছলে সুদীপ্ত বিচ্ছিরি রকম ভাবে পড়ে যায়। তেমন বড় কিছু না হলেও পা-টা ফুলে গেছে! যন্ত্রণাও হচ্ছে! তাই আরেকটা দিন রেস্ট নিয়ে ফিরে যাবার পরিকল্পনা করি। কিন্তু তখন কি আর জানতাম আদৌ এখান থেকে আমাদের আর কোনদিন ফেরা হবে না!

গগন ফিরে এসে সারাদিন একটাও কথা বললো না। সন্ধ্যের কিছু পরেই রাতের খাবার করে দিয়ে ও ওর গ্রামে চলে গেল। আমরাও আর ওকে বাধা দিলাম না। আটটা নাগাদ রাতের খাবার খেয়ে সুদীপ্ত ঘুমাতে চলে গেল। আর আমি? আমি বাংলোর বারান্দায় এসে একটা বেতের চেয়ারে কিছুক্ষণ বসলাম। আজ পূর্ণিমা! আকাশ আলো করে বড় থালার মতো চাঁদ উঠেছে। মনোরম পরিবেশ! কিন্তু সামনের জ্যোৎস্নাস্নাত জঙ্গলটা দেখে গা-টা কেমন শিরশির করে উঠলো। আমি পাশের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম।

মাঝরাতে হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। কোনো আওয়াজ শুনলাম কি! কেউ কি আমাকে ডাকলো? নাকি কোনো দুঃস্বপ্ন দেখলাম? ঠিক কী কারণে ঘুম ভাঙলো সেটা নিজেই বুঝতে পারলাম না। বালিশের পাশে রাখা হাতঘড়িটা দেখলাম একবার। দু'টো বাজছে। টেবিলে জ্বালিয়ে রাখা মোমবাতিটা নিভিয়ে গেছে ঠিকই কিন্তু জানলা দিয়ে আসা চাঁদের একফালি আলোয় ঘরটা আলোকিত হয়ে আছে। একটা হাই তুলে আবার শুতে যাবো তখনই দেখলাম দরজার একটা পাল্লা খোলা। আমি তো দরজা লাগিয়েই শুয়েছিলাম... তাহলে? কেমন যেন ধাঁধা লাগলো! বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ালাম।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখলাম করিডোরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। ইলেকট্রিসিটি না থাকার জন্য করিডোরের দুদিকে দুটো হ্যারিকেন সন্ধ্যে থেকে জ্বলে। তবে? ভালো করে লক্ষ্য করলাম করিডোরটা শুধু অন্ধকারই নয় সঙ্গে একটা বোটকা বুনো গন্ধে এখানকার বাতাস ভারি হয়ে আছে। একটা কিলবিলে হিমশীতল ভয় আমার পা বেয়ে যেন শিরদাঁড়ায় উঠে এলো। আমি তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে গিয়ে টর্চ হাতে আবার বেরিয়ে এসে দেখলাম হ্যারিকেনটা মেঝেতে পড়ে আছে। চারদিকে কাঁচ ছড়িয়ে। সারাটা শরীর কেঁপে উঠলো... পাশের ঘরে সুদীপ্ত শুয়ে আছে। পা টিপে টিপে এগিয়ে গিয়ে সুদীপ্তর ঘরের সামনে দাঁড়ালাম। দরজাটা হাট করে খোলা। দেখলাম বিছানা ফাঁকা। সুদীপ্ত ঘরে নেই!

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে আমি ওখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম। ঘরের দরজা খোলা, অন্ধকার করিডোর, বোটকা গন্ধ... আমার মাথা যেন কাজ করছে না। এমন সময় দেখলাম করিডোরের ওপ্রান্তে বারান্দার দরজাটা খোলা। দরজা দিয়ে শো শো করে ঠান্ডা বাতাস ঢুকছে। সুদীপ্ত কি তবে বাইরে বেরিয়েছে! কেন? তাড়াতাড়ি সেদিকেই এগিয়ে যায়। দরজার কাছে এসে দাঁড়াতেই চাঁদের আলোয় যা দেখলাম তাতে আমার সারা শরীর অবশ হয়ে গেল। দেখলাম বাংলোর সামনে ঘাসে ঢাকা লনের মতো জায়গাটায় পড়ে আছে সুদীপ্তর ক্ষতবিক্ষত শরীর! না মৃতদেহ নয়! কারণ তখনো সে শ্বাস নিচ্ছে... কিন্তু আর কতক্ষন?

"সুদীপ্ত... এ অবস্থা তোর কীভাবে হলো? "- চোখ ফেটে জল এলো আমার। সুদীপ্ত আস্তে আস্তে আমার দিকে তাকালো। ওর চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়লো, ঠোঁট দুটোও একবার কেঁপে উঠলো। তারপর ধীরে ধীরে চোখ দুটো চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। ঠোঁট নেড়ে ও কী বোঝাতে চাইলো আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। ওর মাথাটা কোল থেকে নামিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। তবে কি গগনের কথাই সত্যি? সেই পাহারাদার বাঘ কি তাহলে...? চারপাশে তাকাতেই মনে হলো অন্ধকারে গাছের আড়ালে কেউ যেন আমাকে দেখছে। শুধু সুযোগের অপেক্ষা... ঝাঁপিয়ে পড়বে আমার উপর। আমিই তো তার হত্যাকারী কিনা! কোনোদিকে না তাকিয়ে আমি দৌড়ালাম বাংলোর দিকে। টের পেলাম কেউ আমাকে অনুসরণ করে পিছনে আসছে। আমি দৌড়ে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে ওখানেই হেলান দিয়ে বসে পড়লাম।

এবার আমি শেষ করবো, আমার সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। আর কয়েকটা মুহূর্ত... তারপর আমি হারিয়ে যাব চিরতরে... কেউ আমার সন্ধান জানবে না... জানবে না আমার শেষ পরিণতি... তাও এই অন্তিম মুহূর্তে সবটা আমি এই ডায়রিতে লিখে রাখছি যদি কেউ কোনদিন এটা পড়ে সেই আশায়!

বন্ধ দরজার ভেতর বসে বসেই হাঁপাতে লাগলাম। কয়েকটা প্রশ্নে মাথাটা ঝিমঝিম করছে। সবকিছু গুলিয়ে যাচ্ছে বারবার। চ্যাটচেটে কিছু একটাতে হাত পড়তে টর্চ জ্বেলে দেখলাম রক্ত! চতুষ্পদ শ্বাপদের রক্তমাখা পায়ের ছাপ করিডোর বেয়ে সোজা আমার দরজা অবধি চলে গেছে। আর পারছিলাম না আমি মনে হচ্ছিল এবার জ্ঞান হারাবো। টলমলে শরীরটা টানতে টানতে ঘরে পৌঁছে আয়নার সামনে দাঁড়াতেই একটা শীতল স্রোত বইয়ে গেল আমার সমস্ত শিরা-উপশিরায়। যন্ত্রণাকাতর সুদীপ্ত ফোলা পা নিয়ে কেন বাংলোর দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল? কেন আমার দরজা খোলা ছিল? আর কেনই

বা আমার ঘুম ভাঙলো? সমস্ত প্রশ্নের উত্তর এক ঝটকায় দিয়ে দিল আমার প্রতিবিম্ব! ঠান্ডা নিস্প্রাণ একজোড়া চোখে সে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমার জ্বলজ্বলে দুটো সবুজ চোখ, ধূসর লোমশ বদলে যাওয়া মুখ, রক্ত লেগে থাকা শ্বদন্ত আর আমার ঘরের দরজা পর্যন্ত আসা চতুষ্পদের রক্তমাখা পায়ের ছাপ চিৎকার করে বলছে সুদীপ্তর শেষ পরিণতির কথা।

উফ্! আমি আর পারছি না। সারাটা শরীরে এক অসহ্য যন্ত্রণা। মনে হচ্ছে আমার শরীরের ভেতর থেকে অন্য আরেকটা শরীর, আরেকটা সত্তা বেরিয়ে আসার জন্য ছটফট করছে...."

ডায়রিটা এখানেই শেষ হয়ে যায়। পড়ার পর আমি ডায়রিটা আবার সেখানেই রেখে দিই। পরদিন ফিরে আসার তাড়া ছিল তাই এবার শুয়ে পড়বো ঠিক করলাম, কিন্তু শোওয়ার আগে জানলাটা বন্ধ করতে গিয়ে বাইরে জঙ্গলের দিকে তাকাতেই মনে হলো একজোড়া জ্বলজ্বলে সবুজ চোখ... এই বাংলোর দিকেই তাকিয়ে আছে!

অভিশপ্ত বাড়ি

শঙ্কর চ্যাটার্জী

অরণ্যমন প্রকাশনীর প্রকাশক চিরঞ্জিৎ-এর পাঠানো ছবিটা শিমুলতলার। ওরা এখন ওখানে বেড়াতে গেছে। বাড়ির ছবিটা দেখে আমার মনে ফুটে উঠলো, আট বছর আগেকার স্মৃতি। এই ধরণের একটা বাড়িতে আমি ও আমার স্ত্রী উঠেছিলাম, শিমুলতলা বেড়াতে গিয়ে। পুরো ফাঁকা বাড়িটা নাম মাত্র ভাড়ায় পেয়েছিলাম। বিরাট বিরাট দুটো শোবার ঘর। উঁচু উঁচু সিলিং, খড়খড়ির লম্বা জানলা। বাড়ির সামনে একটা কপিকল লাগানো ইদারা। রান্নাঘর, লোহার রেলিং দেওয়া চওড়া বারান্দা। আমাদের দুজনের পক্ষে যথেষ্ট।

চারিদিকে গাছপালার ভিড়। বাড়ি ঘিরে মোটা দেওয়ালের বাউন্ডারি...। আমাদের দুজনের খুব পছন্দ হয়ে গেলো। কলকাতার পায়রার খোপের মতো ফ্ল্যাটে থেকে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। যাক, কয়েকদিন হাত পা ছড়িয়ে বিশুদ্ধ বাতাস নেওয়া যাবে। বাড়ির কেয়ারটেকার সজ্জন দয়াল, চাবি আমার হাতে দিয়ে নমস্কার জানিয়ে চলে গেলো। যাবার আগে বলে গেলো, "আজকের রাতটা চালিয়ে নিন। কাল সুবে রসুইকে লিয়ে দিবাকর কো ভেজ দেঙ্গে।"

শীতের সবে শুরু। কিন্তু এখানে এখনই হিমেল হাওয়া। রাতে স্টোভে ভাতে ভাত খেয়ে আমরা দুজন বারান্দায় পাতা দুটো ইজি চেয়ারে এসে বসলাম। চাঁদের আলোয় সামনের বাগানটা আলোয় ভাসছে। আমি গায়ে চাদর চাপিয়েছি। স্ত্রী শ্রাবণীর আবার একটু গরম গরম বাতিক। তবু শাড়িটা ভালো ভাবে গায়ে জড়িয়েছে। দুজনে নীরবে বসে চাঁদের আলোয় প্রকৃতির শোভা দেখছি। চাঁদের আলোয় সারা প্রকৃতি অপরূপ সাজে সেজে উঠেছে। বাড়ির সামনে দিয়ে পাথুরে উঁচু নিচু রাস্তাটা মাঠের বুক চিরে দূরে টিলার কাছে হারিয়ে গেছে। কোন এক রাত জাগা পাখির ডাক কানে আসছে। এ ছাড়া সব নীরব।

কাছাকাছি কোন বাড়ি নেই। খানিকটা বাদে শ্রাবণী উঠে দাঁড়ালো। "বেশ ঠান্ডা লাগছে, ঘর থেকে চাদরটা নিয়ে আসি।" ইলেকট্রিক থাকলেও পাওয়ার খুব কম। এর ফলে একটা মায়াবী পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। একা হতেই মনের মধ্যে পুরোনো ইচ্ছেটা মাথা তুলে দাঁড়ালো। এ রকম পরিবেশে ভূতের গল্প খুব

জমে। মস্তিষ্কে একটা প্লট দানা বাঁধতে শুরু করেছে! শীতল বাতাসে সেই প্লট ক্রমশ গভীর আকার ধারণ করছে। চাঁদের আলো একটু একটু করে সরছে। ইস, এই সময়ে যদি একা থাকতাম, নির্ঘাত একটা হাড় কাঁপানো ভৌতিক গল্প লিখে ফেলতে পারতাম। কেননা ইতিমধ্যে গল্পের চরিত্ররা যেন চোখের সামনে ঘোরা ফেরা করতে শুরু করেছে।... আচমকা রাতের নীরবতা ভেঙে একটা কর্কশ শব্দ কানে এসে ধাক্কা মারলো।

মনে হচ্ছে, কেউ ইদারা থেকে কপিকলের সাহায্যে বালতি করে জল তুলছে! আমি যেখানে বসে আছি, সেখান থেকে কুয়োটা সরাসরি দেখা যায় না। ওটা বাড়ির একটু পিছন দিকে। এতো রাতে কে আবার জল নিতে এলো ? চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাবার আগে শ্রাবণী ঘর থেকে চাদর জড়িয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে ক্যাঁচ কোঁচ শব্দ-টা বন্ধ হয়ে গেলো। স্ত্রী একটা হাই তুলে বললো। "অনেক ট্রেন জার্নি করে এসেছো। নতুন ঠান্ডায় বসে থাকলে শরীর খারাপ হতে পারে। তাছাড়া এগারোটা বাজতে চললো, ঘরে চলো।"

ওই জল তোলার শব্দ আমার চোখ থেকে ঘুম কেড়ে নিয়েছে। বৌকে যদি বলি, আমি শব্দের সন্ধানে যাবো! তাহলে আর দেখতে হবে না। কিন্তু মনের অন্দরে কৌতূহল আমার চরমে পৌঁচেছে। সামনের গেট দিয়ে কাউকে ঢুকতেও দেখিনি। পুরো বাড়িটা উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা! তাহলে? এই তাহলে টাই আমাকে ভাবাচ্ছে।

"তুমি শুয়ে পড়ো। আমি একটু বাদে যাচ্ছি।" একটু কেশে বললাম।

"অচেনা নিরিবিলি জায়গা। চোর বদমাশও আসতে পারে।" -কথাটা খারাপ বলেনি ও। তবু মন সায় দিচ্ছে না। এক অজানা রহস্য যেন আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ওকে সান্ত্বনা দিলাম।

"মিথ্যে ভয় পাচ্ছো। তুমি যাও, আমি আসছি।" ও ইতস্তত করে শুতে চলে গেলো। আমি কান খাড়া করে আছি। নির্জন নিস্তব্ধ শিমুলতলায়, রাতজাগা যেন এক অতন্দ্র প্রহরী। এখন ভাবি, ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেই বোধহয় ভালো হতো। সব বিষয়ে বেশি কৌতূহল কখনো কখনো বিপদ ডেকে আনে। আমি যে খাল কেটে কুমির ডেকে আনছি কল্পনা করতে পারিনি। এতো ভয়াল ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার শিকার আমি হবো, ঘুণাক্ষরে টের পাইনি!

* * *

শ্রাবণী চলে যেতেই উঠে দাঁড়ালাম। চাঁদ ইতিমধ্যে টিলার দিকে খানিকটা সরে গেছে। তবু আলো যথেষ্ট আছে। রাত জাগা পাখিটার ডাক আর শোনা যাচ্ছে না।

বোধহয় সে ঘুমিয়ে পড়েছে। দূরে টিলাটা যেন সাদা কালোয় আঁকা একটা ছবি হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি চার ধাপ সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম। এবার সন্তর্পণে ইদারার দিকে এগোলাম। ইদারার পিছনেই একটা গাছ থাকার জন্যে জায়গাটা আলো আঁধারি গোছের। কাউকে নজরে পড়লো না। কিন্তু স্পষ্ট শুনেছি কপিকলের আওয়াজ। আরও কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে একেবারে কুয়োর সামনে দাঁড়ালাম। দেখি, দড়ি বাঁধা বালতিটা শানের মেঝেতে নামানো রয়েছে। বালতিতে অর্ধেক জল রয়েছে। বাকি জলে মেঝেটা ভিজে সপসপ করছে। আমার সন্দেহ মিলে গেলো। কারণ জলের ধারা এখনও গড়াচ্ছে। একটু আগে কেউ যে জল তুলেছে তার টাটকা প্রমাণ।

এদিক ওদিক তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেলাম না। এ আবার কিরকম লুকোচুরি খেলা? এক মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। হিম শীতল বাতাস টিলার ওপর থেকে নেমে এসে আমার শরীরের ওপর দিয়ে বয়ে গেলো। গাছের পাতাগুলো যেন হঠাৎ প্রাণ ফিরে পেলো ওই বাতাসে। নড়াচড়া শুরু করে দিলো। একটা অস্পষ্ট ফিসফিসানি তাদের কাঁপনে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো চারপাশে। যেন পাতাগুলো নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। যেহেতু শীত আসছে, তাই কিছু শুকনো পাতা ঝরে পড়তে লাগলো। ঠান্ডা বাতাসে আমার বুকের মাঝে কাঁপুনি ধরাচ্ছে। বেকার এখানে দাঁড়িয়ে থাকা নিরর্থক। তখনি বৌয়ের কথাটা মাথায় খেলে গেলো। কোন চোর বদমাশ এর আগমন ঘটতে পারে। তাই যদি হয়? আমাকে এখানে টেনে আনার একটা উদ্দেশ্য হতে পারে। এদিকে এই সুযোগে ঘরে ঢুকে যা কিছু আছে, তাই নিয়ে কেটে পড়তে পারে। কেননা শোবার ঘরটার দরজাটাও ভেজানো।

চটপট পা চালিয়ে বারান্দার দিকে চললাম। সেই সময়, কুয়োর জলে ঝপাং করে বালতি পড়ার শব্দে বুকটা ভয়ে কেঁপে উঠলো। প্রথম ভয় পেলাম। কারণ পিছু ফিরে কাউকে দেখতে পেলাম না। এর ফলে ভয়টা দুগুণ বেড়ে গেলো। দড়ি বাঁধা বালতিটা কুয়োর মধ্যে ফেললো কে? কপিকলের দড়ি টানটান অবস্থায় দুলছে। সাহস পেলাম না, এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে ইদারার নিচটা দেখতে! যদি অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ে? বিশৃঙ্খল পা ফেলে বারান্দার কাছে ফিরে আসতেই, কানে এলো ক্যাঁচ কোঁচ করে জল ভরা বালতি তোলার শব্দ! বিনা মানুষে এই কাজ কখনও সম্ভব? যদি না অদৃশ্য শক্তির আবির্ভাব না ঘটে! কথাটা মনে আসতে স্নায়ুগুলো শিথিল হয়ে এলো। এর আগেও কয়েকবার

তাদের উপস্থিতি আমি উপলব্ধি করেছি। কিন্তু এই বিদেশ বিভুঁইয়ে সামনা সামনি এরকম ঘটনা খুব কম!

কুয়ো তলায় যাবার উৎসাহ ইতিমধ্যে মন থেকে উধাও হয়ে গেছে। তার জায়গায় সারা দেহে ভয় হামাগুড়ি দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চাঁদের আলো কমে আসছে। ঠান্ডা ক্রমশ বাড়ছে। সিঁড়ি দিয়ে বারান্দার ওপর উঠে এলাম। কপিকলের কর্কশ শব্দ তখনও হয়ে চলেছে। কোন অতল থেকে জল তুলছে? যে জল তুলছে তাকে কল্পনায় চিন্তা করে আতঙ্কে হাত পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যাচ্ছে। এই জনহীন নিশুতি রাতে ঘরে শুয়ে সারা রাত যদি ওই জল তোলার শব্দ শুনতে হয়, ঘুম হবে ?

বারান্দায় উঠে দরজাটা বন্ধ করতে গিয়ে এক মিনিট থমকে গেলাম। কারণ আওয়াজটা আচমকা বন্ধ হয়ে গেলো। তার মানে, ভরা বালতি ইদারার ওপর উঠে এসেছে। কান খাড়া করে আছি। জল ঢালার শব্দ শোনার জন্যে। হঠাৎ, অন্য রকম একটা আওয়াজ কানে এলো। কেউ যেন মাটিতে কোদাল চালাচ্ছে। খপ খপ করে মাটি কাটছে। মাথাটা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। এতো রাতে এই ঠান্ডায় কে মাটি কাটবে ? বাইরে বেরিয়ে দেখবো? দোটানায় পড়ে গেলাম। একদিকে জানার ইচ্ছে। অন্য দিকে ভয়! মনকে সংযত করলাম। যা থাকে কপালে, বারান্দা থেকে উঁকি মেরে একবার দেখবো। ভূত কোনদিন মাটি কাটে না। আবার পা ফেললাম দরজার বাইরে। ঘাড় ঘোরাতে বারান্দার পাশে থাকা নোনা গাছটার নিচে দেখলাম। খালি গায়ে হাঁটু পর্যন্ত সাদা ধুতি পরা একটা লোক কোদাল হাতে মাটি খুঁড়ছে। এর মধ্যে খানিকটা গর্ত মতো কেটে ফেলেছে। লোকটা কি রক্ত মাংসের তৈরী ? না কোন বিদেহী আত্মা!

এই সময় হঠাৎ যেন লোডশেডিং হয়ে গেলো। মুহূর্তে কালো অন্ধকার চারিদিকে ছেয়ে ফেললো। আমার চোখের সামনে থেকে ওই লোকটাকে কালো আঁধার গিলে ফেললো। লোডশেডিং নয়, আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম এক খন্ড কালো মেঘ চাঁদটাকে ঢেকে ফেলেছে। অন্ধকারের সাথে ভয়টাও আমাকে চারধার থেকে জড়িয়ে ধরলো। কেননা ওই অন্ধকারের মাঝেও মাটি কাটার শব্দ আমার কানে আসছে। কোন অশুভ শক্তি কারো শেষকৃত্যের জন্যে কবর খুঁড়ে চলেছে। আমার বুকের সাহস একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে। এ গুলো যে মানুষের কাজ নয়, তা এখন একটা বাচ্চা ছেলেও বুঝতে পারবে। দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে শোবার ঘরে চলে এলাম।

ঘরের কম পাওয়ারের আলোয় দেখলাম বউ অকাতরে ঘুমোচ্ছে। কম্বল

টেনে নিয়ে শুয়ে পড়লাম। নিজের বুকের ধুকপুকুনি শুনতে পাচ্ছি। রাতটা কোন রকমে কাটলে বাঁচি। সজ্জন প্রসাদ একবারের জন্যে জানতে দেয় নি যে এটা ভূতের বাড়ি। গাড়ি ওয়ালাটাই বা কি ? বাইরে থেকে জানলা ভেদ করে সেই মাটি কাটার খপ খপ শব্দ ক্রমাগত কানে আসছে। যার ফলে দু চোখের পাতা এক করা সম্ভব হচ্ছে না! শ্রাবণী একদিক থেকে বেঁচে গেছে। ঘুমের গভীরে আছে। কিন্তু তখনও কি জানি ভয়ে আতঙ্কে আমার অজান্তে আমি কি ভুল করে বসে আছি ? জানলে হার্ট ফেল করে মারা যেতাম!

* * *

চোখ বুজে ঠাকুরের নাম করছি। সকাল হলেই এখান থেকে কেটে পড়তে হবে। সস্তায় থাকার জায়গা খুঁজতে গিয়ে এই অবস্থা। কিন্তু যাবার আগে বাড়ির গোপন রহস্যটা জানতে হবে। নিশ্চয়ই এর পিছনে কোন মর্মান্তিক ইতিহাস আছে। এই সময় রফিক থাকলে ভালো মোকাবিলা করা যেত। এই সময় নতুন একটা চিন্তা মাথায় খেলে গেলো। আত্মা সর্ব ক্ষেত্রে বিরাজমান। তারা যেখানে খুশি যেতে পারে। এই ঘরের মধ্যেও আসতে কোন বাধা নেই! কথাটা মনে হতেই শরীরে শিহরণ খেলে গেলো। বাধ্য হয়ে চোখ দুটো খুললাম। অন্ধকারের পর্দা সারা চোখ জুড়ে। ঘরের আলো একটু আগেই জ্বলছিল। সজ্জন-এর কথা মনে পড়ে গেলো। এখানে নাকি প্রায় বিজলি চলে যায়।

চারিদিকে এতো গাঢ় অন্ধকার যে পাশে শুয়ে থাকা স্ত্রীকে পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। ঠান্ডার জন্যে জানলার কাঠের খড়খড়ি বন্ধ। উঠে জানলা খুলতেও মন চাইছে না। কারণ জানলার নিচে ওই লোকটা গর্ত খুঁড়ছিলো। এখনও নিশ্চয়ই ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। মোবাইলটা হাতড়ে বালিশের নিচ থেকে বার করলাম। এটাতে টর্চ আছে। টর্চটা জ্বালাতেই বিষম খেলাম! এ আমি কোথায় শুয়ে আছি? শোবার ঘরের কোনে দাঁড় করানো ড্রেসিং টেবিলটা কই? তাছাড়া দেওয়াল বক্স আলমারিটাও চোখে পড়ছে না! মোবাইলের আলোয় অচেনা লাগছে! পরক্ষণেই শ্রাবণীর কথা মনে এলো। আমি না হয় দেখতে ভুল করছি, কিন্তু ও তো শুয়ে আছে। কিন্তু বিছানার পাশে তাকাতে, আমার হৃদপিন্ড যেন স্তব্ধ হয়ে গেলো! কোথায় শ্রাবণী ? আমি একা রয়েছি খাটে। একটু আগেও ওকে দেখেছি পাশে কম্বল চাপা দিয়ে ঘুমোচ্ছে। আমার মুখের সমস্ত রক্ত কে যেন ব্লটিং পেপার দিয়ে শুষে নিয়েছে। বুঝতে পারছি মুখটা চক খড়ির মতো সাদা হয়ে গেছে। মস্তিষ্কের কোনে কোনে রক্ত যেন নাচছে! অনেক কষ্টে ভয়-টাকে দমন করার চেষ্টা করছি। কারণ তান্ত্রিক রফিক বলেছিলো-- যত ভয় পাবেন, তত ওদের আনন্দ। তত শক্তি বৃদ্ধি পাবে অশরীরি পিশাচদের।

জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁটটা চাটলাম। মনে একটা কথা ভেসে এলো। এমনও হতে পারে...শ্রাবণী বাথরুমে গেছে। আমি যখন চোখ বুজে মাটি কাটার শব্দ শুনছি... হয়তো বুঝতে পারিনি। কিন্তু তখনও জানিনা আমার চিন্তাধারা কতটা ভুল! মোবাইলের আলো দরজার ওপর ফেলতেই মাথাটা ঘুরে গেলো। দেহের সব রক্ত যেন জমাট বেঁধে গেলো। সভয়ে দেখলাম দরজাটা ভেতর থেকে ছিটকিনি আটকানো! তাহলে শ্রাবণী গেলো কোথায়? মনের ভেতর আতঙ্কের ঝড় বইছে। এ কি ভয়ের সমুদ্রে পড়লাম! চিন্তাধারা গুলো পর্যন্ত এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। আমাকে ঘিরে রয়েছে ভয় মাখানো এক অদ্ভুত নীরবতা। ক্রমশ আমি পাথরের মতো জড় পদার্থে পরিণত হয়ে যাচ্ছি।

শ্রাবনীর চিন্তা আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র করে খাট থেকে নামলাম। সেই সময় ঘরের নীলচে আলোটা জ্বলে উঠলো। বিছানার দিকে তাকিয়ে দেহটা হিম হয়ে গেলো! টানটান চাদরে শ্রাবণীর শোরার চিহ্নটুকু নেই। যত দেখছি, মাথার ভেতরে অশুভ চিন্তা জট পাকাচ্ছে। আমাকে আগে স্ত্রীকে খুঁজে বার করতে হবে। একটা জল জ্যান্ত মানুষ বন্ধ ঘর থেকে মিলিয়ে যেতে পারে না। আচমকা দরজার বাইরে থেকে কেউ ধাক্কা দিলো। এই ঠান্ডায় কপাল থেকে এক ফোঁটা ঘাম হাতে পড়লো। এক টুকরো বরফ যেন! এবার বাইরে থেকে শ্রাবণীর গলা পেলাম। "এই ঘরে শুয়েছো কেন? পাশেরটা আমাদের শোবার ঘর।" ওর কণ্ঠস্বর আমার মনে অল্প জোর আনে। পরক্ষনেই মনে পড়ে যায়। তাই যদি হবে ? একটু আগে ও এই ঘরে শুয়ে ছিল! নিজের চোখে দেখেছি। তাহলে বাইরে যে আছে, সে সত্যি শ্রাবণী তো? দরজা খুললে অন্য কিছু বীভৎস দৃশ্য দেখবো না তো? নিজেকে কেমন পাগল পাগল লাগছে। কোনটা সত্যি, কোনটা মিথ্যে বোঝার বাইরে চলে গেছে। মাথাটা ধোঁয়াশা হয়ে গেছে।

"কি হলো, আমার কথার উত্তর দিচ্ছো না কেন ?" শ্রাবণীর উদ্বিগ্ন গলা। আবার সন্দেহের দোলায় পড়লাম। ও বাইরে থেকে দরজা ধাক্কা দিচ্ছে। "ভোর হতে চললো।" এই কথাতে মনের হারানো শক্তি ফিরে এলো। তবু মোবাইলে সময় দেখলাম। পৌনে চারটে বাজছে। সারা রাত আমি এই ঘরে একা ছিলাম? পাশে যে শুয়ে ছিলো তার কথা মনে আসতেই পা দুটো কাঁপতে লাগলো। দরজার ছিটকিনি খুলতে বউয়ের চিন্তিত মুখ দেখতে পেলাম। বাইরের দালানে আলো জ্বলছে। আমার চোখ মুখের চেহারা দেখে ও একটু ভয় পেয়ে গেলো।

"কি হয়েছে তোমার? ভয়ের স্বপ্ন দেখেছো?" মুখ খুলতে গিয়ে চেপে

গেলাম। কি দরকার ওকে ভয় পাইয়ে ? নিজেকে সংযত করলাম। ভাঙা গলায় বললাম। "ঘুমের ঘোরে ভুল করে এই ঘরে শুয়ে পড়েছিলাম। খেয়ালও করিনি তুমি নেই।" মনে হলো আমার কথাটা ও বিশ্বাস করলো না।

"ঠিক আছে, ও ঘরে গিয়ে শোবে চলো।" ওর পিছু পিছু আমি চললাম। যেন একজন বিপর্যস্ত, বিদ্ধস্থ, শ্মশান ফেরৎ যাত্রী।

* * *

সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ ঘুম ভাঙলো। মাথাটা ভার হয়ে আছে। মুখ ধুয়ে হাফ হাতা সোয়েটার চাপালাম। চা খেয়ে বললাম। "শুধুতো চা চিনি এনেছি। গতকাল যে দোকান থেকে চাল, আলু এনেছি। সেখান থেকে ডিম আর পাঁউরুটি নিয়ে আসি। ব্রেকফাস্টে ওমলেট আর টোস্ট হয়ে যাবে। "আমার আসল উদ্দেশ্য দোকানে গিয়ে কৌশলে বাড়িটার ইতিহাস জানা। কারণ সজ্জন মোটেই বলবে না। মনে মনে স্থির করে নিয়েছি। প্রাতরাশ সেরে এখান থেকে কেটে পড়বো।

মুখে একটা সিগারেট ধরিয়ে গুমটি দোকানের দিকে চললাম। সূর্য উঠলেও এখনও উত্তপ্ত হয়ে ওঠেনি। বরং মিঠে কড়া তাপ ভালোই লাগছে। দোকানিটা চিনতে পারলো। হাসির বদলে ওর মুখে বিস্ময়। হয়তো ভেবেছিলো ভোরে আমরা এ স্থান ছেড়ে চলে গেছি। ওর মুখের ভাব দেখেই বুঝলাম, অভিশপ্ত বাড়িটার বিষয়ে কিছু জানে। ডিম আর পাঁউরুটি কিনে ওকে প্রশ্ন করলাম। দোকানে এখন কোন খদ্দের নেই। ওকে আমার ভয় পাবার কথা বলতে একটু এদিক ওদিক তাকালো। আমাকে বেঞ্চে বসতে বলে হিন্দিতে ওর কাহিনী শুরু করলো।

কয়েক বছর আগে এই বাড়িতে থাকতো রঘুবীর জি আর তার স্ত্রী। বাগানের কাজকর্মের জন্যে একজন মালি রেখেছিলো। মালি বাগানের কাজ দেখতো আর তার বউ রান্না, ঘর দোরের কাজ করতো। ইদারার পিছনে ওদের ছোট্ট একটা ঘর ছিল। যা এখন নেই। রঘুবীর ভেঙে দিয়েছে। প্রায় সময় রঘুবীর বৌকে নিয়ে পাটনায় থাকতো ব্যবসার কাজে। মালিটা ছিল খুব সন্দেহ বাতিক। বৌকে খুব সন্দেহ করতো। কোন লোকের সঙ্গে কথা কইলেই খুব পেটাতো। একদিন এই রাগের চোটে রাত্রে গলা টিপে বৌটাকে মেরে ফেলে। তারপর ওর লাশ বাগানে গর্ত খুঁড়ে পুঁতে দেয়। সেই সময় রঘুবীর এখানে নেই। মালি রটিয়ে দিলো, বৌ দেশে চলে গেছে। আমাদের সন্দেহ হলো। একা একা রাত্রে বউ চলে গেলো ? অনেকে প্রশ্ন করতে শুরু করলো। রঘুবীর ফিরে এসে আমাদের মুখ থেকে শুনে ওকে খুব জেরা করতে, অবশেষে স্বীকার করলো। রঘুবীর থানায় গেলো। সেই সুযোগে মালি ওই বড়ো ইদারার ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা

করলো। পুলিশ এসে দুটো লাশ তুলে নিয়ে গেলো। দু দুটো অপঘাতে মৃত্যু হবার পর, রঘুবীরের স্ত্রী বাড়িতে থাকতে চাইলো না। তখন ওই সজ্জন, জলের দামে বাড়িটা কিনে নেয়। যারা এখানে বেড়াতে আসে, তারা সস্তায় বাড়ি পেয়ে যায়। কিন্তু কেন জানিনা একদিনের বেশি কেউ থাকে না। দোকানি একটু চুপ করে। কেননা একজন খদ্দের এলো চাল কিনতে।

ও চলে যেতেই শুরু করে। আমাদের সন্দেহ হয়। একদিন গরমকালে দোকান বন্ধ করে রাতে ফিরছি। শুনতে পেলাম কুয়ো থেকে কেউ যেন জল তুলছে। পাঁচিলের সামনে গিয়েও কাউকে দেখতে পেলাম না। পিছু ফিরতে দেখি মালির বৌটা আমার সামনে দিয়ে পাঁচিল টপকে ভেতরে ঢুকে গেলো। দেখুন বাবু, এখনও গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। সজ্জনকে বলতে, ও আমাকে শাসালো। আমি নাকি ওর ব্যবসা বন্ধ করতে চাইছি। চুপ করে গেলাম। এখানকার কিছু লোকও ছায়ামূর্তি দেখতে পেলো, কানাঘুঁষো শুরু হলো। খদ্দের আসা কমে গেলো। সেই জন্যে স্টেশনে দালাল রেখে দিয়েছে। তারা লোক নিয়ে আসে। তবে সবাই ওই আত্মার দেখা পায় না। কিছু কিছু টুরিস্ট পেয়েছে। যেমন আপনি। ও আবার অনুরোধ করলো, যেন সজ্জনকে ওর কথা না বলি।

আর আমার শোনার কিছু ছিল না। তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম। ব্রেকফাস্ট সেরে সজ্জনকে ফোন করলাম। গাড়ি আনতে বললাম। চলে যাবার কথাও বলে দিলাম। ও দেখলাম, বিশেষ কিছু বললো না। এক ঘন্টার মধ্যে গাড়ি ধরে একটা ভালো হোটেলে এসে উঠলাম। আগে আমাকে ভালো করে স্নান করতে হবে। কেননা কাল রাতে ওই অতৃপ্ত আত্মার পাশে আমি শুয়েছি। ভাগ্যিস রফিকের দেওয়া কবচটা হাতে বাঁধা ছিল। কিন্তু স্নান করতে গিয়ে দেখলাম বাহুতে বাঁধা ঝকঝকে রুপোর কবচটা কালচে হয়ে গেছে।

এখান থেকে ফিরে ওর মাজারে যেতে হবে। মনে হয়, অশুভ শক্তির প্রভাবে কবচের শক্তি কিছুটা নষ্ট হয়ে গেছে। বাথরুম থেকে বের হতে, শ্রাবণী জিজ্ঞেস করলো, "হঠাৎ মত পরিবর্তন করে হোটেলে চলে এলে?" জানতাম এ প্রশ্ন আসবে। তৈরী ছিলাম। বললাম, "কয়েকদিনের জন্যে আসা। এর মধ্যে তোমায় হাত পুড়িয়ে রান্না করা! শুনলে লোকে কি বলবে?" ও তৃপ্তির হাসি হাসলো।

আজ এতদিন বাদে ঘটনাটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। বিশ্বাস করা না করা আপনার হাতে।

রক্ষক

সৌমিত্র কুনাল

অন্যদিনের চেয়ে সেদিন খুব ভোরেই উঠে পড়লেন দেবশঙ্কর বাবু। অ্যালার্ম বাজার অন্ততঃ আধঘন্টা আগে তো হবেই। আসলে গতকাল ফোনটা আসার পরেই অস্বস্তি হচ্ছিলো। মনে হচ্ছিলো তখনই ছুটে বেরিয়ে যান। কিন্তু বয়স, সময় আর শরীরের কথা মনে করেই নিজেকে কোনোরকমে আটকে রেখেছিলেন কলকাতার বাড়িতে। পুরুলিয়ার তলাইমুন্ডি নামক গ্রাম ছেড়েছেন আজ বহুদিন হলো। তবু দেশ আর বাড়ি বলতে আজও নিজের প্রানপ্রিয় তলাইমুন্ডি গ্রামের বসতভিটের প্রতি তাঁর আত্মিকটান নিখাদ আর নির্ভেজাল।

বিশাল না হলেও ধনী ছিলেন দেবশঙ্কর বাবুর পূর্বপুরুষরা। ঊর্ধতন সপ্তম পুরুষ ছিলেন নীল ব্যবসায়ী ওয়ালটন সাহেবের নায়েব। কোনো এক অজানা কারণে, বছর বিশেকের অনাথ প্রতাপ দে'কে নিজের পুত্রবৎ স্নেহ করতেন ওয়ালটন সাহেব। নীল ব্যবসায়ী হিসেবে আর পাঁচটা দাগী ব্রিটিশের মতো, তিনি নির্মম'ও ছিলেন না। তাই বেশিদিন নীল ব্যবসা টানতে পারেন নি। স্বভাব কবি এবং নরম মনের ওয়ালটন সাহেব, তাই মাত্র বছর পাঁচেক চালানো নীল ব্যবসায়ে লোকসান গুনে পাড়ি জমিয়েছিলেন কলকাতা শহরে। ফেলে রাখা নীলকুঠি, দানপত্র করে গিয়েছিলেন প্রতাপ দে'কে। আর কিনে দিয়েছিলেন প্রায় পঞ্চাশ বিঘে ধানী জমি। যাতে তিনি চলে গেলেও, প্রতাপ বাবু নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে কিছু একটা করে খেতে পারেন। প্রতাপ বাবু ছিলেন করিৎকর্মা পুরুষ। সাহেবের গোমস্তায় কাজ করতে করতেই ইংরেজি আর পার্শী ভাষাটা শিখে নেন নিজের চেষ্টায়। সাগরপারের ব্রিটিশ প্রভুদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করে, পঞ্চাশ বিঘের ধানী জমি থেকে নীলের চাষ করিয়ে, বছর না ঘুরতেই লাভের মুখ দেখা শুরু করলেন। বছর তিনেকের মধ্যে এমন প্রতিপত্তি বানিয়ে ফেললেন যে, নীলকুঠিকে রাতারাতি বানিয়ে ফেললেন দোতলা ভদ্রাসন। পঞ্চাশ বিঘের জমি থেকে সম্পত্তির পরিমাণ হলো একশো কুড়ি বিঘে। পুরুলিয়া শহরে ব্যবসা করতে আসা বা ধর্ম প্রচার করতে খ্রিষ্টান সাহেবদের রীতিমতো ধারকর্জ দিতে

শুরু করেন সুদের বিনিময়ে। তাঁর নিজস্ব লেঠেলবাহিনীর ভয়ে ব্রিটিশ সন্তান হোক বা নিতান্তই গ্রাম্য হাভাতে কৃষক, ধারের টাকা বা দাদনের টাকা মেরে দেওয়ার চিন্তা অবধিও করতেন না কেউই। বছর পাঁচেকের মাথায় মোট পাঁচশো বিঘের জমিদারি নিয়ে, মাত্রই আঠাশ বছর বয়সে, ব্রিটিশ সরকারের থেকে "রায়চৌধুরী" উপাধি লাভ করেন। লোকে তাঁকে আড়ালে বলতো পিশাচ। কারণ অবশ্যই সঙ্গত। সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে স্ত্রীর মৃত্যুর পরপরই, জমিদার প্রতাপ রায়চৌধুরী একজন সিদ্ধ তান্ত্রিকের সংস্পর্শে আসেন। কথিত আছে তিনি কৌশিকি অমাবস্যায় কামাখ্যা মন্দিরে নরবলি দিতেন। শিষ্য প্রতাপ'কে দিয়ে তিনি তন্ত্রের বহু ক্রিয়া করিয়েছিলেন। এমনকি...

অ্যালার্মটা তারস্বরে বেজে উঠলে, চিন্তার জাল কেটে গেলো দেবশঙ্করবাবুর। স্ত্রী মল্লিকা'র দিকে তাকিয়ে দেখলেন, ঘুমোচ্ছে। অগত্যা তাড়াতাড়ি নিজেই এক কাপ চা করে খেয়ে নিলেন। গিজারে জল গরম হতে হতে দ্রুত হাতে দাড়ি কেটে, স্ত্রী মল্লিকা'কে ডেকে বললেন, "বাড়ি যাচ্ছি। দিন দুয়েকের জামাকাপড় গুছিয়ে দিতে পারবে?" মল্লিকা ধড়মড় করে উঠে বসে বললো, "হঠাৎ কি ব্যাপার? এত ভোরে বেরোবে? কোনো খারাপ কিছু হলো নাকি কারো?" স্নানঘরে ঢুকতে ঢুকতে খানিক বিরক্ত হয়েই দেবশঙ্করবাবু বললেন, "এত প্রশ্ন করা কেন? না খারাপ কিছু হয়নি। কিন্তু যাতে না হয় সেই কারণেই যাচ্ছি। বিষয় সম্পত্তির একটা গতি করতেই হবে, নইলে তুমিও সর্বনাশ এড়াতে পারবেনা।" মল্লিকাদেবী কিছুই না বুঝলেও, এটা বুঝলেন যে তাঁর স্বামী আর অপেক্ষা করবেন না। এবার হাতের কাছে সব গুছিয়ে না দিলে এক কাপড়েই বেরিয়ে যাবেন।

স্নান করতে করতে গতকাল রাতে ফোনে ভাইয়ের কথাগুলোই ভাবছিলেন। পুরুলিয়ার তলাইমুন্ডি গ্রামের পূর্বতন জমিদারের বাড়ির একতলার ঘরে যে সংসারের রক্ষাকর্তা আর সর্বনাশ দুইই একসাথে আছে, ভাই সেটা বিশ্বাস করতে রাজি নয়। বাড়ি ভেঙে পড়ছে দ্রুত। একদিকের ভাঙা অংশের ইঁট বেচে দিয়েছে বছর খানেক আগেই। তাই দিয়ে নিজের দিকের অংশটা খানিক সরিয়ে নিয়েছিলো। কিন্তু এখন তার দিকের অংশেও বড়ো ভাঙন লাগছে। এখনই কিছু একটা ব্যবস্থা না করলে, কোনোদিন হুড়মুড় করে সব শুদ্ধু ভেঙে পড়বে। দাদার পাঠানো টাকায় বাড়ি সারানো যাবে না সংসার চালিয়ে। গুপ্তধনটা চাইই চাই। কিন্তু ওরা কেউই জানে না সত্যিটা। শুধু জানেন তিনি নিজে। বাবার মৃত্যুর সময়ে কথাগুলো বলে গিয়েছিলেন একমাত্র বড়ছেলেকে।

শীতের ভোরে, রূপসী বাংলা এক্সপ্রেস সাঁতরাগাছি স্টেশনে ঢোকার মিনিট পনেরো আগেই, অ্যাপের গাড়ি দেবশঙ্করবাবুকে স্টেশনে পৌঁছিয়ে দিলো। দ্রুত টিকিট কাউন্টারের দিকে গেলেন দেবশঙ্কর। ভোরের ঠান্ডা হাওয়া গায়ে মাখতে মাখতে স্মৃতির উঠোনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন দেবশঙ্কর। আবছা আবছা মনে পড়ে আজকাল সবকিছু। জ্ঞান হওয়া অবধি দেখে এসেছেন, বাড়ির ভেতরের মন্দির লাগোয়া একতলার একটা ছোট্ট ঘর। সে ঘরে ঢোকার অধিকার ছিলো না কারো। কেবল প্রতি অমাবস্যার রাতে, বাবা গিয়ে একথালা খাবার আর ঘটি করে জল দিয়ে আসতেন তালাবন্ধ ঘর খুলে। কিন্তু সেই থালাবাসন কেউ বের না করলেও, পরেরদিন দেখা যেতো, থালাবাসন পরে আছে ঘরটার বাইরে। বাবাকে শৈশবে বহুবার জিজ্ঞেস করেও সঠিক উত্তর পাননি দেবশঙ্কর। বাবা হেসে বলতেন, "ম্যাজিক"। বাবার মৃত্যুর পরে বছর দশ বারো, প্রতিমাসে একবার করে বাড়ি ফিরতেন নিয়ম মাফিক বাড়ি ফিরতেন দেবশঙ্কর। নিজের হাতে দরজা খুলে খাবার আর জল রেখে আসতেন ভেতরে। পরের দিন ভোরে উঠে আবার থালা বাসনগুলো দরজার বাইরে থেকে নিয়ে নিজে হাতে মেজে ঘষে ঠাকুরের বাসনের সাথে রেখে দিতেন নির্দিষ্ট জায়গায়। একদিন কেবল ভুল করে বলির পাঁঠার মাংসের বদলে, কলকাতার হাফিজের রেওয়াজি মাংস কিনে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেবার অমাবস্যার পরের দিন সকালে অদ্ভুতভাবে থালা বাসন একদম আগের রাতের মতোই ছিল। খাবারে কেউ হাত অবধি দেয়নি। বাড়ির বাকিরা হাসাহাসি করলেও, দেবশঙ্করবাবু ভালোই বুঝেছিলেন একটা গন্ডগোল হয়েছে। বিস্তর বড়ো গন্ডগোল। সেটা প্রমাণ হতেও বেশি সময় লাগলো না। দুপুরে খেতে বসেই, মুখে ভাত তোলার আগেই দেবশঙ্করবাবু বুকে প্রবল ব্যাথা অনুভব করলেন। আর সেটা এতই প্রবল যে তিনি অজ্ঞান হয়ে মুখ থুবড়ে পড়লেন ভাতের থালায়। জ্ঞান ফিরতে জানতে পারলেন সিভিয়ার স্ট্রোক। পুরুলিয়া জেলা হাসপাতাল দায় ঝেড়ে ফেলতে চেয়েছিলো। অনেক কষ্টে বন্ডে সই করে ভর্তি করানো হয়েছে। বুকে স্ট্রেইন বসবে। তবে সেটা হবে কলকাতার। সেবার প্রায় মাস তিনেকের ধকল সহ্য করে বাড়ি ফিরতে পেরেছিলেন। তবে ত্যাগ করতে হয়েছিল উত্তেজনা আর হাজারো রকম খাদ্য, যার মধ্যে একটা হলো রেওয়াজি মাংস।

শীতের দিনে কলকাতা থেকে রূপসী বাংলা ট্রেন ধরতে কষ্ট হলেও, একটাই সুবিধে একদম কাঁটায় কাঁটায় বারোটার আগেই পৌঁছিয়ে দেয় পুরুলিয়া। ভাইকে বলাই ছিলো। সে বাইক নিয়ে অপেক্ষা করছিল স্টেশনের বাইরে। বাইকে পথের ধুলো মেখে আরো আধ ঘন্টার যাত্রার শেষে দেবশঙ্করবাবু পৌঁছলেন

নিজের গ্রামে। "আঃ!" বলে একটা প্রশান্তির নিঃশ্বাস নিলেন গ্রামে পৌঁছে। একটানা সাইত্রিশ বছর কলকাতায় থেকেও, দেবশঙ্করবাবুর এখনও মনে হয় তিনি ঠিক শহুরে নন। নিজের বাড়ি বলতে এখনও মাঝে মাঝে সল্টলেক না বলে, বলেন তলাইমুন্ডি। হয়তো মানুষের জন্ম আর শৈশব যে স্থানে মেখে থাকে, তাকে উপেক্ষা করার ক্ষমতা স্বয়ং ঈশ্বরের অবতারেরও থাকে না। তাই বোধহয় কৃষ্ণ, মথুরাধিপতী হয়েও অধিক পূজিত হন গোকুলেশ্বর নন্দলালা হয়ে। দুপুরে খেতে বসে ভাইই প্রথম কথাটা পুনরুত্থাপন করলো।

"দাদা, জানি তোমার ইচ্ছে নেই। কিন্তু ভেবে দেখো, বাড়িটা ভেঙে পড়লে যে বাচ্ছা কাচ্ছা নিয়ে পথে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। একে একে তো সবই গেছে। চৌহদ্দির মধ্যে পরে আছে এই আধ ভাঙা অংশটা আর মন্দিরের পাশের হেফাজতখানা। আর সত্যি বলতো দাদা, আমি কি নিজের জন্য চাইছি? এ তো সবই বাড়িটা মেরামত করে থাকার জন্য। রায়চৌধুরী বংশের ভিটে রক্ষার জন্য..." ভাইকে মাঝপথে থামিয়ে, ডাল দিয়ে ঢেঁকিছাঁটা চালের ভাত মাখতে মাখতে দেবশঙ্করবাবু বললেন, "কিন্তু তাও বিষ্টু। তুই সব জানিস। কেন ওই সম্পত্তিতে আমরা হাত দিতে পারি না। দিলেও কি হবে, কিছুই তো তোর অজানা নেই। টাকা কি আমি দিই না বিষ্টু? শুধু গেল বছর তোর ভাইঝির বিয়ে দিতে গিয়ে একটু বেসামাল হয়ে পড়েছি। নইলে...আমায় একটু ভাবতে দে। আমি একটু চেষ্টা করি।"

ডাক্তারের নির্দেশে, রাতের খাওয়া আজকাল ন'টার মধ্যেই সেরে নেন দেবশঙ্করবাবু। দোতলার দক্ষিণ খোলা ঘরটায় শুয়ে, খোলা জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি ভাবছিলেন বাবার বলে যাওয়া গল্পের শেষাংশটুকু।

স্ত্রীর মৃত্যুর পরে, তান্ত্রিক গুরুর সংস্পর্শে এসে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত জমিদার প্রতাপ রায়চৌধুরী কিছুটা শান্তি পেয়েছিলেন। স্ত্রীকে তিনি নিজের চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন। এমনকি জন্মান্ধ সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে স্ত্রীর মৃত্যু হওয়ায়, সেই সন্তানের মুখদর্শন করেননি। কেবল ঔরসজাত হওয়ায়, আঁতুরেই মেরেও ফেলতে পারেন নি সন্তানকে। কিন্তু অগাধ সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে চিন্তিত প্রতাপ, গুরুর আদেশে দ্বিতীয় বিয়ে করেন সর্বসুলক্ষণা এক নারীকে। তাঁর গর্ভে জন্ম নেয় রায়চৌধুরী বংশের একে একে সাত সাতজন উত্তরাধিকারী। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার এবং স্থানীয় ডাকাতের হাত থেকে, নিজস্ব কয়েক কোটি মূল্যের সোনার গয়না ভবিষ্যতের জন্য গুপ্ত করে রাখার জন্য প্রয়োজন পড়েছিলো একটি গোপন কক্ষের আর একজন সম্পদ রক্ষাকারী

যক্ষের। গুরুর আদেশে নিজের প্রথম সন্তানকে যক্ষ নিযুক্ত করতে দ্বিতীয়বার ভাবেননি প্রতাপ রায়চৌধুরী। একে জন্মান্ধ, তায় মা-খাগী সন্তান জন্ম থেকেই ছিলো তাঁর চক্ষুশূল। এক অমাবস্যায়, লোকচক্ষুর আড়ালে সেই অভাগা সন্তান যক্ষ হয়ে নিযুক্ত হলো মন্দির লাগোয়া একতলার ছোট্ট ঘরের মাটির নীচের চোরা কুঠুরিতে। আর সেই থেকেই তাঁকে খুশি করার জন্য প্রতি অমাবস্যায় রাতে বলির মাংস, পোলাও, মাছ, মিষ্টান্ন দিয়ে ভোগ দিয়ে আসছে এই বংশের উত্তরপুরুষরা। কিন্তু যে কজন সদস্যই সেই চোরা কুঠুরি ভেঙে গুপ্তধন নিতে চেয়েছিলেন, তাদের তৎক্ষনাৎ মৃত্যু হয়েছে। দেবশঙ্করবাবুর চিন্তা একটাই। বড়ো মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলেও, ছোটটা সবে কলেজে ভর্তি হয়েছে। বড়ো মেয়ের বিয়ে দিয়ে এখন আর্থিক অবস্থা টালমাটাল। অবসরের আর মাত্রই বছর চারেক বাকি। এই সময়ে তাঁর কিছু একটা হয়ে গেলে, মল্লিকা মেয়েকে নিয়ে কি করবে!! কিন্তু এটাও তো ঠিক, বাবাকে মৃত্যুর সময় কথা দিয়েছিলেন, যেমনই পরিস্থিতি হোক না কেন, ভাইকে আর এই দেশের সম্পত্তি তিনি প্রাণ দিয়েও রক্ষা করবেন। প্রায় রাত দুটো নাগাদ, একবার নিজের হাতের তাবিজে হাত রেখে কিছুক্ষণ চোখ বুজে থেকে উঠে বসলেন। কুঁজো থেকে জল খেয়ে, জানলাটা খুলে দিলেন। এখান থেকে মন্দির আর চোরা কুঠুরির ঘরটা স্পষ্ট দেখা যায়। অমাবস্যা কেটেছে মাত্রই দিন দুয়েক আগে। সরু একফালি চাঁদ উঠেছে আকাশে। পরিষ্কার আকাশে তারাগুলো চুমকির মতো ঝিলমিল করছে। হঠাৎ মনে হলো, চোরা কুঠুরির ঘরটার চারদিকে একটা প্রকান্ড কুয়াশার মেঘ জটলা বেঁধেছে। সেটা সাপের মত পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ঘিরে রেখেছে ঘরটাকে। কিছুক্ষণ সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে, কিরকম একটা অনুভূতি হলো দেবশঙ্করবাবুর। ঝপ করে জানলাটা বন্ধ করে দিলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে শুয়ে থেকে, একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে, পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়লেন দেবশঙ্কর।

সূর্য সবে উঠেছে। কুয়াশা ঘেরা, হাড় কাঁপানো ঠান্ডার মধ্যে, স্নান সেরে দেবশঙ্করবাবু, একবার গৃহদেবতাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে এগিয়ে গেলেন চোরা কুঠুরির দিকে। ভাই বাদে বাড়ির বাকিরা তখনও ঘুমোচ্ছে। অবশ্য সেই কারণেই এই মোক্ষম সময়টাই বেছে নিয়েছেন দেবশঙ্করবাবু। বেশী লোকজন থাকলে ঝামেলা বাড়বে বই কমবে না। দরজাটা খুলতেই একটা ভ্যাপসা গন্ধ নাকে এলো। কেমন একটা পুরোনো আতপ চালের গন্ধ। দেশ পাড়াগাঁয়ের মানুষ দেবশঙ্কর বাবু গন্ধটার সাথে বিলক্ষণ পরিচিত। বাস্তুসাপ থাকলে, বাড়ির আশেপাশে এরকম গন্ধ থাকে। দরজাটা খুলে, দেবশঙ্করবাবু ভাইকে বললেন, "যদি আমার কিছু হয়ে যায়, ওদের দেখিস।"

ভাই রসিকতা করে বললো, "আজকের দিনে এসব গাঁজাখুরি গপ্প বিশ্বাস করোনা দাদা। লোকে শুনলে হাসবে। তোমার কিচ্ছু হবে না।" খুব ক্ষীণ কিন্তু তীক্ষ্ণ হিসহিস শব্দটা কানে আসছিল দেবশঙ্করবাবুর। ফাঁপা মেঝের একটা বিশেষ কোণে ঠেলা দিতেই, মাটির নিচের ঘরের দরজাটা খুলে গেল। আর সাথে সাথেই...

এক পা নেমে, চোরা কুঠুরির মধ্যে ডান পা রাখামাত্রই একটা কেউটে সাপ পেঁচিয়ে ধরলো দেবশঙ্করবাবুর পা'টা। হিসহিস শব্দটা এখন অনুক তীব্র আর তীক্ষ্ণও। বন্ধ ঘরের জন্যই হয়তো সেটা আরো ভয়াবহ মনে হচ্ছে। দেবশঙ্করবাবু অনুভব করলেন, সাপটা তাঁকে ধীরে ধীরে প্রচন্ড জোরে বেঁধে ফেলছে ছোবল মারার আগে। হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডাতেও তিনি দরদর করে ঘামছিলেন। দরজার বাইরে থেকে দৃশ্যটা দেখে, ভাই বিস্ময়ে, ভয়ে চেঁচিয়ে বললো, "দাদা আমি মেনেছি। ফিরে এসো। শাবলটা সাপের মাথায় মারো। আমার সম্পত্তি সারানোর প্রয়োজন নেই। আমরা সব বেচে চলে যাবো কোথাও।"

দেবশঙ্করবাবুর হঠাৎ কি মনে হতে, সাপের চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝলেন, চোখের জায়গাটা গভীরভাবে বন্ধ। কোনদিনও যে সেখানে কোনো চোখ ছিলো না, এটা বোঝাই যায়। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। সাপটা যে তাঁর পূর্বপুরুষ সেটা তিনি জানতেন। এখন মানলেনও। কিন্তু এত কাছ থেকে, এমন আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় তাকে দেখে, দেবশঙ্কর বাবু ভয়ে আড়ষ্ট হলেও, বোধবুদ্ধি হারালেন না। বাবার বলে যাওয়া একটা কথা এখনও তাঁর মনে আছে, "যক্ষ, বংশের কারো ক্ষতি করবে না, যদি না তার মনে লোভ আসে।" দেবশঙ্করবাবুর বাবা অবশ্য এটা পরীক্ষিত সত্য বলেন নি। কারণ তিনি নিজে কোনোদিন এইরকম সাহসী কাজ করেন নি। তবে তিনি ছিলেন প্রাজ্ঞ মানুষ। স্থানীয় স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তিনি নিশ্চয়ই জ্ঞানলব্ধ মতামতই দিয়েছিলেন, এমনটাই মনে হলো দেবশঙ্কর বাবুর। ততক্ষণে সাপরূপী যক্ষ, দেবশঙ্করবাবুর পা'কে জড়িয়ে ধরে ধীরে ধীরে উপরে উঠে আসছে।

চরম বিপদের সম্মুখীন হয়েও, কখনও কখনও দৈব কৃপায়, মানুষ সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে মুহূর্তের মধ্যে। দেবশঙ্করবাবুর ক্ষেত্রেও তেমনটাই হলো। তিনি আর দেরি করলেন না। মনের সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে, খুব ধীরে হাতজোড় করে শান্তস্বরে সাপটিকে বললেন, "আপনি সম্পর্কে আমার পূর্বপুরুষ এবং এই অমিত ধনসম্পদের রক্ষী। কিন্তু বংশানুক্রমে এই ধনসম্পদে আমারও অধিকার আছে। আমার বংশের চিহ্ন এই তাবিজ (হাতের তাবিজ দেখিয়ে)। আমি কথা

দিচ্ছি এই পূর্বপুরুষের ভিটে সারাই করার মতো সামান্য অর্থই আমি নেবো। আমাদের নিজেদের তেমন সামর্থ থাকলে এতে হাত দিতাম না। আপনি আমায় অনুমতি দিন।" দেবশঙ্করবাবুর বিলক্ষণ জানা আছে, সাপ দেখতে না পেলেও সামান্য শব্দ শুনতে ঠিকই পায়। আর প্রাণী হোক বা যক্ষ, অনুরোধ আর আদেশের পার্থক্য সবাইই বোঝে। কিছুক্ষণ সাপটা তার ফণা দুলিয়ে চললো দেবশঙ্করবাবুর মুখের সামনে। তারপর ধীরে ধীরে ফণাটা এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকলো দেবশঙ্করবাবুর মাথা বরাবর। কিছু একটা আন্দাজ করে তিনি, সাপের ফণার সামনে মাথা নীচু করলেন। সময়টা বোধ করি দু তিন সেকেন্ডের বেশী হবে না। যদিও দেবশঙ্করবাবুর মনে হলো সেটা কয়েক যুগ।

মাথায় নরম অথচ হিমশীতল স্পর্শে দেবশঙ্করবাবু বুঝলেন, তাঁর আর বিপদ নেই। কারণ এই স্পর্শ স্নেহের, প্রশ্রয়ের। দেবশঙ্করবাবু অনুভব করলেন ফাঁস আলগা করছে কেউটে। সম্পূর্ণ শরীর থেকে শীতলতা মুক্ত হতে চোখ খুলে আর কিছু দেখতে পেলেন না। একবার চারপাশটা ভালো করে দেখলেন। নাঃ! কিছুই নেই। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন, বুকে হাত দিয়ে ভাই ঠকঠক করে কাঁপছে। দেবশঙ্করবাবু স্মিত হেসে বললেন, "এই যাত্রা বেঁচেই গেলাম সবাই।"

সেই রাতে ফাঁকা ফ্ল্যাটে

উপাসনা রায়

ভরসন্ধ্যাবেলা লোডশেডিং হয়ে গেল আচমকা। ধুত্তোর, কোনও মানে হয়! ব্যাজার মুখে সোফা ছেড়ে উঠল সুদর্শনা। একটা হিন্দি সিনেমায় বেশ বিভোর গিয়েছিল সে।

ও বাবা, বাইরে ঝড় উঠেছে যে! হাতড়ে হাতড়ে মোবাইলটা নিয়ে, ফ্ল্যাশলাইট জ্বেলে ক্যান্ডেল খুঁজতে লাগল সুদর্শনা। সম্ভাব্য সমস্ত জায়গা খুঁজলো। কিন্তু না, মোমবাতি মিলল না। সর্বনাশ করেছে। বাইরে রীতিমত দুর্যোগ শুরু হয়ে গেছে। রাতে কারেন্ট যদি না আসে! পলাশও তো এখনও ফেরেনি। তার ফিরতে রাত হয়। আরেহ্ এমার্জেন্সিটা তো আছে। প্যাসেজের এক ধার থেকে সেটা নিয়ে এসে জ্বালল সুদর্শনা। কিন্তু বিপদ যখন আসে তখন একা আসে না। এরও চার্জ নেই। যে কোনও মূহুর্তে দেহত্যাগ করবে বলে মনে হচ্ছে। যতটুকু আলো পাওয়া যাচ্ছে তা না পাওয়ারই মত। মহা জ্বালাতনে পড়া গেল তো! একে অন্ধকার, তায় বৃষ্টি, তার উপর আবার গোটা ফ্ল্যাটটায় সুদর্শনা সম্পূর্ণ একা। ইসসসস, ক্যান্ডেল নেই একটাও, এটা কেন যে একটু খেয়াল করেনি আগে!

এবার বেশ ভয় করতে লাগল সুদর্শনার। জানালাগুলো বন্ধ করে আবার সোফায় এসে বসে পড়ল ও। ফোন লাগালো পলাশকে।

"হ্যালো, হ্যালো, শুনছো? শুনতে পাচ্ছো?"

"কি হল কি? শুনতে পাচ্ছি তো। কিন্তু গলাটা এরকম শোনাচ্ছে কেন তোমার?"

"দ্যাখো না, ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে। কারেন্ট নেই। এমার্জেন্সি লাইটটায় চার্জ দিতে ভুলে গেছি। ক্যান্ডেলও নেই বাড়িতে। পুরো ফ্ল্যাট একেবারে ঘুটঘুট্টে অন্ধকার হয়ে যাবে যে কোনও মূহুর্তে। কি যে করি এখন!"

"ও এই ব্যাপার? তা আমি এখান থেকে কি করব বলো দেখি? কিছুটা সময় একটু একা একা কাটিয়ে দাও প্লিজ। আমার ফিরতে দেরী হবে। তেমন হলে দোতলার শর্মাভাবীকে ডেকে নাও, ছাড়ছি।"

ফোন কেটে দিল পলাশ। রাগ ধরে সুদর্শনার। শর্মাভাবীকে ডেকে নাও বলেই খালাস! তিনি যেন অসুস্থ শর্মাজিকে ছেড়ে এখন সুদর্শনার ফ্ল্যাটে আসতে যাবেন!

ইতিমধ্যে ভয়টা বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। রাতের রান্নাও তো হয়নি! আজ দুপুরে যা ছিল তা শেষ। কি বানাবে এই অন্ধকারে! ফ্রিজে কিছু সবজি কাটা আছে। সাথে ডিম দিয়ে বড় এক বাটি ম্যাগি করে নেবে বরং। পেট ভরানো নিয়ে ব্যাপার। পলাশের এসব ব্যাপার নিয়ে কোনও ঝামেলা নেই। ওকে যা দেওয়া হবে, সোনামুখ করে তাই খাবে।

ওই যাহ্ বেডরুমের জানালাটা বন্ধ করেছে কি? এই রে, সব ভিজে গেল গো! ফ্ল্যাশলাইট হাতে তাড়াতাড়ি বেডরুমে আসতেই চিৎকারটা গলাতেই আটকে গেল ওর। বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে আছে পলাশ। এবার চিৎকারটা ছিটকে বেরিয়েই এল গলা দিয়ে "তুত-তুমি! তুমি কখন এলে? কি করে এলে?" পলাশ উঠে বসল "তুমি সিনেমায় এমন মজে ছিলে যে কিচ্ছুটি খেয়াল করোনি।"

"ক-ক্-কি যাতা বলছো? তার মানে দাঁড়ায় তুমি লোডশেডিং'এর আগে এসেছো। কিন্তু তারপরে আমি নিজে মোমবাতি খুঁজতে এঘরে এসেছিলাম।"

"আমি তখন টয়লেটে ছিলাম।"

এবারে একটু আশ্বস্ত হল সুদর্শনা। "ওহ্ তাই বলো। এসে ডাকবে তো আমায়! আর কি বদমায়েশি বুদ্ধি গো তোমার! যখন ফোন করলাম, তুমি বেডরুম থেকে কথা বলে গেলে! কি যে করো! উফ... কি ভয় পেয়ে গেছিলাম বাপরে। যাকগে শোনো, রাতে তো কিছুই নেই, ডিম আর সবজি দিয়ে ম্যাগি বানাচ্ছি। চলবে তো? না চললেও কিছু করার নেই। ঘরে মোমবাতি নেই। ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। মোবাইলের ফ্ল্যাশলাইটটাই একমাত্র ভরসা। আমারটার ব্যাটারী প্রায় শেষের মুখে। এখন তো চার্জও দেওয়া যাবে না। দরকারে তোমার ফোনটা লাগতে পারে কিন্তু।"

উত্তরে পলাশ ধীরলয়ে 'হ্যাঁ' সূচক ঘাড় নাড়ল। বেডরুম ছেড়ে ড্রয়িংরুমে আসতেই হঠাৎ সুদর্শনার মনে হল পলাশ যে ভিজতে ভিজতে এল, ওর ব্যাগ, জুতো, ছাতা এসব কই? আর ঘরে একটা টর্চও নেই। এখন মোবাইল আসার পর এই ফ্ল্যাশলাইটে কাজ চলে যায় বলে দরকার হয় না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, থাকলে খুব ভাল হত। কোনও কিছুতে আর বিশেষ মাথা না ঘামিয়ে কিচেনে চলে গেল সুদর্শনা। ম্যাগি সিদ্ধ করতে করতে একবার পলাশের

উদ্দেশ্যে গলা তুলল সুদর্শনা "শুনছোও... তোমার ম্যাগিতে কাঁচালঙ্কা কুচি দেব? আর স্যালাড কাটব? খাবে? সস দেব কিনা সেটাও বলো।"

কোনও উত্তর নেই। সুদর্শনা আবার ডাকলো "কি গোওওওও, শুনছো? সস আর কাঁচালঙ্কা খাবে?" ঠিক তখনই কিচেনের স্ল্যাবের উপর থাকা মৃতপ্রায় এমার্জেন্সি লাইটটা দপ দপ করে উঠে একেবারে নিভে গেল। ড্রয়িং কাম ডাইনিং কাম ওপেন কিচেনটা কুপকুপে অন্ধকারে ডুবে গেল পুরোপুরি।

সুদর্শনা তাড়াতাড়ি হাতড়ে হাতড়ে ফ্ল্যাশলাইট জ্বেলেছে। পলাশের একটু সাহায্য চাই। ফের হাঁক পাড়ে সুদর্শনা "কি হল কি? কানের মাথা কি একেবারে খেয়ে বসে আছো? বলছি তোমার মোবাইলটা নিয়ে এদিকে এসো একবার।"

কোনও উত্তর নেই। অন্ধকারেই সিদ্ধ ম্যাগির জল ঝরিয়ে রেখে সুদর্শনা বেডরুমে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই থমকে দাঁড়ালো। মেইন দরজার কাছে জুতোর তাকের উপর মোবাইলের হাল্কা আলো পড়তেই সুদর্শনা স্পষ্ট দেখল তাতে শুধুমাত্র তার নিজের চটিজোড়া রয়েছে। সেখানে নেই পলাশের জুতো, দরজার ধারে রাখা নেই কোনও ভিজে ছাতা এমনকি সোফার পাশে, ছোট টুলে পলাশের ব্যাগ রাখার জায়গাটাও বেবাক ফাঁকা। হঠাৎ অন্ধকারটাকে যেন চতুর্গুণ মনে হল সুদর্শনার। বুকের ভিতর হাতুড়িপেটা শুনতে শুনতে খুব সাবধানে পা ফেলে বেডরুমের দরজার ধার ঘেঁষে নিজেকে যথাসম্ভব আড়াল করে দাঁড়াল। চোখ রাখল ঘরের ভিতর। ঘর ফাঁকা। বিছানা টানটান নিভাঁজ। এমনকি লাগোয়া টয়লেটের দরজাও খোলা। ভিতরে যে কেউ নেই তা বোঝাই যাচ্ছে। হঠাৎ সুদর্শনার মনে হল, আচ্ছা পলাশ আবার কোথাও বেরুলো না তো? সুদর্শনা কিচেনে ব্যস্ত দেখে হয়ত আর ডাকেনি!

পলাশ বাড়ি ফিরেছে কাকভেজা হয়ে। লোডশেডিং'এ গোটা বিল্ডিং তীব্র অন্ধকারে ডুবে আছে। অতিকষ্টে ল্যাচে ডুপ্লিকেট চাবি ঢুকিয়ে দরজা খুলতেই নতুন করে নিকষ কালো আঁধারটা যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল পলাশের উপর। একি! ড্রয়িং কাম ডাইনিং এমন ঘুটঘুট করছে কেন? অবশ্য সুদর্শনা বলছিল বাড়িতে মোমবাতি নেই! এমার্জেন্সি লাইটটা, সেটা কি হল? এঃ, বড্ড ভুল হয়ে গেছে। এক প্যাকেট মোটা মোম নিয়ে ঢোকা উচিৎ ছিল। অবশ্য এই বাদলায় কোত্থেকে, কিভাবেই বা কিনতো!

"দর্শনা..আ..., দর্শনা..আ... কোথায় তুমি?" সাড়া নেই। সারা ঘর ম্যাগির গন্ধে ম ম করছে। জুতো ছেড়ে রেখে নিজের মোবাইলের ফ্ল্যাশ জ্বেলে কিচেনের দিকে এগোলো পলাশ। গ্যাসে ম্যাগি বসানো রয়েছে সত্যিই। তাড়াতাড়ি গ্যাস নেভালো পলাশ। আবার গলা ওঠালো সুদর্শনার উদ্দেশ্যে।

"দর্শনা..আ... আরেহ্ কোথায় তুমি? গ্যাস অন রেখে কোথায় গেছো? দর্শনা শুনছোওও...?"

কোত্থাও কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে পলাশ ওর ভিজে ছাতাটা দরজার পাশে ঝুলিয়ে, ব্যাগটা নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে বেডরুমে গিয়ে ঢোকে। বেডরুম ফাঁকা। টয়লেটের দরজাও ভিতর থেকে খোলা। পলাশ একটু ঘাবড়েই গেল এবার। বাইরে এই দুর্যোগ! বৃষ্টি দমকে দমকে বেড়েই চলেছে! এর মধ্যে সুদর্শনা গেলটা কোথায়? এবার একটা ফোন করতেই হয়। কিন্তু পলাশ ফোন করতে উদ্যোত হতেই সুদর্শনার নম্বর থেকেই ভেসে এল কল। পলাশ তাড়াতাড়ি ফোন কানে চাপলো "হ্যালো, হ্যালো দর্শনা, কোথায় তুমি? এই ঝড়বাদলের রাতে একা একা কোথায় বেরিয়েছো?"

ওপাশ থেকে শান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গীতে সুদর্শনা বলল "আরে শোনো শোনো। তোমায় তাড়াহুড়োতে ফোন করাই হয়নি। তাছাড়া আজ সারাদিন তোমার মিটিং ছিল। দুপুরে খবর এল কাকার শরীরটা হঠাৎ খারাপ হয়েছে। আমি তখনই তড়িঘড়ি বাঁশদ্রোণী চলে এসেছি।"

"কিইই? তুমি বাঁশদ্রোণীতে? কখন গেছো?"

"দুপুরে খেয়ে উঠতেই তো ফোন এল। মিনিট পনেরোর মধ্যেই বেরিয়েছি। ধরো দুটো আড়াইটে।"

"কি বলো পাগলের মত? তুমি যে একটু আগে আমায় ফোন করলে! করে বললে কারেন্ট গেছে, ঘরে মোমবাতি নেই। তোমার নাকি ভয় করছে?"

"আমি ? পাগলের মত আমি বকছি নাকি তোমার মাথাটা গেছে? আমি তো বিকেলের আগে থেকেই বাঁশদ্রোণীতে!"

পলাশের মাথা ঝিমঝিম করছিল। কি বলছে সুদর্শনা এসব? তাড়াতাড়ি কললিস্ট চেক করল। সত্যিই তো! এইমাত্র ছাড়া আগে সুদর্শনার ফোন থেকে কোনও কলই ঢোকেনি। দুই হাতে মাথা চেপে সোফায় বসে পড়ল পলাশ। সে কি পাগল হয়ে যাচ্ছে?

তার এই ধারণাকে বদ্ধমূল করে দিয়ে কিচেন থেকে গরম গরম ম্যাগির প্লেট হাতে করে বেরিয়ে এল সুদর্শনা। মিষ্টি হেসে বলল "খেয়ে নাও। দ্যাখো তুমি যেমনটি পছন্দ করো। বিনস, গাজর, ক্যাপসিকাম, মটরশুঁটি আর ডিম দিয়ে বানিয়েছি। এই এক মিনিট। একটু চিজ ছড়িয়ে দিই উপরে। আশ্চর্য্য, পলাশের এতটুকুও ভয় করছে না। যেন এমনটাই হওয়ার ছিল।

বাঁশদ্রোণী থেকে পলাশকে ফোন করে দিতে পেরে কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েছে সুদর্শনা। একটা মাত্র তো রাত। ঠিক কোনও না কোনওভাবে কাটিয়ে দিতে পারবে পলাশ। কিন্তু ওই যাহ্, দেখেছো কান্ড, রাত্রে কি খাবে পলাশ সেটাই তো বলা হল না! বেরোনোর আগে ওবেলার ভাত কিছুটা বেঁচেছিল, সেটা ফ্রিজে রেখে এসেছে সুদর্শনা। আর একটু ডালসিদ্ধ, সাথে ডিম আলু ভাজা করে রেখেছে।

এবাবা, নিজের থেকে কিচ্ছু খুঁজে পাবে না লোকটা। খুঁজে দেখবেও না। নির্ঘাত আজ উপোস করবে রাত্রে। যত জ্বালা সব সুদর্শনার কপালে। একে কাকুকে নিয়ে দুশ্চিন্তার শেষ নেই...। আবার ফোনটা হাতে নিল সুদর্শনা। কিন্তু পলাশের নম্বর ডায়াল করার আগেই বেজে উঠেছে ফোন। পলাশই করছে ফোনটা।

"হ্যালো দর্শনা, শোনো, আমি আজ অফিসে আটকে পড়েছি। দেখছো তো কি অবস্থা ওয়েদারের। আজ আর বাড়ি ফেরার রিস্ক নিচ্ছি না। আমি অফিসেই থেকে যাচ্ছি। চিন্তা করো না। না খেয়ে থাকব না। ক্যান্টিন থেকে খেয়ে নেব। তুমি সাবধানে থেকো। দরজা জানালা ভাল করে বন্ধ করে নাও। দুর্যোগের রাত। বুঝতে পারছি একা একা থাকতে হবে রাতটা। একটু ম্যানেজ করে নাও প্লিজ।" এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে থামলো পলাশ। ফোনের ওপারে সুদর্শনার মাথায় তখন বাজ পড়লেও সুদর্শনা এতটা চমকাত না! প্রকান্ড এক বিষম খেয়ে নিজেকে সামলাতে মিনিট তিনেক সময় নিল সুদর্শনা। তারপর কোনওক্রমে বলল "কি বলছো বলো তো? পাগল টাগল হয়ে গেছো নাকি? একটু আগেই তো আমি তোমায় ফোন করলাম। করে বললাম যে আমি বাঁশদ্রোণীতে এসেছি। কাকুর শরীরটা হঠাৎ খারাপ হয়েছে। তখন তুমি তো বললে তুমি পৌঁছে গেছো। ফ্ল্যাটে ঢুকে গেছো।"

"কি? তুমি কিসব বলে চলেছো দর্শনা, তুমি কখন আমায় ফোন করলে? কি বলছ এসব? তাছাড়া তুমি যে বাঁশদ্রোণী গেছো সেটা তো আমি এইমাত্র তোমার মুখে শুনলাম। যদি আগে জানতাম তাহলে কি আর বলতাম যে একটা রাত একা একা একটু ম্যানেজ করে নাও!"

"কি আবোল তাবোল বকছো, একটু আগেই আমি তোমায় ফোন করে সব বলেছি যে আমি বাঁশদ্রোণী এসেছি। কখন বেরিয়েছি তাও বলেছি। তুমি সবটা শুনেছো। আর এখন কিনা তুমি পুরোপুরি উল্টো গাওনা গাইছো? তুমি রাতে কি খাবে সেটা বলতে তখন ভুলে গেছিলাম বলে আবার ফোন করতে গেলাম

তার আগে তুমি নিজেই ফোন করলে। করে এসব আটভাট বকছো। দাঁড়াও আমি কললিস্টটা চেক করি। করে তোমায় স্ক্রীনশট পাঠাচ্ছি। তাহলে তোমার বিশ্বাস হবে তো? আচ্ছা সত্যি করে বলো তো? অফিসে বসে বন্ধু বান্ধব জুটিয়ে নেশা ফেশা করছ নাকি? নইলে এইরকম ভুলভাল তো বকো না তুমি কখনও! আমার কেমন কেমন যেন ঠেকছে বাপু।"

বলেই সুদর্শনা কললিস্ট হাতড়াতে শুরু করলো। হ্যাঁ এইতো, কয়েক ঘন্টা আগেই যে সে পলাশকে ফোন করেছে তার প্রমাণ। কিন্তু পলাশ খুঁজে পাচ্ছে না সেই কলের প্রমাণ। কিন্তু সুদর্শনার মুখে নেশার কথা শুনে ভয়ঙ্কর চটে গেল সে। তেড়েফুঁড়ে উঠে বলল "খবরদার বলছি। একদম বাজে কথা বলবে না। দিনরাত এক করে খাটছি শুধু তোমার জন্য। তারপরও এই সমস্ত বলতে এতটুকু বাধে না তোমার?"

দম্পতি নিজেদের মধ্যে বচসা বাড়িয়ে চলে। কারণ কেউই মিথ্যা বলছে না। তাদেরই ফাঁকা বন্ধ ফ্ল্যাটে তখন রয়েছে আরও দুজন। যারা ধরতে পারে ভিন্ন ভিন্ন রূপ।

ডিওজেনের শিকার

অমৃতা ঘোষ

"ওই ওই কুকুরটা! ওটা বাড়ির চারপাশ দিয়ে আবার ঘুরছে! ওটা শয়তান। আমি বলছি ওটা আমাদের রক্ত খেতে এসেছে।" আলেজান্দ্রোর চিৎকার শুনে তার বাকি দুই বন্ধু পেদ্রো এবং কার্লোস নিজেদের ঘর থেকে ছুটে এসেছে। ওরা জানলা দিয়ে নিচে উঁকি মারলো কিন্তু কিছু দেখতে পারলো না। পেদ্রো বন্ধুকে শান্ত করে বলল, "ওখানে কিছু নেই আলেজান্দ্রো। তুমি নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখেছ।" কার্লোস জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে বলল, "এই জানলাটা খুলো না। এটা খোলার পর থেকেই তুমি অনেক কিছু দেখছ। অথচ আমরা কিন্তু কিছুই দেখতে পারছি না।" আলেজান্দ্রো তার গভীর নীল দুটো চোখে বন্ধুদের দিকে তাকায়। সেই চোখ বিষন্নতায় ভরা। এরপর নিজের বিছানায় ফিরে গিয়ে বলে, "আমি কোনো স্বপ্ন দেখছি না। ওটা ডিওজেন। এই জঙ্গলের ত্রাস! ওর দৃষ্টি পড়েছে আমার উপর। ও আমাকে ওর সাথে নিয়ে যেতে চায়।"

বন্ধুর কথায় দুই বন্ধুর কপালে ভাঁজ পরে। বারংবার নিষেধ করা সত্ত্বেও ডানপিটে আলেজান্দ্রো তার ঘরের গ্লাসউইন্ডো খোলে। অথচ প্রতিটা গ্লাসউইন্ডো মোটা কাগজ দিয়ে ঢাকা ছিল। সে নিজে হাতে সেই কাগজ সরিয়ে, জং পরে যাওয়া লক ভেঙে, সেটা খুলেছে। এরপর থেকেই সেই আতঙ্ক ওই জানলা দিয়ে ঢুকে আসতে চাইছে তার ঘরে। ওরা জানে যদি সে আলেজান্দ্রোকে নিয়ে যেতে পারে, তাহলে এক এক করে ওদের দুজনের জীবনকেও গ্রাস করবে মৃত্যুর কালো ছায়া। কিন্তু উপায় কি? তিন বন্ধু কম চেষ্টা করেনি বেলজিয়ামের সোনিয়ান ফরেস্ট থেকে বাইরে বের হতে, কিন্তু প্রতিবার এক ভুলভুলাইয়াতে আটকে গেছে! আবার ফিরে এসেছে এই অভিশপ্ত বাড়িটায়।

* * *

আলেজান্দ্রো, পেদ্রো এবং কার্লোস বেলজিয়ামেরই ছেলে। বসন্তের কোনো এক দিনে তিন বন্ধু ঠিক করেছিল সোনিয়ান ফরেস্টে ঘুরতে যাবে। যেমন ভাবনা তেমন কাজ। বসন্তের এক দুপুরে তিনজন পৌঁছে যায় সেই অরণ্যে। অনেক পর্যটক ঘুরতে এসেছে তবে তারা এখন ফিরতি পথ ধরেছে। আসলে এই

জঙ্গল সম্মন্ধে স্থানীয় লোকেদের মুখে অনেক অলৌকিক এবং ভৌতিক গল্প শোনা যায়। এই তিন বন্ধুও সেই সব কথায় বিশ্বাস করে এবং যথেষ্ট ভয়ও পায়। তবে ভয়ের মধ্যেই একটা রোমাঞ্চ অনুভূত হয়। তাই সকাল সকাল আসার চেষ্টা করেও যখন বিফল হলো তখন ওরা ঠিক করলো, জঙ্গলের কিছুটা ঘুরে দেখে বিকেল নাগাদ ফিরে যাবে। প্রথমে বসন্তের ঝরা পাতায় ঢাকা পথ দিয়ে হাটতে হাটতে লক্ষ্য করলো, চারিদিকে সুন্দর লাল পাতার জঙ্গলটা কিছুটা গিয়েই শেষ হয়ে গেছে। আর সেখানে- কঙ্কালের ন্যায় দেখতে দৈত্যাকার বিচ ট্রি গুলো দাঁড়িয়ে আছে। দেখলে মনে হয় ওগুলো অশুভ। ওই গাছগুলো যেন গোপনে সুন্দর লাল পাতার ম্যাপল ট্রি গুলোকে খেয়ে নিচ্ছে। জঙ্গলের এই ভাগ পর্যন্ত ওরা কিছু মানুষের দেখা পেয়েছিল কিন্তু এরপর শুরু হয় ঘন ব্রুসেলস ট্রি-এর জঙ্গল। সেই অরণ্য এত গভীর এবং প্রতিটা গাছের মাথা আকাশ ছুঁয়ে, সূর্যকে ঢেকে দিয়েছে। জঙ্গলের ভেতরে তাই দিনের বেলাতেও অন্ধকার। পেদ্রো বলল, "কিরে, সবাইত ফিরছে! আমরা কি করবো?"

আলেজান্দ্রো সেই অন্ধকারে প্রবেশ করতে করতে বলল, "চল কিছুটা ঘুরে, সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসবো।" কার্লোস কিন্তু কিছু বলল না। শুধু দুই বন্ধুকে অনুসরণ করতে করতে সন্দিগ্ধ নয়নে অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে কি বা খুঁজতে লাগলো! ওদের সবার হাতের মোবাইলের আলোতে যতটুকু দেখা যাচ্ছিল তার উপর আন্দাজ করে তিনজন এগিয়ে চলছিল। এমন জঙ্গলে হিংস্র পশু হয়তো নেই কিন্তু বিষাক্ত সাপ থাকতেই পারে। আর তাছাড়া সূর্যালোক না পৌঁছানোয় পরিবেশটা কেমন স্যাতস্যাতে আর দূষিত। হঠাৎ কার্লোস বলল, "তোরা একটা আওয়াজ শুনতে পারছিস?"

দুই বন্ধু একটু দাঁড়িয়ে শোনার চেষ্টা করলো। পেদ্রো বলে উঠলো, "না তো, কিসের আওয়াজ?" আলেজান্দ্রো এই সময় বলে ওঠে, "আমার কি মনে হয়, আমাদের ফিরে যাওয়া উচিত।" বাকি দু'জন ওর কোথায় সহমত হয়ে ফিরতি পথ ধরলো। বেশ কিছুক্ষণ হেটে আবার এক স্থানে কার্লোস বলল, "ওই যে আবার ডেকে উঠলো!" এবার পেদ্রো ধমকের সুরে বলে, "কিসের আওয়াজ? কে ডাকে? আমিত এখানে প্রবেশ করার পর থেকে একটা পাখি, এমনকি পোকারও আওয়াজ পেলাম না।"

কার্লোস কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ আলেজান্দ্রো চিৎকার করে উঠলো, "জলের আওয়াজ, হ্যা শোন ওই বাঁ দিকটা থেকে জলের আওয়াজ আসছে। পাশেই কোনো নদী আছে।" ওরা তিনজন বাঁ দিক বরাবর হেঁটে দেখলো সত্যি

এক পাহাড়ী খরস্রোতা নদী বয়ে যাচ্ছে সোনিয়ান ফরেস্টের বুক চিরে। তারা বুঝলো, নিঃসন্দেহে ওরা পথ হারিয়েছে। কারণ যখন তিনজন জঙ্গলে প্রবেশ করেছিল তখন ওরা কোনো নদী দেখেনি। এবার কার্লোস বলল, "আমি কিন্তু এই ফরেস্টে ঢোকার সময় থেকেই কুকুরের ডাক শুনছি! যেখানেই গেছি, সেই ডাক আমাদের অনুসরণ করে চলেছে!" ওর কথায় বাকি দুজনের শিরদাঁড়া দিয়ে যেন একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল। ওরা জানে এর অর্থ সেই নরকের পিশাচ, ডিওজেন ওদের পিছু নিয়েছে।

এদিকে নদীর উপরে কিছুটা আকাশ দৃশ্যমান হয়। তাতে দেখা যায় জঙ্গলে রাত নেমে, আকাশে প্রায় গোলাকার চাঁদ উঠেছে। পূর্ণিমা হয়ত কিছুদিন পরেই। একটা ভয় তিন বন্ধুকে পেয়ে বসে। সারা রাত এই জঙ্গলে থাকলে, সেই বিভীষিকা এক এক করে তিন জনকেই মেরে ফেলবে। এখন দরকার মাথা গোঁজার স্থান। কি করবে, না বুঝতে পেরে ওরা নদীর ধারে বসে। হঠাৎ পেদ্রো আর্তনাদ করে ওঠে, "কে, কে আমার পেছনে?"

কিন্তু পেছনে ঘন জঙ্গল ছাড়া আর কিছুই দেখা যায়না। সে বলে, "আমার ঘাড়ে কার যেন নিঃশ্বাস পড়লো!" এবার কার্লোস এবং আলেজান্দ্রো একটু সচকিত হয়। আসলে কিছুক্ষণ আগেই হঠাৎ দু'জনের একটু তন্দ্রা এসেছিল। অসময়ে অমনটা হওয়ার কারণ কি ওরা জানে না। তবে পেদ্রো চেঁচিয়ে উঠতে, দু'জনে জেগে ওঠে এবং পেছনে ঘুরে তাকিয়েও ওরা কাউকেই দেখতে পেলো না। জঙ্গলের দিকে কিছু না দেখলেও নদীর ওপারে আচমকাই যেন একটা বাড়ি উদয় হলো! তিনজনের কেউই সেই বাড়িটা আগে খেয়াল করেনি। কিন্তু পেদ্রো সেদিকে আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে বলল, "ওই দেখ একটা বাড়ি। নিশ্চয়ই ওখানে রাতে মাথা গোঁজার জায়গা পাবো।" পেদ্রো কথাগুলো কেমন যেন ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল। বাকি দু'জনের মনে হলো, ও ভয়ে অমন ভাবে কথা বলছে। কার্লোস হতাশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, "এই নদী কি করে পার করবো?" তার উত্তরও পেদ্রোর কাছে আগে থেকেই যেন ছিল! সে বলল, "ওই ত একটা রাফটিং বোট, নদীতে ঝুঁকে পড়া গাছটায় বাধা আছে। ওটা করেই পার হয়ে যাবো।"

কার্লোস আর আলেজান্দ্রোর অবাক ভাবটা কাটছেই না। যখন ওরা ওখানে এসেছিল তখন ত বাড়ি, বোট কিছুই চোখে পড়েনি। তাহলে হঠাৎ কোথা থেকে সেগুলো গজিয়ে উঠলো? তবে ওদের কাছে বেশি ভাবার সময় ছিল না। তখন ওদের মনে একটাই ভয়। আর তার নাম হলো ডিওজেন।

* * *

ওরা তিনজন গত দু'দিন ধরে বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা করেছে কিন্তু কিছুতেই সেই

জঙ্গল থেকে বেরতে পারেনি। আর আজ ত আলেজান্দ্রোকে আর একা এই ঘরে রাখাই যাচ্ছে না।

পেদ্রো প্রথম দিন কুকুরের ডাক শুনতে পেয়েছিল কিন্তু এই বাড়িতে আসার পর আর কিছু শুনতে পায়নি। বাড়িটায় উপরে দুটো শোয়ার ঘর আর নিচে হল। পরিত্যক্ত বাড়ি হলেও মোটামুটি পরিষ্কার। আলেজান্দ্রো আর কার্লোস ঠিক করলো উপরের ঘর দুটোয় থাকবে আর নিচের সুবিশাল হলটা গেলো পেদ্রোর দখলে। কিন্তু সেই জানলা খোলার পর থেকে আলেজান্দ্রো যে আতঙ্কে কাটাচ্ছে তারপর ওকে আর একা ঘরে রাখা ঠিক হবে না ভেবে, কার্লোস বলল, "চল আলেজান্দ্রো আমার ঘরে চল।"

পেদ্রো ওকে বাধা দিয়ে বলে, "তোর ঘরটা খুব ছোট, দু'জনের হবে না।"

"ঠিক আছে, তাহলে আমি এই ঘরে চলে আসি।"

"এরপর ডিওজেনের নজর তোর উপর পড়ুক! জানিসতো ডিওজেনের আরেক নাম ডি-ওজেন বা দি-আইস! ওর দৃষ্টি যার উপর পড়ে তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।"

পেদ্রোর গলার ফ্যাস ফ্যাসে ভাবটা যায়নি। তাই সেই গলায় কথাগুলো দুই বন্ধুর মনে শিহরণ জাগালো।

রাত একটু গভীর হতে কার্লোসের হঠাৎ একটা আওয়াজে ঘুম ভেঙে যায়। এমনিতেই সে নানারকম দুশ্চিন্তা এবং ভয়ে দিন কাটাচ্ছিল। তাই ঘুমটা অত গভীর হয়নি। তার উপর আওয়াজটা কেমন বিরক্তিকর। কেউ যেন নখ দিয়ে বাইরের দেওয়াল আঁচড়াচ্ছে। হঠাৎ এক অজানা ভয়ে পেদ্রো বিদ্যুদপৃষ্টের মত তার জানলার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। কিছুক্ষণ সব শান্ত। কিন্তু আবার সেই আওয়াজ হয়। সেটা নিচ থেকে উপরে উঠে আসছে। নিজের ঘরের জানলা না খুলে, কার্লোস ধীরে ধীরে পাশে যে ঘরে আলেজান্দ্রো ছিল সেই ঘরে গিয়ে জানলা দিয়ে নিচে উঁকি মারতেই, ভয়ে তার হৃৎপিণ্ড যেন গলায় এসে ঠেকলো। সে স্পষ্ট দেখলো, পেদ্রো বাড়ির বাইরে দিয়ে ঠিক টিকটিকির মত দেওয়াল বেয়ে উপরে উঠে আসছে।

আকাশে চাঁদ দেখে বোঝা যায় পূর্ণিমা। সেই জোৎস্নায় পেদ্রোর একটা অদ্ভুত ছায়া মাটিতে পড়েছে, যা দেখলে মনে হয় খুব ছোট একটি কুকুর দেওয়াল বেয়ে উঠছে! কার্লোস বুঝতে পারলো, সেই মুহূর্তে তাকে ওই বাড়ি ত্যাগ করে পালতে হবে। সে দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমেই হল ঘরে কিছুতে হোঁচট খেয়ে পরে গেলো। যে জিনিসটায় সে হোঁচট খেলো সেটা দেখে দুঃখে এবং প্রচন্ড ভয়ে সে আবার দৌড়তে শুরু করে। আলেজান্দ্রোর শরীরটা কোথায় সে জানে না। তবে তার কাটা মুণ্ডটার হোঁচট খেয়েই সে পড়ে গিয়েছিল! দৌড়তে

দৌড়তে সে নদীর কাছে এসে বোটটা দেখতে পায়। কিছু না ভেবে বোটে চড়ে বসে এবং বিস্ফারিত চোখে দেখে পেদ্রো রূপী ডিওজেন, দৈত্যাকার গাছগুলোর উপর লাফিয়ে লাফিয়ে তাকেই অনুসরণ করে আসছে। সে এক ভয়াবহ দৃশ্য। কার্লোসের বোট খরস্রোতা নদীতে ভেসে যাচ্ছিল। হঠাৎ সেটাই লাফিয়ে পড়লো পেদ্রো! তার মুখ থেকে সবুজ রঙের আঠালো লালা ঝরছে। মুখের একদিকে তখনও আলেজান্দ্রোর রক্ত লেগে আছে। সে হামাগুড়ি দিয়ে কার্লোসের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। মৃত্যুর সম্মুখ্যে দাঁড়িয়ে কার্লোস দেখলো, পেদ্রোর পেছনদিকের বোটের কোণাটা নদীর অপর পাশের পাড়ে ঠেকেছে। বাঁচার তাগিদে সে প্রচন্ড ক্ষিপ্রতার সাথে ডিওজেনকে এক ধাক্কা দিয়ে, লাফিয়ে পড়লো ভূখণ্ডে। এরপর আবার জঙ্গলের মধ্যে ছুটতে লাগলো। কিন্তু বেশি দূর যেতে পারলো না। সামনেই দেখলো এক নারকীয় দৃশ্য! নদীর পাড়ে যে জায়গাটায় প্রথম দিন ওরা বসেছিল সেখানে, একটা পাথরের আড়ালে পড়ে আছে পেদ্রোর মৃতদেহ। কার্লোস সামনে তাকিয়ে দেখে, পেদ্রোর মৃত দেহ আরেক পেদ্রো অর্থাৎ পেদ্রো রূপী ডিওজেন সেই বাসি শরীরটার উপর গিয়ে বসেছে। এরপর সেটাকে ছিড়ে ছিড়ে খেতে লাগলো। কার্লোস বুঝতে পারলো, সেদিন ও আর আলেজান্দ্রো যখন একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল আর পেদ্রো চিৎকার করে ওঠে তার পেছনে কেউ আছে বলে তখনই জঙ্গলের অশরীরী ডিওজেন তাকে মেরে, তার রূপ নিয়ে, বাকি দু'জনকে ওই বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। আর তখন থেকেই পেদ্রোর গলার স্বর কেমন ফ্যাসফ্যাসে।এরপর ডিওজেন অপেক্ষা করছিল পূর্ণিমার। আকাশে থালার মত চাঁদ উঠলে ডিওজেনের প্রচন্ড খিদে পায়। আর তাই ওই বাড়িতে সে খাবার সঞ্চয় করে রাখছিল। শুধু দুটো মানুষে তার খিদে মিটবে না।

কার্লোস আবার ব্রুসেলস ট্রির জঙ্গলে ছুটতে থাকে। হোঁচট খেয়ে পড়ে যায় আবার উঠে ছুটতে থাকে। কিন্তু সে বুঝতে পারে তার পালানোর সব পথ বন্ধ। কারণ সে প্রতিবার ঘুরে ঘুরে ফিরে আসে নদীর ধারে, আর দেখতে পায় সেই পিশাচ পেদ্রোর শরীরটা পরম শান্তিতে খাচ্ছে। কার্লোসের পালিয়ে যাওয়া নিয়ে তার কোনো চিন্তা নেই। সে যেন নিশ্চিত, সে যে মায়াজাল বিস্তার করেছে সেটা কেটে কার্লোস পালাতে পারবে না। তারও পরিণতি হবে তার বাকি দুই বন্ধুর মত। সেও পরিণত হবে ডিওজেনের শিকারে।

* * *

ডিওজেন হলো বেলজিয়ামের সোনিয়ান ফরেস্টের এক আত্মা, যে কিনা যেকোনো রূপ নিতে পারে তবে বেশিরভাগ সময় এক হিংস্র কুকুরের রূপ নিয়ে জঙ্গলে শিকার খুঁজে বেড়ায়। আর তার ছায়া অপেক্ষাকৃত অনেক ছোট একটা কুকুরের মত দেখতে হয়।

বলি

অমু অর্ণব মুখার্জী

চারিপাশে অন্ধকারের কালো চাদর বিছানো, তারই মাঝে একটা ছোট্ট একতলা বাড়ির দুটো জানলায় দুজনের সন্ত্রস্ত মুখ দেখা যাচ্ছে। ঘরের ভেতর থেকে হলদে আলোর আভা দেখা যাচ্ছে। দুটোই বাচ্চা মেয়ে কিন্তু দুজনকেই একই দেখতে বাইরে সেই অন্ধকারের মধ্যে যেন অসংখ্য ছায়া মূর্তি ভেসে বেড়াচ্ছে। বাঁদিকের জানালা থেকে মেয়েটা চেঁচিয়ে বলছে, "আমাকে ছেড়ে দাও, আমি বাড়ি যাবো, বাপি আর মার কাছে।" হঠাৎ সেই অন্ধকারের মধ্যে থেকে, এক ভয়ঙ্কর খসখসে গলায় কেউ বলে উঠলো, "বাইরে বেরোবি, তবে দেখ তোর পাশে হাহাহাঃ হাঃহাঃ"। সেই ভয়ঙ্কর হাসিতে কেঁপে উঠে বাচ্চা মেয়েটি পাশে দেখেই চমকে উঠলো; দেখলো তারই মতো দেখতে মেয়েটার শরীর ধীরে ধীরে সাদা রক্তশূণ্য হয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়লো এবং ওর শরীর থেকে কালো রঙের ধোঁয়ার অবয়ব ঠিক যেন একটা বড়ো আকারের বাদুড়ের মতো ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে পরিণত হয়ে, সেই জানালা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলো আর সঙ্গে সঙ্গে চারিপাশ তীব্র অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো।

আঁতকে উঠে বিছানায় বসলো সিম্পি। মেয়ের আর্তনাদ শুনে শোভন দৌড়ে মেয়ের ঘরে গেলো, পিছন পিছন শ্রীতমাও। বাবাকে দেখেই সিম্পি জড়িয়ে ধরে কান্নায় ফেটে পড়লো। "আবার সেই স্বপ্নটা দেখেছিস মা?" শোভন প্রশ্ন করলো মেয়েকে। কাঁদতে কাঁদতে উত্তর দিলো সিম্পি, "হ্যাঁ, বাবা, রোজ রোজ একই স্বপ্ন কেন দেখছি? বাব...বাবা আ..আ আমি কি সত্যি ওই ঘরটাতে আটকে যাবো? আমি কি মরে যাবো?"

"এসব কথা বলতে নেই মা" বলে শ্রীতমা মেয়েকে কোলে টেনে নিলো, আর ক্রোধ মিশ্রিত স্বরে শোভনকে বললো, "প্রথমেই তোমাকে বলেছিলাম গুরুদেবের কাছে নিয়ে যাই, কিন্তু তোমার অবিশ্বাসের কারণেই মেয়েটা দিন দিন এরকম শুকিয়ে যাচ্ছে।"

স্ত্রীয়ের এরূপ ভর্ৎসনার পর শোভন বললো, "ঠিক আছে তুমি যখন তাই চাও তো তাই করো, কিন্তু আমি ওনার ঘরের বাইরেই থাকবো।"

* * *

"মা ওকে নিয়ে তো এলি কিন্তু অনেকটাই দেরী করে ফেলেছিস"

"কেন গুরুদেব? আমার মেয়ের কি কোনো ক্ষতি হতে পারে?"

"আর একবার যদি ও ওই স্বপ্ন দেখে তাহলে ও কোনো দিনই আর চোখ খুলবে না।"

"মানে ও কি মারা যাবে?"

"হ্যাঁ তা হতেও পারে। কিন্তু আমি তা হতে দেবো না। এই ত্রিজুতিটা প্রতিদিন শোয়ার সময় লাল সুতো দিয়ে ওর কপালে বেঁধে দিবি।"

"তাহলেই হবে তো গুরুদেব? আর কিছু হবে না তো।"

"না রে মা ওকে কেউ 'স্বপ্নবান' নিক্ষেপ করেছে। তাই ওর মৃত্যু আমি আটকাতে পারলেও অন্য যাহোক কিছুই ওর হতে পারে।

"মানে?"

"মানে, হয়তো ওর শরীরটাই শুধু ইহজগতে থাকবে কিন্তু জ্ঞান থাকবে না। মানে তোমাদের ভাষায় কোমায় চলে যেতে পারে।"

"সেকি, আর কি কোনো উপায় নেই?"

"না মা আমার দ্বারা এর থেকে বেশি কিছু করা সম্ভব নয়।"

* * *

দুদিনের মধ্যেই সিম্পির সেই স্বপ্নের পুনরাবৃত্তি ঘটলো, একই ভাবে সে চেঁচিয়ে উঠে আবার শুয়ে পড়লো, কিন্তু আর উঠে বসলো না। শোভন আর শ্রীতমার শত ডাকাডাকিতেও উঠলো না। টানা তিনদিন ধরে মেয়ের এম আর আই থেকে শুরু করে বিভিন্ন ডাক্তারের মতামত নেওয়া, এছাড়াও শ্রীতমার কথায় কবিরাজ, বৈদ্য করেও কোনো ফল হোলো না।

কিন্তু শোভন দমবার পাত্র নয়। নিজে একজন সায়েন্টিস্ট তাই সে বিশ্বাস করে, বিজ্ঞান এর দ্বারা সম্ভব নয় এমন কোনো কাজ নেই। এর ঠিক দুদিন পরেই রাতে শোভন হঠাৎ "সিম্পিইইইই.." বলে আঁতকে উঠলো। শ্রীতমা মেয়ের ঘর থেকে ছুটে এলো। শ্রীতমা এখন মেয়ে ঘরেই শোয় কারণ মেয়ের এখন চব্বিশ ঘন্টাই সেলাইন চলছে। সে নিজে নার্স তাই প্রতি নিয়ত মেয়ের দেখাশোনা সেই করছে। শোভনের চিৎকার শুনে সে ছুটে এসে বললো,

"কি হোলো তোমার? এভাবে চিৎকার করে উঠলে কেন?"

"আ...আ আমি সিম্পিকে দেখলাম বুঝলে সে সে.. সেই স্বপ্নটা, যেটা সিম্পি দেখতো ও ও ওটা আমিও দেখলাম।"

"কিঃ... কি বলছো তুমি? কি দেখেছো?"

"ওই একই স্বপ্ন, কিন্তু আমি দেখলাম, আমি বাঁদিকের জানলায়, আর সিম্পি ডানদিকের জানলায়। চোখের সামনে সিম্পির শরীর রক্তশূণ্য হয়ে মেঝেতে পরে গেলো, আর ওর শরীর থেকে একটা কালো ধোঁয়া জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেলো। আর চারিপাশ থেকে একটাই আর্তনাদ শুনতে পেলাম, "বাবা আমায় বাঁচাও এখান থেকে নিয়ে চলো।"

* * *

প্রতিদিন সেই স্বপ্নের তাড়নায় শোভোনের চোখ থেকে ঘুম উড়ে গেছে। সাতদিন ধরে দিনরাত এক করে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে একটা মেডিসিন ও হেড ক্যাপ বানিয়েছে শোভন। যাতে সময় ও তারিখ নির্ধারণ করার উপায় আছে, আর একধরনের মিউজিক সেট করেছে, যা মামুষকে 'ড্রিম ট্রাভেল' করতে সাহায্য করবে। উদ্দেশ্য একটাই স্বপ্নের দেশে গিয়ে মেয়েটাকে যাহোক করে ওই ঘরে ঢোকা থেকে আটকানো।

শ্রীতমাকে বিষয়টা জানানোর পর, ও প্রথমে বিশ্বাসই করতে চায়নি, তাই শোভন বললো, "আজ রাতেই আমি ট্রাই করবো ওই ঘরে ঢোকার আগের পর্যায়ে পৌঁছানোর। তুমি আমার পাশেই থাকবে, যখনই আমার মুখ দিয়ে গোঁঙানির শব্দ বের হবে তুমি আমার হেড ক্যাপের এই লাল সুইচটা টিপে দেবে। তারফলে আমি আমার স্বপ্নের জগৎ থেকে বেরিয়ে আসবো, তখনই আমার শরীরে প্রচণ্ড কম্পন হবে। সেই কম্পন থামার পর তুমি আমার চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে জাগিয়ে তুলবে। মনে থাকবে তো?"

"হ্যাঁ মনে থাকবে। কিন্তু আমার মেয়েটাকে কি সত্যিই ফিরে পাবো?"

"পাবে নিশ্চই পাবে এটা আমার প্রমিস, আমি আমার জীবন দিয়েও মেয়েকে ফিরিয়ে আনবো।"

মাথায় ক্যাপটা পড়ে মিউজিক অন করে শুয়ে পড়লো। এবার শোভন দেখলো সেই ঘরের ভেতরেই সে বাঁদিকের জানালার সামনে বসে আছে আর সিম্পি ডানদিকে। কিন্তু সে এটা চায় না। তাই সে বেরিয়ে আসতে চায় স্বপ্ন থেকে। তখনই শ্রীতমা শুনতে পেলো শোভন একটা গোঁ গোঁ করে শব্দ করছে। তখনই শ্রীতমা ক্যাপটায় যে লাল সুইচ ছিলো সেটা টিপে দিলো। তার কিছুক্ষণ পর শোভনের শরীর ধাতস্থ হোলো। এরপর শ্রীতমা জলের ঝাপটা দিয়ে

শোভনকে জাগিয়ে তুললো। আর বললো,

"কি গো কি হোলো?"

"প্রথম বারে সফল হতে পারলাম না।"

"পারলে না মানে আবার চেষ্টা করো আমার মেয়েকে যাহোক করে ফিরিয়ে দাও, তোমার কাছে হাত জোড় করছি।"

"একি, এভাবে বলছো কেন? ও আমারও মেয়ে, আমি যখন তোমাকে প্রমিস করেছি, ওকে ফিরিয়ে আনবোই।"

এই বলে, শোভন নিজের ক্যাপের টাইম কন্ট্রোল বোতামটা প্রেস করে পাঁচ মিনিট আগের টাইম সেট করলো, তারপর আবার ক্যাপটা পরে মিউজিক অন করে শুয়ে পড়লো।

এবার সে দেখলো চারিপাশ অন্ধকার তারই মধ্যে একটা বাড়ি আশ্চর্যরকম ভাবে দৃশ্যমান। হঠাৎ দেখতে পেলো সিম্পি সেই বাড়িটার সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছে। শোভন তখনই জোরে জোরে চেঁচাতে লাগলো, "সিম্পি ওই বাড়ির ভেতর ঢুকিস না... দাঁড়া..."

কিন্তু শোভনের কোনো কথাই যেন সিম্পির কানেই পৌঁছালো না। ইতিমধ্যে কেউ যেন সেই ঘরের দরজাটা ভেতর থেকে খুলে দিলো আর সিম্পি ঘরের ভেতর ঢুকে গেলো। শোভন কাছে যেতেই ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেলো।

শ্রীতমা দেখলো শোভন আবার গোঁ গোঁ শব্দ করছে, তাই আবার লাল সুইচটা টিপে বন্ধ করলো আর জলের ঝাপটা দিয়ে শোভনকে জাগিয়ে তুলেছে। শোভনের শরীর প্রচণ্ড ক্লান্ত লাগছে, সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে গেছে।

শ্রীতমা এবার ভর্ৎসনার সুরে বললো, "হুঁ... কই আমার মেয়ে তো এখনও ফিরলো না? তোমার দ্বারা এসব সম্ভব নয়। যতক্ষণ না আমার মেয়ে ফিরছে ততক্ষণ তুমি চেষ্টা করবে। আর এবার তুমি গোঁ গোঁ শব্দ করলেও আমি ওই সুইচ বন্ধ করবো না যতক্ষণ না আমার মেয়ে উঠছে।"

এবার শোভনেরও জেদ চেপে গেলো। একদিনে দুবারের বেশি এই এক্সপেরিমেন্ট করা শরীরের পক্ষে যে কতটা হানিকারক হতে পারে, তা শোভন জানে। তাও সে সেই আশঙ্কাকে আমল না দিয়ে ক্যাপের মিউজিক অন করে দিলো, কিন্তু এবারে স্বপ্নের জগতে পারি দেওয়ার আগে সে তার তৈরি মেডিসিনটাও মুখে পুরে দিলো। যদিওবা এই মেডিসিনের এফেক্ট বা কার্যকারিতা কতটা তার পরীক্ষা এখন সে করে উঠতে পারেনি।

* * *

এবার শোভোন আবার সেই বাড়ির সামনেই উপস্থিত হোলো। দেখলো বাড়ির দরজায় কালো রঙের তালা ঝুলছে। হঠাৎ একজন সাধুর আবির্ভাব ঘটলো, শোভনের তাকে চিনতে ভুল হলো না। সে সেই দরজার তালা খুলে ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো। এবার ঘরের আলোটা জ্বালালো। শোভোন দেখতে পেলো সিম্পির কথা মতো আরও একটি মেয়ে ডানদিকের জানালায় বসে আছে, কিন্তু ওই মেয়েটাকেও অবিকল সিম্পির মতোই দেখতে, শোভন সিম্পি ভেবে এগিয়ে যেতে যাবে তখনই সিম্পির আবির্ভাব হোলো। এবার সিম্পি সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যেতে যাবে তখনই শোভন দৌড়ে গিয়ে সিম্পি নিয়ে আবার সেই আড়ালে লুকিয়ে পরলো। বেশ কিছুক্ষণ পর সেই দরজা খুলে বেরিয়ে এলো সেই সাধু, আর বললো, "আমার এই বলি চাই, যে এটা আটকানোর চেষ্টা করবে তাকেও বলি হতে হবে।"

ওদিকে শ্রীতমা হঠাৎ দেখলো, মেয়ের শরীরটা একটু নড়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি মেয়ের কাঁধে হাত দিয়ে ডাকতে লাগলো, "সিম্পি.. সিম্পি ওঠ মা, ফিরে আয় মা। তোর মা যে তোর জন্য অপেক্ষা করছে।" বেশকিছুক্ষণ পর সিম্পি চোখ খুললো। ঠিক তখনই শ্রীতমার কানে এলো পাশের ঘর থেকে শোভনের তীব্র গোঁঙানির শব্দ ভেসে আসছে। মেয়ের শোকে আর শোভনের ওপর কিছুটা রাগেই শ্রীতমা এ ঘরে চলে এসেছিলো। দৌড়ে গেলো পাশের ঘরে। শোভনের শরীর যেন বিদ্যুৎ স্পৃষ্টের মতো কাঁপছে। সে তাড়াতাড়ি সেই লাল সুইচ অফ করলো। তাতেও কোনো ফল হলো না, কারণ ততক্ষণে অনেক দেরী হয়ে গেছে। শোভনের শরীর প্রচণ্ড কাঁপতে কাঁপতে এক সময় শিথিল হয়ে গেলো। শ্রীতমা জলের ছিটা দিলেও সে আর উঠছে না। এবার শ্রীতমা কান্নায় ভেঙে পড়লো আর বললো, "ওগো আমায় ক্ষমা করো, আমি এটা চাইনি। আমার মেয়ের দুঃখে তোমায় যা নয় তাই বলেছি। তুমি আমাদের পাশে না থাকলে আমরা কি করবো? কোথায় যাবো?" ঠিক তখনই কলিং বেল বাজলো। শ্রীতমা আলুথালু বেশে গিয়ে দরজা খুললো, দেখলো বাইরে গুরুদেব দাঁড়িয়ে আছে।

"গুরুদেব আপনি সঠিক সময়ে এসেছেন। শোভন আমার মেয়েকে ফিরিয়ে দিয়েছে কিন্তু ও আর উঠছে না। আপনি কিছু করুন" বলেই গুরুদেবের পায়ে আছড়ে পড়লো। গুরুদেব ওকে তুলে ধরে বললো, "ভেতরে চলো, আমি দেখছি।"

"আসুন গুরুদেব, এই ঘরে শোভন আছে।"

কিন্তু গুরুদেবের কানে যেন শ্রীতমার কথাই পৌঁছালো না। সোজা গিয়ে

ঢুকলো সিম্পির ঘরে, সিম্পিকে কোলে নিয়ে বেরিয়ে এলো।

"ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আপনি?" বলে শ্রীতমা দৌড়ে গিয়ে সিম্পিকে ছিনিয়ে নিতে গেলো। গুরুদেব তাকে এক ধাক্কায় ফেলে দিয়ে বললো,

"ওকেই আমার চাই। ষোড়শী কন্যা আমার বলির উপাদেয়। তাই আমিই ওকে স্বপ্নবান মেরে কোমায় পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু তোর ওই বিজ্ঞানী স্বামী আমার সব হিসাব উল্টে দিলো! তাই এবার ওকেই আমি স্বপ্নের জগতে আটক করে দিয়েছি... হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! বিজ্ঞান! আমাকে বিজ্ঞান দেখানো"

এরইমধ্যে শ্রীতমা আবার ঝাঁপিয়ে পড়েছে গুরুদেবের ওপর তার মেয়েকে সে বলি হতে কখনই দেবে না। সিম্পিকে নিয়ে রীতিমতো ধস্তাধস্তি চলতে লাগলো দুজনের মধ্যে। ঠিক সেই সময় গুরুদেবের পিছন থেকে মাথায় হেড ক্যাপটা পড়িয়ে দিয়ে মিউজিক অন করে দিলো কেউ একজন, গুরুদেব সঙ্গে সঙ্গে ভূপতিত হোলো।

"শোভন তুমিইইই..." মাথাটা দুহাতে চেপে ধরে শোভন বললো, "হ্যাঁঃ আমি। দ্বিতীয়বার যখন আমি স্বপ্নটা দেখি তখনই একজনকে দরজাটা খুলতে দেখি। আর তখনই আমি চিনে যাই যে ওটা তোমার গুরুদেব। তাই তৃতীয়বার আমি স্বপ্নদেশে যাওয়ার আগে আমার তৈরি মেডিসিনটা খেয়ে নিয়েছিলাম। এর এফেক্ট কি হবে তার কোনো ধারণাই আমার ছিলো না, কারণ এটার পরীক্ষা করার সুযোগ আমি পাইনি। কিন্তু এখন বুঝলাম, আমার ক্যাপ যদি কখনও ফেল হয়, এই মেডিসিন তার ঠিক আধ ঘন্টার মধ্যেই, মানুষকে স্বপ্নজগত থেকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনবেই। এখন আমি জোর দিয়েই বলতে পারি বিজ্ঞান পারে না এমন কিছুই নেই।" এরপর ওই গুরুদেব চিরকালের জন্য কোমায় চলে যায়। কারণ শোভন টাইম সেকশনে হাজার বছর আগের সময় ও তারিখ সেট করে দিয়েছিলো।

পূজা বা যেকোনো প্রকার সাধনাই সর্বদাই মানুষের হিতকার্যে ব্যবহার করা উচিৎ। কিছু হিন প্রবৃত্তির মানুষ বা অসাধু আছে যাঁরা সকলেরই ক্ষতি করতে চায়। কিন্তু বলি কখনও কোনো পূজার অঙ্গ নয় বা ছিলোও না। বেদ বা পুরাণে পূজার ক্ষেত্রে বলির উল্লেখ অবশ্যই আছে, কিন্তু সেই বলি হলো মানুষের আদিম রিপুর বা যে ষড়রিপু মানুষকে চালনা করে, সেই রিপুর বলি দিতে হয় পূজার সময়।

মানুষের মূর্খতা, সেই বলির অর্থ, তারা বুঝতে শেখেনি বা চায়ওনি। তাই তারা এই বলির অর্থ ভিন্ন ভেবে নিয়ে নিজেদের আসুরিক প্রবৃত্তি জাগিয়ে তুলেছে। তাই অতীতকাল থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন পূজায় এই বলি প্রথা চলে আসছে। কিন্তু এটা মানুষদের বা আমাদের মনে রাখা উচিত যারা বলি দেয়, সে নিজেও একদিন বলি হতে পারে!

আমরা হারি নি

দেবাশিস ভট্টাচার্য্য

সামনের টেস্ট টিউবটার দিকে একবার চাইলেন ড. ইউং। প্রায় দশ বছরের রিসার্চ কমপ্লিট হলো আজ। টেস্ট টিউবের ভিতরের ঘন সবুজ থকথকে একটা জেলি,পরিমাণে খুবই অল্প। কিন্তু কি রকম রং পাল্টে যাচ্ছে।সবুজ থেকে নীল আবার নীল থেকে সবুজ হয়ে যাচ্ছে। সামান্য এই টুকুন জেলি ই সারা পৃথিবীকে শেষ করে দিতে পারে। এতটাই এর মারণ শক্তি। ছুঁচের আগাতে যে টুকু জেলি লাগতে পারে তাই দিয়ে বানিয়ে ফেলা যায় হাজার হাজার রাক্ষস হাজার হাজার রক্তচোষা ভ্যাম্পায়ার। ডাক্তার ইউং জেলিটার নাম দিলেন "কে ২"।

না এটাকে এইভাবে ফেলে রাখা যাবে না। এই জেলি শেষ করে দেবে এই পৃথিবীকে। তার আগেই এটাকে অ্যান্টি চেম্বারে হিমায়িত করতে হবে। যদি কোনোদিন অ্যান্টিডোট আবিষ্কার হয় তবেই নিয়ে আসা যাবে বাইরে। ঘড়ির দিকে একবার তাকালেন ড. ইউং রাত প্রায় তিনটে বাজে। একহাতে সিলড টেস্ট টিউবটা নিয়ে এগিয়ে গেলেন সামনের অ্যান্টি চেম্বারের দিকে। বুকের বাঁ দিকটায় বেশ কিছুদিন ধরেই একটা চিনচিনে ব্যাথা হচ্ছিল। বন্ধু ড. স্মিথ অ্যান্ডারসন কিছুদিন আগেই বলেছিল "ইউং একবার হসপিটালে ভর্তি হয়ে সব চেক করে নাও। তোমার ইকো ক্যার্ডিওগ্রাম রিপোর্ট ভালো নয়।"

অ্যান্টি চেম্বারের দরজা টা খোলার জন্যে সবে চাবিটা পকেট থেকে বের করতেই, বুকের বাঁ দিকটাতে আচমকা যেন একটা সাপের ছোবল মারলো। একহাতে টেস্ট টিউব টা আঁকড়ে ধরলো ড. ইউং। একটা শ্বাস কষ্ট তার সাথে একটা ভীষণ যন্ত্রনা হতে আরম্ভ করলো বুকের বাঁ দিকটাতে। হাত টা ক্রমশঃ শিথিল হয়ে আসছে। এত অন্ধকার লাগছে কেন? শেষ বারের জন্যে চোখটা একবার খুললো ড.ইউং। হাতটার থেকে টেস্ট টিউবটা পড়ে যাচ্ছে। শেষে বারের মত হাতটা একবার বাড়ালেন ডাক্তার ইউং।

কিছু করার আগেই একটা ফটাশ করে আওয়াজ করে টেস্ট টিউবটা মাটিতে পড়ে গেল সবুজ রঙের জেলিটা ছিটকে পড়ল মাটিতে। তারপরই সেটা একটা সবুজ রঙের ধোঁয়া হয়ে উঠতে আরম্ভ করলো মাটির থেকে। শেষ নিশ্বাস ফেলার আগেই ডাক্তার বুঝতে পারলেন সর্বনাশ যা হাওয়ার হয়ে গেলো। তারপর সব অন্ধকার।

তিন মাস পর

ভোর হয়ে আসছে। চতুর্দিক এখনও হালকা হালকা অন্ধকার মত লাগছে। নিবারণ এর ভোর ভোর ওঠা অভ্যেস। চিরজীবন এই ভোর বেলাতে উঠে নদীর ধারে ও যায় প্রাতঃকৃত্য করতে। আজও ভোর ভোর চলে গিয়েছিল। প্রাতঃকৃত্য করে, হাত মুখ ধুয়ে সবে নদীর পাড়ে এসে দাঁড়ালো নিবারণ। একটা নিস্তব্ধতা একটা ভোরের ঠান্ডা হাওয়া জুড়িয়ে দিচ্ছিল পুরো শরীরটা অন্যান্য দিনের মত।

আচমকাই চোখটা গেলো নিচের ওই ঝোপটার দিকে। আরে ঈশ্বর বাগদী না? আজ চারদিন হলো বেটা উধাও। ওই ঝোপ টার মধ্যে বসে আছে কেন? কি করছে ও ওখানে? নিবারণ চিৎকার করে ডাকলো "এই ঈশ্বর ওখানে বসে কি করছিস? চারদিন কোথায় ছিলিস তোর বাড়ির লোকজন সব চিন্তা করছে?" ঈশ্বর বাগদি বোধহয় নিবারণ কে দেখতে পায় নি। এইবার ওপর দিকে চেয়ে দেখলো। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে উঠে আসতে লাগলো নদীর ঢালটার ওপরের দিকে। নিবারণের হাসি পাচ্ছিল ভাবছিল ঈশ্বর কি পাগল হয়ে গেলো না কি? এই রকম হামাগুড়ি দিয়ে আসছে কেন? অনেকটা পশুদের মত? ভাবতে ভাবতেই ঈশ্বর চলে এলো নিবারণের কাছে, একদম সামনে। এতক্ষণে চেয়ে দেখলো নিবারণ। হা ঈশ্বর "এ কি ঈশ্বর না কোনো নরকের প্রাণী?" দু পাশে স্বদন্ত গুলো লম্বা হয়ে বেরিয়ে আছে। সারা মুখটা কি রকম মরা মানুষের মত। আর বিশেষ করে চোখ দুটো। মনিগুলো পুরো সবুজ। আর তা ঘণঘন রং পাল্টাচ্ছে। সবুজ থেকে নীল আবার নীল থেকে সবুজ। ভগবান এ কাকে ডাকলাম ভাবতে ভাবতেই ঈশ্বর বা সেই প্রাণীটা ঝাঁপিয়ে পড়লো নিবারণের ওপর। শেষ বারের মত নিবারণ চেষ্টা করলো ধাক্কা মেরে ঈশ্বরকে দূরে ছুঁড়ে ফেলার। কিন্তু কি অসম্ভব শক্তি এই প্রাণীটার আর তত গরম প্রাণীটার শরীর। আগুন যেন আগুন। ঘাড়ের কাছটায় একটা জ্বালা করে উঠলো। একরাশ গরম আগুন যেন কেউ ঢুকিয়ে দিলো শরীরের মধ্যে। তারপর আর কিছু মনে নেই নিবারণের।

কতক্ষন বাদে জ্ঞান ফিরলো নিবারণের মনে নেই। চোখটা খুলতেই একটা অসহ্য যন্ত্রনা সারা শরীরে। সারা পৃথিবীটা এই রকম সবুজ দেখাচ্ছে কেন? তার সাথে একটা তৃষ্ণা সেটা কিসের কে জানে? তৃষ্ণা রক্তের তৃষ্ণা। চেয়ে দেখলো নিবারণ সামনের দিকে ঈশ্বর বসে আছে ওর সামনে। মুখের পাসে হাতটা দিতেই বুঝতে পারলো ওরও সামনের স্বদন্ত গুলি একটু একটু করে বেরিয়ে আসছে। দূর থেকে কে যেন আসছে না নদীর দিকে! তার মানে আর একটা শিকার। আর একটা রক্তচোষা ভ্যাম্পায়ার তৈরি হবে। হাজার হাজার লাখ লাখ কোটি কোটি রক্তচোষা ভ্যাম্পায়ার শুধু সময়ের অপেক্ষা।

আরো তিন মাস পর

আজ প্রায় ছ মাস হতে চললো পৃথিবীর সব বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছেন আচমকাই এই পৃথিবী ব্যাপী এই সংকট মোকাবিলার। সব মানুষ ও পশুরা ধীরে ধীরে রাক্ষস এ পরিণত হচ্ছে। একে অপরের ওপর হামলা করছে। আর যার ওপর হামলা হচ্ছে সেই তৎক্ষণাৎ পরিণত হচ্ছে রক্তচোষা ভ্যাম্পায়ারে। মিলিটারি রুলস চালু করেও কিছুতেই আটকানো যাচ্ছে না এই আক্রমণ। দিনের "শুরু থেকে রাত" আবার "রাত থেকে দিন" শুধুই লড়াই চলেছে এই রক্তচোষা রাক্ষস দের সাথে।

দিল্লী র ডিফেন্স রিসার্চ অর্গানাইজেশনে বেশ কিছুদিন হলো এই নিয়ে গবেষণা চলছে। ডাক্তার অভিজিৎ সেনের অধীনে একটা বিরাট টিম কাজ করে চলেছে এই প্রজেক্টে। কিন্তু আজ অবধি কিছু করা যায় নি। যে কজন রক্তচোষা ভ্যাম্পায়ার মানুষ বা পশু পাখির দেহ পাওয়া গেছে। যারা মারা গেছে তাদের আর. এন.এ ও জিন টেস্ট করে যেটা বোঝা যাচ্ছে এটা একটা ভাইরাস ঘটিত রোগ। যা মানুষের দেহের ইমিউনিটি ভেঙ্গে তৈরি করছে এক নতুন ধরনের ইমিউনিটি। এক নতুন প্রজাতি। এক নতুন ধরনের ভাইরাস। যা প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তন করছে নিজের চরিত্র।

অভিজিৎ আর একটা জিনিষও বুঝতে পারছিল খুব শীগ্রই কোনো প্রতিষেধক আবিষ্কার না করতে পারলে সারা পৃথিবীটাই রক্তচোষা ভ্যাম্পায়ার সিটিতে পরিণত হবে। যেটা কোনো মতেই মেনে নেওয়া যায় না। তবে একটা জিনিষ পরিষ্কার এই বিপর্যয় পুরোটাই মানুষের তৈরি। বহু বছরের পাপ, দম্ভ, অহঙ্কার যার জন্যে আজ এই সামগ্রিক বিপর্যয়। আজ প্রায় আট মাস হতে চললো এই লড়াই চলছে। যে কজন মানুষ আজ অবধি বেঁচে আছে সবাই চলে গেছে সেনাবাহিনীর তৈরি করা বিশেষ আয়রন বাংকারে। যার বাইরে থেকে ঘিরে রেখেছে কোটি কোটি রক্তচোষা ভ্যাম্পায়ার। মানুষ নিজেই বন্দী হয়ে গেছে নিজের সৃষ্টির কাছে।

এক বছর পর

আজ নিয়ে এক বছর হলো মানুষ জাতি আন্ডারগ্রাউন্ডে। আস্তে আস্তে কমে আসছে খাবার ও জলের ভান্ডার। এর মধ্যে অনেক মানুষ মারা গেছে অসুখে ও খাবার না পেয়ে। কিন্তু মানুষরা হার মানে নি বরং মানুষরা লড়ছে এই রাক্ষসদের সঙ্গে এই রক্তচোষা ভ্যাম্পায়ার দের সঙ্গে।

এই রকমই এক সন্ধ্যা বেলাতে অভিজিৎ এবং ওর সহযোগী বৈজ্ঞানিকরা ল্যাবে কাজ করছিল। হটাৎ ই দেখতে পেলো টেস্ট টিউবের মধ্যে থাকা কে ২ ভাইরাস যা ওরা সংগ্রহ করেছিল রক্তচোষা ভ্যাম্পায়ার দের মৃত শরীর থেকে। আজ তার মধ্যে আগের দিন আবিষ্কার করা যে নতুন ভাইরাস "সিটি ৫" দেবার পরই কি রকম ফ্যাকাসে হতে শুরু করলো "কে ২" ভাইরাস টা। তারপর সব পরিষ্কার নিমিষের মধ্যে একটা সাদা সচ্ছ শান্তি সব উধাও সেই সবুজ থেকে নীল ভাবটাই উধাও। অভিজিৎ বুঝতে পারছিল মিশন সাকসেস। কে ২ খতম। তার মানে মানুষেরই জয় নিশ্চিত হলো। কিন্তু টেস্ট না করে কি বিশ্বাস করা যায়। সবাই এর সম্মিলিত চিৎকারের মাঝে অভিজিৎ বলল দাঁড়ান আগে দেখি বাইরে কি রেজাল্ট আসে। আগে টেস্ট করতে হবে। অন্য প্রাণীর ওপর দেখার আর সময় নেই সরাসরি প্রয়োগ করতে হবে রক্তচোষা ভ্যাম্পায়ারদের ওপর।

বাংকারের একটা লুকোনো খাপের মধ্যে দিয়ে একটা ছুঁচ এর ডগাতে একটু সিটি ৫ লাগিয়ে একটা ছোট এয়ার গান নিয়ে সিক্রেট উইন্ডো খোলার কথা বললেন অভিজিৎ। আর্মির সিনিওর অফিসার রাও এসে দাঁড়ালেন বাংকারের সিক্রেট উইন্ডোর সামনে। মেজর জেনারেল অর্ডার দিতেই খুলে গেল পুরো সিক্রেট উইন্ডো। বুলেট প্রুফ গ্লাস দিয়ে পুরোটা ঢাকা। বাইরে দাঁড়িয়ে কোটি কোটি রক্তচোষা মানুষ ভুল বলা হলো মানুষ ছিল এখন সব রাক্ষস বা রক্তচোষা ভ্যাম্পায়ার। সিরিঞ্জটা অভিজিৎ তুলে দিলো মেজর জেনারেল এর হাতে যার নিডিলে র মাথায় লাগানো আছে এক ফোঁটা সিটি ৫।

বাংকারের সামনে যে বিশাল একটা রক্তচোষা ছিল তাকেই টার্গেট করা হলো। একজন সৈনিক শুধু ছোটো একটা ফুটো দিয়ে এয়ার গান টা র ট্রিগার টা টিপে দিলো। সবাই অপেক্ষায় কি হবে মানুষ নামক সভ্যতা টা থাকবে না নিশ্চিহ্ন হবে দানব কে ২ র কাছে। বাইরের স্ক্রীন টা জুম করা হলো। ওই তো সিরিঞ্জ টা গেঁথে গেছে রক্তচোষা ভ্যাম্পায়ার টার শরীরে। দু মিনিট হয়ে গেলো কিন্তু রেজাল্ট পুরো জিরো।

মাথা নিচু করে বসেছিল ডাক্তার অভিজিৎ সেন। তার মানে কিছুই করতে পারে নি সিটি ৫। একরাশ হতাশা আর আতঙ্ক। তার মানে আবার শুরুর থেকে শুরু করতে হবে। যদি ততদিন মানুষ বলে এই প্রজাতি আর জীবিত থাকে এই পৃথিবী নামক গ্রহে। হটাৎই একটা সম্মিলিত হাততালির আওয়াজ ফেটে পড়লো পুরো সিক্রেট বাংকারের মধ্যে। সবাই এসে জড়িয়ে ধরেছে অভিজিৎকে। কি ব্যাপার বুঝতে বুঝতে অভিজিৎ চাইলো বাংকারের বাইরের দিকে।

গ্লাস এর বাইরে ছটফট করছে রক্তচোষা টা। গলার কাছে হাত দিয়ে মুখ টা খোলার চেষ্টা করছে। পাশের থেকে আর একটা উন্নত প্রজাতির মিউটান্ট এ গিয়ে গিয়ে ওই রক্তচোষাটাকে ছুঁতেই তারও একই অবস্থা। যা বোঝার অভিজিৎ বুঝে গেছে। ব্রম্ভাস্ত্র এসে গেছে মানুষের হাতে। শেষ অবধি মানুষ পেরেছে কে ২ কে শেষ করতে। মেজর জেনারেল সবটা বুঝতে পেরে গেছেন। চটপট একটা স্প্রে মেশিন আনতে বললেন তার সহকর্মীদের। তারপরের ঘটনা শুধুই জয়ের গল্প। একটু খানি সিটি ৫ জলে গুলে স্প্রে করে দেয়া হলো বাংকারের বাইরের মুক্ত আকাশে। দশ মিনিটের মধ্যে ই মারা গেলো বাইরে থাকা কোটি কোটি রক্তচোষা ভ্যাম্পায়ার।

প্রায় এক বছর বাদে সবাই বেরিয়ে এলো বাংকারের বাইরে। সামনের দিকে যতটা নজর চলে শুধুই ভ্যাম্পায়ার আর রক্তচোষা ভ্যাম্পায়ার কিন্তু সবাই মৃত। একে একে সবাই বেরিয়ে এলো বাংকারের বাইরে। কোনো শব্দ নেই, কোনো আওয়াজ নেই। শুধু এক অপরিসীম নিস্তব্ধতা। আর আছে প্রচুর অক্সিজেন যা মানুষ প্রায় ভুলতে বলেছিল। নিজের টেকনোলজি নিজের কাছেই অভিশাপ হতে চলেছিল। এই নতুন পৃথিবী এক পরিষ্কার দূষণহীন পৃথিবীর মাঝে দাঁড়িয়ে কিছু মুস্টিমেয় মানুষ যারা হারে নি। যারা লড়াই করে জিতেছে "কে ২" বিরুদ্ধে। আমরা মানুষ আমরা হারি না হারতে জানি না...।

গরমিল

অভিজ্ঞান সেন

রাতে ঘুমোতে আজ দেরি হয়েছে। মনে অনেকগুলো চিন্তা একসঙ্গে ঘুরপাক খাচ্ছিল। হিসেবটা ঠিক মেলাতে পারছি না। শুধু আমি কেন, মোহিনীও মেলাতে পারছে না। মোহিনী, আমার সহধর্মিনী। সহকর্মীনিও বটে। এই ব্যস্ত, কর্মমুখর জীবনে যে দুজনের জন্য একটু সময় বার করবো, তার জো নেই। এমনই আমাদের পেশা। কিন্তু যে দাম্পত্য সকালের ব্রেকফাস্ট আর রাতের ডিনারে শেষ হয়ে যায়, তার কি আদৌ কোনো রং আছে ?

তাই নিজেদের কর্মব্যস্ততার মধ্যেও দুদন্ড সময় বের করে ছুটে এসেছি বীরভূমে। আমার পৈতৃক ভিটেয়। নিজেদেরকে নুতন রূপে খুঁজে পেতে। কলকাতা শহরটার মধ্যে কেমন একটা আলাদা বন্ধন রয়েছে। সে বন্ধন মায়ার হতে পারে, বিলাসের হতে পারে, কিংবা কর্মেরও হতে পারে। কলকাতার বাইরে পা দিলেই, আর কেউ লক্ষ করেছেন কিনা জানি না, একটা আলাদা গন্ধ পাওয়া যায়। সম্পূর্ন অন্যরকম। শহরের দৈনন্দিন ভাবের সাথে সে গন্ধ এক্কেবারে খাপ খায় না। ট্রেনে যেতে যেতে বাইরের সবুজ ধানক্ষেতগুলোর দিকে তাকিয়ে তাই আমার বারংবার মনে হয়, ইস, এ জগৎ কি মেকি না? বহুতল, আর্জেন্ট মিটিং, আপয়েন্টমেন্টস, জরুরি ডেডলাইনস, আর সপ্তাহ শেষে নেটফ্লিক্স। সত্যিই কি ঐ জগতটার দাম ই উন্মুক্ত প্রান্তরের চেয়ে বেশি? সেই অধরা দিগন্তের চেয়ে বেশি? কে জানে!

মানুষের চিন্তামাফিক যদি সব হত, তাহলে বোধহয় জগতের ৯৯ শতাংশ সমস্যার সমাধান এমনি এমনিই হয়ে যেতো। কিন্তু যা হলে সুবিধা হত, সেই সব দিয়েই দুনিয়াটা ঠাসা থাকলেই বোধহয় বেশি সমস্যা হত। তাই যে সমস্যাগুলো আছে, সেগুলো বোধহয় ভালোর জন্যই আছে! কিছুটা এমনই হলো আমাদের সঙ্গেও। বাড়ি পৌঁছবামাত্র বাড়ি থেকে আমার ছোড়দা বেরিয়ে এসে বললেন, "বুঝতেই তো পারছিস, পুজোর সময়, বাড়িতে অনেক লোকজন, তুই এক কাজ কর, তুই পুরোনো মহলটাতে থাকবি ?"

না করবার উপায় ছিলো না। যখন মানুষ যেয়েচেয়ে কোথাও থাকতে বারণ

করছে, জোর করে তো সেখানে থাকা যায় না ! হয়ত শৈশবে দাদা এমন অন্যায় আবদার করলে মারপিট বেঁধে যেতো, কিন্তু আমাদের উচ্চতা বাড়তে বাড়তে দূরত্বটাও যে কখন বেড়ে গিয়েছে, টের পাইনি।

এ তল্লাটে সেনদের প্রতিপত্তি রাজাদের চেয়ে কিছু কম ছিলো না। একশো বিঘে জমির, প্রসাদের মতো একখানা মহল, প্রচুর সোনাদানা আর প্রায় ১ লক্ষ টাকা বার্ষিক আয়ের জমিদারির মালিক গৌরিমোহন সেন দাপিয়ে বেড়াতেন গোটা বীরভূমে। বাংলার জমিদারি সমাজে তাঁর যথেষ্ট প্রতিপত্তি এবং সুনাম ছিলো। যদিও নামে গৌরি সেন হলেও কাজে তাঁর সাথে রাধাকান্ত দেবের অধিক মিল ছিলো। এছাড়াও গুণের মধ্যে মেয়েছেলের নেশা থাকায় তাঁকে পুরোদস্তুর জমিদারই বলা যেতে পারে।

এই ভগ্নপ্রায় পুরোনো মহলটারও একসময় নাম ছিলো 'গৌরি ভবন'। ঝাঁ চকচকে সাদা মার্বেল মেঝে, ৫০এর অধিক কক্ষ বিশিষ্ট দুতলা লাল রঙের মহলের চারিপাশে ছিলো বিদেশি পরী দিয়ে সাজানো বিশাল বাগান, যাতে প্রায় ৩০ প্রকারের রং বেরঙের ফুল ফুটতো। এছাড়া প্রায় দু মানুষ উঁচু এবং প্রায় ৬০ইঞ্চি মোটা কাঁটাতার দেওয়া পাঁচিল নিয়ে 'গৌরিভবন' রাজবাড়ীর থেকে কম কিছু ছিলো না। কিন্তু এহেন বৃহৎ অট্টালিকাকে ছেড়ে একসময় আমার প্রপিতামহ হীরেন্দ্রনাথ সেনকে বাধ্য হয়ে চলে আসতে হয় নতুন মহলে, অর্থাৎ আমার ছোটবেলা যে বাড়িতে কেটেছে। প্রতি বছর দুর্গাপূজার সময় মহালয়ার আগের দিন সারা পুরোনো মহল জুড়ে প্রায় ২০ জন দল বেঁধে গিয়ে প্রদীপ দিয়ে আসে। হীরেন্দ্রনাথই এই প্রথাটি চালু করেছিলেন তাঁর প্রিয় বাড়ি ছেড়ে আসার সময়।

ছোটবেলায় আমার মনে প্রশ্ন জাগত, কী এমন ঘটল যে নিজের বাড়ি ছেড়ে হীরেন্দ্রনাথ নিজের বাড়ি বানিয়েছিলেন। শিশু মন; বড়োদেরকে বারংবার জিজ্ঞেস করতাম, যদিও কোনোবারেই সদুত্তর পাইনি। এমনকি বড়ো হয়েও যখন জিজ্ঞেস করেছি, সকলের মুখ হয় হঠাৎ থমথমে হয়ে গিয়েছে, আর নয়ত আমাকে বকে ঝকে চুপ করিয়ে দিয়েছে। যদিও তার মানে এই নয় যে আমি সেই ইতিহাস জানতে পারিনি।

তখন আমি সবে কলেজ পাশ করেছি। হঠাৎ একদিন বড়দা আমায় নিজের ঘরে ডেকে পাঠালেন। বড়দা আমার চেয়ে প্রায় ১৫ বছরের বড়ো হওয়ায় আমি বড়দাকে বেশ ভয়ই পেতাম। এছাড়া তখনকার দিনে দাদাদের শাসনও ছিলো দারুন। ফলে দাদা ডাকামাত্র বুকটা ধড়াস করে উঠেছিল, 'এখন আবার কি ভুল করলাম?'

মুখ নীচু করে ঘরে ঢোকামাত্র দাদা বললেন, "তোকে জরুরি কিছু কথা বলার আছে। এখন তুই বড়ো হয়েছিস, তোর এগুলো জানা দরকার।" বুকে অদম্য উত্তেজনা নিয়ে শুনতে বসেছিলাম। বলা বাহুল্য আমার উত্তেজনা পরে বিফলে যায়নি। দাদার মুখে আমাদের পুরোনো মহলের যে ইতিহাস শুনেছিলাম, এখনো ভাবলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে!

গল্পের প্রয়োজনার্থে আগেই উল্লেখ করেছি, গৌরিমোহনের চরিত্রের দোষ ছিলো। ছোটোখাট দোষ নয়, বেশ বড়ো রকমেরই দোষ ছিলো। অনেকদিন বেঁচেছিল লোকটা! বুড়ো বয়স পর্যন্ত ওঁর এই নারী প্রীতি বজায় ছিলো; শরীরের কামত্তেজনা বিন্দুমাত্র কমেনি। এছাড়া যখন নারী পেতেন না, সেই সময়টুকু ব্রহ্মচর্য পালন করে বীর্য সঞ্চয়ের প্রবল চেষ্টা করলেও সে চেষ্টা দুই এক দিনেই বিফল হয়ে যেতো। ওঁর বয়সী বুড়ি থেকে শুরু করে কম বয়সী এমনকি কিশোরী মেয়েরাও ওর লোলুপ দৃষ্টি থেকে রেহাই পেতো না। ফলে প্রতিপত্তি যতই থাক, লোকটার সম্মান একেবারেই ছিলো না। প্রায় চার বার হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল ওকে কোনো না কোনো মেয়ের সর্বনাশ করার জন্য। কিন্তু কোনো না কোনো উপায় উনি বেঁচে যেতেন সেসমস্ত হামলা থেকে। কেউ বলত লোকটা কোনো প্রেত কে বেঁধে রেখেছে, কেউ বলত ব্যাপারটা ছিলো সম্পূর্ণই ওঁর কুটবুদ্ধি। যদিও আসল সত্য, কেউ জানে না!

সেই গৌরীমহনকেই একদিন দোতলায় তাঁর ঘরে বিভৎস ভাবে খুন হওয়া অবস্থায় পাওয়া যায়। ওনার স্ত্রীকেও আর কোথাও পাওয়া যায় নি। পুত্র হীরেন্দ্রনাথ বাপ মায়ের এহেন পরিণতি দেখে এবং পরিবারের সকলের মধ্যে 'অমঙ্গলের আবাহন' এর ফিসফিসানি এবং কিছু নীরব বিদ্রোহে বিরক্ত হয়ে বাধ্য হয়েছিলেন বাড়ি বদল করতে।

তারপর থেকে আজও পর্যন্ত কেউ ঐ বাড়ির দোতলায় রাত কেন, দিনের বেলাও কাটায়নি। পরিবারে প্রচলিত আছে, যে অন্তত এক দিন থাকবে, হয় সে পাগল হয়ে যাবে, আর নয়ত তার মৃত্যু একপ্রকার নিশ্চিত। বিশেষত কোনো নারী যদি সঙ্গে থাকে তবে তো মৃত্যু একেবারেই সুনিশ্চিত। হিসেবটা এইরকম। আমাদের গন্তব্য পুরোনোমহলের বার মহলে। অন্দর মহলে ঢোকার সাহসও আমাদের নেই, আর সেই উপায়ও নেই। একখানা মোটা তালা দিয়ে অন্দরমহলখানা বন্ধ করা রয়েছে। সারাদিন হই হুল্লোড় করে রাতে ফিরলাম শোবার জন্য। কী কী করলাম, সেই বর্ণনা এখানে নিষ্প্রয়োজন বলেই বোধ করছি।

রাতে শুতে যাবার আগে আমার অভ্যাস প্রায় আধঘন্টা পায়চারি করা। খাবার হজমেও এই পায়চারি যেমন উপকারী, তেমনি শরতের রাতের আকাশের তারাগুলো গুনতে গুনতে সিগেরেট টানার মজাটা যারা উপভোগ করেনি, তারা জানে না। মোহিনী আর আমি এক সাথে বাড়ির বাইরেটা পায়চারি করছিলাম। মোহিনী থাকার দরুন সিগেরেটটা মুখে দিতে পারিনি, ওর ভয়ে বলব না ওকে শ্রদ্ধা করি বলে, জানি না। পায়চারি করতে করতে বাড়ির পিছনদিকে চলে গিয়েছিলাম কখন টের পাইনি। হঠাৎ অন্দরমহলের একটা জানলা থেকে হুট করে সাদা মত কি যেন একটা ধুপ করে নিচের ঝোঁপে পড়ল। হঠাৎ যেন হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেলো। শিরদাঁড়া দিয়ে একটা হিমেল স্রোত সুনামির মতো উপর থেকে নিচের দিকে বয়ে গেলো! একটা আস্ত নরমুন্ড!

ঠিক মতো করে দেখতে হাতের টর্চ টা সেদিকে ঘোরাতেই দেখি, ওহ... একটা দলা পাকানো কাগজ মাত্র! সত্যি, মানুষের চোখের ভুলেই যে... এক সেকেন্ড! উপর থেকে কে ফেলল কাগজ খানা ? অন্দরমহলে তো কেউ থাকেনা! মোহিনী বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। পরস্পরকে বুকে চেপে ধরে কোনোক্রমে আমরা শয়নকক্ষে ফিরে এলাম।

শুয়ে পড়লাম। ঘুম আসছিলো না। পাশে মোহিনীর গরম গরম নিঃশ্বাস ও জানান দিচ্ছিল, ও জেগে রয়েছে। জিজ্ঞেস করলাম,"ঘুম আসছে না ?"

"নন... না মানে, খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম গো!"

স্বাভাবিক। ভয় লাগাটাই স্বাভাবিক। আমি আর কিছু বললাম না।

কখন ঘুমিয়ে গিয়েছি, খেয়াল নেই। হঠাৎ ঘরে ধুপ ধাপ শব্দে ঘুম ভেঙে গেলো। কে যেন থান ইট ছুঁড়ছে একের পর এক। পাশ ফিরে দেখি, মোহিনী শুয়ে শুয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে। আমি ওকে চেপে জড়িয়ে ধরলাম। আওয়াজ ধীরে ধীরে তীব্র থেকে তীব্রতর হতে লাগল! হঠাৎ করে শব্দটা একেবারে বন্ধ হয়ে গেলো। হাঁফ ছেড়ে বিছানায় সোজা হয়ে বসামাত্রই, দরজাটা যেন কে সজোরে ধাক্কাতে শুরু করল! শুনেছি বিপদের মুহূর্তে মানুষের সাহস শতগুন বেড়ে যায়। আমারো তাই হলো। দৌড়ে গিয়ে দরজায় কষিয়ে এক কিল মারলাম। দরজা ধাক্কানোটা কিছুক্ষনের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। বেশ কিছুক্ষন দরজার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার পর পিছন ফিরতেই, মোহিনী কোথায় ?

আমার মাথা কাজ করছিলো না। এক লাথিতে দরজা খুলে দৌড়াতে দৌড়াতে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। কোথাও কেউ নেই। উদ্ভট ব্যাপার তো! বাগানের সামনের দিকটা পুরো খুঁজে দেখার পর ফিরে এলাম ঘরে। ঘরে ঢুকে

দেখি মোহিনী খাটের উপরে বসে ভয়ে থর থর করে কাঁপছে! আমায় দেখে রেগে মেগে বললো, "তুমি হঠাৎ কোথায় চলে গিয়েছিলে! আমি তো ভাবলাম, তুমি বুঝি আমায় এই বিপদের সময়... " আমি হাঁ করে তাকিয়ে আছি ওর দিকে। অদ্ভুত বিস্ময়ে, এবং প্রচন্ড ভয়েও বটে। তার কারণ অবশ্য ওর হঠাৎ পুনরাবির্ভাব নয় ! বরং ...

এক অপরূপ সুন্দরী নারী দাঁড়িয়ে রয়েছে আমার সামনে। আমার দিকে মৃদু ভাবে হাসছে। পিছনে খাটের উপর বসে মোহিনী, যার চোখ দুটোর একটিতেও তারা নেই। শরীরের রং অসম্ভব ফ্যাকাশে আর চুড়িদারের হাতা থেকে বেরিয়ে রয়েছে দুটো কঙ্কাল হাত!

ঘেমে-নেয়ে উঠে বসলাম খাটের উপর। মোহিনী তখনো অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ওর চেহারা সম্পূর্ন স্বাভাবিক। উফফ, কি ভয়ানক স্বপ্ন! প্রকৃতির ডাকে সারা দিতে অন্দরমহলের পিছন দিকের ঝোঁপের কাছে যেতেই...। কার যেন একটা দেহ পড়ে আছে মাটিতে। চোখের তারা নেই, মুখ ফ্যাকাশে, চুড়িদারের হাতার ভিতরবদিয়ে বেরিয়ে আসছে দুটো কঙ্কাল হাত! ভয়, আতঙ্ক দুই ভাবের চরম প্রকাশে আমি স্থবির হয়ে গেলাম!

হঠাৎ নিজের ঘরের দিকে ছুটে যেতেই দেখি, আমার সম্পূর্ন খাট ফাঁকা। ঘরে কেউ নেই...

কিন্তু ... হিসেবটাতো মিলল না !

জানা অজানার পৃথিবীতে

আকাশ দত্ত

"ও আগে এরকম ছিল না, ইনফ্যাক্ট ওকে আমি এই সিচুয়েশনে দেখিনি কখনো, সো আমার ব্যাপারটা একেবারেই ভালো ঠেকছে না, প্লিজ ডু সামথিং টু সল্ভ দিস প্রবলেম।" কথাগুলো একনাগাড়ে বলে থামলো মিস্টার এরিক। তার দ্রুত শ্বাস উঠছে নামছে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে আর তার সঙ্গে এটাও বেশ ভালো করে বোঝা যাচ্ছে উনি রীতিমতো ভয় পেয়ে রয়েছেন। ওনার মুখে চোখের বলিরেখাগুলো ফুটে উঠেছে আরও দৃঢ় ভাবে , ওনার মুখে ভয়ের ছাপটা স্পষ্ট ভাবে ধরা দিচ্ছে।

আমরা বসে রয়েছি এখন সাত্যকির বাংলোয়, এটা ইয়োর্কশায়ারের মধ্যে পরে। সাত্যকি খুব গম্ভীর ভাবে মিস্টার এরিকের কথাগুলো সব মনোযোগ সহকারে শুনলো আর তারপর পাশে রাখা কফি মাগে একটা চুমুক দিয়ে বললো,- দিস ইস ইন্ডিড ভেরি স্ট্রেঞ্জ কেস মিস্টার এরিক, আমি অনেক কেস আমার জীবনে হ্যান্ডেল করেছি কিন্তু এরকম কেসের কথা না পাস্টে শুনেছি না আমার রিসেন্ট টাইমে। এই কেসটা তাই আমাকে ভাবাচ্ছে, তবে আমি একবার আপনার মেয়ের মুখের থেকে কিছু কথা শুনতে চাই, ক্যান আই?

মিস্টার এরিক কি যেন চিন্তা করে যাচ্ছিলেন, সাত্যকির কথাটায় মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানিয়ে বললো,- ইয়েস প্লিজ তবে একটা রিকোয়েস্ট ও তো বাচ্চা প্লিজ দেখবেন যাতে ওর ওপর কোনো স্ট্রেস না পরে, প্লিজ লুক আফটার দ্যাট।

ভদ্রলোক কথাগুলো বলে ডাকলেন,-এমিলি, এমিলি। পাশের ঘর থেকে বাচ্চা মেয়েটা ছুটে এলো এই ঘরে আর তারপর হাসি মুখে সবার দিকে একবার করে তাকিয়ে বাবার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

মিস্টার এরিক-এমিলি মা , মাই প্রিন্সেস, এই আংকেল তোমায় কিছু জিজ্ঞেস করবে , তুমি গুড গার্ল হয়ে উত্তর দিয়ে দাও দেখি।

সাত্যকি মিষ্টি করে হেসে এমিলির দিকে একটা চকলেট এগিয়ে দিয়ে বললো, -এটা তোমার জন্য সোনা।

এমিলি- থ্যাংক ইউ আংকেল। তারপর ঘুরে মিস্টার এরিকের দিকে তাকিয়ে বললো,- পাপা এটা আমি নেবো?

- হ্যাঁ মা।

এরপর সাত্যকি প্রশ্ন করা শুরু করলো এক এক করে।

-এমিলি তুমি যা জানো আমায় বলো সোনা, নির্ভয়ে বলো।

-কি বলবো আংকেল?

-ওই পুতুলটা কি তোমার পছন্দ, ওর সঙ্গে তুমি কি কথা বলো? ও কি তোমার সাথে কথা বলে?

এমিলির চোখে একটা আনন্দের ঝিলিক খেলে উঠলো। ও বললো,

-ইয়েস আংকেল, ও তো আমার বেস্ট ফ্রেন্ড। ওকে পুতুল বলবে না, ওর নাম তো ড্রিমি। ও খুব ভালো আংকেল জানো, ওকে একদিন কিছু ইভিল লোক রাস্তায় রেখে দিয়ে গেছিলো, ঠিক আমাদের বাড়িটার থেকে কিছুটা দূরে। সবাই ওকে দেখে পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল কিন্ত কেউ ওকে ডাকেনি বা কথা বলেনি। আমি ওকে দেখতে পাই আর আমি ওকে বাড়ি নিয়ে আসি আমার সঙ্গে।

এমিলির সব কথাগুলো নোট করবার দায়িত্ব রয়েছে আমার ওপর আর আমি সেটাই করছি। আমি কথাগুলো শুনছি কিন্ত ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না একটা পুতুল কথা বলতে পারে, কি করে তা সম্ভব, আচ্ছা মেয়েটা সব বানিয়ে বলছে নাতো, হতেও তো পারে এটা ওর ইমাজিনেশন, না হওয়ার কোনো কারণ নেই।

সাত্যকি বললো, -তারপর? ও কি বললো তোমায়?

এমিলি এবার ধীরে ধীরে বললো,- ড্রিমিকে নিয়ে এসে আমার ঘরে রাখলাম, আমার বাকি বন্ধুদের সঙ্গে। ওকে পরিষ্কার করলাম, ওকে চকলেট দিলাম খেতে ও খেয়ে নিলো, ওর খুব জল তেষ্টা পেয়েছিল ওকে জল খাওয়ালাম। এরপর কটা দিন পেরিয়ে গেলো ড্রিমি শুধু আমায় দেখতো কিন্ত কিছুই বলতো না, তারপর একদিন আলাপ হলো ওর সঙ্গে ভালো ভাবে। ওর নাম জানলাম আর আংকেল তারপর আমাদের খুব ভালো বন্ধুত্ব হয়ে গেলো। আমরা একসঙ্গে বসে রাত্রে অনেকক্ষন গল্প করতাম, আমরা একসাথে খেতাম, আমি নিজে খেতে বসবার আগে ওর জন্য খাবার নিয়ে আসতাম তারপর আমার ঘরে বসে দুজনে খেতাম। ড্রিমি খুব মিষ্টি, ও সবার ভালো চায় জানো আংকেল শুধু যারা খারাপ করে অন্যের সঙ্গে বা যারা অন্যকে কষ্ট দেয় ড্রিমি তাদের শাস্তি দেয়। ড্রিমি ইভিল পিপিলদের একদম দেখতে পারে না!

এমিলি একটানা এতগুলো কথা বলে থামলো। ঘরের মধ্যে সবাই চুপচাপ, মিস্টার এরিক একবার মেয়ের দিকে দেখছেন আবার একবার সাত্যকির দিকে। ওনার মুখের থেকে ভয়ের ছাপটা এখনো মেলায়নি বেশ বুঝতে পারছি।

সাত্যকি - এমিলি তোমার বন্ধু কি এখন তোমায় ঘরেই?

হ্যাঁ আংকেল। ছোট করে মাথাটা নাড়িয়ে বললো এমিলি।

সাত্যকি- আচ্ছা ও কি কোথাও বেরোয় রাতে বা অন্য কোনো সময়, ও কি আর কিছু তোমায় বলে?

-না, ড্রিমি কোথাও বেরোয় নাতো শুধু বলে ও সবাইকে ভালো রাখবে, ড্রিমিকে ছোটবেলায় সবাই খুব বুলি করতো, ঠিক মতো খেতে দিতো না, খুব মারতো আর একদিন এভাবেই ও হারিয়ে গেছিল অনেক দূরে।

-দূরে মানে?

-ড্রিমি বলেনি আংকেল, ওকে আমি কতবার জিজ্ঞেস করেছি আর ও শুধু গম্ভীর হয়ে গেছে।

সাত্যকি - থ্যাঙ্ক ইউ সোনা তুমি খুব সুন্দর করে সব উত্তর দিয়েছ, তোমার আরেকটা চকলেট পাওনা এই নাও।

সাত্যকি চকলেট এমিলিকে দিতে যেতেই ও বলে উঠলো,- আংকেল আমার বন্ধুর জন্য দেবে না?

সাত্যকি হেসে আরও একটা চকলেট নিয়ে এমিলির হাতে দিলো। এমিলি হেসে থ্যাঙ্ক ইউ জানিয়ে আবার পাশের ঘরে চলে গেলো। আমি মিস্টার এরিক আর সাত্যকির দিকে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। মিস্টার এরিক বলে উঠলেন, "শি ইস লাইয়িং মিস্টার রায়। ও একবারের জন্যেও বললো না প্রতি রাত্রে ও বাইরে বেরিয়ে যায়, সাথে ওই ইভিল ডলটা নিয়ে। আমি ওই ডলকে অনেকবার ভেবেছিলাম ডেসট্রয় করে দেবো বাট আই কান্ট! আমার মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি পারিনি বাট আই ওয়ান্ট টু নো হোয়াট ইস দ্যা ট্রুথ বিহাইন্ড ওল দিস। সত্যি কি আমার মেয়ে এমিলি সব ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত নাকি এই অভিশপ্ত ডলটা ওকে দিয়ে সব করাচ্ছে। আমার মেয়ের চিন্তায় আমার রাতে ঘুম হয়না মিস্টার রায়, আমি ওকে আটকাবার চেষ্টা করেছি দু একবার কিন্ত পারিনি! ওর মধ্যে তখন এমন পাওয়ার থাকে যে ওকে আটকানো নেক্সট টু ইম্পসিবল।"

সাত্যকি বললো, "আপনি এখন যান মিস্টার এরিক। আমি দেখছি সত্যি কি আর আমি অবশ্যই সত্যিটা বের করবো কথা দিলাম। এমিলির কোনো

ক্ষতি হবে না কথা দিলাম, আপনার মেয়ে খুব মিষ্টি ওকে আগলে রাখবেন ভালোবাসায় সবসময়।

* * *

সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। এখন শীতের সময়, বেশ একটা কনকনে ঠান্ডা অনুভব করছি ঘরের ভেতরে। মিস্টার এরিক আর এমিলি চলে গেছে দুপুরে, এখন ঘরে আমি আর সাত্যকি। ফায়ারপ্লেসের সামনে বসে গভীর মনে চোখ বন্ধ করে সেই বিকেল থেকে ভেবে চলেছে আর আমি একা বোকার মতো বসে আছি।

আমি জয়ন্ত বোস। এইখানকার ডেলি স্টোরি নিউজপেপারের সাংবাদিক, আমার কাজ হলো সব ইম্পরট্যান্ট নিউজ কভার করা আর এখন এই কেসটা সবথেকে ইম্পরট্যান্ট। আমি আর সাত্যকি অনেকদিনের বন্ধু, সাত্যকির সঙ্গে যখন থেকে পরিচয় ও এরকম কেস নেয় আমি দেখেছি, ও সত্যসন্ধানী একদিকে আবার অন্যদিকে স্টোরি রাইটার। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটা বই বেরিয়েছে ওর আর বলা বাহুল্য অধিকাংশ বেস্ট সেলিং তকমা পেয়েছে।

এমিলির এই কেসটা আমি প্রথম সত্যকিকে বলি, ওর এই ঘটনা আমাদের কাগজে বেরিয়েছে কিছুদিন আগেই বড়ো করে, একটা মেয়ে রাতের অন্ধকারে কোনো অপরাধ দেখলেই সবাইকে শাস্তি দেয়, মেয়েটা মানে এমিলিকে অনেকে দেখেছে বাকিদের পাশে দাঁড়াতে, কেউ খেতে পারছে না এমিলি গিয়ে তাকে নিজের হাতে খাইয়ে দেয়, কেউ ঠান্ডায় রাস্তায় শুয়ে কাঁপছে এমিলি গিয়ে তার গায়ে চাদর দেয়, রাস্তায় কেউ কারুর জিনিস চুরি করে পালাচ্ছে, এমিলি সেখানে পৌঁছে গিয়ে শাস্তি দেয় তাকে। সবার মুখে মুখে এমিলির কথা, ইয়োর্কশায়ারে এখন অপরাধ অনেক কমে গেছে। আমাদের নিউজপেপারে ঘটনাগুলো বড়ো করে ছাপতেই একদিন যোগাযোগ করলো মিস্টার এরিক আর কথাগুলো বললো খুলে আর আমাকে বললো যদি সত্যি বের করবার কোনো উপায় পাওয়া যায় কারণ উনি খুব ভয় পেয়ে আছেন মেয়ের জন্য।

আমি তখন এতো সবিস্তারে কিছু জানতাম না, আজ ভালো করে শুনলাম পুরোটা আর এই পুতুলের ব্যাপারেও জানলাম। আমারও ব্যাপারটা শুনে বেশ ভয় লাগছে, এরপর কি করবো জানি না! ওই পুতুল কি যেন নাম, হ্যাঁ ড্রিমি মেয়েটার কোনো ক্ষতি করে দেবে নাতো তবে সত্যি যদি কথাগুলো এমিলির মন গড়া না হয় তাহলেই!

কিরে এবার কি করণীয়? কিছু ভাবলি নাকি?

সাত্যকি চোখ মেলে বললো,- আজ রাত্রে যেতে হবে বুঝলি মিস্টার এরিকের

বাড়ির কাছে আর তারপর যা হবে দেখা যাবে।

আমি বললাম,- কি বলছিস! এই রাতে যাবো আর যদি ভুলভাল কিছু একটা হয় তখন কে সামলাবে! এই রাতের অভিযান একটু বেশি রিস্ক নেওয়া হয়ে যাবে না, আমরা আদৌ জানি না মেয়েটা সত্যি বলছে কিনা, পুরোটা তো ওর বানানো হতেই পারে!

সাত্যকি - দেখাই যাক না, রেডি থাকবি, ঠিক রাত ১২টা।

মিস্টার এরিকের বাড়ির থেকে একটু দূরত্বে আমরা দুজন দাঁড়িয়ে রয়েছি। সাত্যকির কি অবস্থা বলতে পারবো না তবে আমি ঠান্ডায় ঠকঠক করে কাঁপছি। আমাদের দুজনের গায়েই ওভারকোট তবুও ঠান্ডা মানছে না! দুজনের হাতে টর্চ ছাড়া আর কিছুই নেই, এই রাত্রে কোনো বিপদ দেখা দিলে কি হবে জানি না! চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগলাম দুজনেই। ঘড়ির সময় জানান দিচ্ছে আমরা এখানে ঘন্টা খানেক দাঁড়িয়ে আছি , ঘড়ির কাঁটা বলছে ১টা বাজে।

গেটটা খুলে গেলো এরিকদের বাড়ির আর ধীরে ধীরে দেখলাম বেরিয়ে এলো এমিলি কিন্তু ও কি! ওর চোখের কাছটা লালচে আভা জ্বলজ্বল করছে আর ওর চুলগুলো উস্কোখুস্কো। সকালের দেখা এমিলির সঙ্গে যেন কতো তফাৎ এখন এই এমিলির, এক গোছা চুল এলিয়ে পয়েছে দুই চোখের মাঝখানে। আমার শরীরটা দিয়ে ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেলো, এমিলি এগোতে লাগলো ধীর পায়ে সামনের বড়ো রাস্তার দিকে আর আমরা ওর পেছন পেছন এগোতে লাগলাম। এতক্ষন খেয়াল করিনি তবে এবার দেখলাম এমিলির হাতে একটা পুতুল ধরা, একটা মেয়ে পুতুল। সেই পুতুলের চোখের কাছটা একইভাবে লালচে আভায় জ্বলজ্বল করছে। তাহলে এই কি ড্রিমি, এমিলির বন্ধু, তাহলে কি পুরোটাই সত্যি যা শুনেছি বা জেনেছি। আমার মাথাটা ঘুরে উঠলো, মিস্টার এরিকের কথাগুলো কানে বাজতে লাগলো, অভিশপ্ত পুতুল!

সাত্যকির দিকে তাকালাম, ওর কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। ও একটু দূরত্ব রেখে নির্বিকার ভাবে হাঁটতে লাগলো। আমরা বড়ো রাস্তায় পৌঁছে থমকে দাঁড়ালাম, এমিলি রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, নজর গেলো পেভমেন্টের দিকে, দুজন লোক শুয়ে রয়েছে, গায়ে কিছু নেই ঠান্ডায় কাঁপছে। এমিলি এগিয়ে গিয়ে একটা চাদর লোকগুলোর গায়ে দিয়ে দিলো। এগুলো কিছু বুঝে উঠলাম না তার আগেই সাত্যকি এগিয়ে গেলো এমিলির দিকে আর সামনে দাঁড়িয়ে বললো, -এগুলো কি হচ্ছে এমিলি? সকালে আমায় মিথ্যে বললে কেন তুমি? এমিলি তাকালো, ওর চোখদুটো কোনো সাধারণ মানুষের হতে পারে না, রক্তের মতো

লাল। ও বললো, - আমি এমিলি না ড্রিমি, ওর ভেতরে আমি আছি ওর বন্ধু হয়ে। সাত্যকির চোয়াল শক্ত হলো, ও বলে উঠলো,- কেন ওকে কষ্ট দিচ্ছ, কি চাই তোমার? তুমি কে? খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো এমিলি আর বললো,-আমি এমিলির কোনো ক্ষতি করবো না তবে ওর মাধ্যমেই আমি চাই সবাইকে ভালো রাখতে, কাউকে কষ্ট না পেতে দিতে।

আমার এই পুতুলটা বড্ড প্রিয় ছিল, খুব যত্নে আগলে রাখতাম কিন্তু যেদিন আমি মরে গেলাম পুতুলটাকে আমার বাড়ির লোক রাস্তায় ফেলে দিলো। তারপর থেকে তো রাস্তায় ছিলাম, একদিন এমিলি নিয়ে গেলো বাড়িতে ব্যাস ভালোবেসে ফেললাম ওকে।

সাত্যকি- কি চাও তুমি? তুমি নিজের জগতে ফিরে যাও।

এমিলি- না আমি যাবো না ফিরে তবে ক্ষতি করবো না কারুর শুধু সবাইকে ভালো রাখতে চাই, যারা খেতে পায় না তাদের খাওয়াতে চাই, যারা ঘুমোতে পারে না তাদের ঘুম পাড়াতে চাই, যারা অন্যের ক্ষতি করে তাদের নিজের হাতে শাস্তি দিতে চাই আর যারা ভালোবাসে সবাইকে তাদের মধ্যে আরও আরও ভালোবাসা ছড়িয়ে দিতে চাই। যেদিন এই পৃথিবী ভালো হয়ে উঠবে সব মানুষ একে অপরকে হিংসা দ্বেষ ভুলে ভালোবেসে থাকবে সেদিন আমার মুক্তি। সেদিন আমি চলে যাবো নিজের জগতে কথা দিলাম।

এমিলি দাঁড়ালো না আর, এগিয়ে গেলো সামনের দিকে। দুটো কুকুর রাস্তায় ধারে কুন্ডলী পাকিয়ে শুয়ে ছিল, পুতুলটাকে কাঁধে নিয়ে এগোলো এমিলি ওরফে ওর ভেতরে থাকা ড্রিমি। কুকুরগুলোর পাশে বসে পরম যত্নে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। খেয়াল করিনি কখন নিজের অজান্তেই আমার চোখটা ছলছল হয়ে উঠেছে। সাত্যকি দেখলাম একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো,-বুঝলি জয়ন্ত, আমাদের এই পৃথিবীতে ড্রিমির মতো অনেককে দরকার। ড্রিমি থাকুক এভাবেই নিজের বন্ধুর কাছে যতদিন না পৃথিবীর মধ্যে ভালোবাসা ছড়িয়ে যাচ্ছে। একদিন নাহয় ও ঠিক খুঁজে নেবে নিজের মুক্তির রাস্তা।

আমিও ঠিক করলাম ড্রিমির মতোই সবার মধ্যে ভালোবাসা ছড়িয়ে দেবো ওর দেখানো পথের পথিক হয়ে। ভালো থাকুক ওরা দুজনে। দূরে দেখলাম উঠে দাঁড়ালো এমিলি। পুতুলটা কাঁধে নিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলো সামনের দিকে, হয়তো আরও কাউকে ভালোবাসায় আগলে রাখতে।

পৃথিবীতে ভালোবাসার প্রয়োজন আর ড্রিমির মতো অনেকের আজ প্রয়োজন।

ব্যাপারটা ভৌতিক

অনুশ্রী মন্ডল

এই প্রথমবার মামার বাড়ি থেকে একা একাই ফিরছে সৌগত। মা আর বাবা ক'দিন এখানে থেকেই বাড়ি ফিরবে। সৌগতরও থাকবারই কথা ছিল। ও জানতো, কলেজ খুলবে আরও তিনদিন পরে।কিন্তু,আজ সকালেই এক বন্ধুর ফোন পেয়ে ও জানতে পারল যে কলেজ খুলছে আগামীকাল।অগত্যা,দুপুরে মাছ-ভাত খেয়েই ওকে কলকাতার জন্য রওনা দিতে হল তাড়াহুড়ো ক'রে,পাছে পরের দুটো ট্রেনই মিস হয়ে যায়!যখন বেরিয়েছিল তখনও আকাশে খটখটে রোদ রয়েছে।মামার বাড়ি থেকে বেরিয়ে পনেরো মিনিটের হাঁটা-পথ।তারপর,গাড়ি পাওয়া যায়।সেখান থেকে গাড়ি ধরে সোজা এখানকার রেলস্টেশন। মামা ওকে স্টেশন পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে আসবে বলছিল,সৌগত নিজেই মানা ক'রে বসল।কলেজে উঠে সদ্য সিগারেটের নেশা ধরেছে ও। এই ক'দিনে মামারবাড়িতে থাকাকালীন মনের মত ক'রে ধোঁওয়া ওড়াতে পারেনি।পাছে,কেউ যদি দেখে ফেলে।একা একা হাঁটতে হাঁটতে দিব্যি সিগারেট টানা যাবে না হয়,তাই মামাকে খানিকটা দূর অবধিও ছেড়ে আসতে দিল না ও।

মিনিট কুড়ি অপেক্ষা করার পরও গাড়ি পেল না সৌগত। দুটো গাড়ি পেয়েছিল বটে, তবে দুটোই রিজার্ভড।এভাবে গাড়ি না পেয়ে মাথাটা গরম হয়ে গেল ছেলেটার।ও ঠিক করল,পায়ে হেঁটেই স্টেশন পর্যন্ত পুরো পথটা অতিক্রম করবে।যেমন ভাবা তেমন কাজ। মিনিট দশেক হাঁটার পর,দেখতে পেল আকাশ কালো করে মেঘ গজিয়ে উঠছে ক্রমশ।গ্রীষ্মের বিকেল,বৃষ্টি হওয়াটা মোটেই অস্বাভাবিক কিছু নয়। পায়ের গতি বাড়াল ও। বৃষ্টিটা নামল খানিকক্ষণ বাদে।ব্যাগ থেকে রেইন-কোট আর ছাতাটা বের করে আরো জোরে জোরে হাঁটতে লাগল।স্টেশনে পৌঁছোতে আর বেশি দূরের রাস্তা নয়।তবে মেঘেদের গর্জন আরম্ভ হয়েছে ইতিমধ্যেই।এরকম বৃষ্টি হলে সন্ধ্যার অন্ধকারটাও যেন ঝুপ করে নেমে পড়ে। একেই গ্রাম্য এলাকা!শহরের মতো ঘন-ঘন ঘর-বাড়ি এখানে প্রায় বিরল।সেইসঙ্গে আশেপাশে ঝোপঝাড়ের পরিমাণটা অনেক বেশি।মেঘের ধুন্ধুমার গর্জন কানে আসতেই অস্থির হয়ে উঠল ছেলেটার অন্তর্মন।

আজ একা একা এভাবে না বেরোলেই পারত। কখন যে কলকাতার ট্রেনে উঠবে, আর যেন কিছুতেই ধৈর্য সইছে না। রেইন কোট আর ছাতা ব্যবহার করলেও হাঁটার ফলে বেশ খানিকটা ভিজে গেছিল ওর জামা-প্যান্ট। মনটা কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে উঠেছে, সেই সঙ্গে চরম বিরক্তির রেখা ফুটে উঠেছে মুখের আনাচে-কানাচে। একটা চাপা ভয়ের উদ্ভব হয়েছে ওর যুবক-হৃদয়ে। পাশে ঘরবাড়ি নেই তেমন যে দাঁড়াবে খানিকক্ষণ। আরও কিছুটা পথ পার হতেই কয়েকটা দোতলা ঘর চোখে পড়ল ওর। মাঝে একটা তিনতলা বাড়িও রয়েছে বলে মনে হচ্ছে। আসলে,গাড়ি করে আসা-যাওয়ার পথে এগুলোর দিকে নজরই পড়ে না। আজ হাঁটতে-হাঁটতে দেখতে পেল নেহাৎ।

বৃষ্টি-বাদলের সময়।সঙ্গে আবার বিদ্যুৎ-এর চড়া চমক। ভয় পাচ্ছে সৌগত। এতক্ষণ এড়িয়ে যাচ্ছিল বড় গাছগুলোকে। এবার একটা সময় বৃষ্টিটা এমন নামল যে ওকে রাস্তা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে হল একটা বড় দালান বাড়ির দাওয়ায়। বাড়িটা বেশ বড় কিন্তু খুব যে পুরনো তা কিন্তু নয়। সন্ধ্যে হয়ে যাবে জানলে ও হয়তো আজ আসতো-ই না। সঙ্গে এই বৃষ্টি ও ধুন্ধুমার গর্জন!গা-টা প্রায়ই ভিজে গেছে।ফোনটারও নেটওয়ার্কের অভাবে আর কাজ হচ্ছে না কোনো।এই হঠাৎ বৃষ্টি কমবেশি সবাইকে বিরক্ত করে। সৌগত-ও বিরক্ত হচ্ছিল প্রচণ্ড রকমের।বাড়িটার দাওয়াতেই দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাল ও।বৃষ্টিতে খানিকটা হলেও ভিজে ওর গায়ের ঠান্ডাটা ধরে গেছে এতক্ষণে,শীত শীত ভাব লাগছে।অগত্যা ইচ্ছে না থাকলেও সিগারেট-ই সাহারা।এমনিতে বেশি সিগারেট খায়ই ও।আর,এখন বাধ্য হয়েই খেতে হচ্ছে।হঠাৎ করে বাড়ির ভেতরের থেকে কিছু একটা ধাতুর জিনিস পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনেই পেছনে ঘুরে দেখল সৌগত। দরজা লাগানো। দরজাটা কেমন যেন!কাঠের তৈরী,ভেজা ভেজা।দরজা বন্ধ বলেই সৌগত কিছু দেখার চেষ্টা করল না।ভিতরে হয়তো মানুষ আছে।যারা কিছু হয়তো কাজ করছে এই কারণেই আওয়াজটা হল।সৌগতকে চমকে দিয়ে একটি ছেলে ওর পাশে এসে দাঁড়াল পেছন থেকে,হঠাৎ ক'রেই।ছেলেটার চেহারাটা বেশ।মুখের গড়নটা অবাক করা।অপূর্ব সোনালী দুটো চোখে যেন কি একটা রহস্য লুকিয়ে আছে।যেন সোনার খনি..হাতে জ্বলন্ত সিগারেট মাথার চুল উস্কোখুস্কো।বয়স ওর থেকে বড়োই হবে।

কেমন যেন ভয় ভয় করল সৌগতর।শহরে থাকার দরুণ এই রকম উদ্ভট অভিজ্ঞতা কখনোই হয়নি..এই যে বৃষ্টিতে একটি গ্রামের ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে।কোনমতেই কোন গাড়ি-টাড়ি কিছুই পাচ্ছে না যে আর একটু রাস্তা পেরিয়ে স্টেশনের দিকে পৌঁছে যাবে। ছেলেটি সৌগতকে জিজ্ঞাসা করল, "কোথা থেকে আসছেন?"

সৌগত ঠোঁট থেকে সিগারেটটা নামিয়ে বলে উঠল, "আসছি না,ফিরে যাচ্ছি।এই তো আপনাদের গ্রামের শেষের দিকে একটি বাড়ি,সেখানে এসেছিলাম এখন আমি উত্তর কলকাতায় ফিরে যাব।"

-সে তো,অনেক দূর..সময় লাগবে পৌঁছোতে।ততক্ষণে তো রাত নামবে..

-হ্যাঁ,রাত তো হবে। আচ্ছা, বলতে পারেন..এখন কি আশে-পাশে কোনো গাড়ি পাওয়া যাবে? কোনোভাবে যদি..

-গাড়ি পাবেন না। এক কাজ করতে পারেন.. আজ রাতটা এই বাড়িতেই কাটিয়ে দিন। আপনি যদি আবার আপনি যে বাড়ি থেকে এসেছেন সেই বাড়িতেই ফিরে যান, তা হলেও সময় লাগবে। আর মেঘ ডাকছে, যা বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে! আপনার যাওয়াটা এই মুহূর্তে হয়তো একদম ঠিক হবে না।"

ছেলেটি সৌগত-কে আটকে দিতে চাইছে, ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই সৌগত আরো একটু ভয় পেয়ে গেল। গলায় ভয়ের কোনো রকম প্রতিক্রিয়া না রেখে সে জিজ্ঞাসা ক'রে উঠল, "এই বাড়িটা কি আপনার বাড়ি?"

প্রশ্নটা শুনে ছেলেটি চুপ ক'রেই রইল। উজ্জ্বল চোখ দুটো কেমন যেন ছানাবড়া হয়ে গেল মুহূর্তেই। সে যেন হঠাৎ ক'রেই আহত হয়েছে প্রশ্নটা শুনে, এমনটাই মনে হল সৌগত-র। তবুও সৌগত বাধ্য হয়েই জিজ্ঞেস করল ফের, "কি হল বলুন বাড়িটা কি আপনার বাড়ি?"

ছেলেটি হাতের সিগারেট ফেলে দিয়ে, সেটাকে পায়ে পিষে সৌগতকে উত্তর দিল, "না,যখন আমি এসেছিলাম এই গ্রামে। এই বাড়িতে ছিলাম কিছুদিন। কিন্তু, আমি আর থাকি না এই বাড়িতে। আমি কিন্তু ঠিক চলে যাব। আপনি কিন্তু এই বাড়িতেই থেকে যান। আপনার কোন অসুবিধা হবে না। এই বাড়িতে যিনি থাকেন, তিনি একজন পৌঢ়া মহিলা। আর কেউ থাকে না বিশেষ। এখানে আপনি থেকে যেতে পারেন।"

স্বভাববশত, সৌগত একটু হেসে ফেলল। কাউকে থতমত ক'রে কথা বলতে শুনলে সৌগত-র বড্ড হাসি পায় সে যেকোনো পরিস্থিতিতেই হোক না কেন! এক চিলতে হাসির পর,পাশ ফিরল সৌগত। সিগারেটের ধোঁয়ার মতন ছেলেটি কোথায় মিলিয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল ওর। পরক্ষণেই ওর হাত থেকে সিগারেটের অবশিষ্টটুকু খসে পড়ল সেই জল কাদার শুকিয়ে যাওয়া ছোপ ছোপ দাগ ধরা দাওয়াতে। ছেলেটির বয়স কম-বেশি তো বাইশ-তেইশ হয়েই। কিন্তু গেল কোথায় সে? এখনই তো এখানেই ছিল, কিন্তু..অবাক হয়ে গেল সৌগত। এবার পিছন ফিরল সে। দেখল বাড়িটার সদর দরজায় তালা

দেওয়া। দু-চোখে বিদ্যুৎ খেলে গেল সঙ্গে সঙ্গে। এর মানে কি হতে পারে ছেলেটি হঠাৎ করে উধাও হয়ে গেল একটু আগেই বাড়ির ভেতরে বাসন পড়ার শব্দ হলো অথচ দরজার বাইরে থেকে বন্ধ তা কী করে সম্ভব! ছেলেটির আচরণেও বেশ কিছু রহস্য লক্ষ্য করেছে ও। কি হল সেসব কিছু ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ চোখের সামনে বিদ্যুতের ঝলকানি দেখতে পেল সৌগত..চোখের সামনে এভাবে বিদ্যুৎ চমকাল? বাড়িটার সামনে যে রাস্তায় হেঁটে এল তার ঠিক বিপরীতে একটা ছোট গাছ বিদ্যুৎ-এ আবিষ্ট হয়ে ঝলসে গেছে মুহূর্তেই একেবারে ওর চোখের সামনে।এবার একটু বেশি ভয় পেয়ে গেল ছেলেটা।কিছু একটা মনে হতেই,দরজার কড়া নাড়তে শুরু করল,ও জানে বাইরে থেকে তালা দেওয়া।তবুও কি যেন একটা মনে হতেই কড়া নাড়তে বাধ্য হল। এই রাতে আর কোথাও যাওয়া যাবে না,কিছুতেই না।আশেপাশে আর একটাও বাড়ি নেই। এই বাদলা সন্ধ্যের ঘোলাটে অন্ধকারে সব যেন কিরম হারিয়ে যাচ্ছে চারপাশ থেকে।ওর মনে হচ্ছে একটু আগেও এখানে বেশ কয়েকটা বাড়ি ছিল কিন্তু এখন সবকিছু আবছা অন্ধকারে ডুবে গেছে আর যেন কিছুই অবশিষ্ট নেই।শুধু ওর চোখের সামনে এই বাড়িটাই রয়েছে।এখানেই একমাত্র আজকের রাত্তিরের জন্য আশ্রয় নিতে পারা যায়।তাছাড়া,ওর হাতে আর কোনো উপায়ও তো নেই। বাধ্য হয়ে আরো একবার কড়া নাড়ল।হাতেগোনা চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড পরে দরজাটা খসে পড়ল। এবার তো আরও অবাক হওয়ার পালা।কিছু একটার তাড়নাই দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল সৌগত দস্তিদার। ভিতরে কিছু যেন একটা ওকে প্রবল আকর্ষণে টেনে আনছে ভেতরের দিকে আর বাইরে থেকে কোনো এক শক্তি যেন ওকে ভেতরে ঢুকতে বাধ্য করছে।সময়ই বোধহয় টেনে আনছিল ওকে,এ ঘটনার চক্রবলে।

ভিতরটা সম্পূর্ণ অন্ধকার। বসার ঘরে বাতির মত একটা আলো জ্বলছে। মৃদু আলো,তাতে কিছুই দেখা যায় না প্রায়।সামনে সিঁড়ি রয়েছে সেটা অবশ্য দেখা যাচ্ছে।কিন্তু শুধু সেই আলোটাই নয়, অন্য কোথা থেকেও একটা সোনালী গোছের আলো আসছে যেন। আশেপাশে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করল সৌগত,কেউ রয়েছে কিনা। না,কেউ নেই,কোনো ঘড়িও তো চোখে পড়ছেনা।ভেতরটাও এবার যেন অন্যরকম কেমন একটা ঘোলাটে অন্ধকারে ভরে উঠেছে.. সৌগতর কিছুই ভালো লাগছে না অথচ ওইখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারছেনা আর,সে প্রবৃত্তিটা খাটছেই না।পেছনে ঘুরে তাকাতেই ও দেখল,যে দরজা দিয়ে তালা ফস্কে পড়েছিল এবং ভেতরে ঢুকে ছিল সেই দরজাটাও আর নেই। সেই দরজাটাও এই ঘোলাটে অন্ধকার এর মধ্যে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

একঘেয়ে বৃষ্টির আওয়াজটা আর শুনতে পাচ্ছে না ও।বিদ্যুতের ঝলকানির শব্দে ওর কানে পৃথিবীর আর কোনো শব্দই পৌঁছচ্ছে না।কিছু সময় পরই শুধু একটা ক্ষীণ কণ্ঠস্বর যেন ওকে বারবার আহ্বান জানাতে শুরু করল। মনটা একবার যেন বলে উঠল নেশা হয়ে গেছে ওর। কিন্তু তা কি করে হয় নেশা করার মতন কোনো জিনিসই তো আজকে নেয়নি।কেমন ক'রে তা হতে পারে? শুধুমাত্র সিগারেটে কি এরকম নেশা হয় নাকি?ওই পরিস্থিতিতে কিছুই বুঝতে পারছিল না।ফোনের টাওয়ার সাপোর্ট করছে না সেই কখন থেকে। সেটা অবশ্য বৃষ্টি বাদলের কারণেই সঙ্গে প্রচণ্ড মেঘ ডাকছে। কি করবে কিছু ভেবে না পেয়ে সামনের দিকে এগোতে লাগল সৌগত। চোখে একরকমের উম্মাদনা।না চাইতেও যেন পা দুটো টেনে নিয়ে চলেছে ওকে।

এদিক-ওদিকে পথ খুঁজতে খুঁজতেই একটা ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে টলে উঠলো ওর পা দুটো।তবে,কি ভেতরে সেই পৌঢ়া মহিলা থাকে এখনও?তাহলে বাইরে থেকে তালা কেনো ছিলো বাড়িটাতে?

বেশ কিছুক্ষণ যেতেই মনে এক আশ্চর্য সাহসের দীপ জ্বলে উঠলো ওর। মোবাইলের ফ্ল্যাস জ্বেলে দেখতে পেল,বাম পাশ ঘেঁষে ওপরে যাওয়ার একটা সিঁড়ি রয়েছে। বেশি কিছু না ভেবে ধাপে ধাপে ওপরে উঠতে লাগলো ও। আবার সেই ক্ষীণ কণ্ঠস্বরটা ওর নাড়ী পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিলো। উফঃ, কি ভীষণ ভয় করছে সৌগতর। কোথা থেকে যে বুকে বল পেয়ে ও এগিয়ে চলেছে,সেটা ও নিজেও জানে না এখন আর। দোতলার একটা ঘরের দরজা আলগা ক'রে খোলা। ভেতর থেকে একটা তীব্র আলো ছিটকে বেরিয়ে আসছে, সঙ্গে একটা পচা-গলা গন্ধও নাকে এসে লাগছে সৌগত-র। কি আছে এই ঘরের ভেতরে! কিসের থেকে এই আলো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে? গন্ধটাও বা কিসের?

বিড়বিড় করে 'রাম' নাম জপ করতে শুরু ক'রে দিল ও। ওর এবার সত্যিই ভীষণ ভয় করছে সে যা-ই হয়ে যাক, দেখতে ওকে হযেই। দেখার পরেও প্রাণ হারালেও ওকে দেখতেই হবে যেন, ভেতরে কি আছে সেটা..খানিকটা হয়তো আন্দাজও করতে পারছে ও। দরজাতে আলতো হাত রাখতেই ঘড়ঘড় আওয়াজ ক'রে সরতে সরতে খুলে গেল সেটা। ভেতরে একটা দীর্ঘ পালঙ্ক। তাতে যেন মিশে রয়েছে একটা কঙ্কালসার দেহ। এগিয়ে গেল সৌগতর প্রায় ঠান্ডা হয়ে আসা শরীরটা। শুয়ে থাকা দেহটা বোধহয় আর বেঁচেই নেয়। গন্ধটা যে ঠিক ওখান থেকেই আসছে। তবে, কি পৌঢ়া মারা গেছেন? শরীরটা কেমন যেন গলে গেছে মনে হচ্ছে। যদি সত্যিই উনি অনেক দিন আগে মারা গিয়ে

থাকেন তাহলে,ক্ষীণ কণ্ঠস্বরটা কার ছিল?উফঃ,এখন এত প্রশ্ন আসছে কেনো মাথার মধ্যে!

মহিলার নাকের নীচে হাত দিতেই একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল ওর হাতে! চমকে উঠে সরে গেল সৌগত। একি! মহিলা বেঁচে ছিলেন এতক্ষণ? ও আসতেই শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন? সে নিঃশ্বাসও যে বরফের চেয়ে অনেক বেশি শীতল!

আবার একবার তীব্রতর আলোই ঝলকে উঠলো ঘরটা। জোড়া চোখে হাত চাপা দিল সৌগত। ও শুনতে পেল আবার সেই কণ্ঠস্বরটা। ভয়ের চোটে কানে হাত চাপা দেওয়ার চেষ্টা করলেও পারল না ও। ওকে যে শুনতেই হবে... নইলে মনের মধ্যে উঠে আসা প্রশ্নগুলোর উত্তর ও আর পাবে না যে কোথাও। হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে থাকা কণ্ঠস্বরটা বলে উঠল, "এসেছিস, খোকা.. এসেছিস তুই... কবে মরে গেছি দেখ... আমার ভেতরটা শুধু বেঁচে আছে... বারবার ওই মরা শরীরটাই ঢুকছিলাম আর বেরোচ্ছিলাম... গলে-পচে গেছে আমার শরীরটা... আর সহ্য হচ্ছিল না... অপেক্ষা করে বসেছিলাম তুই আসবি... বিপুল আপণ ছেলেরা মা-টাকে এই ঘরে পুরে চলে গেল। তুই তো পর হয়েও আমার আপণ... বিপুল খোকা.."

সৌগত আর নিতে পারল না। একটা আত্মা ওকে এসব বলছে ভূতে কোনোদিন বিশ্বাস করেনি ও। আজ হাড়ে হাড়ে বুঝল, মানুষ বোধহয় ভুত বলতে এই আত্মাগুলোকেই বোঝায়। অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ল ওর শরীরটা।

* * *

"ওই দেখো, চোখ খুলেছে.." ভারি গলায় কে যেন একটা বলে উঠল। ঝাপসা চোখে লোকটার মুখটা বুঝতে পারছিল না সৌগত। "এই কি হয়েছিল তোমার? ইস্টেশনের বাইরের রাস্তাটাতে পড়েছিলে..কি ব্যাপার! গায়ের পোশাকটা দেখে তো নেশাখোর বলে ভাবাই যায় না.."

ধরা গলায় সৌগত উঠে বসতে বসতে বলে উঠল, "স্টেশনের দিকে আসতে ওই সুরকি খসে পড়া বাড়িটাতে কি দেখলাম আমি ওগুলো..."

-কি দেখলে?

ঘটনার দৃশ্যগুলো আর যে ভয়টা ও পেয়েছিল সেটা মনে করাতেই বারেক দুলে উঠল ওর শরীর। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

-চলুন দেখবেন চলুন... ঘুরে আসুন ঘরটার থেকে, তাহলে মানবেন তো ?

-আরে বাবা, সুরকি পড়া ও বাড়িতে একজন বুড়ি থাকতেন, তাকে নিয়ে

তার ছেলেরা দিল্লি চলে গেছে, ওই কিসব চিকিৎসার জন্যে। মাস দুয়েক হয়ে গেল তো। ঘর তালা মারা,তুমি ঢুকলে কোন্ দিক দিয়ে!?

আর তর্ক বাড়াল না সৌগত।উঠে বসে বলল,"চলুন তাহলে.."

হ্যাঁ ঘরটা থেকে একটা মৃতদেহ পাওয়া গেল। তবে, কার? বাড়ির মালকিনের! সেই বয়স্ক মহিলা। অনেক আগেই তার দেহ কোষ গুলি নির্জীব হয়ে পড়েছে। আশেপাশে একটা অন্যরকম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। সবাই যেটা জানে সেটা মিথ্যে হয়ে দাঁড়াল ঘটনাটাতে। যাওয়ার আগে পরিচিত কয়েকজনকে বলে গেছিল ওই বুড়ির ছেলেরা, "মাকে নিয়ে যাচ্ছি, এখানে তো দেখভাল করার মত নিজের লোক নেই, ডাক্তারও নেই তেমন। বাড়িটাতে তালা দিয়ে গেলাম।"

বুড়িটার দেখভাল করার জন্য একটা ছেলে প্রায় মাস নয়েক ধরে ছিল এ বাড়িটাতে। বেশ ভালো ছেলে, আশেপাশের কোন একটা গ্রামের। বুড়ি ছেলেরা এসে তাকে নাকি মা-কে দেখার চাকরি থেকে ছুটি দিয়েছে, যেহেতু তারা মা-কে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাচ্ছে তাই তার আর কোন প্রয়োজন ছিল না। একথা ছেলেরা নিজে বলে গেছে এখানকার পরিচিত মানুষজনকে। তাহলে একটা মানুষ তালা বন্ধ অবস্থায় দু-মাস বেঁচেছিল কি ক'রে। এটাই তো সবথেকে বড় রহস্য। সৌগতর আর কলকাতা যাওয়া হল না। মেন্টাল শকটাও কাটাতেও টাইম লাগবে।

সপ্তাহ খানেক এখানেই থাকবে বাবা-মা'র সাথেই। প্রায় তিন দিন বিষয়টা নিয়ে ভাবতে ভাবতে কেটে গেল। এতটাই বিষয়টার মধ্যে ডুবে গেছে ও যে তারপর থেকে একটা সিগারেট ধরানোর কথাও মনেই আসেনি। চার দিনের মাথায় মামাতো ভাই প্রভাকরকে নিয়ে সেই ছেলেটার গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দিল সৌগত। ছেলেটার গ্রামের নামটা ওই স্টেশনে যারা ওকে হেল্প করেছিল তাদের কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছে। একে-ওকে-তাকে জিজ্ঞেস ক'রে বাড়িটা খুঁজে পেতে অসুবিধে হল না ওদের।মামা বাড়ির গ্রাম থেকে এই গ্রামের দূরত্ব কয়েক কিলোমিটারের। দেখে মনে হয় বছর তিনেকের মধ্যে বাড়িটা করা। সিমেন্টের গাঁথুনিতে ইট বসানো কেবল। কোনোরকম কোনো প্লাস্টার নেই। আশেপাশের দোতলা তিনতলা দালানগুলোর মাঝখানে বাড়িটা বড্ড বেমানান, ছোটোও।

পৌঁছতে বিকেল হয়ে গেছে ওদের। ভাঙ্গা সিমেন্টের উঠোনে উঠে দেখল একটা লোক খাটিয়াতে গা এলিয়ে শুয়ে রয়েছে। সৌগত খুকখুক ক'রে গলা ঝাড়তেই তড়বড় ক'রে উঠে বসল লোকটা। ছেলেটার নাম বিপুল, আগেই জেনেছে সৌগত।

"আচ্ছা, বিপুল.. বিপুল বাড়িতে আছে?"

একটা অদ্ভুত শূণ্য দৃষ্টি নিয়ে সামনের লোকটা তাকিয়ে থাকলো সৌগত দিকে, কিছু বলল না। সৌজন্যতা বজায় রেখে সৌগত আবার জিজ্ঞেস করল, "বিপুল কি বাড়িতে নেই?"

এবার লোকটা মিনমিনে গলায় বলল,"বিপুলের খবর নিতে এসেছেন, বসুন.." খাটিয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়াল লোকটি। সৌগত আর প্রভাকর গিয়ে বসল খাটিয়াটায়। লোকটা আবার সেই মিনমিনে গলায় জিজ্ঞেস করল," জল খাবেন?" সৌগত কিছু বলার আগেই প্রভাকর বলে বসল,"একটু তাড়াতাড়ি বলুন না প্লিজ বিপুল আছে কি নেই?" লোকটার তামাটে মুখে বিষণ্ণতার পুরু আবরণ ছেয়ে গেল। যেন চোখ দিয়ে জল পড়ছে তার। খসখসে গাল দিয়ে একনাগাড়ে জল পড়া শুরু হয়েছে। বিপুল তো আর বেঁচে নেই। দু-মাস আগে...। আপনারা কিসের জন্য এসেছেন ওর খোঁজে জানতে পারি আমি?

'বেঁচে নেই' টা শুনে সৌগত কেমন যেন মুষড়ে পড়ল।

"ও, আপনাদের বুঝি বিশ্বাস হচ্ছে না আমার কথা। ছেলেটা সেই কোন ছেলেবেলায় বাপটাকে আর মাটাকে হারাল, আমি ওর কাকা। নিজেই এতদিন দেখভাল করেছি ছেলেটার। মামার বাড়ি পাঠিয়ে দিইনি নিজের কাছে নিজের মতন ক'রেই রেখেছি। মানুষ হতে শিখিয়েছি,কাজকর্ম ক'রে খেঁটে খেতে শিখিয়েছি। ওর মরে যাওয়াতে আমার চেয়ে বেশি কষ্ট আর কেউ পায়নি। আমার এই কথাই অন্তত বিশ্বাস করবেন না আপনারা। বলতে বলতেই ঘরের লোহার দরজাটা খুলে ভেতর থেকে একটা ছবি টেনে বের করলেন সেটা সোজা গিয়ে খাটিয়ায় বসে থাকা সৌগত হাতে ধরিয়ে দিয়ে সরে দাঁড়াল, "এই যে এই যে, এ-ই আমার ভাইপো.. যার খোঁজে এসেছেন, বিপুল।"

অবাক হয়ে ছবিটা প্রভাকরের কোলে নামিয়ে ছিঁটকে সরে বসল সৌগত। এটা তো তার ছবি, সেই ঝড়ের রাতে ওই ঘটনাটা ঘটার আগে যে ছেলেটার সাথে দেখা হয়েছিল ওর। যে ছেলেটা সিগারেটের ধোঁয়ার মতন মুহূর্তেই মিশে গিয়েছিল সেদিনের সেই ভেজা বাতাসে। সৌগত ভেবেছিল হয়তো চলে গেছে কিন্তু সে। কিন্তু, সে তো দু-মাস আগে। মরার পর ওর কাছে এসেছিল বিপুল। কিন্তু কেন!শব্দগুলো সবটা গলা দিয়ে উঠে এলো না, সৌগত বলে দিতে পারল না সব কথা অনায়াসে।

"তবে একদিন এসেছিল আমার সামনে। যে বাড়িতে কাজ করছিল সেখান থেকে ছুটি নিত না ও, আমি জানতাম। হঠাৎ একদিন বাড়ি চলে এল

দেখলাম।সন্ধ্যেবেলা কাজ থেকে ফিরে এসে দেখি এই উঠানে বসে রয়েছে মুখ নামিয়ে, অবাক হলাম। ভাবছিলুম, কাজটা ছেড়ে গেছে কিনা। বলে বসলাম, "কি রে কি হলো তুই চলে এলি, দেখা করতে এলি শুধু?"

আমাকে কি বলল জানেন, বলল, "আমি তো আর বেঁচে নেই, কাকা। গ্রামের বাইরে পানাপুকুরটা আছে, জঙ্গলের ভেতরের এক পাশে, ওখানে... আমার লাশটা ওখানে ফেলে দিয়ে এসেছে ওই লোকগুলো, ওই..ওই যে ওই বড়োমা-র ছেলেগুলো..মেজো ছেলে আর ছোট ছেলেটা আমাকে খুব মারল। ভেবেছিলো মেরে তাড়িয়ে দেবে, এমনিতে বড়ো মা-কে ছেড়ে দিয়ে যেতে চাইছিলাম না যে। বড়োমা-কে না দেখে..যাচ্ছি না দেখে ভাবছিল, ওদের বাড়ি দখল করব। মারতে মারতে মেরে দিল আমাকে। যখন দেখল মরে গেছি, প্রাণটা একবারে বেরিয়ে গেছে, পাঁজাকোলা ক'রে তুলে নিয়ে ওই পুকুরে ফেলে দিল ছুঁড়ে..!

শুনতে শুনতে আমি ভয়ে ঝিমিয়ে পড়ছিলাম। নেহাৎ বেটা তো আমার খুব আপন, নইলে ওসব শুনতে শুনতে মরেই যেতাম আমি, জিভ বেরিয়ে যেত আমার। ঘটনাটার পর আর ওকে দেখতে পাইনি কখনো। পানা পুকুরের কাছে একাই গিয়েছিলাম একবার। জলটা স্থির। আচ্ছা, আপনারা বলতে পারেন, আমার বিপুলের শরীরটা ওখানেই পড়ে আছে এখনও?" কান্না এসে গেল পরিবেশটা জুড়ে।

"পুলিশকে বলেছেন এসব নিয়ে?" প্রভাকর সন্দিগ্ধ হয়ে জিজ্ঞেস করল ঝাঁঝরা হয়ে পড়া সামনের মানুষটিকে।

"কার জন্য? কার জন্য পুলিশকে বলতুম। ছেলেটাই নেই যে!"

"আপনি শিওর আপনি সজ্ঞানে বিপুলকে দেখেছিলেন?"

কোন উত্তর দিল না সামনের লোকটা, একভাবে আকাশের দিকে চেয়ে রইল। প্রভাকরের হাতটা চেপে ধরে সৌগত ওকে চুপ করার জন্য বলল। সামনের লোকটা যে গল্প বানাচ্ছে না, সেটা সৌগত খুব ভালো ক'রেই টের পাচ্ছে ভয়ের চোটে ডান দিকে ফিরতে পারছে না আর ও। প্রভাকর লক্ষ্য করেনি হয়তো। সামনের লোকটাও লক্ষ্য করেনি। কিন্তু সৌগত ঠিক দেখতে পেয়েছে, উঠোনের এক পাশে ওর ঠিক ডান পাশে হাঁটু মুড়ে বসে আছে সেই ছেলেটা। চোখ মুখ উজ্জ্বল যেন ওর চেষ্টা সফলতা পেয়েছে চোখদুটো সেই সোনালী আজ আশার আলো নেই বটে তাতে। আশা যে পরিপূর্ণ হয়েছে ওর। তাই তো ওইভাবে চেয়ে আছে। মুক্তির নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে তার মুখ চোখ।

ডানদিকে পুরোপুরি মুখ না ফেরালেও,স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল সৌগত..সেই ছেলেটা..মানে বিপুল ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। নিজের রক্তের সম্পর্কের না হলেও ওই মা-টাকে এতদিন আগলে রেখেছিল।নিজে বেঁচে না থেকেও মায়ের মুক্তিতে ছেলেও মুক্ত হতে চলেছে..তার কাজ যে ফুরিয়েছে।শরীর ছাড়া তার পক্ষে এ কাজ যে সম্ভব ছিল না করা।তাই তো ওকে সৌগতর সাহায্য নিতে হয়েছিল ওভাবে। সন্ধ্যের মাখা-মাখা অন্ধকার বেয়ে ওই চোখ দুটো ঠিকরে সোনালী আলো এসে পড়ছে সৌগতর পায়ের কোলের কাছটাতে।

আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ একটু একটু করে স্পষ্ট হচ্ছে। ছায়ামূর্তি হয়ে যাচ্ছে উঠোনের এক পাশে বসে থাকা বিপুলের স্পষ্ট অবয়বটা, আর একটু পরেই হয়তো সম্পূর্ণ মিলিয়ে যাবে সে মুক্তির সাগরে। প্রচন্ড ভয়ে নাড়ীগুলো অবশ হয়ে আসলেও, সৌগত নিজেকে সোজাভাবে ধরে রেখেছে। বিপুলের ব্যাপারটা যতটা না ভৌতিক তার চেয়েও বেশি ভৌতিক ঠেকছে ওই কুলাঙ্গার ছেলেগুলোর কাণ্ডটা..মা-কে একা বন্ধ ক'রে দিয়ে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে চলে গেল।ক'বছর পর এসে হয়তো বাড়িটা আর জমিজমা বেচে দিয়ে নোটের তাড়া নিয়ে যাবে ব্যাগে ভরে।যাতে বিপুল কিছু টের না পায়,তাই ওর গায়ে হাত তুলে ওকে তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা।মরে গেছে দেখে,ওদের বুক কাঁপলো না!কাঁপবেই বা কি ক'রে! পাষান্ড যে..নইলে নিজের মা-কে ওভাবে ফেলে রেখে চলে যেতে পারে নাকি!

সমাজের তলানিতে পা রেখে এই নৃশংস কাজ যারা করেছে তাদের শাস্তি আগত ঈশ্বর নিশ্চয়ই নিজে হাতে সে শাস্তি রচনা করছেন। খানিক পরে বিপুল সত্যিই মিলিয়ে গেল আকাশ থেকে গড়িয়ে পড়া চাঁদের আলোতে।শেষটাই সাহস ক'রে একটুখানি ঘুরিয়ে সৌগত দেখতে পেল,ছেলেটার মুখে অমলিন হাসি..যেন এটা কৃতজ্ঞতার উপহার স্বরূপ ঝরে পড়ছে ওর পাতলা ঠোঁটের ভাঁজে-ভাঁজে,এটা সৌগতকে দেবে বলেই হয়তো এতক্ষণ বসেছিল ও।

ওক বিভীষিকা

অভীক পোদ্দার

বেশ হই-হুল্লোড়ের সাথেই ডিনার পার্টিটা চলছিল। সবাই খুব ফুর্তির মেজাজে ড্রিংসের গ্লাস হাতে নাচা নাচিতে মত্ত। কিন্তু, লক্ষ্য করলাম পিটারের মন সেদিকে নেই। সে যেন একটু আনমনেই খুব গভীরভাবে কিছু একটা ভাবছে। সেই যেদিন সে স্কাউট থেকে ফিরেছে, সেদিন থেকেই ওর মধ্যে এই ভাবটা খেয়াল করছি। কিন্তু, বহুবার জিজ্ঞেস করা সত্ত্বেও সে ব্যাপারটা স্রেফ এড়িয়ে গেছে। এবারে অবশ্য সে স্কাউটে গেছিল বিশেষ একটি দরকারে। যদিও, সেখান থেকে এত তাড়াতাড়ি ফেরার কথা মোটেই ছিল না। কিন্তু, দিন তিনেকের মধ্যেই সে ফিরল। কানাঘুষো এও শুনলাম সেই জমিটি, যেখানে সে বাংলো বানাবার প্ল্যানে গেছিলেন সেটাও নাকি রাতারাতি বিক্রি করেছ। তাও আবার অতি সস্তায়, মানে যাকে বলার জলের দরে। এই ব্যাপারটাই মনের ভিতর বিরাট একটা কৌতূহল সৃষ্টি করছিল। তাই ভাবলাম পার্টি শেষে যে করেই হোক ওর মুখ থেকে কথাটা আদায় করতেই হবে।

পার্টি শেষে অতিথিদের গেট অবধি এগিয়ে, বিদায় জানিয়ে যখন ড্রয়িংয়ে ফিরলাম তখন রাত প্রায় ২টো। এমনিতেই শীতের রাত্রি তার ওপর গত দু-দিন হল এই একলায় বরফ পড়ছে, তাই দরজাটা বন্ধ করে কাঁপতে কাঁপতে সোফায় এসে বসলাম। দেখলাম পিটার তখনো সেই ড্রিংক্সটা হাতে নিয়ে এক মনে সিলিংয়ের দিকে চেয়ে আছে। এবারে যেন হুট করেই ওই ব্যাপারটা মনে পড়ে গেল। এতক্ষণ গেস্টদের চাপে একটু ভুলেই মেরেছিলাম সেটা।

'পিটার... এই পিটার...।', কুনুইয়ের গুঁতোয় একটু নাড়া দিলাম। এটুকুতেই পিটার যেন একটু চমকে উঠল। তারপর, গ্লাসটা হাত থেকে সেন্টার টেবিলের ওপর নামিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, বল...'

'বলবি তো তুই...। কী হয়েছে টা কী?'

এর প্রত্যুত্তরে পিটার একটু বলদের হাসি হাসল। বুঝলাম, এ-হাসি কৃত্রিম। কিছু একটা সে গোপন রাখতে চাইছে।

'হেসে লাভ নেই... কী হয়েছে বল? যেদিন থেকে তুই স্কাউট থেকে ফিরেছিস তখন থেকেই দেখছি এই আনমনা ব্যাপারটা। কারও প্রেমে-টেমে পড়লি নাকি?' শেষ কথাটা ইচ্ছে করেই বললাম। আসলে, সেটা বলে আমি ওর অভিব্যক্তিটা বুঝতে চাইছিলাম। কিন্তু, লাভ কিছুই হল না, পিটার যে-কে সেই। কিছুক্ষণ আগেই আগুন নিভে যাওয়ায় ঘরের তাপমাত্রাটা এইবারে হুহু করে কমছে। ফায়ারপ্লেসে কাঠ গুঁজে চটপট দুটো ওয়াইনের পেগ বানালাম। তারপর, একটা গ্লাস পিটারের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'এই নে...।'

ও কোন কথাই বলল না। শুধুমাত্র হাত বাড়িয়ে গ্লাসটা টেনে নিল।

'কী হয়েছে সেটা বলবি কি?', মনে মনেএইবার একটু রাগই হল।

'কোন বিষয়ে...?' পিটারের উদাস কণ্ঠের জবাব।

'স্কাউট থেকে এত জলদি ফিরলি... আর এদিকে শুনলাম জমিখানাও নাকি বেচে দিয়েছিস...?', গ্লাসে চুমুক মেরে প্রশ্ন করলাম।

'হুম...'

'কিন্তু কেন?', একটু উত্তেজিতই হয়ে উঠলাম।

'এমনি।'

'এমনি এমনি? মিথ্যে বলিস না। কী হয়েছে বল...', গ্লাসখানা নামিয়ে রেখে এইবারেসোফার ওপর একটু গুটিয়ে বসলাম। খানিকক্ষণ সব চুপ। দেখলাম গ্লাসের ওপর আনমনে পিটার আঙ্গুল ঘোরাচ্ছে। বুঝলাম এইবারে ব্যাটা মুখ খুলবেই। এতক্ষণে গরম ভাবটা একটু বেড়েছে।

'জানি ঘটনাটা হয়ত তুই বিশ্বাস করবি না, আর শুধু তুই কেন, শিক্ষিত সমাজে এ-ঘটনা রটলে সবাই জাস্টহেসেইউড়িয়ে দেবে। তবু, শোন...। গ্লাসে প্রথম চুমুকটা দিয়েই পিটার বলা শুরু করল।

স্কাউটে উত্তরাধিকার সূত্রে যে জমিটা পেয়েছিলাম সেটা ছিল পর্বতের গা-লাগোয়া ওক গাছের জঙ্গলে ঘেরা। আয়তনে মাঝারি কিন্তু চৌকো ভূ-খন্ড। পর্বত, নির্জনতা, জমির প্রকার সব মিলিয়ে বাংলোর জন্য একেবারে পারফেক্ট প্লেস। আর তুই তো জানিস, ওদিক থেকে যা টাকা পেয়েছিলাম পুরোটাই আশাতীত। তাই ঠিক করলাম ওই জমিটার ওপর বেশ সুন্দর ছোট মতন বাংলো বানাব। সেইমতন ব্যবস্থাও করলাম। প্রশাসনিক কিছু দলিল পত্রে সই করার জন্য দুটো দিন ওখানেই থাকতে হত। তাই, জমিটার পাশেই একটা পরিত্যক্ত বাড়িতে একটা রাত ছিলাম। কিন্তু... '

এটুকুই এই পিটার থেমে গেল। দেখলাম ওর ঠোঁটদুটো কাঁপছে। 'তারপর' ফের ওকে একটু ঠেলা দিলাম। ঢকঢক করে গ্লাসের সম্পূর্ণ পানীয়টা শেষ করার পর গ্লাসটা নামিয়ে পিটার ফের বলা শুরু করল, 'প্রথম যেদিন ওই বাড়িটায় ছিলাম সেদিন দুপুর নাগাদ ওখানে উঠি। সঙ্গী বলতে মাতাল ড্রেক। এখন কথা হল এমন একজন মাতালকে সাথে রাখার দরকারই বা কী? নিশ্চয়ই উপযুক্ত কারণ আছে, ড্রেক এই কাজটায় খুব সাহায্য করছিল। তা দুপুরটা কিছু টেকনিক্যাল ব্যাপার নিয়ে আলোচনাতেই কেটে গেল। সন্ধ্যার পর দুজনে বসে একটু ড্রিংক করলাম। কিন্তু, তখনও অবধি কিচ্ছুটি টের পাইনি।

নেশায় চুর হয়ে ড্রেক সেদিন ড্রয়িংয়েই শুয়ে পড়ল। আমিও চলে এলাম শোবার ঘরে। এরপর, কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম ক্যামব্রিসের খাটে। টিমটিমে লাল একটা ডুম জ্বলছিল ওপাশের দেয়ালের গায়ে। সেদিকে চেয়েই ভাবি বাংলোটার কথা ভেবে মনটা বেশ খুশিই হচ্ছিল। এসব ভাবতে ভাবতেই কখন যে দু-চোখের পাতা লেগে এসেছে, টের পাইনি।

হঠাৎ, একটা বীভৎস স্বপ্নে চিৎকার করে উঠে বসলাম। দেখলাম, ঘড়িতে রাত্রি তিনটে। সত্যি বলতে, এমন ভয়ানক স্বপ্ন আমি কখনোই দেখিনি। ততক্ষণে টি-শার্টটা ঘামে ভিজে পুরো চুপচুপে হয়ে গায়ের সাথে এঁটে এসেছে। গলার কাছটাতেও বিন্দু বিন্দু ঘাম। শরীরটার মধ্যেও কেমন একটা ছাড়া ছাড়া ভাব। একটু থিতু হতেই হাত বাড়িয়ে পাশের ছোট টুলটার ওপর থেকে জলের বোতলটা নিয়ে কিছুটা জল খেলাম। এবারে যেন একটু ভাল লাগল। কিন্তু, লক্ষ করলাম অন্য একটা ব্যাপার। দূর... বহুদূর থেকে যেন ক্ষিণ একটা শব্দ এসে বারে বারে দু-কানে বিঁধছে। খুব হালকা, কিন্তু তীক্ষ্ণ সেই শব্দ। আর পরমুহূর্তেই যেন মনে পড়ে গেল স্বপ্নটা।

বেশ গভীর রাত্রি। ওকের সারি ঘেরা একটা নির্জন প্রান্তরের মধ্যে সরু পথ বেয়ে আমি হাঁটছি। কোথায় হাঁটছি? তা জানি না। হাঁটছি তো হাঁটছিই...। পথ যেন আর শেষ হয় না। জ্যোৎস্না রাত্রি। ওকের বন ভেদ করে উঁকি দিচ্ছে সরু ফালির চাঁদটা। জ্যোৎস্নার ক্ষীণ আলোর চাদর ছেয়ে রেখেছে বনটার সমগ্র প্রান্তর। চারিদিক নিস্তব্ধ। ঠান্ডা হাওয়ার একটা স্রোত সোঁ-সোঁ শব্দে বয়ে চলেছে চারিপাশে। কিন্তু, সেই মধ্যেই কানে বিঁধছে আরেকটা তীক্ষ্ণ শব্দ। করাতের ঘ্যা-ঘ্যা। সাথে মুহুর্মুহু চিৎকার। মনে হল যেন কেউ অনেক গুলো করাতের সাহায্যে এই ওক বনের কোন এক প্রান্তে গাছের গুঁড়ি ছিন্ন করছে। আর তাতেই যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠছে গাছগুলো। বাতাসের আঘাতে ওক

গাছগুলো ক্রমাগত মাথা দোলাচ্ছে। যেন একরাশ কষ্টে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছে সদলবলে। হঠাৎ-ই সেই শব্দ ছাপিয়ে আরেকটা শব্দ আমার কানে এলো। আর সেটা শুনতেই আমার ষষ্ঠেন্দ্রিয় জানান দিল এক বিভীষিকাময় মুহূর্তের। নিমেষে ঠান্ডা হয়ে এল শরীরের সমস্ত শিরা উপশিরা। না... না... সে-শব্দ ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতা আমি হারিয়েছি। প্রথমটায় সেটাকে বাতাসের শব্দ ভেবে ভুল হলেও, ধীরে ধীরে সেই ঝিম ধরানো শব্দটা ক্রমে গ্রাস করতে থাকল সারা বনটাকে। প্রাণহীন অরণ্যের বুকে দামামার ন্যায় বেজে চলল সেই আর্ত কান্নার সুর। সম্মোহিতের মতন সেই সুর আমার চারিদিক ঘিরে ঘুরতে থাকল ক্রমাগত। সুরটা ভেসে আসছে ওই ওক গাছের সারির আড়াল থেকে। সত্যি বলতে, সেই বিষাক্ত সুরটা গ্রাস করতে থাকল আমার বুকের ভিতরটাও। একসময় এও মনে হল, সুরটা যেন আর কোথাও নয়, বরং আমার মস্তিষ্কের ভিতর থেকেই উঠে আসছে। থরথর করে কেঁপে উঠছে আমার শিরদাঁড়াটা। একটা ভয়ধরানো বিস্ময় ধীরে ধীরে জাঁকিয়ে ধরছে বসছে আমার মনে। আমি রুদ্ধশ্বাসে দৌড়চ্ছি। কিন্তু, কোথায় এর শুরু... কোথায়ই বা শেষ! এই বন যেন শেষ হবারই নয়। এ-যেন কোন এক অভিশপ্ত বদ্ধ ভূমি...'

এটুকু বলা শেষে পিটার একটু জল খেল। দেখলাম সে হাঁফাচ্ছে। কিন্তু, ততক্ষণে এই অদৃশ্য কৌতুহলটা আমার সারা শরীর জাঁকিয়ে ধরেছে। তাই, চটপট বলে উঠলাম, 'তারপর?'

জিভ দিয়ে দু-ঠোঁট চেটে নিয়ে পিটার যে ঘটনা বলল তা শুনে মনে খানিক ভয়ের সঞ্চার করল।

'এরপরেই ঘুমটা ভেঙে গেল। কিন্তু, সেই জোরালো করাতের শব্দটা কিছুতেই যেন ভুলতে পারলাম না। গুমোট দশায় দমবন্ধ হয়ে এল। মনে হল, সেই করাতাঘাতের শব্দটা বুঝি মাথার ভেতর গেঁথে বসেছে। এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতেই বিছানা ছেড়ে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ালাম। পাশেই নিজস্ব মালিকানাধীন জমিটা। এখান থেকে সেটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সেদিকেই ঠায় চেয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। একটু পরে মনে হল ওক গাছের সারিগুলো যেন সত্যিই আমার দিকে এক-পা এক-পা করে এগিয়ে আসছে। আর করাতের শব্দের সাথেই এবার শুরু হল সেই তীক্ষ্ণ, হাড়হিম করা চিৎকার। নাহ!... এ-কান্না কোন মানুষের নয়, আর না তো এই জগতের। এই কান্না যেন পাতাল থেকে উঠে আসা অভিশপ্ত কোন কম্পাঙ্কের। একটা সময় মনে হল আমি বোধ হয় পাগল হয়ে গেছি। পরক্ষণেই দেখলাম গাছের সারিগুলো বাড়িটার চারপাশ

ঘিরে ধরেছে। সরু সরু ডালপালা মেলে ধরে উঠে আসছে ওপরে। সেই এক একেকটাওক গাছ যেন ভিন্ন অলৌকিক সত্ত্বা। ওরা হাসে, ওরা কাঁদে, কথা বলে, এমনকি হাঁটাচলাও করে। লক্ষ করলাম সেই সরু সরু কান্ড গুলোর গায়ে ফুটে উঠেছে একজোড়া করে জ্বলন্ত গোলাকৃতি অংশ। সেই অংশগুলো যেন ক্রমশ জ্বলছে-নিভছে।

ততক্ষণে ভয়ে আমার সারা শরীর ঠান্ডা হয়ে এসেছে। সেই ভয়কে উপেক্ষা করেই পরক্ষণে ঘরের ভেতরে ঢোকার বহু চেষ্টা করলাম। কিন্তু, বুঝলাম সেই ক্ষমতা আমি বহুক্ষণ আগেই হারিয়েছি। পা-দুটো যেন প্রচন্ড শক্তিতে কেউ জাপটে রেখেছে। এমনকি, হাত দুটোও নাড়াতে পারলাম না। গলার কাছটায় ভারী, শক্ত কিছু অনুভব করলাম। ক্রমে অসাড় হয়ে আসছে সারা দেহ। মাথার ভেতরের শিরাগুলো হয়তো করাতাঘাত, চিৎকার, কান্নার সেই তীক্ষ্ণ মিশ্রিত শব্দে এখুনি ছিঁড়ে যাবে। হারিয়ে যাবে মুখের ভাষা, চোখের দৃষ্টি। এ-জন্মের মতন সেই শক্তিতে বিলীন হব আমি। সেই গাছগুলো এইবারে আরও খানিকটা উঠে এসেছে। আর মাত্র দশ গজ। এরপরেইচিরতরে গ্রাস করবে আমাকে...।'

এটুকু বলার পর পিটারেরপ্রচন্ডশ্বাসকষ্ট শুরু হল। তাই, তক্ষুনি এই ব্যাপারে আর কিছু জিজ্ঞেসকরিনি। যদিও পরে শুনেছিলাম, ওই ঘটনার পর সেই রাত্রে ব্যালকনিতেই সে নাকি জ্ঞান হারিয়েছিল। পরে যখন জ্ঞান ফেরে তখন সে সেই অঞ্চলের হাসপাতালে। আর এই ঘটনার দু-দিন পরেই সব বেচে-বুচে সে এখানে ফিরে আসে। ওর বদ্ধমূল ধারণা ওই ওক বনটা নাকি কোন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। সেই গাছগুলোই এই ঘটনার জন্য দায়ী। তবে, পরদিন সে শুনেছিল ড্রেক নাকি এসব কিছুই শোনেনি।

ভালোবাসি

বাপ্পাদিত্য দাস

বিলু... ওঠ... বড় বিপদ সামনে... বিলু...

ডাকটা খুব কাছ থেকে আসছে, গলাটা খুব চেনা। চোখের পাতা আঠার মত জুড়ে আছে, অনেক কষ্টে খুললাম। চারপাশের আধো অন্ধকার সয়ে আসতে সময় লাগলো কিছুটা। একটা ঘর, কোন জানলা নেই, দেওয়াল গুলো বিবর্ণ, মেঝেটা ফুটিফাটা, সোঁদা গন্ধ চারপাশে, ভ্যাপসা গরম আর গুমোট, দম নিতে কষ্ট হচ্ছে। ঘরটার ঠিক মাঝখানে রঙীন কিছু গুঁড়ো দিয়ে আলপনার মত, ঠিক আলপনা না.. অঙ্ক বইতে দেখা জ্যামিতির ছবির মত বা তারচেয়েও জটিল কিছু চিহ্ন আঁকা। সেই চিহ্ন ঘিরে অনেকগুলো মোমবাতি স্থির শিখায় জ্বলছে। একপাশে তামার একটা থালায় জবা ফুলের মালা আর কিছু রঙীন গুড়ো, কোন জন্তুর হাড়, ছোট বাটিতে ঘন খয়েরী রঙের থকথকে তরল কিছু, একটা কুশের আসন পাতা। আর ওই আলপনার মত আঁকাটার মাঝখানে বসানো একটা মানুষের মাথার খুলি। ঘরটার চারপাশে দেওয়ালের ধার ঘেঁষে সার সার কালো অন্ধকারের স্তূপের মত কিছু পড়ে আছে।

সেদিকে এগোতে গিয়ে বুঝলাম অসম্ভব দুর্বল লাগছে শরীর, মাথা ঘুরছে, পা কাঁপছে...। কোনওরকমে নিজেকে শক্ত করলাম, মাথা কাজ করছে না, খুব অস্বস্তি হচ্ছে, গরম লাগছে। কপালের ঘাম মুছতে গিয়ে হাতে চটচটে কিছু একটা লাগল, চোখের সামনে ধরে দেখি লাল রঙের, ঠিক লাল নয়, খয়েরী কিছু, দুর্গন্ধে গা গুলিয়ে উঠল, একটা ঠান্ডা শিরশিরে তেঁতুল বিছের মত ভয় শিরদাঁড়া দিয়ে নিচে নামছে, নিজের দিকে তাকালাম, আমার কোমরে শুধু একফালি লাল কাপড়ের টুকরো জড়ানো। এ কোথায় এলাম আমি, সে কোথায় ?

এবার সব মনে পড়তে লাগলো আমার...। কাল ছিল শনিবার। রোজকার মত বন্ধুদের সঙ্গে দাপিয়ে ফুটবল খেলে ঝাঁপ মেরেছি বিশাল দিঘীটায়। টানা বেশ কয়েকবার সাঁতরে এপার ওপার করার পর একে একে রাজু নীলু সতীশরা উঠে গেছে জল থেকে, আমি আরো কিছুক্ষণ থাকবো। এই সময়টায় একা চিৎ হয়ে জলে ভেসে থাকতে আমার খুব ভালো লাগে। সন্ধ্যে হয়ে গেছে, আকাশ

এখন ঘন কালো, পাশের ঝুপসি গাছগুলো থেকে ভেসে আসছে ঘরে ফেরা পাখীদের ডাক, শিরশিরে হাওয়া বইছে, মাথার ওপর নিকষ কালো আকাশ জুড়ে ঝিকিমিকি তারার ফুলকারি কাজ ছেয়ে আছে, সেই আকাশের ছায়া পড়েছে জলে, এখন আমার চারপাশ জুড়ে যেন কেউ চিকমিকে জরি চুমকি বসানো কালো শাড়ী পরে তাঁর সারা শরীর দিয়ে আমায় ধরে আছে। স্থির হয়ে দেখছি আমার চারপাশ জোড়া আকাশ, আমি জলে নয়, যেন আকাশে ভেসে আছি। এমন সময় পাড় থেকে ডাক শুনলাম তুলির, "চল ওঠ, রাত হয়ে গেল, কাকীমা চিন্তা করবে"।

এই এক জ্বালা হয়েছে, মেয়েটা কিছুতেই আমার পিছু ছাড়ে না। পাড়ারই মেরে, বলতে গেলে একসাথেই বড় হয়েছি, পড়াশোনা খেলাধুলো সবই একসাথে। মেয়েটা আমাদের দলের সঙ্গেই ঘোরে, খেলে, ওর বয়েসী অন্য মেয়েদের সঙ্গে বেশী ভাব নেই ওর। আমার ওপর এসকটু বেশীই অধিকার ফলায়। এমন খবরদারি করে যে মাথা গরম হয়ে যায়।

-তুই যা, আমি আসছি ।

-তাড়াতাড়ি উঠে আয়, লেখা পড়া নেই খালি খেলা আর সাঁতার। তোর যে কি হবে।

গজগজ করতে চলে গেল ও, এমন ভাব করে যেন আমার গার্জেন। আরে আমি কি বাচ্চা ? কালই আমি আঠেরো হয়ে যাবো। ভেজা গায়ে পাড়ে উঠে দাঁড়িয়েছি, ঝোপের পাশ থেকে জার্সীটা নিয়ে মাথা মুছতে গিয়ে একটা খসখসে আওয়াজ এলো কানে। একটা গন্ধ পেলাম, অচেনা, অন্যরকম তীব্র একটা গন্ধ, ফুলের নয়, অন্য কিছুর। মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠলো, শরীর অবশ লাগছে, ঠিক তখনই...।

অন্ধকার রাতের, চাঁদহীণ তারাজ্বলা আকাশের নিজস্ব একটা আলো থাকে, মায়াবী, ছমছমে, রহস্যময় সেই আলোতে, ঘনকালো আকাশের নীচে তাঁকে দেখলাম। যেন মোম ধোওয়া গায়ের রঙ, একঢাল কালো চুলের কিছুটা সামনে বুকের একপাশ ঢেকে নীচে নেমে গেছে। পরনে কালো শাড়ী, বক পাখনার মত সাদা মুখ, গলা, বুকের ওপরটা, হাত দুটো। সেই তীব্র নেশা ধরানো গন্ধটা ওর গা থেকেই আসছে।

-ক্কে, কে তুমি ?

-আমি তোমায় নিতে এসেছি বিলু... যাবেনা আমার সাথে ?

আমার আরো কাছে সরে এসেছে সে, আরো তীব্র হচ্ছে সেই গন্ধটা, আমার শরীরের মধ্যে একটা উথালপাতাল টের পাচ্ছি, নিশ্বাস ঘন হচ্ছে, গরম লাগছে। আমার আরো কাছে সরে এসে নরম তুলতুলে পালকের মত হাতে আমার বুকটা স্পর্শ করলো সে। হাসলো, চাঁদহীণ আকাশে তারাদের আলোয় আমি এবার

পরিস্কার দেখতে পাচ্ছি ওর পান পাতার মত মুখ, পুরু লাল ঠোঁটের ওপরের বাঁদিকে একটা কালো তিল। ঝকঝকে সাদা ওপর পাটির দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরেছে। আমার নগ্ন শরীর জুড়ে খেলা করছে ওর হাত সাপের মত কিলবিল করে, বুক পেট ছাড়িয়ে নীচে নামছে, আমি শিউরে উঠলাম, টের পেলাম, এই প্রথমবার, আমার গোপন পৌরুষ এখন লোহার মত কঠিন, তীব্র এক আক্ষেপ, একটা আকুতি, বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার আকাঙ্খা টের পেলাম ভিতরে, আশ্লেষে চোখটা আপনি বুজে এল, হাপরের আওয়াজের মত বুকের ধকধকানি শুনতে পেলাম। আমার প্রায় আঠারো বছরের জীবনে এমন তোলপাড় কোনদিন হয়নি। আমি ভুলে যাচ্ছি সব।

আমি কে ? কোথায় ? কিচ্ছু আর মনে পড়ছে না। আমার নাম, পরিচয়, ন্যায় অন্যায়, লাজ লজ্জা... কিচ্ছু মনে পড়ছে না। শুধু দমবন্ধ করা অপেক্ষায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছি... এরপর কি ?

-কি সুন্দর তুমি, কি সুঠাম, দীর্ঘ আর দৃঢ়।

আমার অবস্থা এখন ভয়ঙ্কর, শরীরের ভিতরটায় কিছু একটা ফুঁসছে খোঁচা খাওয়া জংলী জানোয়রের মত, ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে ওর ওপর। ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে ওকে। আমি কখনো এমন নারী দেখিনি, ছোঁয়া পাইনি। খুব কষ্ট হচ্ছে আমার।

-আমার চাও বিলু ?

-হ্যাঁ, চাই।

নিজের গলা শুনে এই অবস্থাতেও নিজেই অবাক হয়ে গেলাম। এই হিসহিসে জান্তব আওয়াজটা আমার ?

-তবে চল আমার সাথে.. এস..

-কোথায় ?

-কোন প্রশ্ন নয়।

আমার ঠোঁটে ওর আঙ্গুল, কি নরম আর উত্তপ্ত। সে পিছন ফিরল। আমি দেখলাম এক অলৌকিক ছবি। পিছনে বিছানো কালো তরল আকাশ, মাথার ওপর জরি বসানো ঝিকমিকে কালো চাঁদোয়া, একঢাল কালো চুলে ঢাকা, কালো শাড়ী পরা এক রহস্যময়ী অমোঘ আকর্ষণে আমায় টানছে। চারপাশটা এখন ভয়ঙ্কর রকম নিশ্চুপ। পাখীদের ডাক থেমে গেছে। দিঘীর জলে হাওয়ার ছোঁয়ায় ওঠা ছলাৎ ছলাৎ আওয়াজটাও কানে আসছে না, গাছের একটা পাতাও কাঁপছে

না। চরাচর জুড়ে একটা দমচাপা অপেক্ষা যেন ওৎ পেতে আছে। এরপর কি? আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত বোধহীন মন আর চরম উত্তপ্ত শরীর নিয়ে তাঁর পিছু নিলাম। এছাড়া আর কিচ্ছু আমার করার ছিলনা।

* * *

হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল। একঝলক বরফ ঠান্ডা হাওয়ায় ভেসে সে ঢুকলো ঘরে, তার পা যেন মেঝে ছুঁচ্ছে না, আমার সামনে এসে দাঁড়লো। এত কাছে যে তাঁর কাঁপাকাঁপা নিশ্বাস আমার বুক ছুঁয়ে গেল। আমি অবাক হতেও ভুলে গেলাম। এ আমি কি দেখছি ? আমার সামনে দাঁড়ানো এ কে? সাদা মার্বেলে গড়া নিখুঁত শরীর তাঁর। সম্পূর্ন নিরাবরন। সে তাকিয়ে আছে আমার দিকে, তার নীল চোখের মনি রঞ্জন রশ্মির মতো এফোঁড় এফোঁড় করে ফেলছে আমার শরীরটাকে, দেখে নিচ্ছে আমার ভিতরটা।

-সময় হয়েছে, চলো তোমায় নিয়ে যাবো এক অন্য পৃথিবীতে, অন্য জীবনে।

এমন শীতল, কঠিন আদেশ আমি কখনো শুনিনি। ঘরের ভিতরটা ভরে যেতে লাগলো সেই তীব্র মধুর গন্ধে। দেওয়ালের ধার ঘেঁষা দলা দলা অন্ধকারের স্তূপের মতো গুলো নড়ে চড়ে উঠলো, গরগরে আওয়াজ ভেসে এলো কানে। মোমবাতি গুলো আচমকা দপদপ করে জ্বলে উঠলো। আমার হাত ধরে সে নিয়ে এল কুশাসনের কাছে, এক ঝটকায় খুলে দিল কোমরের লাল কাপড়ের টুকরোটা। হাঁটু গেড়ে বসে বাটির তরলটা ঢেলে দিল খুলিটার ওপরে, দুর্বোধ্য উচ্চারণে মন্ত্রপাঠ শুরু করলো। আমি টের পেলাম আমার ভিতরে সেই উত্তাপটা ফিরে আসছে, একটা উথালপাতাল শুরু হয়েছে ভিতরে। মন্ত্রপাঠ থামিয়ে সে হাত ধরে আমায় বসালো তাঁর কোলে। আমার মাথাটা ঘুরে গেল। কি আছে এই নগ্ন আসঙ্গ শরীরী ছোঁয়ায়? আমি যেন হালকা হয়ে যাচ্ছি, চারপাশটা বদলে যাচ্ছে, সেই গন্ধটা বিবশ করে দিচ্ছে আমায়। মুখের সামনে তুলে ধরলো মড়ার খুলিটা, গোলাপী জিভ দিয়ে চাটছে গায়ে লেগে থাকা তরলটা, তারপর সেই নীল চোখের সর্বনাশা চাহনিতে আমায় ইশারা করলো। আমি জিভ বার করলাম, ছোঁয়ালাম খুলিটায়। কি ভীষণ ঠান্ডা ওটা, অসহ্য দুর্গন্ধে গা গুলিয়ে বমি এল আমার, হাত থেকে পড়ে গেল খুলিটা ।

আমার নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিল ও, ওর মুখ আমার একদম সামনে, ওর নিশ্বাস পড়ছে আমার মুখে, কি অসম্ভব ঠান্ডা তা, আমার ভিতরের উত্তাপ আবার কমে আসছে। হঠাৎ বাইরে থেকে ঝড়ের মত কিছু আছড়ে পড়লো দরজায়, ছিটকে উঠে পড়লাম আমি, দরজাটা খুলে গেছে, মোমবাতি গুলো দপদপ

করছে, দেওয়ালের ধার ঘেঁষে পড়ে থাকা কালো স্তূপ গুলো থেকে গরগরানিটা বেড়ে উঠছে। দরজায় দাঁড়িয়ে তুলি, ওকে চেনা যাচ্ছেনা, ওর চোখে মুখে হিংস্র আক্রোষ, হাতে একটা কাটারি।

-রাক্ষসী তুই বিলুকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিবি ? এত ক্ষমতা তোর।

পাগলের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল তুলি ওর ওপর, সঙ্গে সঙ্গে ও টুঁটি টিপে ধরল তুলির, ছটফট করছে তুলি, একহাতে ওকে ছাড়াতে চাইছে আর অন্য হাতে কাটারিটা চালাচ্ছে কিন্তু ওর শরীরের নাগাল পাচ্ছে না, ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পড়ছে তুলি, কাটারিটা পড়ে গেল হাত থেকে ঝনঝন করে।

আমার হঠাৎ কি হলো জানিনা, ভিতর থেকে কে যেন বলে উঠলো তুলির ভয়ানক বিপদ, ওকে বাঁচাতে হবে যে কোন মূল্যে। মেঝেতে পড়ে থাকা লাল কাপড়টা কষে বেঁধে নিলাম কোমরে, হাতের কাছে পড়ে থাকা খুলিটা ছুঁড়ে মারলাম ওর মাথা লক্ষ্য করে। সাথে সাথে বিভৎস গর্জন করে ও ঘুরে দাঁড়ালো আমার দিকে। অসীম শক্তিতে একহাতে মেঝে থেকে তুলে ধরেছে তুলিকে। চোখের সামনে এখন ওর পানপাতার মত মুখটা পাল্টে যাচ্ছে, লাল ঠোঁটদুটো ফাঁক হয়ে একটা বিভৎস হাঁ করে গর্জে উঠল ও, সেই হাঁ মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে কিলবিলে কালো তেলতেলে সাপের মত কিছু।

আমি তক্ষুণি পায়ের সামনের দপদপ করতে থাকা মোমবাতিটা ছুঁড়ে মারলাম ওর গায়ে, সেটা গিয়ে পড়লো ওর এলানো চুলে, মুহূর্তে দাউদাউ করে জ্বলে উঠল ওর, খসে পড়তে লাগল মুখের মোমরঙা চামড়া, বেরিয়ে এলো কোঁচকান কালো চমড়া, হাড়হিম করা চিৎকারে সারা ঘরটা কেঁপে উঠল, ওর একটাও দাঁত নেই, অন্ধকার মুখগহ্বর থেকে কিলবিল করে বেরিয়ে আসছে অজস্র সাপের মত কিছু, আগুনের শিখায় পড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে, চুল গুলো পুড়ে যাচ্ছে ওর, শরীরটা ভেঙেচুরে যাচ্ছে।

রক্তজল করা আর্তনাদ করে তুলিকে ছেড়ে দিল। ও এখন প্রাণপণে লোলচর্মসার দুহাতে নিজের মুখ, মাথা, সারা শরীরকে আঁকড়ে ধরছে, ওর হাতে উঠে আসছে ওর নিজের চামড়া, কয়েক মুহূর্তের মধ্যে দেখলাম বিভৎস এক বৃদ্ধার আধপোড়া শরীর পড়ে আছে মেঝেতে, হাঁফাচ্ছে, সেই অবস্থাতেই বুকে ঘষটে ঘষটে এগিয়ে আসছে আমার দিকে, ঘড়ঘড়ে গলায় বলছে, "তোকে ছাড়ব না, তোর জীবন, তোর যৌবন আমার চাই। পালাতে দেবনা তোকে।"

আমি দৌড়ে গেলাম তুলির কাছে, জাপটে ধরলাম বুকে। তুলি হাঁফাচ্ছে, মারাত্মক কাশছে, ওর চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে। আমি আগে কখনো

তুলিকে কাঁদতে দেখিনি। আমার বুকটা টলমল করে উঠলো মায়ায়, আমার জন্য শুধু আমার জন্য তুলির এত কষ্ট।

- তুলি তুই ঠিক আছিস তো ? তুলি ?

-পালাতে হবে বিলু আমাদের পালাতে হবে।

ওদিকে তখন দেওয়ালের ধারের সেই কালো স্তূপ গুলো বুকে হেঁটে এগিয়ে এসেছে, ঘিরে ফেলছে ওকে। আগুনের আলোয় দেখা যাচ্ছে যা এতক্ষণ আমি অন্ধকারের স্তূপ মনে করেছিলাম তা আসলে কতগুলো জীবন্ত অতি বৃদ্ধ মানুষ। মাথায় কোনও চুল নেই, অস্থিচর্মসার শরীর, দাঁত নেই, লালা ঝরছে, গরগরে জান্তব আওয়াজে তারা হিসহিসিয়ে বলছে।

-অনন্ত যৌবনবতী হবি ? আঠারো বছরের কিশোরের জীবন যৌবন ছিনিয়ে নিয়ে ? আমাদের মত ওকেও চুষে খেতে পারলে তোর সে আশা হয়তো আরও কিছুদিনের জন্য পূরণ হতো, তারপর আবার কোন শিকার।

সরীসৃপের মত অবয়ব গুলো ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর, তারপর দাউদাউ করে জ্বলে উঠল, একসাথে।

আমি শক্ত করে তুলির হাতটা ধরলাম, "পালাতে হবে তুলি, আমাদের বাঁচতে হবে"। দৌড়ালাম বাইরের দিকে। পিছনে সারা ঘরটা জ্বলে উঠেছে।

-বাঁচবো তো শেষ অবধি আমরা ?

-ওই দিকে চল, দিঘী তে ঝাঁপ দিতে হবে ?

তুলির হ্যাঁচকা টানে বাঁ দিকে দৌড়ালাম, ওইতো সামনেই আমার সেই আজন্ম চেনা দিঘী। একটা ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের আওয়াজ কানে এলো আর সঙ্গে সঙ্গে একটা সজোর ঝটকায় ছিটকে পড়লাম দিঘীতে। শেষ মুহূর্তে তুলির হাতটা সজোরে আঁকড়ে ধরেছিলাম, শুধু এটুকুই মনে আছে।

চোখ মেলে দেখলাম দিঘীর পাড়ে আমি চিৎ হয়ে শুয়ে আছি। মুখের ওপর ঝুঁকে আছে তুলি। ওর চোখে চিন্তা, উৎকণ্ঠা, ভয়। ঠিক তখনই আমাদের মাথার ওপরে কুসুম রাঙা আকাশে টকটকে সোনালী লাল সূর্য উঠলো, অনেক পাখী কিচিরমিচির করে সেই আকাশে উড়ে গেল দিকশূণ্যপুরের দিকে, চারপাশের বুনো ঝোপঝাড়ে একসাথে কুঁড়ি ফুটে অনেক ফুল ফুটলো, সেই গন্ধে ভরে গেল চরাচর। আমি তুলির মুখটা নামিয়ে আনলাম আমার মুখের ওপর, চোখ বুজে খুঁজে নিলাম ওর ঠোঁট দুটো। পৃথিবী যেন থেমে গেল। কোথাও কোন শব্দ নেই। শুধু দুটো হৃদয়ের লাবডুব একসাথে বলে উঠলো... ভালবাসি, বড়ো ভালবাসি।

শাস্তি

বিদিশা মুখার্জি

কয়েকদিন থেকেই রাত্রে দমবন্ধ হয়ে আসছে প্রমিতার। এমনিতেই এই ভারী শরীর নিয়ে আজকাল হাঁটাচলা , শোওয়া-বসা সবটাই বড় কঠিন হচ্ছে তার পক্ষে। সামনের মাসে ডেলিভারি ডেট দিয়েছে ডাক্তার। তবে তার ধারণা এইমাসের শেষ পর্যন্তও টানতে পারবে না সে, তার আগেই তার স্বপ্নের পুতুল কোলে আসবে। ভাবতেই কেমন এক অপার মায়া ফুটে উঠলো চোখেমুখে প্রমিতার। কিন্তু তখনই যেনো কেউ জোরে গলাটা চেপে ধরলো ।দম বন্ধ হয়ে আসছে তার। বিছানায় আধশোয়া প্রমিতা উঠে বসলো। গোটা শরীর ঘামে ভেসে যাচ্ছে, একটু ধাতস্থ হয়ে পাশে রাখা জলের গ্লাসটা তুলে মুখে দিতেই কেমন গন্ধে গা-টা গুলিয়ে উঠলো। জলে কেমন যেন কাঁচারক্তের গন্ধ। এটা কি করে সম্ভব! কাঁচের তৈরি এই গ্লাস ঝকঝকে পরিস্কার। এতে গন্ধ হবে কেনো? তাহলে কি এই এলাকার জলটা এরকম বিটকেলে গন্ধের। কিন্তু গত দু'দিনে তো কিছু বোঝেনি। তাছাড়া তপেন তো গত দশমাস এখানে আছে , ওর কাছেও কখন কোনো কথা শোনেনি।

তপেন নিউ টাউনের এই ফ্ল্যাটে দশমাস আগেই এসেছে। ওদের অফিস থেকে সুসজ্জিত ফ্ল্যাটখানা বরাদ্দ হয়েছে ফ্যামিলি নিয়ে থাকবার জন্য। কিন্তু তখন ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারে বেশি জার্নি করবে না বলে,প্রমিতা ব্যারাকপুরে মায়ের কাছে ছিল। তারপর তো সেকেন্ড ওয়েভের জন্য কয়েকমাস লক্ ডাউনের ঝামেলায় আটকে রইলো মায়ের কাছে। কিন্তু তপেন সঙ্গে না থাকলে ডেলিভারির হ্যাপা পোহানোর মত কেউ নেই তার বাপের বাড়িতে।তাই এখানে এসেছে এই সপ্তাহের প্রথমদিকে।

প্রমিতা সারারাত এপাশ-ওপাশ করতে লাগলো। মাঝে একবার তপেনকে ডেকে বললোও যে তার শুলেই অস্বস্তি হচ্ছে, কেউ যেন ওর গলা চেপে ধরছে। শুনে তপেন কিছুক্ষণ হতভম্ব তাকিয়ে রইলো,তারপর 'ও তোমার মনের ভুল'- বলে বুকের কাছে প্রমিতাকে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে নিজেই ঘুমিয়ে পড়লো। প্রমিতা তপেনের কাছ থেকে সরে এসে বারান্দায় রাখা চেয়ারে

বসলো। খানিকটা তন্দ্রামত এসেওছিল,আবার যেন গলাটিপে ধরলে যে শ্বাসকষ্ট হয় সেরকম শুরু হলো। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো সে। কেউ নেই কোথাও কিন্তু এখনও গলার কাছে যেন ঠান্ডাস্পর্শটা লেগে আছে। অদ্ভুত একটা শিহরণ খেলে গেলো তার সর্ব্বাঙ্গে। এই বারান্দা থেকে নীচের পার্কটা দেখা যায়। রাস্তার আলোয় স্পষ্ট দেখলো প্রমিতা , একটা শিশু শুয়ে আছে ঘাসের উপর। আর সবথেকে যেটা ভয়ঙ্কর - শিশুটির চোখ তার দিকে স্থির নিবদ্ধ। একবার মনে হলো সে স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু চোখ কচলে ভালো করে দেখে একই দৃশ্য দেখতে পেলো ! এবার যেন শিশুটির মুখে এক ক্রুড় হাসি ফুটে উঠলো। এত ছোটো বাচ্চার মুখে এরকম হাসি হয় না। হাড়হিম করা দৃষ্টির সঙ্গে অমন হাসি প্রমিতার সমস্ত চেতনাকে বিবশ করে দিলো। গোঁ-গোঁ করতে করতে সে জ্ঞান হারালো। পরেরদিন সকালে যখন চোখ মেলে তাকালো ,তখন হসপিটালের বেডে শুয়ে। ডাক্তার তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। ডাক্তারের পিছনে মা আর তপেনের উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি চোখে পড়লো তার। উঠে বসতে যাচ্ছিলো সে,ডাক্তার তাকে নিরস্ত করলেন। বললেন, 'এখন কেমন আছেন মিসেস মৈত্র'? ঘাড় নেড়ে ভালো আছে এটা জানাতে,ডঃ সান্যাল বললেন, "কাল আপনার সি-সেকসন হবে। বাচ্চার পজিশন ঘুরে গেছে,এটা মা ও বাচ্চার জন্য বিপদজনক। তাই আমি এই স্টেজে আর কোনো রিস্ক নিতে চায় না।দরকার হলে কয়েকটা দিন ইনকিউবেটরে থাকবে বেবি। তবে মনে হয় না সেসবের দরকার হবে। চিন্তা করবেন না বেবি ইস পারফেক্টলি অলরাইট।"

ডাক্তার চলে গেলে মা আর তপেনও কিছুটা সময় তার কাছে ,বসে চিন্তাগ্রস্ত মুখে বেরিয়ে গেলো কেবিন থেকে। পুরো ফাঁকা কেবিনে প্রমিতার কেমন যেনো অস্বস্তি হচ্ছিলো। থেকে থেকেই বাচ্চাটির সেই হাড়হিম করা দৃষ্টি চোখের সামনে ভেসে উঠছিলো।কয়েকবারই ভয়ে চোখ বন্ধ করে রইলো প্রমিতা, কিন্তু তাও যেন স্বস্তি পেলো না। চোখ বন্ধ করলে কেউ যেন গলায় চেপে ধরছে,আবার চোখ খুললে সেই বীভৎস শিশুমুখ ক্রুড় হাসি আর নিথর চোখে চেয়ে আছে যেন তার দিকে। কেমন এক ঘোরের মধ্যে বাস করছে সে। অথচ উঠে পালাবার ক্ষমতাও যেন নেই। হঠাৎ প্রবল ঝাঁকুনিতে চোখ খুললো প্রমিতা। নার্স তাকে ডাকছে লাঞ্চ করার জন্য। বেডে উঠে বসলো প্রমিতা। হসপিটালের দেওয়া বরাদ্দ খাবার খেয়ে,খানিকটা যেন ঝরঝরে লাগলো তার। উঠে টয়লেটে গেলো। ডিউটিতে থাকা নার্স তাকে দরজা লক করতে বারণ করে দিলো। মুখেচোখে জল ছেটাতেই আঁতকে উঠলো প্রমিতা,জলটায় অসম্ভব কাঁচা রক্তের গন্ধ। যেন খানিকটা রক্ত কেউ তার মুখে ছুঁড়ে দিয়েছে। মুখতুলে

রক্তেমাখা নিজের মুখ আয়নায় দেখে চিৎকার করে জ্ঞান হারালো সে। দু'দিন পরে যখন জ্ঞান এলো,দেখলো সবার মুখ কেমন থমথমে,আর তার শরীরটা বড় হাল্কা। পেটের দিকে চোখ পড়তেই বুঝলো তার ডেলিভারি হয়ে গেছে। উঠে বসার অবস্থা নয়,তবু জিজ্ঞাসু চোখে সবার দিকে তাকাতে, নার্স জানালো তার একটি ছেলে হয়েছে। কিন্তু তাকে NICU-তে নেওয়া হয়েছে। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো প্রমিতা। নার্স জানালো প্রমিতা বাথরুমে পড়ে যাওয়ায় পেটে আঘাত লেগেছিল, আর তাতে ওয়াটার ব্রেকেজ হওয়াতে বাচ্চাকে বের করে নিতে হয় তাদের। এখন কিছুদিন ওরা বাচ্চাকে ইন্টেনসিভ কেয়ারে রাখবে। শুনে কান্নায় ভেঙে পড়ে প্রমিতা। তপেন তার হাতটা ধরে বসে থাকে। দু'একটা দিন গেলে ধীরে-ধীরে তপেনকে সব জানাই সে। তপেনের আচরণে অদ্ভুত এক উচাটন লক্ষ্য হয় প্রমিতার। কিন্তু এই অবস্থায় সেসব নিয়ে মাথা ঘামাতে পারে না।

ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠায় হসপিটাল থেকে রিলিজ করে দেওয়া হয় তাকে। রিলিজের পর বাচ্চাকে দেখতে নিয়ে যাওয়া হয় NICU-তে। অতটুকু শিশুর ছোট্টোহাতে চ্যানেল করা,খোলা টেবিলের উপর যন্ত্রপাতির সঙ্গে বেঁধে থাকা-এসব বড় করুণ দৃশ্য। নিজের সন্তানকে ঐ অসহায় অবস্থায় দেখে মায়ের মনের যে অবস্থা হয় তা শুধু যিনি 'মা'-এর মন সৃষ্টি করেছেন তিনিই বোঝেন। বাচ্চাকে দেখে প্রমিতা চোখের জলে ভেসে গেলো। ডিউটিতে থাকা নার্স জোর করে যখন তাকে সরিয়ে আনছিল পিছনে ফিরে তাকিয়ে দমবন্ধ হয়ে এলো প্রমিতার। তার ছেলের মুখে এ কেমন হাসি,চোখটাও প্রমিতার দিকে। এ কি তার চোখের ভুল?

বাড়িতে ফিরে প্রমিতা দু'চোখের পাতা এক করতে পারলো না,যদিও ডাক্তার তাকে বিশ্রাম নিতে বলেছে। ঘুমের ওষুধ গুলোও তেমন কাজ করছে না। পরেরদিন সকালের জন্য যেন অনন্ত প্রতীক্ষা। আজকে আর তাকে হসপিটালে অ্যালাও করবে না,নইলে সে দৌড়ে যেত ছেলের কাছে। নিজের চোখের ভুল কিনা প্রত্যক্ষ প্রমাণ নিয়ে আসত। অলস সময় গড়িয়ে গড়িয়ে রাতের পথে হাঁটতে লাগলো। প্রমিতা নিজের ঘরে একা শুচ্ছে,তপেন পাশের রুমে আর মা ডাইনিং-এ। তখন রাত বারোটা ,মনে হলো বাইরে কচিগলার কান্না শোনা যাচ্ছে। প্রমিতা ঘুমের ওষুধ খেয়েছে ,তন্দ্রাচ্ছন্ন হলেও তার কানে আওয়াজ ভেসে আসছে। কেউ যেন করুণ আর্তির সঙ্গে কেঁদে কেঁদে বলছে, "আমাকে ছেড়ে দিন বাবু, আপনারা। আমি ন'মাসের পোয়াতি। আমাকে এভাবে নষ্ট করবেন না। পেটের দায়ে রান্নার কাজ করতে এসেছি, কিন্তু তাবলে আপনাদের খিদে মেটাতে পারবো না।"

কথাগুলো যেন পাশের রুম থেকে ভেসে আসছে। তন্দ্রা ছুটে গেলো প্রমিতার। শ্লথপায়ে পাশের রুমে পৌঁছে আলতো হাতে দরজা খুললো,তপেন নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। কোথাও কেউ নেই। কিন্তু প্রমিতা এইঘর থেকে শব্দটা পেয়েছে নিশ্চিত। ধীরে ধীরে নিজের ঘরের ব্যালকনিতে ফিরে এসে বসলো সে। তার এরকম পাগল অবস্থা কেনো,কি হচ্ছে তার সঙ্গে? এর একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে।

তখনকার মত বিছানায় ফিরে এলো সে। হঠাৎ বাইরের পার্কের দিকে চোখ পড়তে, দেখলো একটি গর্ভবতী মহিলা তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই কি তাহলে একটু আগে... আর ভাবতে পারে না প্রমিতা। কোনোরকমে বিছানায় এলিয়ে পড়ে। সকালে জলের ঝাপটানিতে চোখ খুলে মা আর কাজের মেয়েটিকে দেখতে পায়। মা জানায় তপেন ডাক্তার ডাকতে গেছে,সারারাত নাকি প্রমিতা ঘুমের ঘোরে এঘর ও ঘর করেছে। শুনে ডুকরে কেঁদে ফেলে প্রমিতা। মা'কে সব বলে। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কাজের মেয়েটি হঠাৎ ফিসফিসিয়ে বলে ওঠে, "পাপ কখনও চাপা থাকে না"

বলেই আতঙ্কিত হয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। প্রমিতা আর তার মা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে তার চলে যাওয়ার দিকে। খানিকটা পরে মাও প্রমিতার জন্য ব্রেকফাস্ট আনতে উঠে গেলেন। প্রমিতা ওয়াশরুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে আবার বিছানায় এসে এলিয়ে পড়লো। কানে কাজের মেয়েটার কথা বারবার বাজছে। অর্থটা বড় ঝাপসা ,তবু কিছু যেন বুঝতে পারছে সে। তপেন ডঃ পালকে নিয়ে ফিরে এলো। ডডাক্তার, প্রমিতাকে চেকঅআপ করে তেমন কিছুই পেলেন না।শুধু জানালেন কড়াডোজের ঘুমের ওষুধ থেকে হয়তো প্রমিতা এরকম অস্বাভাবিক আচরণ করছে। তারপর তিনি বেরিয়ে গেলেন। তপেন তাঁকে ছেড়ে হসপিটালে গেলো ছেলের খবর নিতে। মা ও নিজের রান্নায় ব্যস্ত। কাজের মেয়েটি প্রমিতার রুম সাফ করছিল। প্রমিতা তাকে ডেকে বললো, 'তুমি তখন কি বলছিলে?' মেয়েটি বললো, 'কই কিছু না তো।'

'আমি তোমার কথাটা শুনেছি। দ্যাখো, তুমি যদি আমাকে খুলে বলো তাহলে আমার সন্তানকে আমি হয়ত বাঁচাতে পারি। মনে হচ্ছে বাচ্চাটা কোনো অশুভ শক্তির প্রভাবে আছে।' মেয়েটির চোখে এক অদ্ভুত দৃষ্টি ফুটে উঠলো। দেখলেই বোঝা যায়, সে কিছু বলতে চায় কিন্তু ভয় পাচ্ছে বলতে। প্রমিতা তাকে অভয় দেয়। তখন মেয়েটি সাহস করে সত্য তুলে ধরে তার সামনে।

গত মার্চে একদিন সন্ধ্যেতে তপেন ও তার চারবন্ধু এই ফ্ল্যাটে পার্টি করছিল,

তাদের খানা পিনার ব্যবস্থা করেছিল যে মেয়েটি সে তখন সন্তানসম্ভবা। তপেনের মদ্যপ বন্ধুরা হঠাৎ মেয়েটিকে জবরদস্তি শুরু করে। তপেন বন্ধুদের সঙ্গ যদিও দেয়নি কিন্তু তাদের নিবৃত্তও করেনি। চারটে অমানুষের অত্যাচারে বাচ্চাটি নষ্ট হয়ে যায় আর মেয়েটি নিজেকে শেষ করে দেয়।

স্তম্ভিত প্রমিতা চোখ তুলে চেয়ে দ্যাখে মা আর তপেন দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। তপেনকে কিছু বলার মত ভাষা খুঁজে পায়না সে। ঘৃণায় সর্বাঙ্গ কুঁকড়ে যাচ্ছে। প্রমিতা মাকে নিয়ে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। তপেনের থেকে দূরে না গেলে তার সন্তানকে যে সে আর ফিরে পাবে না সেটা নিশ্চিত। হসপিটালের রিসেপসনে পৌঁছে ছেলের কথা জিজ্ঞেস করতে তারা পিডিয়াট্রিসিয়ানের কাছে পাঠিয়ে দিলো। পিডিয়াট্রিসিয়ানের রুমে ঢুকতে ভদ্রলোক পরম কুণ্ঠায় উঠে এসে ধরে বসালেন প্রমিতাকে। প্রমিতা আশ্চর্য হয়ে তাকিয়েছিল তাঁর দিকে,উনি সেই দৃষ্টির সামনে অসহায় হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ সময় নিলেন নিষ্ঠুর সত্যি প্রকাশ করতে। যে ভয়াবহ পরিণতির কথা প্রমিতা অবচেতনে ভেবেছিল সেটাই সত্যি হলো। তার সন্তান মায়ের কোলে আর ফিরবে না কোনদিন। শেষবারের মত সন্তানকে দেখতে চাইলে নার্স তাদেরকে নিয়ে গেলো মর্গে, সেখানে ছোট্টো শরীরটাকে ঢেকে রাখা হয়েছে ট্রান্সপারেন্ট প্লাস্টিক দিয়ে। প্রমিতা বাচ্চার হাড়হিম করা নিথর চোখ দেখে কান্নায় ভেঙে পড়লো। তাকে বাইরে নিয়ে এসে বসানো হলো। কিছু পরে একটা কাগজে সই করিয়ে নিয়ে গেলো হসপিটালের এক স্টাফ, যাতে লেখা ছিলো বাচ্চাটিকে হসপিটালের নিজস্ব জমিতে কবর দেওয়া হবে তার অনুমোদনে। অন্যের ভুলের মাশুল গুণতে হলো প্রমিতাকে আজ। বিবশ হয়ে গেছে সে। ব্যারাকপুরে মায়ের বাড়িতে ফিরে যাওয়ায় এখন একমাত্র পথ তার।

দিনদুই পরে রাত্রি বারোটায় তার মোবাইল বেজে উঠলো, তপেনের ফোন। ঘৃণায় ফোনটা কেটে দিলো প্রমিতা। তার সন্তানের মৃত্যুর জন্য দায়ী লোকটার এত সাহস দেখে সে স্তম্ভিত। বেশ কয়েকবার ফোনটা যখন বেজে উঠলো বাধ্য হয়ে সুইচ অফ করে দিলো সে। সারারাত এপাশ-ওপাশ করে ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল। মায়ের চিৎকারে ঘুম ভেঙ্গে গেলো। মা কাঁদতে কাঁদতে জানালেন, কাল দুপুরে কে যেন তপেনকে শ্বাসরোধ করে মেরেছে। তার মুখের উপর বালিশ চাপা ছিলো কিন্তু কোনো ফিঙ্গারপ্রিন্ট কোথাও পাওয়া যায়নি। খবরটা আকস্মিক হলেও বড় তৃপ্তিদায়ক মনে হলো প্রমিতার। শুধু বুঝতে পারলো না দুপুরে মৃত ব্যক্তির ফোনটা রাত বারোটায় তার কাছে কিভাবে এলো! এ'কদিনের কালোছায়া সরে গিয়ে যেন সকালটা বড় নির্মল আজ।

ভূত যখন বন্ধু

বিজ্ঞান বন্ধু ভট্টাচার্য ভট্টাচার্য্য

সালটা সম্ভবত ১৯৮৯ অথবা ৯০। বীরভূম জেলায় গেছি কোনও একটা ভি.আই. পি ডিউটিতে। আমি তখন রাজ্য তৃতীয় সশস্ত্র আরক্ষা বাহিনীর তাজা জাওয়ান। আহমেদেপুর থানায় আছি। একদিন দুপুরে খবর এলো এই থানারই কোনও একটা গ্রামে গলায়দড়ি দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। বড়বাবুর আদেশে একজন দারোগাবাবুর সাথে বেড়িয়ে পরলাম ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে। থানার গাড়িতে বেশ কয়েক কিলোমিটার যাওয়ার পর কুতুবপুর বলে একটা গ্রামের শেষ প্রান্তে কয়েক একর জুড়ে সদ্যকাটা ফাঁকা ধানি জমির পাশের রাস্তায় গাড়িটা দাঁড়ালো। নেমে দেখলাম, চারিদিকে শুধু ধু-ধু প্রান্তর। কোথাও কিছু চোখে পড়ছে না। শুধু আধমাইল দূরে একটা বড় গাছের আবছা ছায়া চোখে পড়ছে। কিছুক্ষনের মধ্যেই সেখানে এসে পৌঁছল স্থানীয় চৌকিদার মুকুন্দ, তার কাছেই জানা গেলো ঘটনা টা ঘটেছে বহু দুরের ঐ গাছটাতেই। অতয়েব এবার পদব্রজে।

প্রায় মিনিট কুড়ি-পঁচিশ ওই এবরো-খেবরো জমি গুলোর উপর আল পথের চড়াই-উৎরাই পেড়িয়ে এসে পৌঁছলাম সেই বড় গাছটার কাছে। এটা একটা বকুল ফুলের গাছ। যাকে স্থানীয় ভাষায় বলে ঘুর্ণী ফলের গাছ। লম্বায় প্রায় কুড়ি ফুটের কাছাকাছি। শাখা-প্রশাখায় বিস্মৃত গাছটা অনেকটা বড় ছাতার মতো অবস্থান করছে। তারই নীচের দিকের একটা ডালে গলায় দড়িদিয়ে ঝুলছে সাদা পায়জামা ও ধুসর রঙের ফুলহাতা জামা পরিহিত আনুমানিক পঁয়ত্রিশোর্ধ একজন যুবক। চোখগুলো ঠিকরে বেড়িয়ে এসেছে সামনের দিকে। জিভটাও বেড়িয়ে আছে অনেকটা, আচ্ছা মানুষের কি এত বড় জিভ হয়? পা দুটো ঝুলছে জমি থেকে ফুট দুই-তিনেক উপরে। ভালোভাবে পর্যবেক্ষন করে আন্দাজ করা গেলো, বডিটা ওই ভাবে রয়েছে প্রায় ঘণ্টা ছয়-সাতেক।

এবার ওই বডিটাকে নামাতে হবে, সুরতহাল করতে হবে, আলামত নিতে হবে, সাক্ষীসাবুদও যোগার করতে হবে। তাই দারোগাবাবু তখন বাধ্য হয়ে আমাদের দু'জন কে ওইখানেই থাকতে বলে নিজেই চললেন কাছাকাছি গ্রামটায় লোকজন যোগার করতে। সূর্য তখন পশ্চিমগামী।

মৃতদেহ থেকে হাত কয়েক দূরে দাঁড়িয়ে আছি দু'জন। মুকুন্দ উসখুস করছে। ওকে ওই ভাবে দেখে জিজ্ঞাসা করায় বললো, "ছার,দারোগাবাবু তো গাড়ি-ঘোরা কিছুই আনবেন নি, মরাটা লিয়ে যাবো কি করি ? এট্টা কিচু তো লাগবিই। এছাড়া এট্টু আলোর ব্যবস্থাও তো করতি হবে নাকি !" বুঝলাম পালাতে চাইছে। কিন্তু দারোগাবাবুর হুকুমে আমাকে একা ফেলেরেখে যেতেও পারছে না। "ভয় পাচ্ছ নাকি !" – আমার প্রশ্নে লজ্জা পেলেও স্বীকার করে নিল সহজ সত্যটা। বললো – এই তল্লাটে নাকি "তেনাদের" মানে ভুত-জিনের উপদ্রব আছে খুব। তাই রাত হয়ে গেলে ওই মরা নিয়ে যাবার মতো কিছুই পাওয়া যাবে না, তা ছাড়া লোকজন থাকলে ও সাহস পাবে কিছুটা। অতএব এইবার ওকে ছাড়তেই হচ্ছে। কিছুটা দ্বিধায় ছিলাম, কিন্তু পরিস্থিতি যা,মুকুন্দু আজ এইগুলো যোগার করতে না পারলে রাতভর ওই মরা পাহারা দিতে হবে। বিদায় নেওয়ার আগে অনেকরকম সাবধান বাণী ও পরামর্শ দিয়ে মুকুন্দ প্রায় ঝড়ের বেগে প্রস্থান করলো, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আঁধার নামলো।

সে এক অদ্ভুৎ পরিস্থিতি। একে ঘোর অমাবস্যার রাত, ঘুটঘুটে অন্ধকার,তায় জনপ্রাণীহীন ধু-ধু প্রান্তর। সদ্যফোটা আকাশের তারাগুলোর আবছা আলো-আঁধারিতে একটা আপাত অস্বচ্ছ বাতাবরণ তৈরী করেছে সমগ্র অঞ্চল জুড়ে। ঝুলন্ত মরাটার একটা কালো অবয়ব শুধু দেখতে পাচ্ছি দূর থেকে। হঠাৎ -- "হু-ক্কা – হুয়া" চিৎকারে চমকে উঠলাম। গোটা অঞ্চলটা বিভিন্ন দিক থেকে হরেক রকম গলায় শিয়ালের ডাক ভেসে আসছে। ক্রমশঃ সেই চিৎকার জোরালো হতে লাগলো। বুঝলাম তেনারা আসছেন। ইতিমধ্যে বেশ কিছু পাখী ফিরে এসেছে এই গাছে তাদের নিজস্ব আশ্রয়ে। অতবড় গাছটার শাখাপ্রশাখার ফাঁক দিয়ে দু-চারটে জ্বলন্ত চোখও দেখতে পাচ্ছি। ভূত কি ? একটু ভালো করে ঠাওর করে বুঝতে পারলাম সেগুলো সব পেঁচা। এইবার চতুস্পদের ছায়া মুর্তী গুলো স্পষ্ট হতে লাগলো। ওরা মরার গন্ধ পেয়ে গেছে। আমার কাছে সম্বল বলতে একটা মোটা বেতের লাঠি। ধুমপানের নেশা নেই তাই পকেটে আলোর ব্যবস্থাও নেই কিছু। শিয়ালগুলো এক একটা দলে বিভক্ত। প্রত্যেক দলের সংখ্যা যা দেখছি তাতে যে কোনও একটা দল আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে আমি নিশ্চিত ভাবে মারা পড়ব। কিন্তু অদ্ভুৎ ভাবে ওদের নিশানায় কেবল মাত্র ওই মৃতদেহটি। যার পা দুটো যেখানে ঝুলছে ওরা সেখানে একবার পৌঁছতে পারলে মুহুর্তে খুবলে খেয়ে নেবে অর্ধেকটাই। মনে সাহস এনে মৃতদেহের খুব কাছে চলে এলাম। পচন সুরু হয়ে গেছে, দুর্গন্ধে টেকা দায়। তার চেও বেশী দায়,প্রাণের বা চাকরির। দু-একটা নেতা গোছের শেয়াল তো দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে

কাছে চলে আসার চেষ্টা করছে, আমিও প্রাণপনে "হ্যাট হ্যাট" করে সমানে লাঠি ঘুরিয়ে চলেছি। ভূত-প্রেত তো দুরের কথা, ওই ঝুলে থাকা মৃতদেহটাকেই তখন আমার পরম আত্মীয় বলে মনে হচ্ছে। এই ভাবে কতক্ষন ধরে যুদ্ধ চলছে জানি না, হঠাৎ বহু দূরে একটা আলোর বিন্দু চোখে পড়লো, সেটা আস্তে আস্তে বড় হতে থাকায় বুঝলাম, মুকুন্দ বা দারোগাবাবুর মধ্যে কেউ একজন আসছে। খানিক বাদে গরুর গলায় পরানো টুং-টাং আওয়াজে বুঝলাম একটা গরুরগাড়ি অবশেষে যোগার হয়েছে। এবার খানিক ভরসা পেলাম।

মুকুন্দ এসেছে একটা হ্যাজাক আর জনা তিনেক লোক নিয়ে গরুরগাড়ি করে। গাছটার কাছাকাছি আসতেই শিয়ালগুলো ভয়ে পিছিয়ে গেলো। আর আমিও চলে এলাম ওদের কাছে। গরুর গাড়ি থেকে নেমে ওরাও দ্রুত চলে এলো আমার কাছে। আমাকে এমন ভাবে দেখছে যেন ভূত দেখার মতো। গাড়োয়ান তো আমার গা হাত পা ছুঁয়ে দেখতে লাগলো আমি বেঁচে আছি কি না। মুকুন্দ এবার হাউ হাউ করে কান্না জুড়লো, ওর জড়ানো গলার কথা শুনে বুঝলাম আমাকে একলা ফেলে রেখে চলে যাওয়ার জন্য ও অনুতপ্ত, যে কারণে অপরাধ বোধে ভুগছে। ভয় পাচ্ছে, আমি এই কথা দারোগাবাবু কে বলে দিলে ওর চাকরিটা থাকবে না। মাথায় হাত বুলিয়ে আশ্বস্থ করলাম ওকে। বাকি তিনজনের মুখ থেকে চুল্লুর গন্ধ ম ম করছে। ওদের দিকে তাকাতেই মুকুন্দ বলে উঠলো, "ওদের মদ না খাওয়ালি এখানে আনতি পারতেম না ছার", মেনে নিলাম, কারণ ওদের দিয়েই ওই মৃতদেহ নামানোর এবং বহন করার কাজটা করতে হবে।

এই সমস্ত কথা চলতে চলতেই দারোগাবাবু এসে গেলেন ওই মৃতদেহের বাড়ির লোক'জন সহ কয়েকজন স্বাক্ষীকে সঙ্গী করে। সঙ্গে করে একটা খাটিয়াও এনেছেন। এখানে এসে গরুর গাড়ি-হ্যাজাক সহ মানুষগুলো কে দেখে খুশি হয়ে মুকুন্দকে ধন্যবাদ জানালেন। তারপর কি মনে হওয়ায় হঠাৎ করেই প্রশ্ন করলেন, "কিরে ? এইসব কখন কিভাবে যোগার করলি ?" --- চুপ করে রইলো মুকুন্দ। তখন আমি বাধ্য হয়েই বললাম গোটা বৃত্তান্ত টা। এইবার কিন্তু দারোগাবাবু রেগে গিয়ে মুকুন্দকে যাচ্ছেতাই বলতে শুরু করে দিলেন। "আমিই ওকে এই গুলো যোগার করতে পাঠিয়ে ছিলাম স্যার", চোখ গেলো আমার উপর, আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললেন, "ধন্যি সাহস তোমার, এই অন্ধকারে, এই নির্জন প্রান্তরে একা একা মরা পাহারা দেওয়া ! ভাবতেই পারছি না। এই অবস্থায় আমি কেন যে কেউ থাকলে তাকে সুস্থ ভাবে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যেত কিনা সন্দেহ। ভয় পাওনি তুমি ? খুব অন্যায় করেছ ওকে

ছেড়ে দিয়ে"। আমি হেসে বললাম, "স্যার এমনিতে ভূতের ভয়-টয় আমার নেই। ভয় যেটুকু হচ্ছিলো তা ওই দূরে বসে থাকা শিয়াল গুলোকে নিয়ে"। দারোগা বাবু বললেন, "ওগুলো তোমাকেও তো আক্রমন করতে পারত !" -- আমি বললাম, "সে সম্ভাবনা হয়ত ছিলো, কিন্তু অদ্ভুত ভাবে ওদের নিশানায় ছিলো শুধু ওই মৃতদেহটা। আমাকে যে ভয় দেখায়নি তা নয়, তবে আমার এই লাঠিটাই ওদের ঠেকিয়ে রাখার পক্ষে যথেষ্ট ছিলো"। দারোগাবাবু আরেকবার ধন্যবাদ জানালেন।

এরপর মৃতদেহ নামানো হলে আলামত যোগার করার পরে গরুর গাড়ি করে মুকুন্দ কে দিয়ে পাঠানো হলো মর্গে, আমরা থানায় ফিরে এলাম, ঘটনাটা জানাজানি হওয়ার পর সহকর্মীরা একটু অন্য চোখে দেখতে লাগলো, আর ফলে যেটা হলো, এরপর থেকে অনেক বড় বড় ঘটনায় ডাক পড়তে লাগলো আমার। সে গল্প পরে।

মেরীর প্রেত

দিব্যেন্দু ঘোষ

তোর বাবা মরতে আর বাড়ি করার জায়গা পায়নি! এমন ধু ধু মাঠ, চারদিকে জলা জমি, ব্যাঙের ডাক, একটু বৃষ্টিতেই প্যাচপেচে কাদা, মৌমাছির মতো ইয়াব্বড় মশার কামড়, ট্রেন ছুটলেই দুদ্দাড় কাঁপুনি, এই মনে হবে ছাদ যেন দড়াম করে ঠিক মাথার ওপর ভেঙে পড়ল বলে! মেরী বিশ্বাসের রোজের প্যানর প্যানর। বিগত পঁচিশ বছর ধরে একই যাতনা। নাহ্, তিনি স্বামীকে কিচ্ছুটি বলবেন না। সব অভিযোগ মেয়ে আষাঢ়ীর কাছে। নামও রেখেছেন বটে মেয়ের। যে-মাসের সঙ্গে চিরশত্রুতা, দুচক্ষে দেখতে পারেন না, সেই মাসের নামের সঙ্গে মিলিয়ে মেয়ের নাম রেখেছেন। শাশুড়ি অ্যানি বিশ্বাস কতবার যে কারণ জিজ্ঞেস করেছেন, তার কোনও উত্তর নেই।

আপনি থামুন তো মাদার। নিজের কাজ করুন। ইচ্ছে হয়েছে, নাম রেখেছি। আপনার ফাদারের কী? দোর্দণ্ডপ্রতাপ বউমার ক্যাটকেটে গা-জ্বালানো কথা শুনলেই নেতিয়ে পড়েন অ্যানি। অথচ মেয়ে ঠাকুমার কাছে গল্প শুনতে বসলেই সেই একই রেকর্ড চালিয়ে দেয় মেরী। মেয়ে তো ভূতের গল্প ছাড়া শুনতেই চায় না। তবে মেরী বিশ্বাসের অভিযোগ নেহাত চুটকি মেরে উড়িয়ে দিলে চলবে না। অ্যান্টনি বিশ্বাস হয় জলের দরে জমি পেয়ে পেল্লায় বাড়ি হাঁকিয়েছেন। কিন্তু এই পঁচিশ বছরে আশপাশে একটা জমিও কেউ কিনল না কেন? বাড়ি করা তো দূরঅস্ত।

বিকেল থেকেই সিপাহি বিদ্রোহের মতো মর্ত্যের বিরুদ্ধে আস্ফালন করে চলেছেন দেবরাজ ইন্দ্র। কত রকমের যে আওয়াজ। আকাশ ডাকছে নাকি ভূতেরা জলসা করছে, বোঝার উপায় নেই। ঝুপ করে সন্ধে নামতেই কড়... কড়...কড়াত্। বাজ পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই অনেকটা দূরে স্টেশনের কাছে কানফাটানো আওয়াজে ট্রান্সফর্মার ব্লাস্ট করল। শোবার ঘরের টিউবটা ফেটে চৌচির হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। সিলিং ফ্যানটা ছিঁড়ে পড়ল মাটিতে। বিছানার ওপর তীব্র চিৎকার করে ঠাকুমাকে জড়িয়ে ধরল আষাঢ়ী। ঠিক তখনই বারান্দার দিকের খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে এল দুটো চোখ। কালচে লাল। ঠিক যেন

আগুনের গোলা। কিচ্ছু নেই, শুধু দুটো জ্বলন্ত চোখ। ওদের দিকেই এগিয়ে আসছে। জ্ঞান হারালেন অ্যানি। আষাটীর চোখ বিস্ফারিত। চোখ দুটো তীরবেগে এসে ঢুকে গেল আষাঢ়ীর চোখে।

মা..আ আ... আষাঢ়ীর গলা হাইস্কেলে উঠতে গিয়েও পারল না। নেতিয়ে পড়ল বিছানায়। ঠিক সেই সময় রান্নাঘরে কেউ যদি মেরীকে দেখত, তা হলে সেখানেই হার্ট ফেল করত নির্ঘাত। ফ্রিজ থেকে মাছ-মাংসের ট্রে বের করা। কাঁচা মাছ-মাংস দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে মেরী। উস্কোখুস্কো চুল, ভাটার মতো চোখ, সেখানে মাংসের বিন্দুমাত্র অস্তিত্ব নেই। শুধু দুটো গভীর গর্ত। মেঝেতে লুটোচ্ছে আঁচল।

মাত্র কয়েক সেকেন্ড। কোথা দিয়ে যে কী হয়ে গেল! অথচ বিকেল আর সন্ধের সন্ধিস্থলে ঠাকুমা আর নাতনির গল্পের আসর বেশ জমে উঠেছিল। ভূত চতুর্দশীর কথা বলতে গিয়ে যমের কথাই বলছিলেন। "কেউ কেউ এই কার্তিকী চতুর্দশীকে যম চতুর্দশীও বলেন। এই তিথিতে চোদ্দটি প্রদীপ আসলে উৎসর্গ করা হয় মৃত্যুলোকের অধিপতি যমের উদ্দেশেই। সেই আলো দেখে যম বুঝতে পারেন, কোন বংশ পূর্বপুরুষদের বিস্মৃত হয়নি। সেইমতো তিনি ওই বংশের পূর্বপুরুষদের এই একটি দিনের জন্য প্রিয়জনদের কাছে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেন"। এভাবে আলগা গাঁথুনিতে এক গল্পের সঙ্গে অন্য গল্পকে নানা নামে বাঁধতে থাকে এই কার্তিক মাসের চতুর্দশী।

অ্যানি বলছিলেন, "নরক ছিলেন প্রাগজ্যোতিষপুরের রাজা। তাঁর অত্যাচারে পৃথিবী ত্রস্ত হয়ে ওঠে। স্বর্গলোক আক্রমণ করে নরক হরণ করেন পারিজাত বৃক্ষ এবং ইন্দ্রের মাতা অদিতির কানের দুলও। তখন দেবরাজ ইন্দ্র উপায় না দেখে আসেন দ্বারকায়। শরণ নেন কৃষ্ণের। অতঃপর কৃষ্ণ রওনা দেন নরকবধের উদ্দেশ্যে। একা নন, সঙ্গে নেন প্রিয়তমা পত্নী সত্যভামাকেও। তবে, যুদ্ধে কিছু বেগ পেতে হয় কৃষ্ণের মতো অপ্রতিরোধ্য যোদ্ধাকেও। একসময় নরকের অস্ত্রের আঘাতে তিনি সাময়িকভাবে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। সেই সময় যুদ্ধ পরিচালনা করেন সত্যভামা"।

ঠাম্মা, তারপর? "জ্ঞান ফিরে পেয়ে নরককে বধ করেন কৃষ্ণ। তাঁর আঘাত এবং বিজয় লাভের সংবাদ যখন পৌঁছয় দ্বারকায়, তখন যাদবরা প্রদীপ জ্বালিয়ে সারা নগর আলোকিত করে। কৃষ্ণের জয় ও কুশল উদযাপনে। সেই থেকে যে দিনটিতে নরককে বধ করেছিলেন কৃষ্ণ, সেই কার্তিক মাসের চতুর্দশী বা নরক চতুর্দশীতে দীপদানের প্রথা শুরু হয়"।

"যম, নরক এরা কেউই ভাল নয়, বলো ঠাম্মা!"

অ্যানি বলতে থাকেন, "নরক শব্দটিকে যমলোকের সঙ্গে এক করেও দেখা যেতে পারে! চতুর্দশীর চোদ্দটি প্রদীপের আলো সাময়িকভাবে হলেও নরকবাস থেকে মুক্তি দেয় পূর্বপুরুষদের! তাই ভূত চতুর্দশীকে অনেকে নরক চতুর্দশী বলেও"!

নরকের গল্পই যে অ্যান্টনি বিশ্বাসের বাড়িকে নিমেষে নরক করে দেবে, কে জানত! অথচ এর বিন্দুবিসর্গও জানতে পারছে না অ্যান্টনি। ঘোর কালো মিশমিশে অন্ধকার একটু একটু চিরে দিয়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে আসতে থাকে সে। বাড়ির খুব কাছে আসতেই নাকে এসে লাগল বীভৎস এক গন্ধ। পচা মাংসের তীব্র কটু গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে। রুমার বের করে নাক চেপে ধরতেই অ্যান্টনি অনুভব করল গা-শিউরে-ওঠা বরফশীতল শিরশিরে হাওয়া যেন হাত বুলিয়ে দিচ্ছে তার সারা শরীরে।

বাড়ির দরজা-জানলাগুলো ক্যাচ ক্যাচ শব্দ করে একবার খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে। ফ্যাকাশে হয়ে ওঠা অ্যান্টনি বাড়ির সদর দরজার দিকে তাকিয়ে দেখে, ঘন কুচকুচে কালো এক অন্ধকার আস্তে আস্তে বিশাল এক কিম্ভূত, কদাকার শরীরের আকৃতি ধরছে। সেই বীভৎস আকৃতির ভেতর এক ভয়ঙ্কর দানবীয় মুখ বসানো আর তার মাঝে মাঝে আগুনের গোলার মতো একজোড়া বিশাল চোখ। কালো সেই অন্ধকারটি ফুলে ফেঁপে যেন আরও বড় হয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে অ্যান্টনির দিকে। সেই জ্বলন্ত ভাটির মতো চোখ দুটি অ্যান্টনির চোখের ওপর এমনভাবে নিবদ্ধ, যেন একজোড়া চুম্বক। দৈত্যাকৃতি অজগর যেমন তার শিকারকে এক অমোঘ আকর্ষণে বিবশ করে ফেলে, তেমনি করে আতঙ্কে অবশ হয়ে আসা অ্যান্টনিকে সেই অশরীরী অন্ধকার যেন এগিয়ে এসে তার শরীরের মাঝে সবলে গ্রাস করে নিচ্ছে।

ঘোর কাটিয়ে ঝটকা দিয়ে উঠেই চিৎকার করে ওঠে অ্যান্টনি, "মেরী, তুমি কোথায়? মা, আষাঢ়ী, তোমরা কোথায়? কী হচ্ছে এ সব?" পাগলের মতো চিৎকার করতে থাকে অ্যান্টনি। কিন্তু সেই অশরীরী বস্তুটি যেন তার পিঠের ওপর চেপে বসতে চাইছে। ক্রমশ যেন ভারে নুয়ে পড়ছে শরীর। গলা বন্ধ হয়ে আসছে অ্যান্টনির। ছুটে পালাতে পারছে না। কে যেন তার পা দুটো মাটির সঙ্গে গেঁথে দিয়েছে। হঠাৎই সেই অন্ধকার বস্তুটি পিঠের ওপর থেকে নেমে পড়ল। তারপর অত্যন্ত দ্রুত গতিতে অ্যান্টনির চারপাশে ঘুরে ঘুরে আষ্টেপৃষ্টে তাকে বেঁধে ফেলতে লাগল। সেই অদৃশ্য চাপে অ্যান্টনির মনে হচ্ছে, তার সারা শরীরের হাড়গোড় যেন ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে

আসছে, মনে হচ্ছে, বাঁচার বুঝি আর কোনও আশা নেই। ঠিক তখনই ফের ট্রান্সফর্মার ব্লাস্ট করার আওয়াজ। কড়...কড়...কড়াত্ আওয়াজ। তীব্র আলোর ঝলকানি এসে পড়ল তার বাড়ির মাথায়। দাউদাউ করে জ্বলে উঠল বাড়িটা। সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা যেন হালকা হয়ে এল। অনেক কষ্টে চিৎকার করে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ল অ্যান্টনি। জ্ঞান হারাবার আগে কানে ভেসে এল মেরীর গলার আওয়াজ। চোখের সামনে দেখল, মেরীর আলুথালু চেহারা, মুখে লেগে কাঁচা রক্ত আর চোখের জায়গায় শুধু দুটো গর্ত। হি হি করে হেসে হেসে মেরী বলছে, শুনতে পেল অ্যান্টনি, "কিঁরে, এই জলায় বাড়ি করবি? তোর বউ, মেঁয়ে, মাঁকে বাঁচাতে পারলি না! তুইও মঁরবি।"

দুঁদে পুলিস অফিসার অ্যান্টনি বিশ্বাসের জ্ঞান ফিরল পুলিস হাসপাতালে। আশপাশে দু-একজন সহকর্মী। ডাক্তার এবং এক গেরুয়া বসনধারী সন্ন্যাসী বসে আছেন বেডের পাশে। অ্যান্টনির সহকর্মী অভিজিৎ বলল, "ইনিই আপনাকে হাসপাতালে ভর্তি করেছেন স্যর। আপনার মা আর মেয়েও ভর্তি এই হাসপাতালেই"।

"আর আমার স্ত্রী, মেরী? সে কোথায়?"

"আপনি ভাগ্যবান, আপনার মা ও মেয়েকে ফিরে পেয়েছেন, কিন্ত সবাই এমন ভাগ্যবান হয় না"। সেই সন্ন্যাসী থেমে থেমে বললেন, "গত রাতে আপনাদের ওপর এক ভয়ঙ্কর পিশাচ ভর করেছিল। যার হাতে পড়লে একমাত্র পরিণতি ভয়ঙ্কর মৃত্যু"।

"এক সময় এই জায়গাটা ছিল শশ্মান। কিন্ত নদী সরে যাওয়ার পর এলাকাটি জলাজমিতে পরিণত হয়। আপনি এখানে বাড়ি করেছেন বটে, কিন্তু কেউ এই জমি কেনে না। আজ থেকে বহু বছর আগে এক প্রেত-সাধক মহিলা তান্ত্রিক এই শশ্বানে বসে প্রেত সাধনা করেছিল তাকে বাধ্য করে কাজে লাগানোর জন্য। সাধনার সময় এক অমাবস্যআর রাতে সেই পিশাচের হাতেই তান্ত্রিকের মৃত্যু হয়। আজও সে শুধু অমাবস্যার রাতেই বের হয়। আর গতকালই ছিল সেই কাল অমাবস্যা"।

"আমার স্ত্রী কোথায়? আর আমার বাড়ি, আমি যে দেখলাম ভয়ঙ্কর বাজ পড়ে গোটা বাড়িতে দাউদাউ করে আগুন লেগে গেল"। সন্ন্যাসী বললেন, "আপনার বাড়ি ঠিকই আছে, কিছু হয়নি। শুধু শোবার ঘরের টিউব আর পাখাটা ভেঙে পড়ে গেছে"।

"আমার স্ত্রী কোথায়? তার কথা কিছু বলছেন না কেন?"

"প্রেত কাকে বলে, জানেন?" সন্ন্যাসী বলে চলেন, "হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম,

তাওবাদ এবং চিনা ও ভিয়েতনামি লোকধর্মে একপ্রকার এমন অতিপ্রাকৃত সত্তা, যা মানুষের চেয়ে অধিক পীড়াভোগ করছে, বিশেষত চরম ক্ষুধা ও তৃষ্ণায়। পালি গ্রন্থ পেতবত্থুতে এদের বিবিধ রূপে পাওয়া যায়। পূর্ব জীবনে মিথ্যুক, ভ্রষ্ট, বলপ্রয়োগী, ধূর্ত-প্রতারক, হিংসুক বা লোভী ব্যক্তিরাই এ জীবনে প্রেত বলে বিশ্বাস করা হয়। নিজেদের কর্মফলের কারণেই তারা একটি নির্দিষ্ট দ্রব্য বা বস্তুর জন্য মাত্রাতিরিক্ত ক্ষুধায় আক্রান্ত। ঐতিহ্যগতভাবে এই দ্রব্য বা বস্তুটি কোনও অপ্রীতিকর বা অপমানকর জিনিস হয়ে থাকে, যেমন লাশ বা মল। হিন্দুধর্মে প্রেত একটি বাস্তব সত্তা। প্রেত একটি রূপ-আকৃতি, একটি শরীর, যা শুধু বায়ু ও আকাশের সমন্বয়ে গঠিত। হিন্দু ধর্মমতে সাধারণ পার্থিব শরীর এ দুটি ছাড়াও আরও তিনটি পদার্থ জল, অগ্নি ও পৃথ্বী বা মাটি দিয়ে তৈরি। বিশ্বাস করা হয়, পূর্বজীবনের কর্মফল অনুযায়ী এ রকম আরও অনেক শরীর আছে, যাতে জীবাত্মা পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। একটি আত্মা পুনর্জন্ম ও পুনর্মৃত্যুর বন্ধনে আবদ্ধ। অনিত্য রূপে আত্মা শুদ্ধ এবং এর অস্তিত্ব দেবতুল্য, তবে তা কায়িক জন্মের শেষরূপে। এই পদার্থের অনুপস্থিতির কারণেই প্রেতরা কিছুই হজম করতে পারে না আর তাই ক্ষুধার্ত রয়ে যায়। প্রেতরা মানুষের কাছে অদৃশ্য। যদিও কেউ কেউ বিশ্বাস করে, নির্দিষ্ট কিছু মানসিক অবস্থায় এদের দেখতে পাওয়া যায়। তারা অনেকটা মানুষের মত দেখতে, তবে সঙ্কুচিত ত্বক, সরু অঙ্গ, অতিশয় ফোলা পেট ও লম্বা গলা বিশিষ্ট। প্রেতরা স্বভাবতই আবর্জনাময় ও পরিত্যক্ত স্থানে বাস করে এবং নিজেদের পূর্বজন্মের কর্ম অনুযায়ী বিবিধ অবস্থায় থাকে। অসম্ভব খিদের সঙ্গে সঙ্গে অসহনীয় তাপ ও ঠান্ডায় ছটফট করতে থাকে"।

এক দুঁদে পুলিস অফিসার অবাক হয়ে শুনছে সেই সন্ন্যাসীর কথা। "জাপানিরাপ্রেতকে গাকি বলে। শব্দটি আধুনিক চিনা ভাষায় ওকুয়ে। ৬৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে জাপানি বৌদ্ধরা চান্দ্রমাসের আশ্বিনী পূর্ণিমায় একটি বিশেষ দিন পালন করে আসছে গাকিদের স্মরণ করতে। তারা বিশ্বাস করে, এই অর্পণ বা উৎসর্গ এবং স্মরণের মাধ্যমে ক্ষুধার্ত ভূতরা পীড়ামুক্ত হবে। জাপানি শিল্পকর্মে প্রেতের স্ফীত উদর ও অমানবিক ক্ষুদ্র মুখ ও গলাবিশিষ্ট কৃশকায় মানুষ রূপে বর্ণনা করা হত। তাদের ঘন ঘন দেখানো হত মন্দিরের উচ্ছিষ্ট জল চাটতে বা নিজেদের পিশাচরূপী ব্যক্তিগত কষ্টের সঙ্গে। থাই লোককথার অন্যতম একটি অংশ প্রেত এবং সেখানে তাদের অস্বাভাবিকভাবে লম্বা হিসেবে বর্ণনা করা হয়। শ্রীলঙ্কান সংস্কৃতিতেও মানুষ প্রেত রূপে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে, যদি তারা জীবনে অত্যধিক কামনা করে থাকে এবং প্রেত রূপে ছোট মুখ থাকার কারণে

তাদের বড় পেট কখনই পূর্ণ হয় না। রক্ত জাতীয় কোনও জীবন্ত কিছু যদি তাদের কামনার বস্তু হয়, তখন মানুষের ওপর তাদের দৃষ্টি পড়ে। অনেক সময় এই প্রেতরা ভ্রম সৃষ্টি করে খুব সাধারণ বেশ ধারণ করে। কিংবা মানুষের রূপ ধরে তাদের মধ্যে মিশে গিয়ে অন্যদের কামনা পূরণ করতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। তারা অদৃশ্য হয়ে বা নিজেদের চেহারা বিকৃত করে ভয় দেখায়। তা সত্ত্বেও সাধারণত প্রেতদের করুণার পাত্র হিসেবেই দেখা হয়, বিশেষ করে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের মধ্যে। তাই কিছু বৌদ্ধ মঠে দেখা যায়, খাওয়ার আগে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা তাদের উদ্দেশে খাদ্য, অর্থ বা ফুল রেখে দেন"। একনাগাড়ে বলে কিছুটা থামলেন সেই সন্ন্যাসী। তারপর যা বললেন, তা শুনে শিরদাঁড়া দিয়ে ঠান্ডা স্রোত নেমে গেল অ্যান্টনির।

"আপনার স্ত্রী মেরী মানুষ নয়, মানুষরূপী প্রেত। যত দ্রুত পারেন আপনার মেয়েকে এখান থেকে সরিয়ে দিন। পরের বার ভাগ্য এত সুপ্রসন্ন নাও হতে পারে। খেয়াল করেছেন নিশ্চয়ই, গ্রামের কেউ আপনার বাড়ির আশপাশ দিয়ে দিনের বেলাতেও চলাফেরা করে না"।

"কিন্তু আপনি কোথায় থাকেন? কী করেই বা আমাদের বাঁচালেন?" অ্যান্টনির প্রশ্ন শেষ হওয়ার আগেই নিমেষে উধাও হয়ে গেলেন সেই সন্ন্যাসী।

এর কিছু দিনের মধ্যেই হাওড়ার সেই অখ্যাত গ্রাম থেকে বদলি নিয়ে চলে গেল অ্যান্টনি। বাড়িটা বিক্রি করার আপ্রাণ চেষ্টা করেও পারেনি। কার্শিয়াঙে বদলি হয় তার। যেখানে বাড়ি কেনে, সেই জায়গার নাম তিনমাইল। পুরনো ইস্কুল পাড়া বলেই পরিচিত। অ্যান্টনি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারল না, তার জীবনে আরও কত কী অপেক্ষা করে আছে!

রক্তপিশাচ

হিমবন্ত দত্ত

অশনি সংকেতের পূর্বাভাস অনেক আগেই টের পেয়েছিলেন কুল পুরোহিত কাশ্যপ। রুদ্রমূর্তি ধারণকারী প্রকৃতিকে উপেক্ষা করে একাই বেরিয়ে পড়লেন তার গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার আচ্ছাদন গ্রাস করে রেখেছে জঙ্গলের প্রতিটা অংশ। শুনশান পরিবেশে অজানা জান্তব গর্জন, রাতজাগা পাখীর তারস্বরে চিৎকার উপেক্ষা করে এগিয়ে চললেন কুল পুরোহিত। জঙ্গলের একটি নির্দিষ্ট স্থানে একত্রিত হয়েছে বেশ কিছু মানুষরূপী শয়তান, যাদের আসল পরিচয় সভ্যজগতের কাছে অজানা। লেলিহান অগ্নিশিখা-কে কেন্দ্র করে তাদের পৈশাচিক উল্লাস অব্যাহত। কিছুটা দূরে, গাছের আড়াল থেকে এক এক করে সকলকে চিহ্নিত করলেন কাশ্যপ। 'হ্যাঁ, সকলেই এখানে উপস্থিত আজ। এটাই সুবর্ণ সুযোগ এই শয়তানদের সমূলে উৎপাটন করার।', মনেমনে ভাবলেন তিনি। যদিও এই যুদ্ধে তার সশরীরে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই নেই। আর মাত্র কিছু সময়ের অপেক্ষা, তারপর তিনি নিজেই ধরা দেবেন এই শয়তানদের হাতে।

আগুনের লেলিহান শিখার লালচে হলুদ বর্ণের আলোর সেই মানুষরূপী শয়তানদের স্বদন্তগুলো চকচক করে উঠছিলো তাদের নতুন শিকারকে দেখে। কৃষ্ণপক্ষের রাতের শেষ প্রহরে কোনো পুরোহিতের রক্তপান, তাদের দ্বিগুন শক্তি আর অধিক সময়ের জন্য যৌবন প্রদান করবে! কুল পুরোহিত কাশ্যপ চোখ বন্ধ করে ভগবানের নাম জপতে থাকলেন। মূহুর্তের অপেক্ষা, সারি সারি স্বদন্তের তীক্ষ্ণ শলাকা বিদ্ধ হয়ে চলল তার সারা শরীরে। খুব দ্রুত রক্তশূন্য হয়ে পড়তে লাগল তার শরীর। আর এর সাথেই, তার রক্তে মিশে থাকা বিষ প্রবেশ করতে থাকল মানুষরূপী শয়তানগুলোর শরীরে। মৃত্যুর পূর্বে নিজের সফলতা একঝলক দেখতে পেলেন কাশ্যপ, তৃপ্তির হাসি ছড়িয়ে পড়ল তার চোখে মুখে। বিষক্রিয়ার ফলে এক এক করে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে লাগল শয়তানের দল।

তীব্র সূর্যরশ্মির তাপদাহে চোখ খুলল বীরুপাক্ষ। বিষের তীব্রতা তখনও পুরোপুরি কাটেনি। আবছা দৃষ্টিতে কোনোরকমে মাথা তুলে চারদিক তাকালো

একবার। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে তার সঙ্গীদের মৃতদেহ। পুরোহিতের অব্যর্থ চালে কিস্তিমাত হতে হতেও এই ভয়ংকর লড়াইতে শয়তান নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করেই ফেলল শেষ পর্যন্ত।

* * *

ফেসবুকের ফ্রেন্ড সাজেশন গুলোর মধ্যে হঠাৎই একটা নামে চোখ আটকালো রোহনের, অর্ক দাস। প্রোফাইলটা একটু ঘেঁটে দেখার জন্য নামের উপরে মাউসটা ক্লিক করল ও। প্রোফাইল পিকচার বা কভার ফটোতে নিজের কোনো ছবি নেই ছেলেটির। বায়ো-তেও তেমন কোনো তথ্য দেওয়া নেই যা দেখে চেনার উপায় আছে। একথা সেকথা ভাবতে ভাবতেই ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে দিল রোহন। রাত প্রায় দু'টো, ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট হওয়ার নোটিফিকেশন আসতেই একটা মেসেজ করল রোহন, 'হাই!'

উল্টোদিক থেকে তৎক্ষণাৎ উত্তর এলো, 'হ্যালো'

'আপনি কি গ্রেটার ইন্ডিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ইলেকট্রিকাল ডিপার্টমেন্টের অর্ক? ২০১১-র ব্যাচ?' বেশ কিছুক্ষণ পর অপর প্রান্ত থেকে উত্তর এলো, 'হ্যাঁ, আপনাকে তো ঠিক চিনলাম না?'

'দাদা, আমি তোমার থেকে দু'বছরের জুনিয়র ছিলাম। পাভেল, ডিম্পি দের ব্যাচ।'

'ওহ আই সি!, উত্তর এল অপর প্রান্ত থেকে। এইভাবেই প্রায় বছর দশেক বাদে আরো একবার রোহন খুঁজে পেল কলেজ জীবনে দেখা সেই অদ্ভুত মানুষটাকে। এক ঝলক মনে পড়ল, ওর কলেজ জীবনের অনেক কথা। অর্ক দাস ছিল অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা একজন মানুষ। তার জ্ঞানের ব্যাপ্তি ছিল অপরিসীম। অথচ বই হাতে দেখার চেয়েও তাকে ল্যাদ খেয়ে সময় কাটাতে দেখায় বেশী অভ্যস্ত ছিল সম্পূর্ণ হোস্টেল। তার এই অসামান্য জ্ঞান ভান্ডারের রহস্য জানতে চাইলে সে বলত, 'ঘুমের মধ্যেই সবচেয়ে বড় চেতনা, সবচেয়ে বড় জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। এই ঘুমই পারে মানুষকে বর্তমান, ভবিষ্যত এবং বহুযুগ আগের ফেলে আসা যুগের সমস্ত কিছু, এক নিমেষে জানিয়ে দিতে, শুধু সেটা বোঝার ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন।' আর এই বোঝার ক্ষমতাটাই নাকি কোটিতে একজনের থাকে। অর্থাৎ নিদ্রাই সমস্ত জ্ঞানের আধার। 'যত্তসব গাঁজাখুরি!', নিজের মনেই হাসল রোহন।

চৈত্রের দুপুরে একরাশ ঘন কালো মেঘ চারদিক ঢাকা দিয়ে অসময়ে অন্ধকার নামিয়ে আনলো। চারদিক থমথমে, ঠিক যেন ভয়ংকর ঝড়ের পূর্বাভাস

পেয়ে প্রকৃতি নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছে। হোয়াটস অ্যাপে পরপর কয়েকটি মেসেজ ঢোকার শব্দে ফোনটা হাতে তুলে নিল রোহন। অর্ক-র মেসেজ। রোহন-কে দিন কয়েকের জন্য নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়ে মেসেজ করেছে সে।

* * *

চারঘাট পিপারিয়া রেলস্টেশন থেকে বেরিয়ে পাশের রাস্তাতেই সাদা রঙের হুন্ডাই-টা চোখে পড়ল রোহনের। গাড়ীর নম্বর আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিল অর্ক। যদিও সেই সবের প্রয়োজন ছিলনা, কারণ এই প্রায় পান্ডববর্জিত ছোট রেলস্টেশনের বাইরে ঐ একটি মাত্র গাড়িই দাঁড়িয়ে ছিল। রোহনকে পিছনের সিটে বসিয়ে গাড়ী ছুটল তার গন্তব্যে। গ্রীষ্মের শুরুতে মধ্যপ্রদেশের তাপমাত্রা কিছুটা বেশি থাকলেও পিপারিয়া অঞ্চলের তাপমাত্রা বেশ মনোরম। এখান থেকে মাত্র ষাট কিলোমিটার দূরত্বে শৈলশহর পাঁচমারির অবস্থান। গাড়ী ছুটে চলল প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত আনহোনি মাতার মন্দিরের উদ্দেশ্যে।

'উতরনা হ্যায় কেয়া মাতা জি কি মন্দির মে?', জিজ্ঞেস করল ড্রাইভার। ক্লান্তিতে চোখ বুজে আসছিল রোহনের। 'নেহি, সিধা অর্ককে ঘর চলো।' গাড়ী ছুটে চলল অচেনা জঙ্গলে ঢাকা পথে। আনহোনি মাতার মন্দিরকে বাঁদিকে ফেলে গাড়ী এগিয়ে চলল কাঞ্জি ঘাটের উদ্দেশ্যে। নাম শুনে রোহন যেমন ভেবেছিল, অঞ্চলটি সম্পূর্ণ তার বিপরীত । জনমানবহীন জঙ্গলের পথে চেনা অচেনা পাখীর কলতান আর গাছের সারি ব্যতীত আর কিছুই চোখে পড়ল না রোহনের। অর্ক রিসার্চের কাজে বেশ কিছু বছর এই অঞ্চলে আছে, এমনটাই জানিয়েছিল রোহনকে। তবে সময় যত এগোচ্ছে ততই সেই বিষয়ে সন্দেহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

চারদিক সবুজে ঘেরা প্রশস্ত একটি জায়গায় ওদের গাড়িটা এসে থামল। সামনে যে মাঝারি আকৃতির অট্টালিকাসম বাড়িটি চোখে পড়ল, তাতে প্রাচীনত্বের ছাপ সুস্পষ্ট। চারদিক খুব সুন্দরভাবে কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরা। গাড়ীর শব্দে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল অর্ক। রোহনকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এসে বলল, 'অসুবিধা হয়নি তো আসতে?'

'নাহ্ কোনো অসুবিধা হয়নি। তবে, প্রচন্ড টায়ার্ড।', মুচকি হেসে বলল রোহন। 'এখন তাহলে খাওয়া দাওয়া করে একটু রেস্ট নিয়ে নাও। রাতের দিকে না হয় কথা বলা যাবে।' ঘড়ির কাঁটা দুপুর তিনটে ছুঁই ছুঁই, গরম ভাত আর মুরগীর মাংস উদরস্ত করে শরীরটা বিছানায় এলিয়ে দিতেই একরাশ ঘুম নেমে এল রোহনের চোখে।

* * *

রাতে খাওয়ার টেবিলে বসে স্বাভাবিকভাবেই বিগত কয়েক বছরের ও কলেজ জীবনের প্রসঙ্গ আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠলো। তারপর একটা সময় অর্ক, রোহনের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলল, 'তোমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর একটা উদ্দেশ্য আছে।'

'মানে? ঠিক বুঝলাম না!', জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল রোহন। 'বলছি।', একটা সিগারেট ধরিয়ে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো অর্ক। তারপর বলতে শুরু করল, 'এখান থেকে কয়েকশো কিলোমিটার দূরে ভীমবেটকা নামের একটা জায়গা আছে, সম্ভবত জায়গাটার নাম তুমিও শুনে থাকবে। প্রায় ৯০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৫৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে ভিমবেটকার রক শেল্টারে মানুষের বসবাস ছিল। যদিও এক লক্ষ বছর আগেও এই রক শেল্টারে আদিম মানুষ বসবাস করত বলে মনে করা হয়। প্যালিওলিথিক পেন্টিং বা গুহাচিত্রের জন্য এই জায়গাটি বিখ্যাত। তবে ঘটনা সেটা নিয়ে নয়। এই অঞ্চলে একটা অদ্ভুত ঘটনা প্রচলিত ছিল একটা সময়, ভ্যাম্পায়ার নিয়ে।', থামল অর্ক।

'ভ্যাম্পায়ার? আদৌ কি সেরকম কিছু আছে না কি?', জিজ্ঞেস করল রোহন। 'আছে। ঘটনাগুলি বংশপরম্পরায় ঐ অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছে। সত্যতা নিয়ে অনেক প্রশ্নচিহ্ন থেকেছে সবসময়ই। তবে, সবটাই উড়িয়ে দেওয়ার মত নয়। আমি এখানে রিসার্চের জন্য আছি প্রায় পাঁচ বছর হয়ে গেল। এখানকার বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়ানোর সুবাদে অনেক ঘটনাই শুনেছি, প্রমাণও পেয়েছি।'

'প্রমাণ? কিরকম প্রমাণ?'

ঘরের কোণে রাখা একটি কাঠের আলমারির দিকে এগিয়ে গেল অর্ক। তারপর একটি ছোট প্যাকেট বের করে এনে রোহনের হাতে দিল। দুর্বোধ্য হরফে লেখা কোনো প্রাচীন পুঁথির অংশ বিশেষ। রোহন খুব ভালভাবে চোখ বুলিয়ে অর্কর দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিন্তু এতে কি লেখা আছে? কিছুই তো বুঝতে পারছি না।' অর্ক বলতে থাকল, 'প্রায় দু'হাজার বছর আগে মধ্যপ্রদেশের ভিমবেটকা ও তার সংলগ্ন অঞ্চলে পিশাচ তৈরির এক ভয়ংকর খেলায় মেতে ওঠে তান্ত্রিক সুকেতু। পিশাচ চক্রের চাকা ঘুরিয়ে সে প্রায় বাইশ জন রক্তচোষার জন্ম দেয়, যাদের আকৃতি, চলা-ফেরা, আচার ব্যবহার সব কিছুই সাধারণ মানুষের মতো। কিন্তু, আসলে এরা রক্তচোষা পিশাচ বা যাকে আমরা বলি ভ্যাম্পায়ার। নির্দিষ্ট সময় অন্তর এরা মানবদেহের রক্তপান করে যৌবন লাভ করে। এদের মৃত্যু নেই। তান্ত্রিক সুকেতুর উদ্দেশ্য ছিল এই রক্তচোষা

পিশাচদের নিজের গোলাম বানিয়ে রেখে তাদের সাহায্যে পৃথিবীতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা। কিন্তু ভগবান এই পৃথিবীর প্রতিটি কোণায় এই খারাপ গুলোর সাথে লড়াই করার জন্য একটুকরো ভালো-র অস্তিত্ব রেখেই দেন। মাহিষমতি-র কুল পুরোহিত এই সমস্ত ঘটনাটা জেনে ফেলেন এবং নিজেকে টোপ হিসাবে ব্যবহার করে, জীবনের আহুতি দিয়ে তান্ত্রিক সুকেতু সহ সবগুলো শয়তান-কে এক অমাবশ্যার রাতে শেষ করে ফেলেন।'

'সবাইকে নয়। একজন বেঁচে গিয়েছিল সেদিন। তার নাম...' উত্তেজিত হয়ে বলতে গিয়ে গলা কেঁপে যায় রোহনের।

* * *

'কলেজের পিছন দিকের জঙ্গলে যেদিন পাভেলের রক্তশূন্য মৃতদেহ-টা পাওয়া যায়, তার আগের রাতেই তোমাকে আর পাভেলকে আমি হোস্টেল থেকে বেরোতে দেখি। দেখা মাত্রই খুব সন্তর্পনে তোমাদের পিছু নিই। কিন্তু আমি সেখানে পৌঁছানোর আগেই সব শেষ। কিছুটা দূরের একটা গাছের আড়াল থেকে সম্পূর্ণ ঘটনাটা দেখি, কিন্তু কাউকে কিছু বলতে পারিনি। এর কিছু মাস পরেই আমার কলেজ জীবন শেষ হয়। কলেজ শেষ হওয়ার পর তোমার ব্যাপারে খোঁজ নিতে শুরু করি বিভিন্ন মাধ্যম থেকে। এই খোঁজ নিতে গিয়েই জানতে পারি তোমার বাবা-মা বা কোনো আত্মীয়ের উল্লেখ কোথাও নেই, কোনো এক ব্যক্তি তোমার গার্ডিয়ান হিসেবে পরিচয় দিয়ে কলেজে ভর্তি করায়, শুধু উল্লেখ আছে তুমি মধ্যপ্রদেশ থেকে এসেছিলে। এর কিছু সময় পরে আমিও আমার রিসার্চের কাজের জন্য মধ্যপ্রদেশকেই বেছে নিই। এখানে এসে থাকতে শুরু করি। আর তারপর এক এক করে ভিমবেটকার লোকমুখে প্রচারিত ভ্যাম্পায়ারের কথা, বিভিন্ন ঘটনা, সবটা পরিস্কার হতে থাকে আমার কাছে। অনেক খোঁজ নিয়ে এটাও জানতে পারি প্রতি দশ বছর অন্তর কৌশিকী অমাবস্যার রাতে জীবিত মানুষের রক্ত পান করতে না পারলে তোমাদের যৌবনপ্রাপ্তি ঘটে না। তাই, সেই ভাবেই প্ল্যান করে তোমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানো। আগামীকাল কৌশিকী অমাবস্যা।' মুচকি হেসে হাতে ধরে রাখা লাইটারে একটা চাপ দিল অর্ক। একটা অদৃশ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল রোহনকে, যা ভেদ করা কোনো মানুষ কেন, রক্তচোষা নরপিশাচের পক্ষেও সম্ভব নয়।

'এটা আমার নতুন আবিষ্কার। আর হ্যাঁ, যেতে যেতে আমার পরিচয়টাও দিয়ে দিই, আমি অর্ক, মাহিষমতি-র কুল পুরোহিত কাশ্যপের উত্তরসূরি।' ঘরের দরজাটা সজোরে বন্ধ হয়ে গেল।

* * *

দিন তিনেক পর, 'সাহাব, আপকা যো দোস্ত আয়া থা কলকত্তা সে, উও চলা গ্যায়া কেয়া? কহিঁ দিখ নেহী রাহা হ্যায়!', তিনদিন ছুটি কাটিয়ে ফেরার পর, জিজ্ঞেস করল ড্রাইভার পবন।

'হাঁ, উসকা কুছ কাম আ গ্যায়া থা তো উও কাল হি নিকল গ্যায়া।', চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বলল অর্ক। বেশ কিছুটা দূরে বসে থাকা, প্রায় বছর নব্বই-এর এক অশীতিপর বৃদ্ধের দিকে ইঙ্গিত করে গলার আওয়াজটা একটু নীচু করে, পবন বলল, 'সাব ইয়ে কৌন হ্যায়? ইসকো তো পহলে কভি নেহী দেখা!'

'ইয়ে ভি মেরা দোস্ত হি হ্যায়, মান লো, কি কহিঁ সদিয়োঁ সে ইয়ারানা হ্যায় হামারা।' মুচকি হেসে বলল অর্ক।

ল্যান্ড অফ্ ব্ল্যাক ম্যাজিক

ঝিলিক মুখার্জী গোস্বামী

বিগত কয়েকবছর হল বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন। কর্মসূত্রে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। গুগল ডুয়োর মাধ্যমে কিছুদিন আগে অবধি নিয়ম করে প্রতিটা ছুটির দিনে ভার্চুয়াল আড্ডা হত। কিন্তু কয়েক বছর হল কোনো এক অজানা কারণে সবাই সবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। একপ্রকার জোর করেই এবছর দুর্গাপুজোর দিনগুলোতে রিইউনিয়নের পরিকল্পনা করি নিজে থেকেই। একের পর এক সব বন্ধুদের ফোন করতে গিয়ে কার্যত অবাক হয়ে যাই। একটু বিরক্ত মিশ্রিত রাগ নিয়ে স্বগতোক্তি করলাম, সবাই একসঙ্গে মোবাইল নম্বর বদলেছে! একবার জানালো না অবধি। সেই মুহূর্তের জন্য চুপচাপ থেকে যোগাযোগ করার অভিপ্রায় থেকে নিজেকে ক্ষান্ত করলাম। পরিকল্পনা ভেস্তে যাওয়ায় কিঞ্চিৎ মনঃক্ষুণ্ন হল বৈকি।

এরপর বেশ কিছুদিন অতিক্রান্ত। অফিসের ব্যস্ততার কারণে সবকিছুই যেন স্মৃতিপট থেকে বিলুপ্ত হয়েছে। গুগল শিট ওপেন করে কিছু জিনিস এন্ট্রি করার কাজ প্রায় মনোযোগ দিয়েই করছিলাম। এমতাবস্থায় ফোনের কাঁপুনি এবং স্ক্রিনে ভেসে ওঠা অপরিচিত নম্বর দেখে মনোযোগে ছেদ পড়ে। অপরিচিত নম্বর থেকে ফোন এলে সহজে ফোন রিসিভ করি না। ট্রুকলারে নম্বরটা দেখতেই বুকের বাম পাশটা অজান্তেই চিনচিন করে উঠল। নামটা স্মৃতিপট থেকে বহুদিন আগেই বিস্মৃত প্রায়। বন্ধুদের তালিকা থেকেও এই নাম বহু পূর্বেই বাতিলের তালিকাভুক্ত করেছিলাম। কারণ ওর কার্যকলাপ আমাদের বন্ধু মহলে ছিল বহুল চর্চিত। এক কথায় বলতে গেলে একদা পছন্দের তালিকায় থাকা নামটা একঝটকায় অপছন্দের তালিকাভুক্ত হয়, ওর একটা কুৎসিত কার্যের কারণে। ফোনটা একদম সাইলেন্ট মোডে করে দিয়ে পুনরায় কাজে নিযুক্ত করি নিজেকে। কারণ ওর সাথে পুনরায় কথা বলার বা যোগাযোগ স্থাপন করার বিশেষ প্রবৃত্তি আমার ছিল না।

* * *

প্রায় এক সপ্তাহ অচেনা নম্বর থেকে আসা ফোন গুলো ইচ্ছে করেই এড়িয়ে

চলছিলাম। বিরক্ত হয়ে নম্বরটা ব্লকলিস্টে যোগ করতে যাব। ফোনের নোটিফিকেশন বারে দৃষ্টি নিবদ্ধ হল। তৎপরতার সঙ্গে তৎক্ষণাৎ নোটিফিকেশন গুলোতে ক্লিক করতেই।

এইভাবে প্রায় প্রস্তরবৎ অবস্থায় অবস্থান করেছি, জানা নেই। অবচেতন মনে মুঠোফোনটা মুষ্টিবদ্ধ করেই সোফার ওপরে ঝপাৎ করে বসে পড়ি। হোয়াটসঅ্যাপে ভেসে আসা ছবিগুলো দেখে প্রায় আতঙ্কিত হয়ে উঠি। প্রতিটা ছবির মধ্য থেকে বয়ে চলেছে রূধির ধারা। প্রতিটা শরীরে ক্ষতের চিহ্ন গুলো দেখে শিহরিত হয়ে উঠি। প্রতিটা ছবির মুখাবয়বে পরম যত্নে লেপন করা হয়েছে এক অজানা আতঙ্ক। মুখমন্ডলের উপরিভাগে অবস্থিত বিস্ফারিত আঁখিযুগল তারই সাক্ষ্য বহন করছে। ওষ্ঠাধারের দুই পাশ দিয়ে গড়িয়ে চলেছে প্রায় কালচে হয়ে যাওয়া লাল রঙা কষ। এই বীভৎসতা মাখা দৃশ্য দেখার পর নিজেকে আর স্থির রাখতে পারলাম না। ছবিগুলোর সাথে পাঠানো লেখাটা দেখে প্রয়োজনের তুলনায় একটু বেশিই অস্থির হয়ে উঠলাম যেন। "যদি নিজের বন্ধুদের প্রাণে বাঁচাতে চাস, কালী পুজোর আগেই চলে আসিস।"

মেসেজ এবং ছবিগুলো দেখে, অজ্ঞাতেই একটা দলা পাকানো কষ্ট যেন কণ্ঠনালী দিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে বুঝতে পারলাম। চোখের কোণে কয়েক ফোঁটা জলের টলমল অবস্থান বুঝতে বিশেষ কষ্ট হল না। এমতাবস্থায় বোধিসত্বের পাঠানো লোকেশন লিঙ্কের ওপর বার কয়েক আঙ্গুল নাড়াচাড়া করার পর লিঙ্কটা ওপেন করতেই একটি পাহাড় ঘেরা ছোট্ট গ্রামের নাম ফুটে উঠতেই একটু অবাক হই বৈকি।

* * *

গুয়াহাটি শহর থেকে প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার দূরে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্তী আসামের একটি সুন্দর গ্রাম, মায়ং। পাহাড়ের গা ঘেঁষে গড়ে ওঠা ছোট্ট গ্রামটাকে ঘিরে রেখেছে সবুজ বৃক্ষরাজির দল। বৃক্ষরাজির দলকে ভেদ করে, ভাণুর একফালি আলো যখন সারা গ্রামকে স্নিগ্ধ করে তোলে তখন যেন আরও তার রূপ ফুটে ওঠে। কিন্তু এই পরম রূপের অন্তরালেই সযত্নে লালিত হয় একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন জগত। যে জগতের কথা বেশি কম অনেকের নিকটেই অস্বচ্ছ ভাবে প্রকাশিত।

মহাভারত সহ বিভিন্ন পুরাণে প্রাগজ্যোতিষপুরের কথার উল্লেখ পাওয়া যায়। একদা যা ছিল আসামের প্রাচীন নাম। আসামের অন্তর্গত মায়ং গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসীরা নিজেদের আবদ্ধ করে রাখে বিভিন্ন অন্ধ কুসংস্কারের

দ্বারা। অন্ধ কুসংস্কারকে হাতিয়ার করেই নিজেদের উপার্জনের রাস্তা তৈরি করে। ডাইনি বিদ্যা থেকে শুরু বিভিন্ন বিভিন্ন রকমের কালো জাদুর কার্যে নিজেদের পারদর্শী করে তোলে এই গ্রামের মানুষ।

কথিত আছে, কাছাড়ি রাজ্যের প্রধান, ঘটোৎকচ। তার ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতার সঙ্গে মহাভারতের বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং জয় লাভ করেছিলেন। সেই থেকেই হয়তো এই জাদু বিদ্যা বা ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা চলে আসছে আসামের এই ছোট্ট গ্রামে। উইচক্রাফ্ট থেকে ব্ল্যাক ম্যাজিক। মৃত পশুর শরীরে প্রাণ প্রতিস্থাপন করে কোনও মানবে পরিণত করা এই বিদ্যারই অংশ। শুধুমাত্র তাই নয়। নিজেকে শক্তিশালী করার জন্য নরবলির প্রথার কথাও পাওয়া যায় ইতিহাসের দিকে দৃকপাত করলে। এককথায় বলতে গেলে ব্ল্যাক ম্যাজিক চর্চার ক্ষেত্র এই মায়ং গ্রাম। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও পাঞ্জাব, বিহার, ওড়িশা সহ ভারতের ভিন্ন ভিন্ন জায়গা থেকে বহু মানুষের আগমন ঘটে এইসব বিদ্যা রপ্ত করার জন্য। তাইতো এই গ্রামকে আখ্যায়িত করা হয়েছে, 'ল্যান্ড অফ্ ব্ল্যাক ম্যাজিক' নামে।

মায়ং শব্দের অর্থ ইলিউশন বা ধাঁধা। মায়ং জায়গাটাই আসলে একটা ধাঁধা বা মায়ার ন্যায়। কিন্তু ওরাই কেন এই ইলিউশনের শিকার হল! তবে কি...! উইকিপিডিয়া বন্ধ করে প্রায় পক্ষঘাত গ্রস্ত মানুষের ন্যায় স্থির হয়ে বসে থাকি। মাথার মধ্যেকার চিন্তার তারগুলো প্রায় এলোমেলো হয়ে গেছে। সেগুলোকে একত্রিত করে ঠান্ডা মাথায় ভাবতে হবে এই পরিস্থিতিকে কিভাবে নিজের আয়ত্বে আনা সম্ভব। যেখানে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে আমার বন্ধুদের প্রাণসংশয়ের কথা। বন্ধুদের প্রাণে বাঁচানো আমার কাছে সেই মুহূর্তে মুখ্য হয়ে উঠেছে।

* * *

ইতিহাসের সরণী বেয়ে, আসামের ছোট্ট পাহাড়ি ঘেঁষা গ্রাম বয়ে চলেছে ঐতিহ্যবাহী ঐতিহাসিক ঘটনার পরম্পরাকে। প্রত্নতত্ব বিশারদদের তত্ত্বাবধানে বহু জায়গা খনন করে মিলেছে মূল্যবাণ ঐতিহাসিক জিনিসের সন্ধান। কোথাও মিলেছে ধারালো অস্ত্র। আবার কোথাও মিলেছে রাজা মহারাজাদের তরবারি। এই অস্ত্র গুলির সাথে,দেশের বিভিন্ন জায়গায় মানব বলিদানের জন্য ব্যবহৃত অস্ত্রের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। অস্ত্র গুলোর ব্যবহার মূলত ঘটেছিল, মায়ং এর অহোম যুগে। জার্নালের নিম্নে উল্লিখিত অস্ত্রের ছবি গুলো দেখে মনের মধ্যে এক আকাশ আতঙ্ক ফুটে ওঠে। যে জায়গা পুরাতত্ত্ব পর্যটন হিসাবে বহুল প্রচারিত। পুরাতন ইতিহাসের কথা যেখানে প্রতিটি আনাচকানাচে ছড়িয়ে

ছিটিয়ে রয়েছে! প্রতিটি ভ্রমণপিপাসু মানুষের মনে যে জায়গা আলাদা মাত্রা রেখে যায়। সেই জায়গা। আর ভাবতে পারছিলাম না। বইপাড়া থেকে কেনা জার্নালটা বন্ধ করে ব্যাকপ্যাকে চালান করে গুয়াহাটি যাওয়ার বিমানের পরবর্তী ঘোষণার জন্য অপেক্ষায় থাকলাম।

হিমশীতল মস্তিষ্কে পুরো ঘটনাটা নিয়ে আরও একবার গ্রাউন্ড ওয়ার্ক করে পুলিশের কাছে গিয়ে সবটা জানানো সমীচিন মনে করে ওঁদের সাহায্যে কালী পুজোর ঠিক আগেই গুয়াহাটির উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। কারণ এতদিনের জন্য অপেক্ষা করার মতো সময় আমার কাছে ছিল না। বর্তমানে একরাশ চিত্তচাঞ্চল্য নিয়ে কলকাতা বিমানবন্দরে বসে আছি।

* * *

গুয়াহাটি বিমান যখন মাটি স্পর্শ করল তখন দিনমণী ক্লান্ত হয়ে পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়েছে প্রায়। বিমান বন্দর থেকেই একটা ট্যাক্সি নিয়ে যখন লোকেশনের কথা বললাম। ট্যাক্সিচালক ঈষৎ বঙ্কিম দৃষ্টিতে আমাকে পরিমাপ করে নিল, বুঝতে অসুবিধা হল না। তার দৃষ্টি উপেক্ষা করে ট্যাক্সিতে চড়ে তাকে কার্যত তাড়া দিয়ে হাইস্পিডে ট্যাক্সি হাঁকাতে বললাম। মূল রাস্তা ছেড়ে ট্যাক্সি যখন সবুজের মাঝে এসে উপস্থিত হল। মৃদুমন্দ পাহাড়ি বাতাস মুখমন্ডলে একটা প্রশস্তি অঙ্কিত করে গেল যেন। শরীরের তুলনায় মনটা ভীষণভাবে পরিশ্রান্ত ছিল। একটুকরো শীতল হাওয়ায় সমস্ত ক্লান্তি ধৌত হয়ে গেল। পাওয়ার ব্যাঙ্ক থেকে মোবাইলটা আলদা করে একটা মেসেজ প্রেরণ করলাম যথাস্থানে।

ট্যাক্সিচালক নীরবে ট্যাক্সি চালিয়ে চলেছে। আমারও বাক্যালাপ করার বিশেষ প্রবৃত্তি ছিল না। ভিতরে ভিতরে প্রচন্ড অস্থির হয়ে উঠছিলাম। গুগল ম্যাপটা ওপেন করে মূল লোকশনের ঠিকানা দিতেই অস্থিরতা বেশি মাত্রায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হল। আর মাত্র পনেরো মিনিটের পথ বাকি আছে। তারপরই মুখোমুখি হব সেই ইবলিশের।

জায়গাটা অন্ধকারে নিমজ্জিত প্রায়। সর্পিল রাস্তা ধরে মোবাইলের আলো জ্বালিয়ে ধীরগতিতে এগিয়ে চলেছি ক্ষুদ্র বাড়িটার দিকে। ট্যাক্সি চালককে অনেকক্ষণ আগেই ছেড়ে দিয়েছি। এই ঘনান্ধকারে আমার নিশ্বাস প্রশ্বাসের অস্তিত্ব ছাড়া আর কিছুই টের পাচ্ছি না। আরও একটু এগিয়ে যেতেই শুকনো পাতার মড়মড়ে আওয়াজ হঠাৎই কর্ণগোচর হতেই একপ্রকার চমকে উঠলাম। ভয়ের চাদর আমাকে জড়িয়ে ধরার পূর্বে নিজেকে সংযত করে কয়েকবার দীর্ঘ শ্বাস নিলাম। সাময়িক নিশ্চলতা ত্যাগ করে পুনরায় ধীরগতিতে ছোট্ট বাড়িটার

দিকে এগিয়ে চললাম। বাড়ির আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে আমি প্রায় অজ্ঞ। কিছুটা সাহসে ভর করে এবং কিছুটা বন্ধুত্বের টানেই হোক একাকী এখানে আসা কতটা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয় জেনেও এখানে এসেছি। মনের অভ্যন্তরে একটা জেদ আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছিল তখন।

মৃদু চাপ দিতেই কাঠের দরজাটা ক্যাঁচ আওয়াজ তুলে অবারিত দ্বারের ন্যায় আমাকে স্বাগত জানাল। যতটা সম্ভব পায়ের আওয়াজ লুকিয়ে আরও একটু ভেতরে প্রবেশ করলাম। মৃৎপ্রদীপের ক্ষীণ রেখা অন্ধকার ঘরকে যেন আরও অন্ধকারে নিমজ্জিত করছে। কাঠের দেওয়াল ধরে ক্রমশ এগিয়ে চলেছি। দেওয়ালে হাত রাখতেই কিছু একটা চ্যাটচ্যাটে আঠালো পদার্থ হাতের মধ্যে লাগার সঙ্গে সঙ্গে মোবাইলের আলোটা অপর হাতে ফেলতেই...।

* * *

কতক্ষণ হাত-পা বদ্ধ অবস্থায় ছিলাম জানা নেই। মুখমন্ডলের ওপর হিম শীতল জলের ঝাপটা পড়তেই ধীরে ধীরে চোখ মেলে যা দেখলাম তা আমার কাছে একদম অকল্পনীয় ছিল। একটা বেতের চেয়ার দখল করে বসে আছে, রক্তিম বসন পরিহিত শঙ্খশুভ্র। মাথার ওপর পরম অযত্নে লালিত হচ্ছে মস্ত বড় জটা। জটার অংশ থেকে কিছু দড়ি পাকানো চুল ওর পিঠের ওপর আলুলায়িত ভাবে পড়ে আছে। ওর ওই রূপের সঙ্গে অতীতের রূপকে মেলাতে ভীষণ রকম কষ্ট হচ্ছিল আমার। এমতাবস্থায়, একটা চকচকে আলো আমার চোখের উপর এসে পড়ল। ভালো করে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতেই, বিমানবন্দরে বসে পড়া জার্নালের কথা মনে পড়ল তৎক্ষণাৎ। শঙ্খশুভ্র এর হাতে থাকা তরবারির আবছা ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠল আমার। ওই অবস্থায় থেকেও বুঝতে অসুবিধা হল না এরপর ঠিক কী ঘটতে চলেছে। দীর্ঘ নীরবতা খন্ডন করে শঙ্খশুভ্রই প্রথমে বলে উঠল, " তোর যে বিশেষ ধৈর্য নেই সে বিষয়ে আমি সেই ছোট্ট থেকেই অবগত আছি। আমি জানতাম তুই ঠিক আসবিই এবং সেটা কালী পুজোর আগেই।"

শঙ্খশুভ্র থামলে আমি কিছুটা ভয়ার্ত স্বরেই বলে উঠি, কিন্তু আমরাই কেন? আমার কথায় ও তখন আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে অট্টহাসি হেসে চলেছে। হাসির তীব্রতা কমিয়ে বলে উঠল, "বোধিসত্বকে যেন কি নামে ডাকতিস! আমসত্ব। তোদের মতো পড়াশোনায় একদমই ভাল ছিলাম না। তোদের ঠাট্টাটা বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রিভেঞ্জে পরিবর্তিত হয়েছিল। তাই তো পড়াশোনা ত্যাগ করে ব্ল্যাক ম্যাজিক শিখতে শুরু করলাম। সেটাও তোরা যেন কিভাবে জেনে গেলি।

আমার সঙ্গ একেবারেই ত্যাগ করলি। সভ্য সমাজে, আমাকে বন্ধু বলে পরিচয় দিতে তোদের ঘেন্না করত। সেই থেকে মনে মনে শপথ করি তোদের থেকেও সর্বশক্তিমান হয়ে তোদের একদিন শাস্তি দেব।"

পুনরায় কিছুক্ষণের নীরবতা। কম্পিত স্বরে বলে উঠলাম, শুধুমাত্র এই কারণে তুই এই পাগলামি করতে পারিস না বোধি। সাদার কাছে কালো চিরকাল বিজীত হয়ে এসেছে। অন্ধকার প্রতিবারের মতো এবারও পরাজিত হবে আলোর কাছে। সর্বশক্তিমানের কাছ থেকে নিস্তার পায়নি কোনো কালো জাদু। তুইও আজ...। আমার কথা শেষ হয় না। বোধি পুনরায় পাগলের মতো অট্টহাসি হাসতে হাসতে ঘরের দক্ষিণে আঙ্গুল নির্দেশ করল। অঙ্গুলি নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে সেদিকে নজর পড়তেই তিনটে কাটা মস্তিষ্কের দিকে নজর যেতেই প্রায় মূর্চ্ছিত হবার উপক্রম হওয়ার আগেই কাঠ স্বরে বোধি বলে উঠল, " ওদের বলি দিয়ে আমি আজ সর্বশক্তিমান হয়েছি। এবার তোর পালা। ভুলে যাস না তুই এখন যেখানে বসে আছিস সেটা কালো জাদুর ভূমি।" অসহায়ের মতো মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকা ছাড়া কোনো উপায়ন্তর ছিল না আমার। যাদের জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এসেছিলাম তারা ইতিমধ্যেই নরবলি রূপ কুৎসিত কর্মে নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে।

নির্লিপ্ত ভাবে বসে মৃত্যুর প্রহার গুনছি। ওদিকে বোধি একটা বেদীর সামনে বসে অদ্ভুত মন্ত্রোচ্চারণে ব্যাস্ত। ওর সামনে সাজিয়ে রাখা আছে কিছু নরকরোটি। প্রতিটা নরকরোটির ওপর অদ্ভুত ধরণের জিনিসের অবস্থান লক্ষ্য করলাম দূর থেকেই। আমি তখন মনে মনে আওড়ে চলেছি, "অসতো মা সদ্ গময়/ তমসো মা জ্যোতির্গময়।" ঠিক এমন সময় বাইরে থেকে কিছু পায়ের আওয়াজ কর্ণপটহে আছড়ে পড়ল। ওষ্ঠাধারে একচিলতে হাসির ঝিলিক ফুটে উঠল।

* * *

বছর কয়েক অতিক্রান্ত হলেও মায়ং থেকে ফিরে আসার পর থেকে সেদিনের সেই বিভীষিকাময় ঘটনার কথা অবচেতন মনের অভ্যন্তরে কোথাও একটা যেন রয়ে গেছে আজও। রাত্রিকালীন সুখ নিদ্রা জীবন থেকে বিলুপ্ত প্রায়। চোখ বুঝলেই, চোখের সামনে ভেসে ওঠে তিনটে ছিন্নমস্তক। যেগুলো ছিল আমার তিন বন্ধুর। ঘরের মধ্যেকার বাতাস কারণে অকারণে ভারী হয়ে ওঠে। মাঝে মধ্যে একটা জেলো হাওয়া মুখমন্ডলে এসে ঝাপটা মেরে যায়। শঙ্খশুভ্রের অট্টহাসি আজও কানের মধ্যে প্রবেশ করে মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে অদ্ভুত রকমের অস্থিরতা সৃষ্টি করে। অফিসের কাজে মাঝেমধ্যেই ভুল করে ফেলি। সহকারী

অফিস কর্মীদের সাথে অকারণে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ি। সেদিন মৃত্যুর দ্বারে হয়তো পৌঁছে যেতাম। যদি না সঠিক সময়ে গুয়াহাটি পুলিশ, আমার মোবাইল নম্বর ট্র্যাক করে আমাকে উদ্ধার করতে আসত। পরিকল্পনা মতো ওনারা সঠিক সময়ের আগেই এসে পৌঁছে, শঙ্খশুভ্রকে অ্যারেস্ট করে নাটকের যবনিকা পতন করেন। সেদিনের নাটকের যবনিকা পতন হলেও আমার জীবনে এক নতুন নাটক শুরু হয়েছিল। শঙ্খশুভ্রের উপস্থিতি মাঝে মধ্যেই টের পাই যেন। নিজের হাতের দিকে তাকালেই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ি। সেদিনের রক্তলিপ্ত হাতের ছবি আজও আমাকে বিতাড়িত করে বেড়ায়। মাঝে মধ্যেই মনে হয়, ঘরের মধ্যে রূধির ধারা বয়ে চলেছে। ঠিক যেমন শঙ্খশুভ্রের ঘরে প্রত্যক্ষ করেছিলাম।

অদ্ভুত রকমের চিন্তাগুলো মনের মধ্যেকার স্বাভাবিক চিন্তাগুলোকে গ্রাস করেছিল। তাহলে কী শঙ্খশুভ্র মুক্তি পেয়ে পুনরায় তার অসমাপ্ত কর্মে লিপ্ত হয়েছে! অন্ধকারের রাজ্যে ফিরে গিয়ে নিজের কালো জাদুর রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে! ও যে বলেছিল, নরবলি দিয়ে সর্বশক্তিমান হয়েছে। তবে কি তাকে আটক করার সাধ্য কারোর নিকটে নেই! আমার মধ্যেকার পরিবর্তনগুলো সেদিকেই ইঙ্গিত করছে। কালো জাদু যেখান থেকে খুশি পছন্দের মানুষের ওপর অ্যাপ্লাই করা সম্ভব। একদা শোনা কথাটা আজ হয়তো বা টের পাচ্ছি। হিনমন্যতায় ভুগতে থাকা একটা মানুষ কতটা সাইকোপ্যাথ হতে পারে! বোধিসত্ব তার প্রমাণ।

মুঠোফোনের নোটিফিকেশনের আওয়াজে সেদিকে চোখ ফেরাতেই নতুন নম্বর থেকে আসা হোয়াটসঅ্যাপ ভিডিওটি ওপেন করি। আজানুলম্বিত কেশে, সেই বেতের চেয়ারে বসে আছে শঙ্খশুভ্র। পরনের রক্তিম বসনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ হল। হাতে ধরে রাখা সদ্য বলি প্রদত্ত নরমুন্ড থেকে রূধির ফোঁটাগুলো টপটপ করে পড়ে ওর পরিহিত বসনকে স্নাত করে তুলেছে। খসখসে আওয়াজ তুলে ওর কণ্ঠস্বর বলে উঠল, "ইউ ইউল বি ওয়েলকামড সুন টু মাই ল্যান্ড অফ্ ব্ল্যাক ম্যাজিক !"

পুনরাবৃত্তি

কঙ্কণা দাস

আমি সৌগত চ্যাটার্জি বেশ কিছুদিন ধরেই ফ্ল্যাট কিনবো খুঁজে চলেছি।দিব্যি কেটে যাচ্ছিল ভাড়াবাড়ীতেই। বাড়িওয়ালার কলেজপড়ুয়া মেয়ের সাথে ওই একটু চালিয়ে যাচ্ছিলাম আর কি। বিয়ে হয়েছে আমাদের তিনবছর হলো। পুরানো সম্পর্কে আমি হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। তাই স্বাদবদল। কিন্তু দিব্যি দিয়ে বলছি, যখন থেকে জানতে পেরেছি আমার স্ত্রী সন্তানসম্ভবা,তখন থেকেই একদম ভালো মানুষ হয়ে গেছি। বাড়ীওয়ালার মেয়ে তুলির দিকে আর তাকাই না।

স্ত্রী কিছু একটা আঁচ করেছিল হয়তো। তাই বাপের বাড়ির জমি বিক্রির টাকা দিয়ে আমাকে বার বার চাপ দিচ্ছিল নতুন ফ্ল্যাট বাড়ি কেনার। অনেকগুলো ফ্ল্যাট এই পাঁচমাসে দেখে নিলাম। কোনটা দামে পোষায় না আবার কোনটা পছন্দ হয় না। আজ অফিসের বেয়ারা রুবুর কাছে একটা ফ্ল্যাট বাড়ির খবর পেয়েছি। অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে স্ত্রী কে নতুন ফ্ল্যাট দেখতে যাবো। যদি পছন্দ হয় তাহলে কিনেই ফেলবো। হাতের কাজ গুলো তাড়া তাড়ি সেরে অফিস থেকে বেরোতে বেরোতে সোয়া চারটে হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি ট্যাক্সি ধরে বাড়ীর দিকে রওনা হলাম। আজ আবার মাঝরাতে ঘুমটা ভেঙে গেল নীলার। স্বামী রাজেন্দ্র তখনো কাজে ব্যস্ত পাশের টেবিলে।

টেবিলল্যাম্পের আলো বিছানা অবধি পৌঁছায় না। হাল্কা আলোর রেশ ঘরময় ছড়িয়ে আছে। কিন্তু নীলার খুব ভয় করছে। ভীষণ ভয়। কথা বলতে পারছে না ও। শিরশিরে ভয় ছড়িয়ে পড়ে ওর বাকশক্তি লোপ করে দিচ্ছে। রাজেন্দ্র শহরের নামকরা রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী। নীলা মানে নীলাঞ্জনা বসুর সাথে প্রায় সাত বছর আগে তার বিয়ে হয়েছে। বিবাহ প্রেমঘটিত। তবে প্রায় ১২ বছরের সম্পর্কে সময় বিশেষ ছাপ ফেলতে পারেনি। এখনো বাচ্চাদের মত ঝগড়া করে ওরা। আর নীলা মুখ ফুলিয়ে বসে থাকে। শেষ কালে গৃহযুদ্ধে জয়ী হয়ে রাজেন্দ্রর কোলে বসে আদরও খায়। বর্তমানে সাত মাসের সন্তানসম্ভবা সে। ইউএসজিতে জানা গিয়েছে, যমজ দুজন আসছে। তারা খুশী। এর মধ্যে লাথিও টের পাচ্ছে।

মিনিটদশেক কেটে যায়। নীলার ভয়ে দমবন্ধ লাগছে। এবার ও মরেই যাবে। হঠাৎ রাজেন্দ্র তাকায় মুখ তুলে। নীলা খাটে উঠে বসার চেষ্টা করে ভয় কাটিয়ে। পারে না। ওর হাতপা অবশ হয়ে আছে। ইন্টারনেট ঘেঁটে দেখেছে এটাকে স্লিপ প্যারালিসিস বলে। কিন্তু ওর ব্যাপারটা অন্য, আসলে গত কয়েকদিন ওর খুব ভয় করছে। একটা ছায়ামূর্তি রোজ ওর পেটের কাছে ঝুকে কি দ্যাখে। কে তা জানে না নীলা। শুধু জানে ওর ঘুম ভেঙে যায় রোজ ওইসময়টুকু ও নিঃসাড় হয়ে যায়। হাজার চেষ্টা করেও নড়াচড়া করতে পারে না। চোরা ভয়ের অনুভূতিতে শুধু শীত শীত করে ওঠে। আজও একই ব্যাপার। তবে রাজেন্দ্র অন্যদিন ঘুমায়। আজ জেগে আছে।

সেই কলেজ জীবন থেকে রাজেন্দ্রর জলদি ঘুমানোর অভ্যেস। তখন ওরা প্রেম করত চুটিয়ে। বাবার বিরাট ব্যবসা থাকায় রাজেন্দ্রর চাকরি বাকরি নিয়ে ভাবতে হয়নি কোনো দিন। বিয়ের প্রায় সাতবছর পর ওরা সন্তানের মুখ দেখতে চলেছে। রাজেন্দ্র উঠে আসে সোফা থেকে। "তুমি জেগে আছো?" তারপর ওর মাথায় হাত রাখে আলতো করে। "ঘুমিয়ে পড়ো, এখন জেগে থাকে না।" নীলার ভয়টা কেটে যায়। ও খসখসে গলায় বলে ওঠে, "একটু জল খাব"। রাজেন্দ্র জলের বোতল দ্যায় ওকে।

জল খেয়ে নীলা পাশ ফিরে শোয়। রাজেন্দ্র টেবিলল্যাম্প অফ করে ডিম লাইট জ্বালিয়ে শুয়ে পড়ে। নীলা রাজেন্দ্র কে জড়িয়ে শোয়। আসলে প্রায় সাতমাসের অন্তঃসত্ত্বা ও। সেভাবে জড়িয়ে ধরতে সাহস হয় না। যদি ঘুমের ঘোরে লেগে যায় পেটে। কিন্তু ভয় কাটানোর উপায় এইটাই এখন। সকালে উঠে রাজেন্দ্র কে ব্রেকফাস্ট টেবিলে সঙ্গ দেওয়া ছাড়া কাজ নেই। সারাদিন প্রেগন্যান্সির বইপত্র পড়ে, একটুআধটু ফ্রিহ্যান্ড করে। দুপুরে ঘুমায় যখন, তখন ভয় পায় না কিন্তু। রাত হলেই ভয় করে। সারাক্ষণ যেন একটা ছায়া ঘুরছে পিছনপিছন। কালকেই তো, রান্নাঘরে ঢুকেছে, পিঠে কার যেন গরম নিঃশ্বাস। অথচ কাজের মাসিও বাজারে গিয়েছে। বাড়ি একদম ফাঁকা। ঘাড় ঘুরিয়ে কারোকে দেখতে না পেয়ে সামনে ফিরেছে, আবার নিঃশ্বাস। ওই অবস্থায় প্রায় দৌড়ে রান্নাঘরে ঢুকে পড়ে ফিল্টারের আড়ালে লুকিয়েছিল খানিকক্ষণ। কাজের মাসি এসে অনেক ডেকে, বেল বাজিয়ে শেষে ডোরম্যাটের নিচে রাখা চাবি দিয়ে দরজা খুলেছে যখন, তখন ও ফিল্টারের পিছনে ঘুমিয়ে কাদা। কাজের মাসি এসব রাজেন্দ্র কে বলতে বারণ করেছে। রাজেন্দ্র আসলে ঘোর নাস্তিক। ভয়ের কথা শুনলে কি বলবে ঠিক নেই। নীলার পা ভেঙেছিল মাস আটেক আগে। মাঝে কিছুদিনের কথা নীলার মনে পড়ে না। কেমন যেন স্লেটে ভিজে

ন্যাকড়া বুলিয়ে মুছে দেওয়া সব। ডাক্তার বলেছেন সিলেক্টিভ অ্যামনেশিয়া। ও নাকি নিজেই ভুলে থাকতে চায় সব। ওর বেবিরা হওয়ার পরে ওষুধ দেবেন।

নীলার ঘুম আসছে না। বাথরুমে যাওয়ার জন্য ওঠে ও। অ্যাটাচড বাথ। রাজেন্দ্র পাশ ফিরে ঘুমাচ্ছে। টয়লেট সেরে ফিরতে গিয়ে দ্যাখে দরজা বন্ধ বাইরে থেকে। রাজেন্দ্রর নাম ধরে চেঁচায় ও। পিছনে কার যেন পা ঘষে এগিয়ে আসার শব্দ পাচ্ছে। শব্দটা ওর ঠিক পিছনে এসে থেমে যায়। দারুণ আতংকে ও দরজা আঁকড়ে ধরে, আর সেই সময়ে আচমকা লাইটটা অফ হয়ে যায়।

নীলার চিৎকার শুনে রাজেন্দ্রর ঘুম ভেঙে যায়। নীলা বিছানায় শুয়েই চিৎকার করে চলেছে হিস্টিরিয়া রূগীর মত। ওর গায়ে হাত দিতে গিয়ে বুঝতে পারে,ও বিছানায় পেচ্ছাপ করে ফেলেছে, ঘুমের মধ্যেই। নীলার কাঁথা পাল্টে দিয়ে রাজেন্দ্র উঠে ব্যালকনিতে যায়। সিগারেট ধরায় একটা। গত সাতবছর ধরে রাতের এই সিগারেটটা ওর ভীষণ দরকারি জিনিস একটা। ভয় বলে কোনো অনুভূতি থাকতে পারে, সাতবছর আগে জানত না ও। যদি না ওর জীবনে ওই ভয়ানক ঘটনাটা ঘটত হয়ত এখনও সব আগের মত থাকত। ব্যালকনিতে এই সময়টা একা দাঁড়িয়ে থাকে ও। স্লাইডিং দরজাটা টেনে দিয়ে লক করে দ্যায় ও। আসলে সে রাতের পরে এটাই ওর সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা রাতে।

ব্যালকনিতে রাখা চেয়ারে বসে পড়ে ও। দরজার ল্যাচ ধরে নীলা তখন টানাটানি করছে। কাঁচ হলে এতক্ষণে ভেঙ্গে ফেলত নির্ঘাত। ভোরের আলো না ফোটা অবধি এই ব্যাপারটা চলবে।ও গা এলিয়ে দ্যায় চেয়ারে।উল্টোদিকের ফ্ল্যাট বাড়িটার সব ঘর অন্ধকার। এত রাতে কে বা জেগে থাকে! বিয়ের প্রায় সাতবছর পরে নীলা যখন লজ্জা রাঙা মুখ নিয়ে এসে নিজের পেটে তার হাত ঠেকিয়ে ইশারা করেছিল, রাজেন্দ্রর পায়ের নিচে থেকে যেন মাটি সরে গিয়েছিল। কিভাবে হতে পারে? তিন বছরের মাথায় যখন প্রেগন্যন্সি এলো না তখন দুজনেই ডাক্তার চেক আপ করতে গিয়েছিল। কিন্তু রিপোর্ট টা দেখেই রাজেন্দ্রর মাথা ঘুরে গেছিল। নীলা সুস্থ, স্বাভাবিক। রাজেন্দ্র কোনদিন বাবা হতে পারবে না। এটা নীলাকে জানালে নিজের মুখটাই থাকতো না। তাই টাকা দিয়ে আসল রিপোর্ট চেপে নকল রিপোর্ট বানিয়ে নিয়েছিল। নীলাও খুশি ছিল। কিন্তু এই খবরে যেমন বিস্ময় তেমনই নিজের গালে নিজেই চড় মারতে ইচ্ছে হয়েছিল।

ইউএসজিতে দেখা গেল দুটি ভ্রূণ লালিত হচ্ছে নীলার দেহে। কিভাবে এর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায় আজকাল সেই চিন্তাতেই সব সময় মশগুল থাকে রাজেন্দ্র। নীলার তখন প্রায় সাতমাসের গর্ভাবস্থা। বাথরুমে পা পিছলে পড়ে

গেল সে। তাঁকে নাকি ছায়ামানুষ ধরবে। জ্ঞান হারানোর আগে এটুকু বলতে পেরেছিল সে। তার পর যমে মানুষে টানাটানি চলেছে কয়েকদিন। আশ্চর্যভাবে নীলা বেঁচে গেল। দুটি পরিপূর্ণ শিশুদেহ প্রায়, ডাক্তারবাবু তুলে দিয়েছিলেন রাজেন্দ্রর হাতে, বাস্কেটে ভরে। রাজেন্দ্রর হাত কাঁপেনি বললে ভুল হবে। হাজার হোক, সন্তান তো। বাড়ির থেকে একটু দূরে খালপাড়ে দাহকার্য করতে গিয়েছিল ও। যখন মাংসপোড়া গন্ধে ভরে যাচ্ছে চারদিক, রাজেন্দ্র গাড়ি স্টার্ট দিতে দিতে ফিরে তাকিয়েছিল একবার, বাচ্চাদুটোর চোখগুলো খুলে গিয়েছিল, ওরা যেন ওকেই দেখছিল ঘৃণাভরে। ভয়ে ওর হাত অবশ হয়ে গিয়েছিল। সন্ধ্যের অন্ধকারেও সেই আগুনের আলোতে ও দেখেছিল, শিশুদুটো হাত পা ছুঁড়ে খেলছে সেই আগুনের মধ্যে।

এরপরে সে তাঁর সেক্রেটারি কাম অঙ্কশায়িনীকে নেশা গ্রস্ত অবস্থায় অসতর্ক মূহুর্তে বলে ফেলেছিল কিভাবে বরাবরের ভীতু নীলাকে সে ভয় পাইয়েছে রোজ রাতে। নীলার স্লিপ প্যারালিসিস এর সুযোগ নিয়ে সে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থেকেছে রাতের পর রাত। ঘরে স্পিকার লুকিয়ে রেখে ভয় দেখিয়েছে, আর তারপর একদিন সেই ভয়েই নীলা বাথরুমে পড়ে যায়। সব শোনার পর তার সেক্রেটারি তার সাথে বাজে ব্যবহার করে তাকে ছেড়ে দ্যায়, চাকরীটাও। ওর তখন পাগল পাগল অবস্থা।

নীলা ভয়ানক শক পেয়েছিল, ও মনে করত ওর সন্তানরা এখনো ওর শরীরে বাড়ছে। আর এই বোধটা ওর চিরস্থায়ী হয়ে গেল। বহুবার চেষ্টা করেছে স্বাভাবিক করতে সবকিছু, হয়নি। কয়েকরাত যাওয়ার পরে বিষয়টা টের পেয়েছে ও। রাতে নীলা বিছানায় পেচ্ছাপ করে ফ্যালে, ঘুমের মধ্যেই। প্রথম মাস দশেক সব সাফ করত ও। করে শুয়ে পড়ত আবার। তারপর সেই অভিশপ্ত রাত। ঘরের মধ্যে বাচ্চাদের হাসির আওয়াজ শুনে চোখ মেলে দ্যাখে নীলা উঠে বসে আছে খাটের ওপর। আর দুটো বাচ্চা ঘরের মেঝেতে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে। রাত তখন আড়াইটে হবে। "নীলা আ" চিৎকার করতে তাকিয়েছিল নীলা ওর দিকে। চোখদুটো যেন কেউ পুড়িয়ে দিয়েছে ওর। সেই পুড়ে যাওয়া চোখের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে আগুনের লাল আভা। নাইট ল্যাম্পের আলোয় অপার্থিব দৃশ্য আরও ভয়ানক হয়ে উঠছিল আস্তে আস্তে। "আমি সবটা জানি,স-অ-বটা" নীলা হিসহিস করে বলে উঠেছিল।

ছিটকে দরজার দিকে যেতে গিয়ে দেখেছিল দুটো বাচ্চা দরজার কাছেই বসে। সুতরাং ব্যালকনিতে গিয়ে দরজা আটকেছিল ও। চেপে ধরেছিল সারারাত

দরজাটা। ভোরে যখন হাল্কা আলো ফুটছে দরজাটা খুলে দিয়েছিল সাহস করে। ঘরে আলো ঢুকতেই বাচ্চাদুটো হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে গিয়েছিল নীলার শরীরে। মনের ভুল ভেবেছিল ঘটনাগুলোকে। রাত পর্যন্তই। রাতে আবার ব্যালকনিতে। নীলার মা বাবা অনেক আগেই মারা গিয়েছিলেন। ওর দাদা হুমকি দিয়েছিল পুলিশ কমপ্লেনের। সুতরাং নীলাকে বয়ে বেড়ানো ছাড়া উপায় ছিল না ওর।

ধীরে ধীরে হামাগুড়ি থেকে টলোমলো পায়ে হাঁটতে শিখেছে ওরা। রাজেন্দ্র আতংকিত চোখে দেখেছে। ব্যালকনির দরজাটাকে কাঠের বানিয়েছে লোক ডেকে। মাঝরাতে ফ্ল্যাটের বাইরে যাওয়া সম্ভব না, আর ওরা গোটা ফ্যাটে খেলে বেড়ায়। এখন ওরা দৌড়ঝাঁপ করে, নীলা মাঝে মাঝেই দরজা নাড়া দ্যায়। ওকে ডাকে "অ্যাই শুনছ, পিকাই আর বাবাই কি সুন্দর খেলছে, কি সুন্দর পড়া বলল"। ভোররাতে নীলা ঘুমিয়ে পড়ে, ওদের শরীরের মধ্যে নিয়ে।

রাজেন্দ্রকে আজ নীলা ডাকছে আবার "অ্যাই শোনো না, এসো না ঘরে, আজ ওদের সাতবছর হল, ওরা আজ চলে যাবে, আর আসবে না"। ভারী মিষ্টি করে ডাকছে নীলা। সত্যিই ত, আজ সেই ঘটনার সাতবছর। "ওরা আর রাগ করে নেই তোমার ওপর, তুমি তো ওদের বাবা"। রাজেন্দ্র যেন মায়াচ্ছন্ন করে ফেলছে, ঘরের ভিতর থেকে ছেলেদুটো ডাকছে "বাবা, ও বাবা,একবার খোলো দরজা"। ও পকেট থেকে চাবি বের করে খুলে ফ্যালে দরজা। ভিতরে তিনজোড়া চোখ ধিকিধিকি জ্বলছে, মাংসপোড়ার গন্ধটা নাকে লাগতেই সংবিৎ ফেরে ওর। ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে, ওকে গ্রাস করেছে আগুন। পোড়ার যন্ত্রণায় চিৎকার করতে করতে যখন ও ছতলার ব্যালকনি থেকে ঝাঁপ দিচ্ছে তখনও কানে বাজছে "বাবা,বাবা—বাবা"।

পুলিশ পরে ফ্ল্যাট থেকে এক মহিলার কঙ্কাল উদ্ধার করে, প্রায় ছবছরের পুরনো। রাজেন্দ্রর মৃতদেহের মুখটা বিশ্রীভাবে পুড়ে গিয়েছিল। সন্তানরা মুখাগ্নি করেছিল তো! সে প্রায় বছর পাঁচেক আগের ঘটনা। ভদ্রমহিলা এতটুকু বলে থামলেন। "আমি এই ফ্ল্যাটবাড়ির ছতলায় থাকি।" আমি আর আমার সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর সামনে দিয়ে সিঁড়িতে উঠতে উঠতে মৃদু হেসে বললেন তিনি। দুটি এগারো-বারোর কিশোর উঁকি দিচ্ছিল সিঁড়ির মুখ থেকে। ভদ্রমহিলাকে উঠতে দেখে "মা" বলে এগিয়ে এল।

"দিদি,আপনার নামটা?"

"নীলাঞ্জনা, তোমরা নীলাদি ডেকো, কেমন?"

কম পাওয়ারের বাল্বের আলোয় দেখতে পেলাম,বাচ্চাদুটোর হাতগুলো পুড়ে কালো হয়ে যাওয়া!

অতীন্দ্রিয় ও দিব্যদৃষ্টি

মৌ চ্যাটার্জী ভট্টাচার্য্য

অনেক মানুষের বোধ হয় একটা অতীন্দ্রিয় শক্তি থাকে, মানে তিনি অনেক কিছু বেশি দেখেন যা অন্য কেউ দেখতে পায় না। অনেকের কাছেই এমন শুনেছি যারা এই ক্ষমতা নিয়ে জন্মায়, তারা নাকি অতীত দেখতে পায়, কেউ বা স্বপ্নে ভিন্ন এক আধিভৌতিক জগৎ দেখেন, ভবিষ্যতে কি ঘটবে তার আভাস পান, অথবা কেউ কেউ বুঝতে পারেন বিপদের আগমনী বার্তা। অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা বলতে সত্যিই কিছু আছে কিনা অবশ্য জানি না। কিন্তু এমন অনেক ঘটনা আছে যার ব্যাখ্যা বিজ্ঞান এখনও দিতে পারেনি।

আমি কোনো তর্কের মধ্যে যেতে চাই না, আপনারা আপনাদের মতো করে গ্রহণ করবেন, আমি শুধু আমার শোনা দুজন মানুষের গল্প বলবো আজ। আমার বন্ধু সুমনার ছোটোমাসি ছয় মাসের জন্য বিদেশ গেলো যেবার, সেবার যাবার আগে তাঁর শ্বশুর ও তেনার মাসতুতো ভাই কালিকা দাদুকে দিদির বাড়ি মানে সুমনাদের বাড়ি রেখে দিয়ে গেলো.. বলে গেলো, -"দিদি দেখিস যত্নআত্তি ঠিকঠাক করিস যেন, যতোই হোক বুড়ো মানুষ, আর ওষুধপত্তরগুলো টাইম করে দিয়ে দিস। আমি সব লিস্ট করে তোর ব্যাগে রেখে দিয়েছি।"

কালিকাদাদু ছোটোমাসির বাড়িতেই থাকতেন.. মানুষটা বড়ো অদ্ভুত, বিয়ে থা করেন নি, স্বাত্তিক টাইপ , মাঝে মাঝে ধ্যানে বসেন এবং প্রায় ৩/৪ ঘন্টা ওইভাবে বসে থাকেন নড়াচড়া বন্ধ করে। চোখের দৃষ্টিও কেমন যেন, ভয় ভয় লাগে তাকিয়ে থাকলে... থেকে থেকেই নিজের মনে একলা কাদের সাথে কথা বলেন-- মনে একটা বেশ ভুতুড়ে অনুভূতি হয় ওনাকে দেখলেই। আমরা ছোটরা পারতপক্ষে এড়িয়ে চলি। এই কালিকাদাদুকে নিয়েই দুটো ঘটনা বলবো।

সুমনাকে বাড়িতে পড়াতে আসতেন আমাদের স্কুলের জয়তীদি। আমিও ওদের বাড়িতে পড়তে যেতাম। সেদিনও যথারীতি দিদি এসেছেন। সুমনার মা চা দিতে গিয়ে ওনার সাথে গল্প গুজব করছেন, আমি আর সুমনা ফাঁক পেয়ে খাতায় কাটাকুটি খেলছি। এমন সময় কালিকাদাদু বাইরে থেকে হেঁটে ফিরলেন। মা দাদুর সাথে জয়তীদিকে আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন,"জানেন ম্যাডাম, দাদু কিন্তু

মানুষের মুখ দেখে অনেক কিছুই বলে দিতে পারেন। খুব জ্ঞানী গুণী মানুষ আমাদের কালিকা দাদু।" জয়তীদি হোহো করে হেসে উঠলেন। তারপর ঘোর অবিশ্বাসীর গলায় বলে উঠলেন,'তাই বুঝি, তাহলে বলুন তো আমার বিয়েটা ঠিক কবে হবে?'

দাদু একদৃষ্টে তাকিয়েছিলেন দিদির মুখের দিকে, তারপর বিড়বিড় করে বললেন, "বিয়ে তো কবেই হয়ে গেছে, ডিভোর্সও, আর তো বিয়ের যোগ নেই, যদি জোর করে করো তো দুর্ভোগ হবে।" বাজ পড়লে যেমন চমকে ওঠে লোকে তেমনি চুপ হয়ে গেলেন দিদি, তারপর "শরীর খারাপ লাগছে" বলে বাড়ি চলে গেলেন। আর এমুখো হলেন না শেষে সুমনাকে পড়ানোই ছেড়ে দিলেন। নিশ্চয়ই কথাগুলো সত্যি ছিল নাহলে ওইভাবে রিঅ্যাক্ট করতেন না দিদি। কিন্তু কিভাবে জানলেন দাদু বলুন তো, উনি তো দিদিকে চিনতেনই না, তবু ওনার অতীত দেখতে পেলেন, কিভাবে?

আর একবার সন্ধ্যেবেলা ছাদে সুমনারা ভাইবোন মিলে খেলতে খেলতে দেখলো দাদু আলসের ধারে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছেন সামনের দিকে আর বিড় বিড় করে কাকে যেন কি বলছেন, কাছে যেতেই কানে গেলো, -"বেশ তো বসে বসে দোল খাচ্ছ! আর কতোকাল? এবার তো মুক্তি নাও।" ওরা ভয় পেয়ে দুড়দাড় করে নিচে নেমে এসে মা কে বলতেই মা উঠে এলেন ছাদে। দেখলেন দাদু তখনও বিড় বিড় করে চলেছেন। কিছুক্ষণ পর দাদু স্বাভাবিক হতেই মা কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, -"কাকে বলছিলেন দাদু ওসব, কার সাথেই বা কথা বলছিলেন?" কালিকাদাদু অনেক্ষন চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন, "এই বাড়িতে কেউ একজন ঘুরে বেড়ায়, লম্বা, ফর্সা, টিকোলো নাক, অনেক বার দেখেছি, সুইসাইড করেছিল তো আজও মায়া ছাড়তে পারে নি। আজ ছাদের আলসেতে বসেছিল দেখলাম। তাই তাঁর সাথেই কথা বলছিলাম। তোমরা ভয় পেয়ো না, কিছু করবে না ও কাউকে, এই বাড়িকে বড়ো ভালোবাসে ও। মায়ায় জড়িয়ে আছে। মুক্তি নেই।"

বিস্ফারিত চোখে সুমনার মা বলে উঠলেন,"এই বাড়ির ছোট ছেলে নয় তো! ঠিক অমনই তো দেখতে ছিল! কলেজে পড়তে পড়তে একটি মেয়েকে ভালবেসেছিল। কিন্তু মেয়েটি ধোঁকা দেওয়ায় সহ্য করতে পারেনি ও, শেষে সুইসাইড করেছিল। আমার তখন সদ্য বিয়ে হয়েছে। কিন্তু আপনি এসব জানলেন কি করে দাদু?" বিড়বিড় করে উঠলেন দাদু, "সে আছে, সে আছে, আজও আছে এখানে।" আর কোনো উত্তর না দিয়ে দাদু ছাদের এক কোণে

বসে ধ্যানমগ্ন হলেন আবার। তবে কি দাদু অতীতকে দেখতে পেতেন? নাহলে বহুবছর আগে মৃত হয়ে যাওয়া একটি মানুষের অস্তিত্ব তিনি বুঝলেন কি করে! আমাদের কাছে তো কোনো উত্তর নেই! আপনারা কি বলেন?

এ তো গেল কালিকাদাদুর গল্প, এবার বলবো অন্য আর একজনের গল্প। দেখুন, জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাস করবো নাকি করবো না, এর প্রতি কি সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্বাস রাখা যায় নাকি সবটাই মেকি। এটা নিয়ে অবিরত তর্ক চালিয়ে যাচ্ছে মানুষ। না না এত তর্কের মধ্যে আমি যেতে চাই না। আমার নিজের জীবনে দেখা একটা ঘটনা শেয়ার করবো আজ। তবে তার আগে একটা কথা বলে নি, আমি বিশ্বাস করি যে ভাগ্য কোনদিন পরিবর্তন করা যায় না। আজকাল কিছু লোভী ও ভন্ড জ্যোতিষী 'দুই মিনিটে ভাগ্য ফেরান' এসব লিখে সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করে। সমস্যায় জর্জরিত মানুষ নিজের অজ্ঞতার কারণে এদের পাল্লায় পরে আর ঠকে যায়। আর মানুষ যদি নিজের অজ্ঞতার কারণে কোন জ্যোতিষীর কাছে গিয়ে ঠকে যায়, তাহলে দোষটা সে নিজেকে দেবে না, দেবে জ্যোতিষশাস্ত্রকে... ঠিক কিনা? ভনিতা ছেড়ে এইবার আসল গল্পটা বলি তোমাদের। জানি না এইটাকে তোমরা কি বলবে ভৌতিক না আধিভৌতিক।

আমার এক পিসতুতো বোনের বিয়ের পর বার বার মিসক্যারেজ হতে থাকে। দুবার এমন হবার পর ভীষণ আপসেট হয়ে পরে দুই পরিবারের কর্তা গিন্নী। বড়ো বড়ো ডাক্তার দেখানো হয়। সব ডাক্তারই যথারীতি অনেক ধরণের টেস্ট করতে দেয়। আল্ট্রা সোনোগ্রাফি থেকে ব্লাড টেস্ট, কোনো কিছুই বাদ পড়ে না। আমার পিসেমশাই জ্যোতিষ-টোতিষ খুব মানতেন, তাবিজ, পাথর ইত্যাদিতে অসম্ভব বিশ্বাস করতেন। নিজেও কিসব গাছের মূল হাতে, গলায় বেঁধে ঘুরতেন। ঠিক ওনার মতের উল্টো ছিল বোনের শ্বশুরবাড়ির লোকজন। বোনের শ্বশুরমশাই তো একদম বুজরুকি বলে উড়িয়ে দিতেন সমস্ত কিছু। সে যাই হোক, পুজোর ঠিক কয়েকমাস আগে, সম্ভবত আগস্ট মাস ছিল। পিসেমশাই, কার কাছ থেকে কোন এক জ্যোতিষাচার্যের খুব নাম শুনে মেয়ে-জামাইকে নিয়ে যাবেন স্থির করলেন তাঁর কাছে। আমাকে ফোন করে বললেন,"বিনু তুই বোনের সাথে চল না। তোরা তো বন্ধুর মতো দুজনে, সাথে থাকলে ও একটু সাহস পাবে। তোর পিসী তো বেতো রুগী, জানিসই তো হাঁটতে পারবে না।" নানারকম গালগল্প শুনে জ্যোতিষার্ণবকে দেখার খানিকটা কৌতুহল ছিলই তাই পিসে বলতেই রাজি হয়ে গেলাম। পরদিন বিকেলে মেয়ে-জামাইকে নিয়ে উনি পৌঁছে গেলেন তাঁর বাড়ি। সঙ্গে ভাঙা কুলোর মতো গেলাম আমিও।

জ্যোতিষাচার্য্যর বাড়ি ছিল শোভাবাজারের কোনো একটা রাস্তায়. ওনার নাম বলছি না তবে উনি ২/৩ বছর হলো মারা গেছেন। আমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট করাই ছিল। গিয়ে দশ মিনিট বসতে না বসতেই ডাক এলো ভেতর থেকে। ঢুকে দেখলাম ফর্সা টুকটুকে রঙ, সৌম্য চেহারার বয়স্ক একজন মানুষ, দেখলে সমীহ জাগে বৈকি। যাই হোক মন দিয়ে ওদের সমস্যা শুনলেন, তারপর বোন ও ভগ্নিপতির কুন্ডলি দেখতে চাইলেন, জন্মসাল, সময় এইসব টুকি টাকি জানতে চাইলেন। আমি তো হাঁ করে চেয়ে আছি ওনার দিকে, কি জানি কি অঘটন ঘটে। অনেকক্ষন কি সব দেখলেন তারপর বললেন, 'কি কি জিজ্ঞাস্য আছে আপনাদের আগে বলুন, তারপর আমি সব বলবো।"

সব কথাবার্তা দরকার নেই তাই জানাচ্ছি না, মূল কয়েকটি প্রশ্ন ও উত্তর লিপিবদ্ধ করছি শুধু। পিসের ইচ্ছেয় আমিই কথা শুরু করলাম, বললাম, 'গুরুজী আগে বলুন আমার বোনের কি কোনোদিনই বাচ্চা হবে না? এই নিয়ে দুবার মা হলো কিন্তু বাচ্ছা ধরে রাখতে পারলো না। খুব মনোকষ্টের মধ্যে আছে।' উনি বললেন, 'কে বললো হবে না, পুজোর মধ্যেই ভালো খবর পাবে, টান এসে গেছে তো।' খুবই অবাক হলাম, বলে কি! না ঢাক, না বাদ্যি, কোনো লক্ষণই নেই! যত্তোসব ভড়ং! অবশ্য মুখে কিছু বললাম না। আরো টুকি টাকি নানা কথাবার্তার পর চলে আসবো বলে উঠেছি, উনি জামাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দেখো বাবা, তোমার ছক দেখে বুঝতে পারলাম তাই বলছি সামনের ডিসেম্বর মাসটা একটু সাবধানে থেকো, গুরুদশা আছে তোমার, মা কিংবা বাবাকে হারাবে তুমি, সামলাতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না, যাবেই, তবু যদি সামলে যায় কোনোক্রমে তবে দীর্ঘজীবী হবেন তিনি।"

এইবার আরও অবাক হলাম। একদম সুস্থ দুজন মানুষ, তাদের মধ্যে একজন মারা যাবেন আর ২/৩ মাসের মধ্যে, সেটা উনি জানতে পারলেন! আশ্চর্য তো! সত্যি বাবা, মানুষকে ভয় দেখাতেও পারেন এরা। গুরুত্ব দিলাম না, বাড়ি ফিরে এলাম, জামাই কিন্তু খুব ভেঙে পড়লো মনে মনে। আমরা বোঝালাম অনেক করে 'তুমি ছাড়ো তো, জ্যোতিষীরা অমন অনেক কথাই বলে, ভয় দেখায়। যতো সব বোগাস।'

-"না না দিদি, উনি খামোখা ভয় দেখাতে যাবেনই বা কেন? উনি তো পাথর, শিকড় বাকড়, যাগযজ্ঞ সংক্রান্ত কোনো কথা বলেন নি যে টাকা নেওয়ার অছিলায় মিথ্যে বলবেন।" কথাটা যুক্তিযুক্ত লাগলেও মনকে বোঝাতে পারলাম না। কিন্তু যে কারণের জন্য এই গল্পের উপস্থাপনা সেইটা এইবার বলি।

সত্যিই সত্যিই পুজোর পর জানা গেলো আমার বোন মা হতে চলেছে এবং সেই বেবি হলোও সুন্দর ভাবে যদিও ডাক্তারদের পরামর্শে বেড রেস্ট এ থাকতে হয়েছিল শেষ ৫ মাস। আর দ্বিতীয় ভবিষ্যবাণী? সেটাও অদ্ভুতভাবে ফলে গেলো, ডিসেম্বর এর মাঝামাঝি ম্যাসিভ হার্ট এট্যাকে চলে গেলেন বোনের শ্বশুরমশাই। অদ্ভুত না?

সবগুলো তো বলি নি, সেই জ্যোতিষাচার্য্য সেদিন যেকটি কথা বলেছিলেন সব কটিই কিন্তু অদ্ভুত ভাবে মিলে গেছিলো। আমি আজও জানি না কিভাবে এত নিঁখুত বর্ণনা দিয়েছিলেন উনি। সেই দৃষ্টিশক্তি মানে দিব্যদৃষ্টি হয়তো ছিল তাঁর যেটা আসলে অনেকেরই থাকে না।

মৃত্যুগন্ধী

মৌমিতা ভৌমিক চৌধুরী

হাতের কোল্ড ড্রিংকসের গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রেখে দ্বৈপায়ন জিজ্ঞেস করলো,"ব্যাপারটা কি রে?এসে থেকে দেখছি তোর চার্জ নেই।এনিথিং সিরিয়াস? কি হয়েছে তোর?" সাম্য একটু ইতঃস্তত করে বললো,"জানি না আমি যা বলতে চলেছি সেই কথাগুলো তোদের বিশ্বাস হবে কিনা।না হওয়ারই কথা যদিও।আমিও প্রথমে বিশ্বাস করতে পারিনি জানিস।কিন্তু এখন তোরা আসার পর মনে হচ্ছে বলতেই হবে। যত সময় যাচ্ছে।" আবীর এবার অধৈর্য্য হয়। "কি হয়েছেটা কি খুলে বলবি একটু? মাথামুণ্ডু কিছুই তো বুঝতে পারছি না।"

"ঠিক। সবটা খুলেই বলছি তোদের। তারপর বুঝবি আজ কেন তোদের এই জরুরি তলব।

দিনকয়েক আগে আমাদের হসপিটালে এক বৃদ্ধা ভর্তি হন এমার্জেন্সিতে। আমার সেদিন অফ ছিল,কিন্তু ওয়ার্ড বয় সুপ্রিয়র মুখে শুনলাম ওটা 'ডাইনি কেস'।"

"ডাইনি কেস?"

"হুম। এখনও রাঢ় বাংলার কিছু কিছু জায়গার মানুষদের মধ্যে ডাইনি-রাক্ষসী এইসব বিশ্বাস প্রবল। বিশেষতঃ কোনো একা সহায়হীনা বৃদ্ধা হলে তো তাকে দাগিয়ে দেওয়া আরোও সোজা।"

"আনবিলিভেবল!" আবীরের গলায় বিস্ময়ের সুর স্পষ্ট।

"হুম। কখনোসখনো এরকম একটা আধটা কেস চলে আসে মিডিয়ার সামনে। ব্রুটালি টরচারড বাই দ্য মব। অধিকাংশ সময় হসপিটালে আনার আগেই মারা যায়। সেসব তোরা নিউজপেপারেও পড়েছিস নিশ্চয়ই।"

"বার্বারিক। তারপর?"

"পরের দিন আমার নাইট শিফট ছিল। সেরাতে অ্যাজ ইউজুয়াল রাউন্ডে গিয়ে দেখি ওয়ার্ডের একদম শেষে, যেদিকটা দিয়ে স্টোরের রাস্তা গিয়েছে সেখানে দেখলাম একটা বেড ফেলা হয়েছে। একটু আশ্চর্য হলাম। অতিরিক্ত বেডের দরকার ছিল না দেখছি। একটা বেড তো ফাঁকাই পড়ে আছে অলরেডি।

তাহলে এই নতুন বেডের ব্যবস্থা কেন?তাও আবার এইরকম জায়গায়! মল্লিকা, আই মিন আমার সাথের নার্সের কাছে শুনলাম ওই বৃদ্ধাকে ইন্টারনাল কোন চোট-আঘাত না থাকায় জেনারেল বেডে শিফট করা হয়েছে আজ বিকেলেই। এদিকে ওনার দুর্নামের কারণেই অন্য পেশেন্টরা তো বটেই, এমনকি কিছু স্টাফরাও নাকি ওনাকে আলাদা রাখারই পক্ষপাতী। মল্লিকাকে বললাম, "সেকি? শুধু একটা অন্ধবিশ্বাসের জন্য একজন পেশেন্টকে তোমরা আলাদা করে দেবে? কোথায় অন্য পেশেন্টপার্টিকে তোমরা বোঝাবে, তা না করে। আর মেট্রন কই? তার এসব খেয়াল নেই কেন কিছু? ডাক তাকে, আমি এখনই কথা বলছি।" মল্লিকার মুখটা কাঁচুমাচু হয়ে উঠে। "স্যার, আমি না, আমি না। সত্যি বলছি। হেড সিস্টার আসলে, মানে... আর অন্য পেশেন্টরাও ভয় পাচ্ছিলো তাই..." মল্লিকা বেশ থতমত খেয়েছে বোঝা যাচ্ছে।

ওকে আর কিছু না বলে, ওর হাত থেকে পেশেন্টদের চার্টগুলো নিয়ে চোখ বোলাতে বোলাতে ভাবলাম নাহ্, স্যারের সাথে কথা বলতেই হবে, এদের মধ্যেই এত কুসংস্কার এখনও। যাইহোক কয়েকজন পেশেন্টের কাছে ঘুরে যখন ওই বৃদ্ধার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, কেন জানি না গাটা একটু ছমছমও করে উঠলো। এদিকটায় আলো সেভাবে আসে না। ওয়ার্ডের টিউবগুলোর থেকে আসা ক্ষীণ আলোই ভরসা। স্টোরের দিকের দেওয়ালটার আড়াল পড়ায় আবার একটা ঘন ছায়ারও সৃষ্টি হয়েছে বেডের অর্ধেকটা জুড়ে। সেই আলো আঁধারির লুকোচুরি খেলার মাঝেই ওনার দিকে চোখ পড়লো আমার। ছোটোখাটো দুমড়ানো চেহারা। গোল ছোট্ট মুখটায় যেন অজস্র বলিরেখারা কাটাকুটি খেলছে। মাথায় মেরেকেটে চার পাঁচ গাছা শণের নুড়ির মতো চুল অবশিষ্ট। কোটরাগত চোখের চারপাশে কে যেন গাঢ় এক পোঁচ কালি লেপে দিয়েছে। গায়ে কালসিটে দাগ।

পাশে দাঁড়ানো নার্সের খোঁজ করতে গিয়ে দেখি সে নেই। ওর জন্য আর অপেক্ষা না করেই নিজেই বৃদ্ধার শীর্ণ মণিবন্ধ হাতে তুলে নিলাম। পালস রেট খুব ক্ষীণ। মাঝেমধ্যেই পালস বিট মিস হচ্ছে। আমি হাতটা ধরায় একটু যেন কেঁপে উঠলো ওনার শরীরটা। যতটা সম্ভব সাবধানে ওনার হাতটা নিচে নামিয়ে রাখলাম। থাক, রেস্ট নিক। একটা অজানা সহানুভূতিতে ভরে গেল মনটা। পিছন ফিরলাম ওয়ার্ডের অন্যদিকটায় যাব বলে, এমন সময় কিছু একটা ফিলিংস হলো জানিস। সেটাকে ঠিক কি বলা চলে আমার জানা নেই। ধর কেউ তোর দিকে তাকিয়ে আছে,সেটা তুই অন্যদিকে তাকিয়ে থাকলেও ঠিক টের পাবি দেখবি। সেরকমই আমার সিক্সথ সেন্স যেন আমাকে অ্যালার্ট করলো।একটা কনশাসনেস আমাকে পিছন ফিরতে বাধ্য করলো।

পিছন ফিরেই দেখলাম ওই বৃদ্ধা উঠে বসেছেন। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন আমার দিকেই। সে দৃষ্টিতে কি যেন একটা ছিল। একটা ক্রুর, কঠিন অথচ লোভী সরীসৃপ যেন খেলা করে বেড়াচ্ছিল ওনার দুই চোখে। মানে, চোখে যেন একটা রাগ রাগ ভাব অথচ একটা ধূর্ত হাসিও খেলে বেড়াচ্ছে একইসাথে। আমি তোদের ঠিক বোঝাতে পারবো না কি যে ছিল সেটা।

ওনাকে আবার শুয়ে পড়ায় নির্দেশ দিতে যাব, এমন সময় আমাকে অবাক করে উনি মৃদু হেসে বলে উঠলেন, "বাবু,তু ভালো লোক আছিস বটে। মোর লাগি তুর মনটা বিকলালো।" বলতে বলতে যেন ওনার চোখ চকচক করে উঠল। ডানহাতের তর্জনীটা তুলে ইশারায় যেন আমাকে ডাকলেন তার কাছে। কিছু বলবেন ভেবে আমি তার দিকে একটু এগিয়ে যেতেই হঠাৎ খপ করে ধরে ফেললেন আমার হাতটা। সেই লোলচর্ম মুখে বসানো চেরা চেরা চোখদুটো আমার চোখের উপর স্থির। আমিও কেমন যেন একটা মন্ত্রমুগ্ধের মতোই তাকিয়ে ছিলাম ওনার চোখের দিকে। কিরকম একটা তীব্র আকর্ষণ যেন জোর করে আমার চোখ দুটোকে টেনে রেখেছিল, কেমন যেন নিজেকে সম্মোহিত মনে হচ্ছিলো। কয়েক মুহূর্ত পরে সম্বিত ফিরে পেতেই জোর করে নিজের হাতটা টেনে নিতে চাইলাম ওনার হাত থেকে। কিন্তু আমাকে অবাক করলো ওই বৃদ্ধার গায়ের জোর। ওই শীর্ণ হাতদুটোতে সে এত শক্তি পেল কি করে!

"আরে, হাতটা ছাড়ুন। কি করছেন?"

কিন্তু হাত ছাড়ার বদলে তিনি আরোও জোরে আমার হাতটা চেপে ধরলেন। মিথ্যে বলব না ওই লাইটের দপদপানি, আলো আর অন্ধকারের লুকোচুরি, সবটা মিলিয়ে আমার গাটাও কেমন যেন একটা ছমছম করে উঠেছিল জানিস। কিরকম একটা আনকানি ফিলিংস হলো ঠিক বলে বোঝাতে পারবো না তোদের। হঠাৎ শুনতে পেলাম পিছন থেকে কার গলা। কে যেন বলতে বলতে ঢুকছে, "ছাড়ান দে সাহেবকে। ছাড়ান দে এহনি।" পিছনের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম সুপ্রিয় ঢুকছে। কোনো কাজে বোধহয় স্টোরের দিকে যাচ্ছিল, আমাকে এই অবস্থায় দেখে ছুটে এসেছে।

যাই হোক। বৃদ্ধার দৃষ্টি এইবার ঘুরে গেল সুপ্রিয়র দিকে। সে দৃষ্টির বর্ণনা দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। তীব্র একটা রাগ, ঘৃণা ফুটে বের হচ্ছিলো তার দুচোখ দিয়ে। তার সমস্ত দেহটা কাঁপছিল রাগে। আমার হাত তখনও ধরা বৃদ্ধার মুঠোর মধ্যে। সুপ্রিয় এইবার এগিয়ে এসে টেনে ধরলো বৃদ্ধার হাতটা। দুজনের টানাটানির চোটেই বোধহয় বৃদ্ধার মুঠো আলগা হয়ে এল। হাতটা

ছাড়িয়ে দেখলাম চাপ চাপ দাগ ফুটে উঠেছে এইটুকু সময়েই।নখের আঁচড়ও লেগেছে বোধহয়, জ্বালা জ্বালা করছে।

সুপ্রিয় ইতিমধ্যে ওদের ভাষায় তেড়েমেরে উঠেছে বৃদ্ধাকে, "তুর তো গেদে সাহস! ডাক্তার সাহেবের হাতটো ধরিছিস।" আমিই নিরস্ত করলাম ওকে। "ছেড়ে দাও।বয়স্ক মানুষ।" সুপ্রিয় দেখলাম ছাড়ার পাত্র নয়। বৃদ্ধাকে তেড়ে শাপ শাপান্ত করে চলেছে। হঠাৎ দেখলাম বৃদ্ধার রাগত দৃষ্টির জায়গায় ক্রূর, সর্পিল সে দৃষ্টির ছায়া আবার ঘনিয়েছে তার দুচোখে। ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠেছে সেই বাঁকা হাসি। মুখ খুললো সে, "তু মর্যে যাবি। তুর আয়ু নাই।" সুপ্রিয় এই কথায় আরোও খেপে গেল। "তবে রে। তু মুকে শাপ দিলি?" আমি সেদিন টেনে না ধরে রাখলে সুপ্রিয় বোধহয় বৃদ্ধাকে গিয়ে মেরেই দিত ঘা কতক। "সুপ্রিয়!" ধমকালাম ওকে। "কি হচ্ছে এসব পেশেন্টের সাথে? বয়স্ক মানুষ, মেন্টাল স্টেটটাও দেখ। বলেছে তো কি হয়েছে? বললেই কি তুমি মারা যাচ্ছ নাকি? তোমাকে কিন্তু আমি অন্য চোখে দেখতাম। তুমিও এইসব কুসংস্কারে বিশ্বাস কর নাকি?" সুপ্রিয় প্রবলবেগে মাথা নেড়ে আমার কথার প্রতিবাদ করতে যাবে, এমন সময় বৃদ্ধা আবার মুখ খুললেন, "তু নয়। উ মর্যে যাবে বটে।" আমি দেখলাম তার ঠোঁটে সেই রহস্যমাখা হাসি এবং আমাদের দুজনকে টপকে বৃদ্ধার শীর্ণ তর্জনী নির্দেশ করছে দরজার দিকে। পিছন ফিরে দেখলাম সেখানে দাঁড়িয়ে আছে মল্লিকা।

লক্ষ্য করলাম মল্লিকার মুখ ভয়ে কাগজের মত সাদা হয়ে গেল নিমেষেই। ও কি একটা যেন বলতে চেয়েও বলতে পারছে না। ঠোঁটদুটো কাঁপছে অল্প অল্প। বুঝলাম এতক্ষণের কথোপকথন ও সবটাই শুনেছে। "ইইই, ডাইন না ছাই। উয়ার কথায় তু মনটো খারাপ করিস কেন? শয়তান বুড়ি। নিজের লাতিটারে বাদাড়ের গুণিনের ফুলপাতা গিলিয়া মের্যে ফেল্যে ফের সেন্টের কথা বলিতে লাগিছে। তু ইর কথা ধরিসনে মোটে।" দেখলাম সুপ্রিয় মল্লিকাকে সান্ত্বনা দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। মল্লিকা থরথরিয়ে কাপছে তখনও। মল্লিকার অবস্থা দেখে আমার তখন ভীষণ বিরক্ত লাগছিল জানিস। ভাবছিলাম কি অবস্থা এদের। এত কুসংস্কার এখনও। নিষ্ফল একটা রাগ কুড়েকুড়ে খাচ্ছিল আমার ভিতরটা। একজন বৃদ্ধাকে ডাইনি অপবাদে অত্যাচার করতে এদের বিবেকে বাঁধে না, এবং তথাকথিত শিক্ষিতরাও এই বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের যুগেও সেসবে বিশ্বাসটা ঠিক করেই চলেছে। রাগে বেরিয়ে এলাম ওখান থেকে। ওয়াশ বেসিনের কল খুলে চোখেমুখে জল দিলাম, একটু বেটার ফিল করলাম কিন্তু মাথার রগদুটো তখনও বেশ দপদপ করছে বুঝতে পারছিলাম।

পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছতে না মুছতেই দেখি সুপ্রিয় এসে হাজির, "স্যার,আপনি রাগ করেছেন?"

"ওসব থাক। তবে তোমাকে অ্যালার্ট করছি কোন পেশেন্টের সাথে এইরকম বিহেভিয়ার ভবিষ্যতে যেন না হয়। নাহলে আমি নিজে কমপ্লেইন করবো মনে থাকে যেন।"

"ঠিক আছে স্যার।" সুপ্রিয়র গলা মিনমিন করে।

একটু থেমে দম নেয় সাম্য। ঘরের অন্য দুজন সদস্য তখন চুপ। ওদের দিকে তাকিয়েই আবার শুরু করে সে।

"সুপ্রিয় ছেলেটা এমনি ভালো জানিস তো। আমাকে খুব ভালোবাসে। ওকে ফিউজড হয়ে যেতে দেখে একটু খারাপই লাগলো। এতোটা রূঢ়লিও বোধহয় বলা উচিত হয়নি। একটু নরম গলায় ওকে ডাকলাম,"আচ্ছা, ওখানে কি বলছিলে কি যেন নাতি? সেন্ট? ঠিক বুঝলাম না ব্যাপারটা?" আমার মুড ঠিক হয়েছে দেখে সুপ্রিয় যেন তার উৎসাহ ফিরে পেল আবার। "হ্যাঁ স্যার। সেই তো বলছি। ওই বুড়ির নাতির নাকি জ্বর ছাড়ছিল না। বুড়ি সেই কোন মুলুক থেকে কোন এক গুণিনের মন্ত্রপড়া ফুল, বেলপাতা এনে সেই বাচ্চাটাকে খাওয়ায়। আর ব্যাস, সে বাচ্চা নাকি পরদিনই মারা যায়। শুনেছি সে নাকি মারা যাওয়ার আগে খুব মাথা চালছিল আর চিৎকার করে কাঁদছিল। এরা জ্বরজ্বালায় ওষুধও খায় না এমনিতে। এমনিই ঠিক হয়ে যায় এরা। কিন্তু বাচ্চাটা মরে যাওয়ায় সকলে একেই দায়ী করলো। বললো এই নাকি ডাইন, বাচ্চাটাকে খেয়ে ফেলেছে।"

"কি আশ্চর্য!জ্বরের জন্য ওইসব ওঝাটোঝার কাছে যাচ্ছে হসপিটালে না এসে? আর সিম্পটমস যা শুনছি তাতে মনে হচ্ছে মেনিনজাইটিসও হতে পারে বাচ্চাটার। ওইরকম কষ্ট পাচ্ছে দেখেও ওরা ডাক্তারের কথা ভাবেনি?"

"এরা এরকমই স্যার। ওষুধকে এরা ভয় পায়। ভাবে ওষুধে আয়ু কমে যায়।"

আমার আর কিছু ভালো লাগছিল না জানিস। এই প্রথম এরকম ঘটনা ফেস করেছি। মুডটাই বিগড়ে গিয়েছিল। "ঠিক আছে। তুমি যাও এখন। আর পেশেন্টদের সাথে বাজে বিহেভ করবে না কিন্তু কখনো মনে রেখ।" সুপ্রিয়কে চলে যেতে বললাম। ও মাথা নেড়ে উল্টোদিকে হাঁটা দিতেই আমিও ক্যান্টিনের দিকে পা বাড়িয়েছি। এমন সময় সুপ্রিয় আবার ছুটে এল।

"স্যার।"

আমি থমকালাম।

"হ্যাঁ,বলো।"

"আপনাকে তো একটা মজার কথা বলাই হয়নি।"

"কি?"

"ও বুড়ি নাকি মরার গন্ধ পায়।"

"মরার গন্ধ? মানে?"

"মানে কেউ মারা যাওয়ার আগেই নাকি ও গন্ধ পায়। আর ওর গন্ধ পাওয়ার তেরাত্তির কাটার আগেই সে লোকটি মারা যায়।"

"কিসব রাবিশ বকছো?" আমি ধমকালাম অল্প। কিন্তু সুপ্রিয়র দেখলাম তাতে কোন হেলদোল হলো না, ও বেশ মজা করেই বলতে লাগলো, "হ্যাঁ স্যার। ও বুড়ি নিজে এসব বলে। ও নাকি ওর নাতির গায়েও এই গন্ধ পেয়েছিল। তাই গুণিনের ফুলপাতা আনতে ছুটেছিল।"

"মৃত্যুর গন্ধ?" আমি হেসেছিলাম, "তা উনি কি করে জানলেন ওটাই মৃত্যুর গন্ধ?"

"সেও বলেছে ও বুড়ি। ছোটবেলা ওর বাপের ঘর ছিল ঝালদায়। ওখানে কোন এক গুণিনের ঘরে ওদের খুব যাওয়া-আসা ছিল। সে নাকি মরার গন্ধটা পেত। গুণিনের অসুখের সময় এই বুড়ি নাকি সেবা করেছিল। সে মরে যাওয়ার কিছুদিন পর থেকেই নাকি বুড়ি এরকম গন্ধ পেতে শুরু করে। প্রথম প্রথম লোককে আগাম মৃত্যুর খবর দিয়ে তাদের হাসির খোরাকি হয়েছিল এ বুড়ি। কিন্তু ধীরে ধীরে এর অপয়া নাম ছড়িয়ে পড়ায় বাপ-মা একে বিয়ে দিয়ে পাঠিয়ে দেয় অন্য গ্রামে। এতদিন নাকি সব চেপেচুপে থাকতো এ বুড়ি। এখন নাতির গায়ে ওই গন্ধ পেয়ে নাকি আর চুপ করে থাকতে পারেনি। নিজের মতো করে বাঁচাতে চেয়েছিল বাচ্চাটাকে। কিন্তু জানেন স্যার, বাচ্চাটা মারা যাওয়ার পর ওকে ওর ছেলেরাই মেরে মাঠে ফেলে এসেছিল। দুদিন ওই মাঠেই পড়েছিল। তারপর ওইদিকের এক স্কুল মাস্টার দেখতে পেয়ে, অনেক কষ্টে লোকজন জুটিয়ে একে হসপিটালে নিয়ে আসে। তারপর তো এই তো দেখছেন।"

সুপ্রিয়র কথাগুলো শুনে আমি কতোটা বিস্মিত হয়েছিলাম তোদের বোঝাতে পারব না। কতোটা অশিক্ষা মানুষকে এখনও ডাক্তারের বদলে গুণিনকে বেছে নেওয়ায় বাধ্য করে কিংবা প্রাণদাত্রী মায়ের প্রাণনাশের উদ্দেশ্যে এগিয়ে নিয়ে যায় মানুষকে সেটা ভেবেই আমি স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিলাম ওই মুহূর্তে।" সাম্য চুপ করে এবার।

দ্বৈপায়ন আর আবীর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। এই ঘটনা শোনার পর কারোর মুখেই কোন কথা জোগাচ্ছে না আর।এমনকি চরম ফাজিল আবীরও এখন চুপ। খানিকপর সাম্যই আবার মুখ খুললো, "তোরা ভাবছিস, হঠাৎ তোদের ডেকে এনে এসব শোনাচ্ছি কেন? বিশ্বাস কর। কারণটা খুব দরকারী। আর দরকারী বলেই তোদের ডেকেছি।"

"কি হয়েছে তুই খুলে বলবি একটু? কিছুই তো বুঝতে পারছি না মাথামুন্ডু। হ্যাঁ,মানছি এই ঘটনাটা সোশ্যালি খুব ডিস্টার্বিং, কিন্তু এর সাথে আমাদের কি সম্পর্ক?"

"সম্পর্ক বোধহয় একটা আছে।সবটা শোন তাহলে বুঝবি।

যাইহোক, পরদিন সকালে ও.পি.ডি তে ছিলাম। সুপ্রিয় ছুটে এসে খবর দিল ওই বৃদ্ধা নাকি সকালে মারা গেছেন, কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট। আমি চমকে উঠেছিলাম শুনেই। গতকালই দেখে এলাম সম্পূর্ণ সুস্থ, অ্যাটলিস্ট লিথাল ইনজুরি ছিল না। অবাক হয়েছিলাম খুব। কোথাও একটা খারাপ লাগাও কাজ করছিল ভিতরে ভিতরে। যাইহোক ঘন্টা খানেকের মধ্যে কাজের চাপে ঘটনাটা মাথা থেকে বেরিয়েও যেত যদি না ইতিমধ্যে আরেকটা ঘটনার সুত্রপাত হত।"

"কী ঘটনা? "

সেটার জন্যই তোদের এখানে ডাকা, সেটার জন্যই এতোটা বললাম, শোন তাহলে। সেদিন রাতে নিজের রুমে এসে বসেছি জাস্ট, হঠাৎ কোলে ধপ করে কি একটা এসে পড়লো। প্রথমে একটু চমকে উঠলেও, দেখি এ তো আমাদের হসপিটালে বিশেষ গ্রাম্ভারি চালে ঘুরে বেড়ানো বিড়াল দুধেল। ধবধবে সাদা গাত্রবর্ণের জন্যই তার এরূপ নামকরণ। গোটা হসপিটাল চত্বরে তার অবাধ বিচরণ। একটু হেসে ওর পিঠে হাত বোলাতে যেতেই একটা গন্ধ পেলাম। ঠিক পচা না, কেমন যেন একটা বাসি, বোটকা গন্ধ। নাক কুঁচকে ওকে নামিয়ে দিলাম কোল থেকে, কোথায় কোথায় ঘুরে এসেছে কে জানে। ওকে ঘর থেকে বের করে দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিলাম সেরাতে। পরদিন ওপিডিতে যাওয়ার মুখেই মল্লিকার সাথে দেখা। দুদিনের ছুটিতে বাড়ি ফিরছে সে।

"স্যরি স্যার ওই পেশেন্টটার ব্যাপারটার জন্য। আর কখনো এরকম কিছু হবে না।" ওর কাঁচুমাচু মুখটা দেখে হাসিই পেয়েছিল সত্যি। কিন্তু খেয়াল করলাম একটা বিশ্রী বোঁটকা গন্ধ ভেসে আসছে ওর গা থেকে। হেসে কিছু বলে ওকে সহজ করে দিতে যাওয়ার আগেই মনোজ, আমাদের হসপিটালের সুইপার, ওকে দেখলাম জলের বালতি, ওয়াইপস নিয়ে কিসব বকবক করতে করতে যাচ্ছে। আমাদের দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছিল ও। তারপর মল্লিকাকে গলা

নামিয়ে বললো, "দুধেল ছাত থেকে পড়ো মর্যে গেছে কাল রাতে। খবরটো পেলে?" দেখলাম মল্লিকার মুখ শুকিয়ে গেল নিমেষেই। শুধু শুকিয়ে গেল বলা ভুল হবে। ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেল এক মুহূর্তেই।

"কি ব্যাপার মনোজ?"

"আজ্ঞা সার, ও বুড়িটো পাক্কা ডাইন ছেল বটে। দুধেল উর খাওয়ারে মুখ দিছিলো বলে দুধেলকে বাখান দিতে দিতে বলেছিল ও মরবেক। দেখ মরলো বটে উ।"

মল্লিকার দিকে আর তাকানোর রুচি হল না জানিস। বুঝলাম এইসব বস্তাপচা কুসংস্কার, এসব এদের মজ্জাগত এবং এতো শীঘ্র সেগুলোকে উপড়ে ফেলা যাবে না। ওদের পাশ কাটিয়ে চলে এসেছিলাম বটে, কিন্তু মাথার মধ্যে একটা ব্যাপারে খচখচানি শুরু হয়েছিল কিছুক্ষণের মধ্যেই। বিড়াল কোনোদিন ছাদ থেকে পড়ে মারা গেছে বলে তো শুনিনি আগে। একটু কেমন যেন লাগছিল শুনে। তারপর নিজেকেই ধমকালাম কষে, আমিও কি তাহলে মনের গহন গোপনে লালন করতে শুরু করেছি এইসব অন্ধবিশ্বাস, জাদুটোনাকে। উফ্। কি দুরাবস্থা আমার। ওপিডিগুলোর চাপ জানিস। হাজারটা পেশেন্ট, তাদের হাজাররকমের সমস্যা। মাথা থেকে এসব বেরিয়েই গেছিলো পুরো। তাছাড়া পরদিন বাড়ি ফেরার আনন্দটাও ছিল। তবে আজ সকালে ট্রেনে বসে যে খবরটা পেলাম সেটা শুনে, "সাম্য চুপ করে গেল।

"খবর?"

"হুম। ট্রেনে চেপে সবে হেডফোনটা কানে গুঁজেছি, এমন সময় দেখি স্ক্রীনে ফুটে উঠেছে সুপ্রিয় কলিং। রিসিভ করতেই ওধারে একটা করুণ গলা ভেসে এলো, "স্যার, মল্লিকা আর নেই। ওকে বাঁচতে দিল না ওই শয়তান বুড়িটা।"

"বেঁচে নেই? কি বলছ কি?" ফোনেই চেঁচিয়ে উঠেছি আমি।

"হ্যাঁ স্যার। ওর বাড়ির কাছে একটা পাঁচিল ভেঙে পড়ে ও..."

সুপ্রিয় আরোও কিছু বলতে চায়, তার আগেই নেটওয়ার্ক চলে যায়। ফোনটা হাতে নিয়ে আমি স্তম্ভিত হয়ে বসে ছিলাম অনেকক্ষণ। ভীষণ খারাপ লাগছিল রে তখন। এত ইয়ং একটা মেয়ে, বাড়ির সব দায়দায়িত্ব ওরই কাঁধে ছিল শুনেছিলাম।" আবীর এবার উসখুস করে উঠে।

"উফ্। এসব শুনতে ভালো লাগছে না আর। এসব ছাড়। এতদিন পর এলি। আর এসেই সেই কিসব ডেথ টেথের গল্প জুড়ে বসেছিস। এইসবের

জন্য তোর আজ সকালের জরুরী কল?"

"ঠিক বলেছিস। তোদের এইসব ভালো না লাগারই কথা। মৃত্যুকে কারই বা ভালো লাগে? কিন্তু না চাইতেও ধর যদি কেউ মৃত্যুর গন্ধ পায়? প্রিয়জন কিংবা চেনা-অচেনা জলজ্যান্ত মানুষদের, যাদের সামনে দেখছে ও তাদের মৃত্যু আসন্ন এটা বুঝতে পারে; তাহলে তার মনের অবস্থাটা তোরা বুঝবি না। "দুহাতে মুখ চেপে ধরে সাম্য। ফুঁপিয়ে উঠে। দ্বৈপায়ন ওর কাঁধে হাত রাখে।

"কি হয়েছে খুলে বল তো? বুঝতে পারছি তুই খুব ডিস্টার্বড এইসব নিয়ে। কিন্তু এইসব তো জাস্ট কোইনসিডেন্টও হতে পারে। এতে এতখানি ভেঙে পড়ার কি আছে? তাছাড়া তুই একজন ডক্টর, লাইফ এন্ড ডেথের মাঝেই তোদের কাজ। ছাড় এসব। মাথা থেকে সরা।"

"আচ্ছা, তোরা কি এঘরে কোন গন্ধ পাচ্ছিস? কোনরকম ডাস্টি, একটা গুমোট টাইপের গন্ধ?"

"গন্ধ? কই না তো। কি রে আবীর, তুই পাচ্ছিস কিছু?"

"উমম্, নাহ্। কোন স্মেল তো নেই।"

"আহ্। জানতাম। আমি জানতাম। এ গন্ধ তোরা পাবি না। এ গন্ধ সে পেত। তার প্রতি আমার সহানুভূতি ছিল, সেটা থেকেই বোধহয় সামহাউ দ্য কার্স ইজ নাউ, উহ্।"

"কিসব আটভাট বকছিস শালা! পাগল হয়ে গেলি নাকি?"

"পাগল? হ্যাঁ। হ্যাঁ। এরচেয়ে আমি বোধহয় পাগল হয়ে গেলেই বেশি খুশি হতাম। জানিস, আজ তোরা এঘরে ঢুকতেই একটা গন্ধ পেলাম। গন্ধটা আমার নাকে সদ্যপরিচিত। এ গন্ধ আমি পেয়েছিলাম দুধেলের গায়ে, মল্লিকার গায়ে। এ গন্ধ মৃত্যুর গন্ধ।"

"অ্যাবসার্ড সাম্য। কিসব বলছিস তুই? তোর মাথাটাথা সত্যি গরম হয়ে গেছে ওইসব সুপারস্টিশনের মাঝে পড়ে।"

"আবীর ঠিক বলেছে। তুই ওইসব নিয়ে বড় বেশি ভাবছিস। তাই তোর ওরকম মনে হচ্ছে। কই আমরা তো কোন গন্ধটন্ধ পাচ্ছি না।"

"হুম। হয়তো তোরাই ঠিক। আমার ওভারথিংকিংয়ের ফলেই এরকম মনে হচ্ছে। কোন গন্ধ নেই। কিন্তু সেটা টেস্ট করাটাও দরকার।"

"কিসের টেস্ট?"

"তোদের মধ্যে কোন একজনের থেকে ওই গন্ধটা আসছে। কিন্তু কার থেকে সেটা আইডেন্টিফাই করতে পারছি না একসাথে থাকলে। তাই, তোদের মধ্যে যেকোন একজন অন্য ঘরে উঠে যা। যে এঘরে থাকবে, তার গা থেকে গন্ধটা পেলে বুঝবো সে নাহলে অন্যজন।"

"এবার কিন্তু আমিও বলছি তোর মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। ওসব ভুলভাল ইন্সিডেন্টগুলোকে মনের মধ্যে জোড়াতালি দিয়ে এইসব বোগাস থিয়োরি বানাচ্ছিস কিন্তু তুই।"

"এসব আমার মনের ভুল সেটা প্রমাণিত হলেই বোধহয় আমিই পৃথিবীতে সবথেকে বেশি খুশি হব রে। সেইজন্যই তো বলছি, একটা ছোট্ট টেস্ট করতে কি ক্ষতি? লেটস জাস্ট ট্রাই ইট।"

"ওক্কে,ঠিক আছে।"

"আরে দাঁড়া। ঠিক আছে কি রে? ও যা তা ফান্ডা ঝাড়ছে, আর তুই সেটা মেনেও নিচ্ছিস?"

"ওর অবস্থাটা দেখেছিস তুই? জাস্ট একটা খেলা বলে মনে কর না এটাকে। ওর মনের ভুলটা ভাঙা দরকার।"

"ঠিক হ্যায়।" শ্রাগ করে আবীর। "লেটস প্লে। আমিই উঠছি প্রথমে। তুই দ্বৈপটার গন্ধবিচার কর।" ও বেরিয়ে যায়। এখন ঘরে ওরা দুজন। চোখ বুজে সাম্য, বুক ভরে গভীর শ্বাস নিল। এই তো, এখনও সেই গন্ধটা পাচ্ছে সে। উহ্। গরম লাগছে এতো! এ.সি-টা কাজ করছে না নাকি?

মনটা ভেঙে যাচ্ছে। কিন্তু দ্বৈপায়নকে কি করে বলবে সে এই চরম দুঃসংবাদ? কোন মানুষকে কি বলা যায় যে তার আয়ু আর কয়েকটা দিন, কিংবা ঘন্টা, কিংবা মিনিট! চোখেমুখের স্মার্টনেসটা জোর করে ধরে, দ্বৈপায়নের চোখে চোখ রাখল সাম্য।

"ধুর। আবীরকে পাঠা।"

"বলেছিলাম তোকে সব মনের ভুল।" উঠে দাঁড়ায় সে। সাম্য দেখল দ্বৈপায়নের চোখে স্বস্তির ছায়া। দ্বৈপায়ন বাইরে যেতেই, ভিতরে ঢুকলো আবীর। চমকে উঠলো সাম্য। একি? না। এ কি করে সম্ভব? এখনও সেই গন্ধ? তাহলে কি ওর মনের ভুল এসব। গত কয়েকটা দিন ওখানকার সকলের মুখে এতবার এতরকম করে ওই বৃদ্ধার অলৌকিক ক্ষমতার গালগল্প শুনেছে যে তার মনের মধ্যেও কখন এইসব অন্ধবিশ্বাসেরা শিকড় চাড়িয়েছে, সে বুঝতেও পারেনি।

মুখে অল্প হাসি ফুটে উঠে সাম্যর।

"ধুর শালা। আমিও কিরকম হয়ে গেছিলাম বল? গন্ধ গন্ধ করে খেপে উঠেছিলাম পুরো। উফ্। যা দ্বৈপটাকে ডেকে নিয়ে আয়। বাড়িতে বলে দে আজ এখানেই থেকে যাবি। আজ হোল নাইট পার্টি করবো।" আবীর একটা গালি দিয়ে পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে গেল। সাম্য উঠে দাঁড়ালো। উফ্। কিসব ভুলভালই না সে ভেবে চলেছে এই দুদিন। আজ তো আরোই। এখন দ্বৈপায়নটা এসে আরোও ঝাড়বে।

কিন্তু কি একটা অস্বস্তি হচ্ছে যেন। ঘাম দিচ্ছে খুব। দমবন্ধ হয়ে আসছে এঘরে। দ্বৈপায়ন আর আবীর কি যেন বলতে বলতে পর্দা সরিয়ে ঢুকছে। বুকে একটা চিনচিনে ব্যথা, এসব কিসের যেন সিম্পটমস্? সাম্যর মাথায় পাগলাঘণ্টি বেজে উঠে। হাতটা অবশ হয়ে আসছে। ওদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়তে গিয়ে সাম্য বুঝলো সে মাটিতে পড়তে চলেছে, এবং এখন ওই বোঁটকা গন্ধটা প্রবল, ভীষণভাবেই প্রবল এবং সেটা তার নিজের গায়ের গন্ধ।

শেষবেলায়

সৌমিতা চ্যাটার্জী

আমার উজান, আমি জানি তুমি এখন ঘুমোচ্ছ, সকালে উঠে এই লেখাটা তুমি পড়বে ,আসলে আমার তোমায় অনেক কিছুই বলার আছে, "বলার আছে অনেক কিছুই।" আসলে তুমিতো খুব কবিতা ভালোবাসো তাই প্রথম দু লাইন ভাবলাম কাব্য করে লিখি। আমাদের প্রথম দেখা, তোমার আমার প্রপোজ করা, আমার হ্যাঁ বলা, প্রেমের শুরু, প্রথম চুমু, প্রথম আদর সবেতেই তো একেকটা কবিতার জন্ম হয়েছে তোমার কলমে তাই আর কি!

যাকগে যে কারণে চিঠি লিখছি আজ তোমায় সেটা বলি। যেগুলো আমি কোনদিনও তোমায় মুখে বলতে পারতাম না, হ্যাঁ কোনোদিন ও তোমার সামনে এই সত্যি গুলো স্বীকার করার সাহস আমার হতো না। তুমি জানো আমি মিথ্যে বলি না অ্যান্ড আই হেট লাইজ, এস ওয়েল এজ লায়ার্স কিন্তু আমার জীবনটাই কত অদ্ভুত দেখো আমার জীবনে সবচেয়ে কাছের মানুষ যে কিনা তুমি তার সাথে আমার সম্পর্কের এত গুলো বছর পুরো মিথ্যে দিয়ে মোড়া। আমি জানি সমস্ত মিথ্যেই তোমার বলার পিছনে একটাই উদ্দেশ্য ছিল সেটা আমায় পাওয়া কিন্তু তবু মিথ্যে তো মিথ্যে ই হয় বলো।

আজ শুরু থেকে বলি, তোমার আমার সম্পর্কের এই কয়েকটা বছরে আমি খুব ভালোভাবে যখন বুঝতে শুরু করি যে আদৌ আমরা একসাথে ভালো থাকবো না ততদিনে অনেক দেরী হয়ে গেছে। তুমি একজন আদ্যপান্ত পজেসিভ হাসব্যান্ড যে তার বউ এর এক মিলিমিটার ভাগও কাউকে দিতে পারে না, অবশ্য সেটা কেই বা পারে ?

আমরা যখন শুরুতে সম্পর্কে জড়াই এবং একটা সময়ের পর বুঝতে পারি কেউই কাউকে ছেড়ে থাকতে পারছি না বা ভবিষ্যতেও থাকতে পারবো না তখন আমরা কনযুগ্যাল লাইফ লিড করার সিদ্ধান্ত নিই। তোমার অনেক অনেক জিনিস যা আমার চূড়ান্ত ভাবে খারাপ লাগে তাও মানিয়ে নিতে চেয়েছিলাম শুধু তোমায় ভালবেসে ।

যতই আমরা শারীরিক ভাবে স্যাটিসফাইড থাকি না কেন একে অপরের প্রতি যতই লয়াল থাকি না কেন ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে অশান্তি চলতেই থাকতো আর সেদিন যখন তুমি জানাও যে সেপারেশনই তোমার সিদ্ধান্ত কিছুক্ষনের জন্য বোবা হয়ে গেছিলাম আমি। আমি ভাবিনি তুমি কোনোদিন ও আমায় ছেড়ে থাকতে চাইবে ইনফ্যাক্ট পারবে।

ছেড়ে এসেছিলাম তোমায়। বলা যায় ছেড়ে দিতে বাধ্য ছিলাম কারণ তুমি আর সম্পর্কে থাকতে চাইছিলে না অথচ দায়ী করেছিলে আমায়। আমার উদ্ধত আচরণ, অহংকারী মনোভাব কথায় কথায় লোক কে ছোট করার মানসিকতা সবই নাকি তোমার দম বন্ধ করে দিচ্ছিল। এগুলো কতদূর সত্যি আমি জানি না সবই তোমার বলা কথা এমনকি তুমি আমার লয়ালটি র ওপরও সন্দেহ করতে শুরু করে দিলে একসময়। জানো তো ছোটবেলা তে আমার মনে হতো আমার সৌন্দর্য্য টা আমার অ্যাসেট কিন্তু যখন তুমি শুধু আমি সুন্দর হবার কারণে ভাবতে শুরু করলে আমি তোমার প্রতি ডিসলয়াল হতে পারি তখন আমার নিজের সৌন্দর্য্য টা লায়াবিলির বাইরে কিছুই মনে হতো না। তোমায় ভালোবাসার পর থেকে যে আমি নিজের আঙ্গুলও কাউকে ছুঁতে দেবার কথা ভাবিনি সেই তুমি ভাবতে শুরু করলে আমি চাইলে তোমায় ঠকাতেও পারি।

যখন আমরা আলাদা হই সেই এপিসোড টা খুবই কষ্টের ছিল আমার কাছে। তোমায় ছাড়া একা বিছানায় শুধু চোখের জলের সাথে কাটিয়েছি। যদিও জানতাম তুমি এত পাগলের মতো ভালোবাসো আমায় যে কিছুতেই ছেড়ে থাকতে পারবে না। তবু কষ্ট হতো খুবই। একটা দীর্ঘমেয়াদি সময় একে অপরকে ছেড়ে কাটিয়েছি সেই সময় স্বাভাবিক ভাবেই একটা সম্পর্কে জড়িয়ে যাই কারণ কোনোদিন আমাদের সম্পর্ক ঠিক হবে এমনটা ভাবিনি, যদিও হয়তো এটা স্বাভাবিক ভাবে বলা ভুল হলো কারণ তখনও আমাদের লিগ্যাল সেপারেশন হয়নি তাই এক্সট্রাম্যারিটাল আর যাইহোক স্বাভাবিক জিনিস না কিন্তু তবুও হয় কারণ তুমি তো চাওই নি ফিরতে আর আমার কাছে। বলাবাহুল্য একটা সময়ের পর আমিও চাইনি আর।

যার সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে যাই তার নামটা আমি বলতে পারবো না কারণ কোনোদিন ভাবিনি আবার আমাদের প্যাচ আপ হয়ে যাবে খুব স্বাভাবিক নিয়মেই শরীরও আসে আমাদের মধ্যে ।আমি জানি কেউ আমার দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলেও তুমি নিজেকে শেষ করে দিতে পারো সেখানে দাঁড়িয়ে তুমি যখন নিজে থেকে আবার ফিরতে চাইলে আমি তোমায় ফেরাতে পারিনি। কিন্তু

তোমায় এই সম্পর্কের কথা কনফেসও করতে পারিনি কারণ সেটা সম্ভব ছিল না ।তুমি যে লেভেলের অশান্তি করতে সেটা সহ্য করতে পারার মতো মেন্টাল স্টেট আমার ছিল না কিন্তু আমি পারছিলাম না আর ব্যালেন্স করতে। ঘরে বাইরে দুটো সম্পর্ক মেন্টেইন করতে গিয়ে আমি হাঁফিয়ে উঠছিলাম। কিন্তু ধরা আমায় পড়তেই হতো কারণ তুমি জানো আমি যেরকম টাইপের মানুষ মিথ্যে যেমন আমার ধাতে নেই তেমনি নাটক করে চলাটা ও আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো না কারণ আমি মুখে এক মনে এক কোনদিনই নই ,আমি পারছিলাম না সম্পর্ক টা কন্টিনিউ করতে কিন্তু তোমায় বলার সাহস ও আমার ছিল না।

যার সাথে সম্পর্কে জড়াই তাকেও দিনের পর দিন আর ঠকাতে পারছিলাম না ।তাই ভেবেচিন্তে দেখি যে আমি যদি তোমায় এটা কনফেস করেও নিই যে আমি আর তোমার নেই বা আমার শরীর শুধু তোমার নেই সেখানে অন্য কারুর অধিকার আছে সেক্ষেত্রে তোমার এমনিও কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়ে যেতে পারে আর যদি সেরকম কিছুই না হয় তাহলে আমি তোমায় যটুটুকু চিনি তাতে তুমি এর শেষ দেখে ছাড়বে ,এরপর আমার বেঁচে থাকাটাই দূর্বিষহ হয়ে যাবে।

তুমি যে কি কি করতে পারো সেটা আমি দেখেছি বহুবার।শুধুমাত্র আমায় পাবার জন্য তুমি যা যা করেছ সেটা নিয়ে গল্প লিখলে মহাভারত হয়ে যাবে সেই তুমি আমার অধিকার এত সহজে ছেড়ে দিতে না ।আর আমিও জানি আমি যদি তোমার না থাকি তাহলে তুমি কোনভাবেই আমায় অন্য কারুরও থাকতে দেবে না এক্ষেত্রে আমার একটাই উপায় ছিল সেটা হলো তোমাকেই সরিয়ে দেওয়া ।হ্যাঁ আমি তোমায় একটা সময় পাগলের মতো ভালোবেসেছি কিন্তু এখন আর বাসি না যেদিন থেকে জানতে পারি আমাদের ব্রেকাপের সময় অন্য কারুর সাথে তোমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল সেদিন থেকেই আমি তোমায় আর ভালোবাসতে পারিনি ।কিন্তু তবু পারিনি তোমার কাছে না ফিরে থাকতে।

যাইহোক এবারে আসল কথা বলি। তুমি হয়তো ভাববে এই চিঠিটা আমি জাস্ট নিজের প্রেজেন্ট রিলেশনশিপ টাকে স্বীকার করে আমি এমনি লিখেও চলে যেতে পারতাম কিন্তু বিশ্বাস করো এত কথা লেখার আমার কোনো ই প্রয়োজনই ছিল না যদি না আমার চিঠিটা যে লেনদি করার ব্যাপার থাকতো কারণ অন্ততঃ তিন থেকে চারটে পেজ না হলে তুমি তোমার অভ্যাসবশত কাগজ উল্টানোর সময় জিভে আঙ্গুল দেবে না সেটা আমি জানতাম আর এটা আমার খুব দরকার ছিল।

বিশ্বাস করো এখন আমি জানি তুমি চিঠির শেষ পাতাটা পড়ছ আর অলরেডি তোমার তিন চারবার মুখে আঙ্গুল দেওয়া হয় গেছে। আসলে আমি ক্যাস্টর সিড

গুঁড়ো করে জলে ডাইলিউট করে কাগজ গুলো শুকিয়ে নিয়ে চিঠিটা লিখেছি। ওই যে তুমি বারবার মুখে আঙ্গুল দিলে তোমার স্যালাইভার সাথে ওই দ্রবণ টা মিশলো যেটা আদতে বিষ। অবাক হচ্ছে! শোনো বলি তাহলে ক্যাস্টর সিড এর মধ্যে রাইসিন বলে একটা যৌগ আছে যেটা আদতে পয়েজন। আমি জানি এখন তুমি চোখে অন্ধকার দেখছ অল্প অল্প হয়তো পুরো চিঠিটা পড়তে ও পারবে না তার আগেই বমি করতে উঠবে তারপর আর জ্ঞান থাকবে না তোমার।

মজার ব্যাপার কি জানো? অনলাইনে ক্যাস্টর সিড তুমিই গুগুল পে করেছিলে আমিই তোমায় বলেছিলাম চুলের জন্য লাগবে, হেয়ার ট্রিটমেন্ট করাবো তাই। কি করব বলো? আমার তো কিছু করার ছিল না, আমি রাতে চিঠিটা লিখে সকালে যখন তোমায় ফোন করে বললাম তোমার বিছানায় রাখা আছে আর আমি মর্নিং ওয়াকে যাচ্ছি আমি আদতে কোথাও ই যাইনি আমি কমপ্লেক্সের নিচেই আছি একটু পরে গিয়েই চিঠিটা পুড়িয়ে পুলিশে ফোন করব। পুলিশ হয়তো তোমায় পোস্টমর্টেমে পাঠাবে, স্টম্যাকে বিষও পাবে কিন্তু বিষের উৎস পাবে না কোনোভাবেই।

এত কথা লিখে জানানোর একটাই উদ্দেশ্য ছিল আগেই বলেছি আর একটা কারণ ছিল এটাই যে তুমি সত্যিটা জেনে যাও কারণ আমি মিথ্যে বলিনা, বলিনি ও তোমায় কোনদিন। তাই আজও শেষবেলায় বললাম না। ভালো থেকো উজান না ফেরার দেশে।

ইতি তোমার আদরের

ঊর্মি।

নেকড়ের ডাক

ময়না মুখোপাধ্যায়

রাত তখন প্রায় বারোটা, ক্যারোল অফিসের পেন্ডিং কাজগুলো শেষ করে সবে ল্যাপটপটা বন্ধ করতে যাচ্ছে ঠিক তখনই তার কানে এল একটা চাপা অথচ তীক্ষ্ম আওয়াজ, আউউউউ...। সে কিছু বুঝে ওঠার আগেই আওয়াজটা যেমন হঠাত এসেছিল তেমন হঠাতই থেমে গেল। কিন্তু ওইটুকু সময়েই ওই জান্তব আওয়াজ ঘুমন্ত পাড়ার নীরবতাটাকে আচমকা যেন ফালাফালা করে দিয়ে গেল। একটা অপার্থিব ভয়ে ক্যারোলের শরীরটা তখনও শিরশির করছিল। সে কয়েক মূহুর্ত স্তব্ধ হয়ে বসে রইল তারপর ভাবল সে কি সত্যিই কিছু শুনল ? না কি সবটাই তার মনের ভুল। সে তার সমস্ত চেতনা দিয়ে ঘর আর ঘরের বাইরের সমস্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শব্দকে নিজের শ্রবণতরঙ্গে ধরার চেষ্টা করল। না,কোন মৃদু শব্দও আর কোথাও শোনা যাচ্ছে না। সে ভাবার চেষ্টা করল ডাকটা কার, কোন জন্তুর হতে পারে। কার ? কুকুরের ? নাহ্, কুকুরের ডাক নয়, অন্য কোন পশুর। কিন্তু কোন পশুর ? এখানে ধারে পাশে কি কোন বন্যপ্রাণী আছে? তার মনে হল আগেও একদিন সে রাতের বেলায় এইরকম একটা ডাক শুনেছিল। সেদিনও ভেবেছিল হয়তো তার শোনার ভুল। কিন্তু আজ যা শুনল তা তো একেবারে স্পষ্ট। তার কানে সেই আওয়াজের ক্ষীণ অনুরণন তখনও রয়ে গেছে। সে ভয়ার্ত চোখে ঘরের এদিক ওদিক একবার দেখে নিল। ডাকটা শোনা অবধি ক্যারোলের কেমন একটা অস্বস্তি হচ্ছে, মনে হচ্ছে এ ডাকের মালিক বোধহয় তার আশেপাশেই রয়েছে। মনের পাতায় এক না দেখা পশুর ছবি ভেসে উঠতেই ক্যারোলের মেরুদন্ড দিয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত নেমে গেল। সে ভাবল কুকুরই যদি হয় তবে তার ডাক কি আরো অনেকবার সে শুনতে পেতো না ? আশেপাশের কারো বাড়িতে কোন কুকুর তো কোনদিন চোখে পড়েনি তার। কুকুর থাকলে তার মালিক নিশ্চয় সকালে বিকালে তাকে নিয়ে হাঁটতে বেরোতো। এখানে যাদের পোষ্য আছে তারা তো সেরকমই করে। নাহ, কালই লোগানকে এই কথাটা জিজ্ঞেস করতে হবে। ওরা নিশ্চয় ব্যাপারটা জানবে। সে উঠে দরজা জানালার লকগুলো একবার চেক করে নিল তারপর নিজেকে আপাদমস্তক কমফর্টারে মুড়ে শুয়ে পড়ল।

অ্যানকনির এই পাড়াটা খুব শান্ত আর নির্জন। ক্যারোল মাত্র একমাস হল এই বাড়ির একতলাটায় ভাড়া এসেছে। সে ওয়েলস ফার্গো ব্যাঙ্কের কনিষ্ঠ কর্মী। কলেজ শেষ করেই সে এই চাকরিতে জয়েন করেছিল। প্রথম পোস্টিং ছিল শিকাগোতে, তার বাড়ির খুব কাছে। সেখানে দুই বছর কাটতে না কাটতেই ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ তাকে আইওয়া স্টেটের এই অ্যানকনিতে বদলি করে দিল। শিকাগোর তুলনায় অ্যানকনি অনেক শান্ত শহর। রাত আটটা বাজলেই শহরটা নিভে যেতে শুরু করে। দশটা থেকে পাঁচটা অফিস করে বাকি সময়টা ক্যারোল নিজের ঘরেই কাটায়। এই বাড়িটা তার ভারি পছন্দের। পুরানো দিনের বাংলো প্যাটার্ণের দোতলা বাড়ি। দোতলায় বাড়িওয়ালা লোগান আর তার স্ত্রী ভিক্টোরিয়া থাকে। তারা নিঃসন্তান। একতলায় থাকে ক্যারোল। বাড়িওয়ালা হিসেবে লোগানরা বেশ যত্নবান। লোগানের বাড়িটা এই পাড়ার একেবারে শেষ প্রান্তে। বাড়ির সামনে পিছনে অনেকটা জমি রয়েছে। সামনের জমিতে লোগানের নানারকম ফুলের বাগান। পিছনের জমিতে ভিক্টোরিয়ার কিচেন গার্ডেন। বাড়ির চারপাশে সবুজ রঙ করা কাঠের বেড়ায় আইভিলতা জড়ানো। মোট কথা বাড়িটা ক্যারোলের ভারি পছন্দের একটা জিনিস ছাড়া। পিছনে কিচেন গার্ডেনের পরেই ঘন জঙ্গল। সেই জঙ্গলের পরে হাইওয়ে, লিঙ্কন স্ট্রিট। পাড়াটা ভারি ছিমছাম হলেও পিছনের জঙ্গলটা দেখলে ক্যারোলের একটু ভয় ভয় লাগে। বড় বড় গাছের সমাহার সেখানে। মাতৃহারা ক্যারোলের ছোট থেকেই একা থাকার অভ্যাস। বেশি লোকের ভিড়ে বেশিক্ষণ থাকলে সে কেমন খেই হারিয়ে ফেলে। কিন্তু মাঝে মাঝে সামাজিকতা রক্ষা করতেই হয়। আজ বিকেলে তেমনই একটা অনুষ্ঠান। ম্যাসনের জন্মদিন, যেতেই হবে। ম্যাসন ক্যারোলের অফিস কলিগ। অফিসের কাজ সেরে সবাই ম্যাসনের বাড়ি এসেছে। সবাই একদিকে হুল্লোড় করলেও ক্যারোল একটু দূরে লনে সাজানো টেবিলগুলোর একটাতে বসেছে। অফিসের সবাই তখন লনের মাঝখানে ম্যাসনের সাথে নাচ শুরু করেছে। লনটা মৃদু আলো দিয়ে সাজানো। একদিকের টেবিলে স্ন্যাক্স আর ড্রিংক সাজানো। ম্যাসন একবার ডাকতে আসলেও ক্যারোল পায়ে ব্যথা বলে ওকে কাটিয়ে দিয়েছে। অত হুল্লোড় তার পোষায় না। একটা রেড ওয়াইন নিয়ে সে মগ্ন হয়ে কলিগদের নাচ দেখছিল ঠিক তখনই তার কানে এল সেই ডাকটা, খুব চাপা অথচ স্পষ্ট। তার টেবিলটা একটু কোণের দিকে, চারপাশে মৃদু আলোয় সেখানে অন্ধকারটা একটু যেন বেশিই জমে আছে। সে ভয়ে ভয়ে চারিদিকের অন্ধকারে একবার চোখ চালাল। নাহ্ কোথাও তো কিছু দেখা যাচ্ছে না। চারপাশের অতিথিদের দিকে তাকিয়ে দেখল তারা সবাই অনুষ্ঠানে মগ্ন।

তবে সে কি ভুল শুনছে, এটা কি তবে তার মনের ভুল। আর কেউ কি এ ডাক শোনে না। আচ্ছা একা থাকতে থাকতে তার কোন হ্যালুসিনেশন হচ্ছে নাতো। ক্যারোলের শরীর খারাপ লাগতে লাগল। সে তাড়াতাড়ি ডিনার সেরে ম্যাসনের কাছ থেকে বিদায় নিল। রাত তখন অনেক হয়েছে। বাড়ি ফিরে গাড়িটা পার্ক করে দরজার লকটা খুলতে যাবে তখনই ক্যারোল ডাকটা আবার শুনল, সেই একই ধরন, আউউউ...। এবার যেন আওয়াজটা আরো কাছে, আরো তীক্ষ্ণ। একটু বেশি সময় ধরেই ডাকল যেন। ক্যারোলের হাতটা কেঁপে চাবিটা ঝনাত করে মেঝেতে পরে গেল। অজানা এক শিহরণে তার শরীরের পশমগুলো দাঁড়িয়ে গেল। চাবিটা দ্রুত কুড়িয়ে নিতে নিতে তার মনে হল ডাকটা কোন কুকুরের নয় নেকড়ের ডাক। কথাটা মনে হতেই তার সারা শরীর ভয়ে সিঁটিয়ে গেল। মেরুদন্ডে শীতল স্রোত বইতে লাগল। আর ঠিক তখনই আবার আউউউউ--। সে দ্রুত লক খোলার চেষ্টা করল। মনে পড়ল ছোটবেলায় বাবার সাথে একটা সিনেমা দেখেছিল, যার মূল চরিত্রে ছিল একটা নেকড়ে। সিনেমার নামটা মনে নেই কিন্তু সেখানে শোনা নেকড়ের ডাকটা তার আজো কানে লেগে আছে। অবিকল সেই ডাক। ক্যারোল দ্রুত ঘরের ভেতরে ঢুকে দরজা লক করে দিল। ঘরের উষ্ণ আবহাওয়ায় একটু আশ্বস্ত বোধ করল সে। না, কালই লোগানকে এই ডাকের কথা বলতে হবে। নিশ্চয় পিছনের জঙ্গলে জন্তুটা থাকে। এত রাত করে ফেরাটা তার উচিত হয়নি।

ক্যারোল কোনোরকমে পোষাক পালটে ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিল। পর্দা সরানো কাঁচের শার্শি দিয়ে বাইরের দিকে একবার তাকাল। বাইরেটা কেমন অদ্ভুত নিঃশব্দ। দূরে রাস্তার হলুদ মরা আলোগুলো সারসার দাঁড়িয়ে, দুপাশের দীর্ঘ গাছ আর বাড়িগুলোর মাঝে রাস্তাটা পড়ে আছে যেন একটা চওড়া কালো সাপ। একটা ভৌতিক অনুভূতি হতে লাগল ক্যারোলের। কি যেন একটা ঘটবে, কে যেন কোথাও ঘাপটি মেরে বসে আছে। হঠাৎ ঘরের অন্য দিকে চোখ যেতেই ক্যারোলের বুকটা ধক করে উঠল। ওখানে ওটা কি ? কি ওটা ? একটা কুকুর নাকি একটা নেকড়ে ? কার ছায়া পড়েছে সেখানে। ক্যারোলের চোখে পড়ল জ্বলন্ত দুটো বিন্দুর মালিক তখন চারপায়ের ওপর ভর করে জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে আছে তারই দিকে। ক্যারোলের শরীরটা হিম হয়ে গেল, তার গলা শুকিয়ে কাঠ। সে ভুলেই গেল যে তার আর ওই জ্বলন্ত চোখের মধ্যে একটা কাঁচের অন্তরায় আছে। ক্যারোল জন্তুটার চোখে চোখ রেখে হাত ঘষে ঘষে কিছু একটা হাতিয়ার খুঁজতে লাগল, একটু হাত চালাতেই পেয়ে গেল একটা কাগজ কাটার কাঁচি। সে কাঁচিটা শক্ত মুঠোয় ধরে সবে মনে একটু শক্তি সঞ্চয় করছে

তখনই, ঠিক তখনই আবার শোনা গেল সেই ডাকটা আউউউউউ...। এতোটা জোরে, এতোটা কাছে, এতোটা তীক্ষ্ণ যে ক্যারোল বুঝে উঠতে পারলো তার এই মূহুর্তে কি কর্তব্য। সে কি অন্য ঘরে পালাবে না কি লোগানকে ফোন করবে। এক একটা মূহুর্ত যেন এক একটা ঘন্টা। মাঝে মাঝেই সেই রক্ত জল করা ডাকটা তার কানে আসতে লাগল। একবার মনে হতে লাগল ডাকটা বাইরে নয় ঘরেই শোনা যাচ্ছে, পরমূহূর্তেই মনে হল সেটা কি করে সম্ভব। নেকড়েটা কিভাবে এই ঘরে ঢুকবে ? সে নিজে হাতে দরজা বন্ধ করেছিল। ক্যারোল আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না তার বুক হাঁপরের মতো ওঠানামা করছে, গলা শুকিয়ে গেছে, মাথা কাজ করছে না, সে কোনওরকমে নিজেকে ওই ঘর থেকে বের করে দরজাটা টেনে লক করে দিয়ে বসার ঘরের সোফায় পৌছালো। তারপর তার আর কিছু মনে নেই। সে জ্ঞান হারিয়ে ছিল না ঘুমিয়ে পড়ছিল সে জানে না। যখন সে চোখ মেলল তখন বেশ বেলা, উজ্জ্বল রোদ এসে পড়েছে ঘরে। কোথাও কোন ভয়ের চিহ্ন নেই। তবু সে আর দেরি করল না। পোষাক পাল্টে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গেল। লোগানের ঘরের দরজা নক করতেই ভিক্টোরিয়া দরজা খুলল। "আরে ক্যারোলিন! এসো এসো। কি ব্যাপার?এতো সকাল সকাল, কোন সমস্যা?" ভিক্টোরিয়ার সাদর অভ্যর্থনাতেও ক্যারোলের শুকনো মুখে হাসি ফুটল না। সে সন্তর্পনে বলল, "ভিক্টোরিয়া তোমাদের এখানে নেকড়ে আছে এটা কি তোমাদের আমায় আগে জানানো উচিত ছিল না ? আমি একা থাকি,অনেক সময় রাত করে বাড়ি ফিরি"। ভিক্টোরিয়া অবাক চোখে বলল, "কি বলছো? তুমি কি কিছু দেখেছো ? তুমি একটু শান্ত হয়ে বোসো তো আমি লোগানকে ডাকি"।

ভিক্টোরিয়ার ডাকে লোগান এল সে ঘরে। ক্যারোলের মুখে সব শুনে সে চিন্তিত মুখে বলল, "দেখ ক্যারোলিন, তুমি যা বলছো সেটা অদ্ভুত এবং অবিশ্বাস্যও বটে। আমরা এখানে কখনো এমন কিছু দেখিনি। এরকম কোন ডাকও কখনো শুনিনি। তবে দিন সাতেক আগে একটা ব্যাপার ঘটেছিল। আমাদের উল্টোদিকের বাড়ির কর্ত্রী মিসেস ওয়ার্নার আমাকে জানিয়েছিলেন উনি আমাদের বাগানে একটা নেকড়ের মতো কিছুকে অনেক রাতে ঘোরাফেরা করতে দেখেছেন। তবে প্রথমটা নাকি ওনার মনে হয়েছিল কোন পাগল বা মাতাল বোধহয় ওরকম চার হাতে পায়ে ঘোরাঘুরি করছে কিন্তু পরে সেটি আকাশের দিকে মুখ করে অদ্ভুত ভাবে ডেকে ওঠে। সেই ডাক শুনে তিনি এমন ভয় পেয়ে যান যে নিশ্চিত হন ওটা একটা পশুই এবং সম্ভবত নেকড়ে। মিসেস ওয়ার্নার একে ইনসমনিয়ার রুগী তারপর চশমা ছাড়া ভালো দেখেন

না তাই আমরা তাকে তেমন ভরসা করিনি কিন্তু তুমি যখন বলছো তখন তো চিন্তা হচ্ছে। ঠিক আছে তুমি শান্ত হও আমি পাড়ার সবার সাথে কথা বলব ততদিন তুমি বেশি রাতে আর বাইরে থেকো না। ক্যারোল বলে, "দেখ লোগান আমি এমন ভয় নিয়ে থাকতে পারব না। একমাসের মধ্যে এটার কিছু ব্যবস্থা কর নইলে আমি অন্য বাড়ি খুঁজে নেব।" কথাগুলো এক নিশ্বাসে বলে ক্যারোল ঘরে ফিরল।

গত একসপ্তাহে ক্যারোল আরো দুদিন ডাকটা শুনেছে। লোগানকে ডেকে দেখিয়েছে ওর বাইরের দরজার ওপর বেশ কয়েকটা আঁচড়ের দাগ। লোগান পুলিশকেও সব জানিয়েছে। তারা এখন রাতের দিকে এদিকে টহলদারি বাড়িয়েছে। লোগান আর ভিক্টোরিয়াও নিয়মিত ক্যারোলের খবর নেয়। আজ কদিন ধরে ক্যারোলের বাড়ির জন্য বড্ড মনটা খারাপ। আজ শুক্রবার। জানালার ধারে বসে ক্যারোল ভাবছিল শিকাগোতে এই শুক্রবার সন্ধ্যায় তার বন্ধুরা নিশ্চয় এখন পাবে গিয়ে খুব হুল্লোড় করছে। সে রকিং চেয়ারটাতে বসে জানালা দিয়ে বাইরে সন্ধ্যে নামতে দেখছিল। ঘরের মধ্যে আবছা অন্ধকার, আধো আলোতে আয়নার দিকে চোখ পড়তেই সে স্পষ্ট দেখতে পেল নেকড়েটাকে, একেবারে তার চোখের দিকে চোখ রেখে তাকিয়ে আছে পশুটা। ক্যারোল রকিং চেয়ারেই পাথরের মত স্থির হয়ে গেল। এটা কি করে সম্ভব ? বন্ধ দরজার ভিতরে ওটা এল কি করে ? ক্যারোল আয়নায় দেখল নেকড়েটা জিভ দিয়ে একবার মুখের চারপাশটা চেটে নিল যেন সামনে অপেক্ষমান খাদ্যের স্বাদ তার রসনাকে রসসিক্ত করে তুলেছে। তারপর মাথাটা একটু বেঁকিয়ে ওপর দিকে তুলে সে তীক্ষ্ম ডাক দিল, আউউউউ...। ক্যারোল বুঝল যা করার এই মূহুর্তেই করতে হবে নইলে এর মীমাংসা করার জন্য বেশি সময় সে পাবে না। সে দৃষ্টি স্থির রেখে ফোনটা হাতড়ে কোলের কাছে আনল। তারপর দ্রুত এক নম্বরে স্পীড ডায়াল করল। এক নম্বরে লোগানের নাম।

লোগান পুলিশের কাছে বয়ান দিয়েছিল এই যে, "সে আর ভিক্টোরিয়া ক্যারোলের ফোন পেয়ে নিজের বন্দুকটা নিয়ে ছুটে যায় নীচে। তারপর ক্যারোলের দরজা নক করে। অনেকবার নক করার পরেও যখন ক্যারোল দরজা খোলে না তখন সে বাগানে এসে জানালার কাঁচের ওপর চোখ রেখে দেখে আধো অন্ধকার ঘরে ক্যারোল একটা ধূসর রঙের আটোসাটো পোষাক পরে সারা ঘরে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে আর মাঝে মাঝে ওপরের দিকে মুখ তুলে অদ্ভুত একটা আওয়াজ করছে। সে এমন অদ্ভুত দৃশ্য দেখে প্রথমে ভীষণ হকচকিয়ে যায়। তারপর চেতনা ফিরতে পুলিশকে ফোন করে।"

পুলিশ এসে বাইরে থেকে লক খুলে ক্যারোলকে যখন বের করে আনে তখন ক্যারোল উন্মাদের মতো আচরণ করছিল। পুলিশ তাকে হসপিটালে ভর্তি করলে লোগান ক্যারোলের বাবাকে ফোন করে সব জানায়। এরপর কেটে যায় বেশ কদিন। ক্যারোলের চিকিৎসা এখনও চলছে।

ক্যারোল বেডে শুয়ে আধো চেতনায় শুনতে পায় ডাক্তারের সব কথা। ডাক্তার তার বাবাকে কিছু বলছিলেন। একটা শব্দ তিনি বারবার উচ্চারণ করছিলেন। "ক্লিনিকাল লাইক্রনথপি"। ক্যারোলের বাবাকে তিনি বোঝাচ্ছিলেন এই রোগটা একটা মানসিক রোগ। এই রোগে একজন ব্যক্তি নিজেকে পশু বলে মনে করতে থাকে এবং যখনি সে একা বোধ করে তখনই নিজে সেই পশুর মত আচরণ করতে থাকে। নিজে পশুর আচরণ করলেও মনে ভাবে বাস্তবে সেই পশুটি তার আশেপাশেই রয়েছে এবং তাকে আঘাত হানতে চাইছে। এ এক বিরল মানসিক রোগ। সম্ভবত একাকীত্ব থেকেই এই রোগে আক্রান্ত হয় মানুষ। ক্যারোল নিঃশব্দে চোখ বুজে পাশ ফিরে শোয়।

কলির কঙ্কাল

প্রিতম সাহা

এত ভয়ঙ্কররকম হত্যা আগে কোনোদিন দেখেনি সতীশ,চোখ দুটো ছুড়ি দিয়ে বের করে অর্ধেক করা হয়েছে, নখগুলো এক এক করে উপরে ফেলা হয়েছে,বড়ো কোনো ধারালো জিনিসের সাহায্যে যৌনাঙ্গ পুরোপুরি দেহ থেকে কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটা নিয়ে মোট পাঁচখানা মার্ডার, একইরকম প্যাটার্ন এই ঘটনায় এবার আলোকপাত করতেই হবে, আর সরকারও এই ঘটনাকে হালকাভাবে নিতে পারছে না তাই এবার এই কেস পুলিশের থেকে হ্যান্ডওভার করে সিআইডি এর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে । আর এই কেসের দায়িত্বভার পেয়েছে সদ্য জয়েন করা তবে অভিজ্ঞতাশীল সতীশ । এভাবে কেউ যে খুন করতে পারে তা ভাবার বাইরে,তাও আবার শিলিগুড়ির মতো শান্ত ও সংস্কৃতির ছায়ায় আবর্তিত এই শহরে।

প্রথম খুন যেদিন হলো সেদিন ছিল লক্ষ্মীপুজো মানে পূর্ণিমা, যার খুন হয়েছে তার নাম ভীম সেন, একটি প্রাইভেট ফার্মে কর্মরত। অফিস শেষে কলিগদের সাথে কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন হঠাৎ তার খুব জোরে টয়লেট পায় তো উনি মাঝে রাস্তায় একসাইডে গাড়ি দাঁড় করান, তারপর সেদিন তিনি আর বাড়ির ফেরেননি। পরেরদিন রংটং পাড় করে তার দেহ পাওয়া যায় সেখানখার লোকাল মানুষরাই তাকে উদ্ধার করে।

এতটুকু বলার পর সতীশ তার অ্যাসিসটেন্টকে থামতে বলে,আর বলে ভিক্টিম কেউ ছিলো । অ্যাসিসটেন্ট (দাশ) বলে, "না স্যার ভিক্টিম কেউ ছিলো না"। এটা শুনে সতীশ একটা সিগারেট ধরালো,সেটায় একটা টান দিয়ে সতীশ বললো বুঝলি দাস "আমার মনে হচ্ছে এই কিলার হয়তো আমাদের মানসিক অবস্থা নিয়ে খেলতে চাইছে,নাহলে তুমি ভাবো দাস কেনো এত ঘৃণ্য ভাবে হত্যা করবে।"

দাস বলে,"তা বুঝলাম স্যার,তবে সব খুনের মধ্যে একটা জিনিস কমন সেটা হলো,সেটা হলো সবার যৌনাঙ্গ দেহ থেকে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। আর স্যার এখনও যতজনকে খুন করা হয়েছে তারা সবাই পুরুষ।" সতীশ বলে, "তুমি কি বলতে চাইছো দাশ এটা কোনো মেয়ের কীর্তিকলাপ?"

দাশ বলে, "না স্যার আমি জাস্ট গেস করলাম ।" সতীশ বলে, "সব হতে পারে, এখনই কিছু গেস করা ঠিক হবেনা ।" হঠাৎ সতীশের এক জুনিয়র হন্ত-দন্ত হয়ে ছুটে সতীশের ঘরে ঢুকলো। সতীশ বলে, "বল রাজা, কি হল আবার এভাবে ঢুকলি যে "।

স্যার আর একটা লাশ পাওয়া গেছে তবে এবার সেটা একটা মেয়ের। এটা শুনে সতীশ বলে, "হোয়াট? তুমি এই কথা বলতে আসছো।" 'না স্যার, আই মিন বডিটা নিয়ে আসা হয়েছে বডিটা আসলে স্যার...। বলো তাড়াতাড়ি রাজা বডিটার ফেস রিভিল করাটা একটু অসুবিধাজনক ওর মুখ অ্যাসিডে পুরো পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে আর দেহের পুরো ছাল কেউ কেটে নিয়েছে।" সতীশ এবার একটু রেগে যায় আর প্রায় চিৎকার করে বলে "কোন খুনী এ, সিআইডির নাকের নীচে এভাবে নৃশংসভাবে হত্যা করে চলেছে।" রাজা একটু চাপা গলায় বলে "স্যার"।

সতীশ বলে "বলো "।

স্যার দুটো চিরকুট উদ্ধার হয়েছে ওই ফিম্যাল বডির সাথে, যার একটিতে লেখা" দ্রৌপদী" আরেকটিতে লেখা "আমি অশ্বত্থথামা"। এটা শুনে সতীশ সাথে সাথে আরেকটা সিগারেট ধরায়, দুটো টান দেওয়ার পর বলে "বডিটাকে ফরেনসিকে পাঠিয়ে দাও, আর রিপোর্টটা দেখিয়ে নিও"। হঠাৎ দাশ বলে ওঠে, "অর্জুন বাগচী, যুধিষ্ঠির দত্ত, নকুল কাঞ্জিলাল, ভীম সেন, সহদেব মন্ডল"। সতীশ বলে, "তুমি কি পাগল হলে দাশ, এমনিতে এ অবস্থা তার ওপর তুমি এসব কি ভুলভাল বকছো"। ভুলভাল নয় স্যার এরা হলো সেই পাঁচ জন যারা এর আগে খুন হয়েছে, কি বলো দাশ ফটাফট দাও দেখি। হুমম, একদম হুবোহু মিলে গেল নামগুলো, মাথার মধ্যে কেমন একটা বিদ্যুৎ নেমে এলো সতীশের। কিছুক্ষণ চুপ করে সতীশ বললো, "একে হালকায় নেওয়া যাবেনা, আমি এখন বাড়ি যায় গিয়ে দেখি এই গিরগিটিকে ধরার কোনো উপায় বের করতে পারি কিনা?"

সতীশ তার গাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল হঠাৎ রাজা পেছন থেকে ডাকলো, "স্যার একটা খবর এসেছে, শুনে যান"। সতীশ ছুঁটে গেল রাজার সাথে,রাজা বলে, "স্যার ফরেন্সিক থেকে খবর এসেছে যে প্রত্যেকটি খুন হওয়ার আগে তাদের সবাইকে মদ খাওয়ানো হয়েছিলো কিন্তু কেন সেটা এখনও ক্লিয়ার না"। সতীশ বলে,"স্ট্রেঞ্জ,খুনী কি করছে সেটা আমাদের বুঝতেই হবে রাজা । এই খুনীকে না মারতে পারলে দিনকে দিন মৃতের সংখ্যা বেড়েই যাবে,এ কোনো বড়ো মাপের খেলোয়াড় যে সিআইডির ইনটেলিজেন্সকে নিয়ে খেলতে চাইছে।"

রাজা বলে,"স্যার আপনি খুব ক্লান্ত,বাড়ি গিয়ে সামান্য রেস্ট নিয়ে নিন প্রয়োজনে আপনাকে ফোন করে দেবো স্যার ।" সতীশ গাড়ি করে বাড়ি ফিরছিলো, হঠাৎ সতীশ দেখে এক মুখোশ পড়া মানুষ ওর গাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে,তার হাতে একটা খুড় সেটা দিয়ে একটা মানুষকে নিরীহভাবে সে সতীশের সামনেই হত্যা করে দিলো কিন্তু সতীশ গাড়ি থেকে বের হতে পারছে না। যখন সতীশের ঘুম ভেঙে যায় দেখে তার স্ত্রী অন্বেষা পাশে শুয়ে রয়েছে। সতীশের ওঠার আওয়াজে অন্বেষাও উঠে পড়ে, সতীশ তার কাছে জানতে চায় ও বাড়িতে এলো কিভাবে? তখন অন্বেষা বলে, "তুমি গাড়িতে করে আসতে আসতে ঘুমিয়ে পড়েছিলে, তাই আর তোমায় ডাকিনি। "ও ঠিক আছে কোনো ব্যাপার না,তুমি শুয়ে পড়ো" বলে সতীশ এগিয়ে যাচ্ছিলো জল খেতে তখনই অন্বেষা বলে "তোমার জামার পকেটে একটা কাগজ পেয়েছি তোমার টেবিলে রেখেছি দেখে নিও" সতীশ এটা শুনে ছুঁটে যায় টেবিলের দিকে দেখি একটা কাগজ রাখা কাগজটা তুলতেই দেখি একটা নাম লেখা "রাম"।

সতীশ সেটা দেখে ছুটে যায় তার গাড়ির ড্রাইভার শিবরাম দার বাড়ি,গিয়ে ডাক দিতেই শিবরাম দা বাইরে এসে বলে,"বাবু এত রাতে আপনি"। শিবরাম দা কথা শেষ না করতেই সতীশ বলে ,"গাড়িতে কেউ এসেছিল শিবরাম,বলো আমায়"। সতীশের পুরোনো লোকেদের মধ্যে অন্যতম শিবরাম, তাই সে জানে শিবরাম এটা করবে না। শিবরাম বলে,"আজ তো আমি আপনাকে আনতে যাইনি, আপনাকে আমার ভাগ্নে কমলেশ আনতে গিয়েছিলো।" সতীশ বলে, "ও কেন গেল আজ?" শিবরাম বলে,"ও আজ মুম্বাই যাবে, তাই কমলেশ আমাকে বললো, "মামা তুমি জিনিসপত্র নিয়ে স্টেশনে যাও আমি ওনাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসছি।" সতীশ প্রায় হতভম্ব হয়ে যায় কোনোমতে নিজেকে সামলে শিবরামের কাছে ওর ভাগ্নের নম্বর চায় শিবরাম বললো ও একটা কার্ড দিয়েছিলো ওতে কমলেশের নম্বর লিখা ছিলো,দাঁড়ান বাবু নিয়ে আসছি ও ঘরে ঢুকলো কার্ড আনতে। প্রায় পনেরো মিনিট হয়ে গেল কিন্তু ও বের হচ্ছে না তাই দেখে আমি ভেতরে ঢুকলাম কেউ একইভাবে শিবরামকে মেরে দিয়েছে। একটা কাগজ রাখা লিখা তাতে "আমি রাম বলেছিলাম মানে শুধু রাম হবে এমন কোনো মানে নেই। পরের নাম, লক্ষণ"।

সতীশ রেগে গিয়ে চিৎকার করে বলে, "কুকুর, এতটুকু যদি সৎসাহস থাকে সামনে আয় "হঠাৎ একটা আননোন নম্বর থেকে মেসেজ আসে "গীতায় লেখা আছে রাগ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে, বিভ্রান্তি বুদ্ধিকে বিঘ্নিত করে। যখন বুদ্ধি বিঘ্নিত হয়, তখন যুক্তি বিনষ্ট হয়। যখন যুক্তিগুলি ধ্বংস হয়, একজন ব্যক্তির পতন শুরু হয়।"

সতীশ ওই নম্বরে মেসেজ করে "তুমি কে?"

উওরে আসে "আমি কলি, এই যুগটার পুরোটাই আমি। তুমি আমায় জানতে যেও না তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে"।

"আমি তোমায় জানতে চাই না, আমি জানতে চাই তুমি এই মানুষদের মারছো কেন?" সতীশ বলে। সতীশ রাজাকে ফোন করে বলে, "রাজা আমি হয়তো সেই খুনীর একটু কাছে পৌছে গেছি, তোকে যেটা বলছি সেটা কর একটা নম্বর পাঠাচ্ছি দেখতো এটা কার? যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমায় জানা এটা কার নম্বর।"

আননোন নম্বর থেকে আবার আরেকটা মেসেজ, "আমায় খুঁজতে যেও না, তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে"। সতীশ রেগে গিয়ে টাইপ করে, "তোর সাহস থাকলে সামনে এসে ধ্বংস করে দেখা"। ওদিক থেকে মেসেজ আসে,"তথাস্তু"। সতীশ কোনোমতে লোকাল পুলিশকে ফোন করে শিবরামের দেহ উদ্ধার করতে বলে, তারপর সেটাকে ফরেনসিকে পাঠানোর সময় সব ফরেনসিকের লোকেরা আর কিছু পাওয়া যায় কিনা সেটার জন্য এসেছিল এবং এই সময় হাতে লাগে এক মহিলার চুল। পুরো টিম একটু হলেও খুশি হয় কারণ তারা ভাবে এবার খুনীকে ধরা একটু সহজ হবে, কিন্তু খুনী যে অমাদের সৈন্য বানিয়ে খেলছিলো আর নিজে রাজা হয়ে লুকিয়ে রাখছিলো তা এখনও আমাদের বোঝার বাইরে ছিল।

সতীশ রাজাকে বলে দেয় নেক্সট খুন যাতে না হয় তার পুরো ব্যবস্থা করো,আমি রাজাকে বলি সকল লক্ষণ নামের লোকের ওপর নজর রাখতে, তখন আমাদের সাথে দাশ ছিলো তো ও বলে "আমার মনে হয় স্যার খুনী অন্য কিছু ভাবছে।" কেনো দাশ তোমার কি মনে হয় "স্যার আপনি দেখুন খুনী এতো বোকা নয় যে আমাদের নাম বলে দেবে তারপর সে খুন করতে এলে আমরা তাকে ধরে ফেলবো, এতো সহজ তো মনে হচ্ছে না বিষয়টা"। সতীশ দাশের কথাটাকে ফেলনা মনে করতে পারলাম না,কারণ ও যুক্তিসঙ্গত কথা বলেছে। সতীশ দাশকে জিজ্ঞেস করে "তুমিই বলে কি করা উচিত?" দাশ বলে "খুনীকে আসতে দিন, আমরা খুনীর আগের মার্ডারগুলো স্টাডি করে বুঝে নিতে সক্ষম আগামী খুন কার হতে পারে, আর সুযোগ বুঝে তাকে আমরা অন্য কারো সাথে রিপ্লেস করে দিলেই কেল্লাফতে"। সতীশ প্রচন্ড আবেগের বসে দাশকে জড়িয়ে ধরে, কিন্তু এ গল্প যে এভাবে শেষ করতে পারবে না, পুরো সিআইডি টিম এটা এখনও বুঝতে পারছিলো না। কারণ এ তো কোনো একটা খুনীর সাথে লড়াই না এ যুদ্ধ তো কালের সাথে তথা সময়ের সাথে, যে কালে সত্য চিরতরে বিলুপ্ত

হবে সেই কালের সাথে। দুদিন পুরো সিআইডি টিম খেটে লক্ষণ আগরওয়াল নামক এক ব্যবসায়ীকে লোকেট করে যে ইনি হয়তো পরবর্তী, কিন্তু সিআইডি যে ফেল করবে সেটা তারা বুঝতেও পারেনি। হঠাৎ সেই আননোন নাম্বার থেকে মেসেজ আসে মাত্র ১৪ মিনিট বাকি বাঁচিয়ে নাও পারলে, সাথে সাথে সতীশ কল করে লক্ষণ আগরওয়ালকে বলে জাস্ট ১০ মিনিটের মধ্যে সিআইডি অফিসে চলে আসুন নাহলে আপনাকে বাঁচাতে পারবো না আমরা হয়তো।

লক্ষণ আগরওয়াল মাত্র ৭-৮ মিনিটের মধ্যে সিআইডি অফিসে চলে আসেন, আমার ফোনে টাইমার চলছিল লক্ষণ আগরওয়াল আসার পরেও প্রায় আরো ৪ মিনিটের মতো বাকি ছিল। হঠাৎ টাইমার অফফ হয়ে গেল কিন্তু কিছু হলো না কিন্তু হঠাৎ চারিদিকের লাইট অফ হয়ে গেল কেউ কিছু বোঝার আগেই সর্বনাশটা ঘটে গেল। সতীশ বললো, সবাই শান্ত হও আর ফোনের টর্চটা জ্বালাও টর্চ জ্বালিয়ে দেখি ফ্লোর পুরো রক্তে ভেসে গিয়েছে, মৃত্যু হয়েছে তবে লক্ষণ আগরওয়ালের না আমার প্রিয় অ্যাসিসটেন্ট দাশ তথা লক্ষণ কুমার দাশের। সতীশ আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলো না ভেঙে পড়লো পুরোপুরি। কিন্তু ভেঙে পড়লে তো হবে না এর প্রতিশোধ নিতে হবে সতীশকে। পরদিন দাশের দেহ দাহ্য করা হলো,লক্ষণ আগরওয়াল দাশের পরিবারকে আর্থিকভাবে যে কোনোরকম সহায়তা করবে বলেছে, দাশ তো লক্ষণ আগরওয়ালকে বাঁচাতে গিয়েই মরেছে তাই তিনি দাশের পরিবারকে এই সাহায্যটুকু করতে চাই।

সতীশ ও পুরো সিআইডি টিম আর বসে না থেকে লেগে পড়লাম কাজে হঠাৎ দিল্লি হেডঅফিস থেকে কল এলো, বলা হলো কেস ছেড়ে দিতে এবার এটা সেন্ট্রাল ডিপার্টমেন্ট হ্যান্ডেল করবে । আমি (সতীশ) অনেক করে বোঝালাম বাট এ কেস আমি আর ধরে রাখতে পারলাম না । আর কি কেসটাকে হস্তান্তর করতে হলো সেন্ট্রাল ডিপার্টমেন্টের আগে। ফোন কাটার পরই রাজা দৌড়ে এসে আমার ঘরে ঢুকলো,বললাম "বুঝলি রাজা কেশটা আর রাজ্য সিআইডির হাতে থাকলো না হয়তো"। কথা শেষ করতেই ও বলে ওঠে "চুলটি কার সেটা জানা গিয়েছে "। সতীশ উন্মাদনার স্বরে বলে ওঠে "কি বলিস, কার ওটা? বল তাড়াতাড়ি"। রাজা বলে "স্যার ওটা রেজানা খাতুনের"। সতীশ বলে "তুই কি পাগল হয়ে গেছিস না নেশাভান করে এসেছিস?"

"না স্যার আমি ঠিকই বলেছি চুলটার ডিএনএ ওর ডিএনএ র সাথে মিলে গিয়েছে" রাজা বলে। সতীশ হতবাক হয়ে মাটিতে চুপ করে বসে পড়ে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একটা সিগারেট ধরিয়ে বলে,"তুই সিগারেট খাস রাজা,বা মদ

বা অন্য কোনো কিছু?" রাজা বলে, "না স্যার আমি এসবের কিছুই করি না"। পরপর দুটো টান দিয়ে সতীশ বলতে শুরু করে, এখন আমাদের কাছে অনেকগুলো জিনিস ধোঁয়াসা, ১. রেজানা খাতুন কিভাবে ফিরে আসতে পারে, যাকে আমি নিজে এনকাউন্টার করেছিলাম। ২. এই খুনী সব মাইথোলজিক্যাল সৎ চরিত্রের নাম আছে এরকম মানুষদের কেনো হত্যা করছে। ৩. খুনী ঘরে ঢুকে কিভাবে দাশকে মারলো আর আমরা বুঝতেও পারলাম না। হঠাৎ রাজা বলে, "স্যার ডিপার্টমেন্টের কেউ নিশ্চয় খুনীকে সব খবর দিচ্ছে নাহলে এভাবে আমরা ফেল করতে পারি না"। আমার খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে রাজা আমায় একটু বাড়িতে ড্রপ করে দেবে, হ্যাঁ স্যার চলুন।

আমি গাড়িতে গিয়ে বসতেই মনে হলো কিছু যেন খুব খারাপ কিছু হতে চলেছে কিন্তু আমি তা ধরতেই পারছি না, রাজা বললো চলেন স্যার। অতকিছু না ভেবে উঠে পড়ি গাড়িতে। খুব ক্লান্ত ছিলাম যেহেতু গাড়িতে উঠতেই গা এলিয়ে দি আর রাজাকে বলে দিই বাড়িতে পৌঁছে গেলে ডেকে দিস।

হঠাৎ গাড়ি থেমে আমার মনে হয় বাড়ি পৌঁছে গিয়েছি উঠে বলি বাড়ি পৌঁছে গিয়েছি রাজা। দেখি রাজা গাড়িতে নেই, দেখি বাড়ি না গিয়ে গাজোলডোবা নিয়ে এসেছে, প্রচন্ড রাগ হল নেমে ওকে বলতে যাবো, এমন সময় একটা ভারী গলায় ও বলে ওঠে, "মিস্টার সতীশ ভট্টাচার্য, আপনাকে অনেক মানসিক অবশাদ দিয়েছি কি না তাই মেজাজটা একটু ভালো করতে এখানে নিয়ে এলাম"।

প্রচন্ড ভয় পেয়ে যায় সতীশও রিভলভারটা বের করতে যাবে এমন ওদিকের মানুষটি বলে "ও ভুল করবেন না, নাহলে কোনো প্রশ্নের উওর না জেনেই আপনাকে মরতে হবে"।

সতীশ বলে "হু আর ইউ"?

ওদিক থেকে উওর আসে "আই এম মিস্টার কলি"।

সতীশ বলে,"তুমি যেই হও কিন্তু তুমি রাজার সাথে কি করেছো আগে এটার উওর দাও"। ও দিকের মানুষটি ভীষণ চিৎকার করে হেসে ওঠে,"ওর সাথে আবার কি করবো,ও তো "কলির কঙ্কাল"। সতীশ বলে,"তুমি কেন এসেছো"? ওই যে বললাম না তোমার প্রশ্নগুলোর উওর দিয়ে তোমার আত্মাকে সঠিক পথ দেখাতে। তোমার প্রথম প্রশ্নের উওর, রেজানা খাতুন ফিরে আসেনি ওর প্রেমিক ইমরান আমায় ওর চুল দিয়েছিলো, সেটাই ওখানে রেখে আসা হয়েছিল। দ্বিতীয় প্রশ্নের উওর, কলিকে শক্তিশালী হতে গেলে সব শুভশক্তিকে ধ্বংস করতে হবে, আর এই মানুষগুলো মাইথোলজিক্যাল নামের সাথে অনেক শুভশক্তির

অধিকারী তাই এদের মরতে হয়েছে আর ভবিষ্যতেও হয়তো কলির কঙ্কালরা আরো এরকম লোকেদের সরিয়ে দেবে। আর তৃতীয় হচ্ছে খুনী ঘরে ঢোকেনি খুনী আগে থেকেই ঘরে ছিল, সতীশ বলে এই কলির অন্যতম কঙ্কাল "রাজা"।

শুনে সতীশ না থাকতে পেরে বন্দুক বের করে রাজাকে মেরে ফেলতে চায়, তখন অপর দিক থেকে লোকটি মুখ ঘোরায় সতীশের দিকে, সতীশ একবার শুধু সেই মুখের দিকে তাকিয়েছে তাতে সতীশ হার্ট ব্লক হয়ে যায়। আসলে সে মুখ কখনো একটা মানুষের হতে পারেনা, চোখ দিয়ে পৃথিবীর সব হিংসা, রাগ ঝড়ে পড়ছে আর মুখে যেন পৃথিবীর সব কষ্ট, রাগ স্থান পেয়েছে সেই মুখ বলারও অযোগ্য।

পরের দিন দুজনের দেহ গাজোলডোবার ড্যাম থেকে পাওয়া যায়, সতীশের পকেটে একটা কাগজ পাওয়া তাতে লিখা, "তোমার আত্মার শান্তি কামনা করি"। রাজার পকেটে একটা কাগজ রাখা তাতে লিখা "ধন্যবাদ কলির কঙ্কাল "।

বন্ধ দরজার রহস্য

রাখী জানা ঘোড়াই

"কি ব্যাপার মি: সেন, এখনো কোন তথ্য আপনি আমাদের দিতে পারেননি, কেন? কখনো তো এত দেরি করেন না,তাহলে?" কথাগুলো বলে মি: বাগচি চেয়ে রইলেন ড: সেনের দিকে।

"নো নো বাগচি, আমি আসলে একটু বিষদে তথ্য দেওয়ার জন্যই সময় নিচ্ছি।"

-"সত্যি! "

-"ইয়েস মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড,আর মাস ছয়েকের মধ্যে আমি আমার গবেষণা কমপ্লিট করে আপনাদের সাবমিট করব। ডোন্ট মাইণ্ড, সব ঠিক সময়ে পেয়ে যাবেন।"

-"ওকে, আই এম ওয়েটিং ফর ইউ" বলেই সেনের সাথে করমর্দন করে ল্যাবরটরি থেকে বেরিয়ে গেলেন বাগচি।

ড: সেন একজন প্রত্নতত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক বাগচি তাকে মিশরের পিরামিড সম্পর্কে কিছু নমুনা দেন, সেই পিরামিড সম্পর্কিত গবেষণাতে ব্যস্ত সেন। সবই হয়েছে কিন্তু পিরামিডের ভেতরে বন্ধ দরজার রহস্য জানার খুব ইচ্ছে। পিরামিডের গায়ে বিভিন্ন চিত্রলিপি দেখে তিনি অনেক কিছু তথ্য জানতে পেরেছেন। তবে অন্যান্য বারের মতো এবারে কোন মিরাকেল হচ্ছে না কেন তাই ভাবছেন। সেন যতবারই যা নিয়ে গবেষণা করতে গেছেন ততবারই তিনি স্বপ্নে অনেক তথ্য পেয়েছেন। আর কি অদ্ভূত ভাবে সেগুলো একদম নির্ভুল হয়েছে। কিন্তু এবার পাঁচ বছর হয়ে গেছে অথচ তিনি কিছুতেই কিছু করতে পারছেন না। কাজকর্ম গুছিয়ে ঘরে এলেন সেন। মেয়ে লিসা খাবার দিতে গিয়ে লক্ষ্য করল বাবাকে,খুব অন্যমনষ্ক।

-"কিছু ভাবছো বাবা?"

-"না তেমন কিছুই না।"

-"বলতে পারো আমাকে। যদি তোমাকে হেল্প করতে পারি।"

-"আর কয়েকটা দিন দেখি তারপর।"

-"না বাবা এখনি বলো আমাকে,না হলে ঘুম হবে না আমার।"

আমতা আমতা করে বললেন,"খুব জানতে ইচ্ছে করছে পিরামিডের ভেতরে কি আছে?"

-"পিরামিড! ইউ মিন ইজিপ্টের পিরামিড?"

-"ইয়েস মাই ডিয়ার।"

-"মমির সন্ধান তো পেয়েছো,তবে? আরো কিছু আছে নাকি?"

-"আছে, বন্ধ দরজার পিছনে অনেক রহস্য লুকিয়ে আছে পিরামিডের ভেতরে।"

-"তাই!"

-"হুম। আচ্ছা পরে এ নিয়ে কথা হবে তুই শুতে যা।"

ড: সেন নিজের ঘরে না গিয়ে ল্যাবরটরিতে গিয়ে বসলেন। চারিদিকে সুসজ্জিত দেশ বিদেশ থেকে আনা বিভিন্ন মূর্তি,অস্ত্রশস্ত্র,বর্ম,মাটির ফলক,গহনা ইত্যাদি। কাঁচের বাক্সে রাখা আছে প্রাচীন মিশরীয় স্বর্ণকারের হাতের সুন্দর কারুকার্যময় একটি লাল পাথরের মূর্তি। এছাড়া নানারকম লিপি মুদ্রা পাথরের টুকরোতে ঘর ভর্তি রয়েছে।

কিছুক্ষণ পরেই উনি এগিয়ে গেলেন একটা কাঁচের জারের দিকে। ভালো করে মূর্তিটাকে দেখলেন,অবশ্য বিগত পাঁচ বছর ধরে তাই দেখে যাচ্ছেন। একটু কি আজ অন্যরকম লাগছে? আরো ভালোভাবে চেয়ে থাকলেন মূর্তির দিকে,পাশে কয়েকটা পাথরের টুকরো টেবিলের উপর সাজানো রয়েছে। পাশের টেবিলে রয়েছে ড: বাগচির দেওয়া কিছু ছবি। এই ছবিগুলো একদম লেটেস্ট,নতুন ডিভাইস পাঠিয়ে এগুলো তোলা হয়েছে। ছবিগুলো দেখতে দেখতে কেমন যেন একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। কতক্ষণ ওই রকম ছিলেন মনে নেই তবে কিছু একটা পড়ে যাওয়ার আওয়াজে ঘুমটা ভেঙে গেল। চেয়ে এদিক ওদিক তাকাতেই চোখ পড়ল পাথর গুলোর দিকে, টেবিল থেকে পড়ে গেছে কয়েকটা। ঘড়িতে তখন রাত দুটো। লাইব্রেরিতে রিসার্চ করেন রাতের পর রাত,কখনো ঘুমিয়েও পড়েন। আজ ভাবলেন ঘরে শোবেন,তাই পাথরগুলো তুলে দিয়ে লাইট অফ করতে গিয়ে মনের মধ্যে খটকা লাগে ওনার, পাথরগুলো পড়ল কেমন করে?

আর তখনই আলমারির মধ্যে থেকে কেউ একজন ফিসফিস করে বলে

উঠল,"আমাকে মুক্ত করো।" ড: সেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছেন না,ভালো করে কান পেতে আবার একই কথা শুনতে পেলেন। তারপরেই তিনি দেখলেন কাঁচের জারের মূর্তিটা একটা সাপ হয়ে জার থেকে বেরিয়ে এসে দেখতে দেখতে মানুষে পরিণত হয়ে গেল। তারপর আলমারির লক খুলল, সাথে সাথে আলমারিতে রাখা মমির ছবিগুলো বেরিয়ে এলো। ড: সেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছেন না,এসব কি হচ্ছে! ছবি থেকে মমি বেরিয়ে দাঁড়াল ড: সেনের সামনে। স্পষ্ট বলল,"আর ইউ রেডি,ড: সেন? হতবাক সেন কোনরকমে বললেন, "হোয়াট?"

-"আপনি তো পিরামিডের বন্ধ দরজার রহস্য জানতে চান। পিরামিডের ভিতরে কি আছে দেখবেন না?"

-"বাংলাতে কথা বলছেন!"

-"আমরা সব ভাষাতে পারদর্শী,আপনি এই তথ্য পাননি?"

-"না মানে..."

-"যারা পিরামিডের মতো একটা আশ্চর্য জিনিস বানাতে পারে তাদের কাছে ভাষাটা কোন ব্যাপার নয় ড: সেন।" মাথা নীচু করে স্বীকার করে নিলেন, "হ্যাঁ তা তো বটে।"

এবার সেই মমি সেনের হাতটা ধরল, সেন চমকে উঠলেন! বরফের থেকেও ঠান্ডা, কি করে সম্ভব! অবাক লাগছে ভীষণ,তিনি জেগে আছেন না ঘুমিয়ে আছেন বোঝবার জন্য গায়ে একটা চিমটি কাটলেন। নাঃ তিনি তো জেগেই আছেন,তাহলে এসব কী হচ্ছে?

"খুব অবাক হচ্ছেন ডঃ সেন?" ঘুরে দেখলেন মিশরের একজন ফারাও সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। মাথা নীচু করে অভিবাদন জানালেন সেন। সবচেয়ে আশ্চর্য লাগল যখন দেখলেন ফারাও মাথা নীচু করলেন। তারপর বললেন,"ডঃ সেন আপনি আজ এখানে এসেছেন আমাদের সৌভাগ্য,পিরামিডের ভেতর ঘুরে দেখার অনুমতি দিলাম, এই পিরামিডের রক্ষক আমিই। আপনাদের জন্য আমাদের কথা সবাই জেনেছে,আমরা চাই আরো জানুক আমাদের সম্বন্ধে। পৃথিবীর মধ্যে আমরাই শ্রেষ্ঠ এটা একদিন প্রমাণ হবেই,আর সেইদিন আবার আমরা সবাই জেগে উঠব।"

-"জেগে উঠব মানে!" বিস্ময় প্রকাশ করলেন সেন!

-"এই মানে বোঝাতেই তো আজ এখানে এনেছি আপনাকে। পিরামিডের

ভিতরে যে রহস্য লুকিয়ে আছে তা দেখে আপনি ধারণাও করতে পারবেন না যে মিশরীয়রা কি করতে পারে।"

-"বেশ তবে দেখাই যাক,পিরামিডের ভেতরে কি আছে।"

-"আপনার জন্য গিজারের খুফুর দরজা খুলে দেওয়া হলো। আপনি চোখ কান সব খোলা রেখে দেখে নিন।"

-"আমি কী গিজারের খুফুর পিরামিডের সামনে দাঁড়িয়ে আছি!"

-"হ্যাঁ পৃথিবীতে যে কটা পিরামিড আছে তার মধ্যে গিজার বা খুফুর পিরামিড সবচেয়ে বড়। এর উচ্চতা চারশ একাশি ফুট, অর্থাৎ আটচল্লিশ তলা বাড়ির সমান।"

-"কিভাবে তৈরি করেছেন? কোন মানুষের পক্ষে তো সম্ভব নয়,তাহলে?"

-"সেটাই তো রহস্য, আপনি ভেতরে গেলে সব তথ্য পেয়ে যাবেন। তবে আপনাকে একটা ছড়া বলব, পিরামিডের ভেতরে দরজা খোলার সন্ধান তাতেই পাবেন।

-"বেশ তবে বলুন,শুনি।"

-"সাদা পাথরের গায়ে চিত্রলিপি আঁকা/ বন্ধ দরজার মুখ ওতেই আছে রাখা।"

-"এইটুকুই?"

-"হ্যাঁ"

-"বেশ তবে চলুন।"

সেন এসে খুফুর পিরামিডের সামনে দাঁড়ালেন,অদ্ভূত এক ভালোলাগা জড়িয়ে ধরল সেনকে। চাঁদের আলোতে ভীষণ সুন্দর লাগছে দেখতে,গ্রানাইট পাথর দিয়ে তৈরি। মনে মনে সেন বললেন,"কি অদ্ভূত সৃষ্টি তোমাদের।" তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন সামনের দিকে। পিরামিড পুরোটাই পাথর দিয়ে তৈরি। প্রায় পঁচিশ লক্ষ পাথরের টুকরো দিয়ে পিরামিড তৈরি করা হয়েছে সেন জানেন। এমনকি এক একটা পাথরের ওজন তিন হাজার থেকে সত্তর হাজার টন,আধুনিক পদ্ধতিতে তৈরি ক্রেনগুলো কুড়ি হাজারের বেশি ওজন নিতেই পারে না সেখানে পাঁচ হাজার বছর আগে কোন পদ্ধতিতে এই পাথরগুলোকে অত ওপরে তোলা হয়েছে ভেবেই সেন অবাক হয়ে যান। পিরামিডের গায়ে যে লিপি এবং চিত্রগুলো রয়েছে তার বেশ কিছুটা সেন উদ্ধার করে ফেলেছিলেন। শুধু একটু জানতে চাইছেন ভেতরে একশফুট লম্বা একটা গুপ্ত ঘর রয়েছে,সেই ঘরে কি আছে?

পিরামিডের ভেতরে তিনি তিনটে লারস চেম্বার দেখতে পেলেন। সেই চেম্বারের গায়ে মিশরীয় ভাষায় লেখা আছে কার চেম্বার কোনটা। একদম নীচে আছে কুইনস চেম্বার,রানীরা মারা গেলে তাদের দেহ মমি করে রাখা হতো এখানে। কুইনস চেম্বারটা ভালো করে দেখলেন,উত্তর দক্ষিণে উনিশ ফুট লম্বা এবং পূর্ব পশ্চিমে সতের ফুট লম্বা। মেঝে থেকে ছাদের দূরত্ব প্রায় সাড়ে কুড়ি ফুট। খানিক এগিয়ে গেলেন উত্তর দক্ষিণে,দুদিকে দুটো প্যাসেজ বেরিয়ে গেছে। সেন আর এগিয়ে গেলেন না। ওখানে দাঁড়িয়ে সেন মনে মনে ভাবলেন যদি রানী কিউপেট্রার মমিটা একবার দেখতে পেতাম খুব ভালো হতো।

তিনি নীচ থেকে ক্রমশ উপরের দিকে এগিয়ে গেলেন, এটা গ্র্যান্ড গ্যালারি, না তেমন কিছুই পেলেন না, এরপর আছে কিং খুফু বা ফিবার চেম্বার। এই ঘরটি অপেক্ষাকৃত অনেক বড়। উত্তর দক্ষিণে চৌত্রিশ ফুট লম্বা এবং পূর্ব পশ্চিমে সতের ফুট লম্বা। এই ঘরের মেঝে থেকে ছাদ পযর্ন্ত উচ্চতা প্রায় উনিশ ফুট। এখানেই রাজা খুফুর মমি রাখা ছিল,যা এখন কায়রো মিউজিয়ামে রাখা রয়েছে সেন জানেন। খুফুর কফিনটা একদম সাদামাটা,অন্যান্য কফিন সেন দেখেছেন গ্রানাইট পাথরের গায়ে সুন্দর ডিজাইন করা আছে কিন্তু এটা অতি সাধারণ।

কিন্তু একটা চেম্বারেও মমি নেই। বুঝলেন মমিগুলো চুরি হয়ে গেছে না হয় মিশরের লোকেরা জাদুঘরে রেখেছে। তবে সেন জানতেন মিশরের অনেক মমি চুরি হয়ে গেছে। আসলে মিশরীয়রা বিশ্বাস করে মানুষ মারা যাওয়ার পরেও তাদের শরীরে আত্মা বাস করে,তাই তারা মৃতদেহকে সংরক্ষণ করে রাখত, এবং পিরামিডের মধ্যে মমি রেখে সেখানে তার প্রয়োজনীয় খাবার গহনা দামী আসবাবপত্র,পোষাক সব কিছু রেখে দিত। এমনকি ফারাও বা রাজারা মারা গেলে যেসব দাসদাসী তাদের সেবা করত তাদেরকেও জীবন্ত মমি করে রাখত। মমির সাথে থাকা দামী জিনিস গুলোর জন্য দস্যুরা মমি চুরি করত। সেন এগুলো সম্পর্কে জানেন,দেখতে দেখতে এগিয়ে গেলেন আরো খানিকটা।

কোথাও যখন কিছু খুঁজে পেলেন না ফিরে এলেন নীচে কুইনস চেম্বারে। উত্তর দক্ষিণে যে দুটো প্যাসেজ রয়েছে সেই প্যাসেজ ধরে এগোতে লাগলেন। বেশ কিছুটা যাওয়ার পর দেখলেন ভারী পাথর দিয়ে প্যাসেজের মুখ বন্ধ করা। তাতে আবার দুটো হাতল লাগানো। কিছুতেই যখন কিছু হচ্ছে না তখন দেখলেন চারিদিকে অনেক চিত্রলিপি আঁকা,আর দুর্বোধ্য ভাষায় কিছু লেখা। কি মনে হলো মনে মনে ছড়াটা একবার আউড়ে নিয়ে ছবিগুলো দেখতে লাগলেন। বিভিন্ন রকম ছবি আঁকা রয়েছে, তার মধ্যে তিনটে ছবি একই রকম, এমনভাবে ছবি গুলো রয়েছে দেখে মনে হচ্ছে একটা চাবি। তিনটে ছবির উপর হাত

বোলালেন, আর সাথে সাথে সামনের বন্ধ দরজাটা খুলে গেল।

দরজা খুলে দেখলেন একদম ঘুটঘুটে অন্ধকার, কিছুই দেখা যাচ্ছে না,জামার পকেটে হাত দিয়ে ছোট টর্চটা পেলেন। টর্চ জ্বালিয়ে দেখলেন ওই ঘরের দেওয়ালে লালরঙের হাইগ্রোলিফ ব্যবহার করে অনেক কিছু লেখা রয়েছে। কিছু সাংকেতিক চিহ্নও রয়েছে। দেওয়াল ধরে এগোতে লাগলেন,তবে এবার বেশ একটু ভয় ভয় করতে লাগলো। ভেতরে কি আছে কে জানে? তার চাইতে ফিরে যাওয়াই ভালো। এই মনে করে একবার ফিরতে চাইলেন কিন্তু মনের কৌতূহলে আবার চলতে শুরু করলেন সামনের দিকে। একটা ক্ষীণ আলোর রেখা দেখা দিল,ক্রমশ সেই রেখা উজ্জ্বল ও প্রকট হলো। সেন দেখলেন বেশ বড় একটা হলঘর। সিংহাসনে বসে আছেন স্বয়ং রাজা খুফু। তাঁর রাজত্বকাল তিন দশক ধরে চলে ছিল। আশে পাশে যারা রয়েছে তাদের শরীরের গঠন বড়ই অদ্ভূত। কারুর মুখ মানুষের, দেহ সিংহের আবার কারুর মুখ পাখির মতো অথচ দেহ মানুষের। মমিগুলো ঘোরাফেরা করছে,এক কোণে শেয়ালের মুখওয়ালা একজন মানুষ দেখতে পেলেন। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো আনুবিশ! মমি শিল্পের দেবতা! কাছে এগিয়ে গেলেন, দেখলেন ভালো করে একটি মৃতদেহকে মমি করা হচ্ছে। জিজ্ঞেস করলেন,"কীভাবে মমি করেন?"

আনুবিশ দেখলেন সেনকে, তারপর বললেন, "কিছু রাসায়নিক পদার্থ আর বিটুনিন মিশিয়ে লিলেন কাপড়ে জড়িয়ে তৈরি করা হয়।"

-"কতদিন সময় লাগে?"

-"প্রায় একমাস।"

-"রাসায়নিক পদার্থ কি কি দেওয়া হয়?"

-"সব যদি বলে দিই তাহলে সবাই তো মমি তৈরি করবে মৃতদেহের। তাছাড়া এটা ব্যয়বহুল। আপনাদের গরীব দেশের এত টাকা নেই।"

অপমান হজম করে এগোতে এগোতে হঠাৎ মানুষের মধ্যে এলিয়নের মতো কিছু দেখতে পেলেন। পলক পড়তে না পড়তেই অদৃশ্য হয়ে গেল। একটা গ্রানাইটের বড় বাক্স দেখতে পেলেন,তার মধ্যে কিছু লাল রঙের তরল রয়েছে,মৃতদেহগুলো তার মধ্যে চুবিয়ে রাখা হচ্ছে। সেন পা পা করে এগিয়ে গেলেন,আঙুলে একটু তরল নিয়ে জামাতে লাগিয়ে নেন। কয়েকটা মমি দেখতে পেলেন ষাঁড়ের। অদ্ভূত সমস্ত কার্যকলাপ দেখে অবাক হলেন সেন। এটা বুঝলেন যে প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতায় আরো এক প্রজাতির মানুষ ছিল যাদের শরীরের গঠন ছিল মানুষের মতো কিন্তু মুখটা ছিল পশুপাখির মতো।

হঠাৎ সবাই খুব চঞ্চল হয়ে উঠল। সবাই লাইন করে দাঁড়িয়ে পড়ল, প্রথমে চাবুক হাতে একজন এলেন, সেন তাঁকে চিনতে পারলেন দেবতা সেথ। মিশরের এই দেবতা উশৃঙ্খল ও ভীষণ হিংস্র। অবশ্য প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতায় অনেক দেবদেবীর উল্লেখ পাওয়া গেছে। চাবুকটা সামনে দোলাতে দোলাতে এগিয়ে গেলেন সেথ। তার পিছনে নানা রকম গহনাতে সেজে এলেন রানী কিওপেট্রা। তার রূপের ছটায় পুরো হলঘর জ্বলজ্বল করে উঠল। সিংহাসনে বসে ড: সেনের দিকে চাইলেন রানী সাহেবা। সেনের উদ্দেশ্যে বললেন," আপনাদের অনুমান সঠিক,মানুষ এবং এলিয়নদের যৌথ প্রচেষ্টাতে পিরামিড তৈরি হয়েছে। এখানে ভিনগ্রহীরা আসে। তাদের সাথে আমরা মিশরীয়রা নিয়মিত মেলামেশা করি যোগাযোগও রয়েছে।"-- এই দেখুন বলেই হাততালি দিলেন। সাথে সাথে চারটে এলিয়ন দৃশ্যমান হলো,দেখেই বুঝলেন অদৃশ্য হওয়ার ক্ষমতা রয়েছে ওদের।

এবার সবার দৃষ্টি সেনের দিকে পড়ল,ভয় পেলেন সেন। কিওপেট্রা বলতে শুরু করলেন,"পিরামিডের গুপ্তঘরে মমিদের আবার শশরীরে পৃথিবীর বুকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে। আজ হাজার হাজার বছর ধরে গবেষণা চলে আসছে। কিন্তু আপনাদের অতিরিক্ত কৌতূহল বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে,শাস্তিতে কিছু করা যাচ্ছে না। কালো যাদুতে মিশরীয়রা শ্রেষ্ঠ সেটা জানেন। সুতরাং --- আপনাকে এমন দৃষ্টানমূলক শাস্তি দেওয়া হবে যে পিরামিডের বন্ধ দরজার রহস্য কেউ আর জানতে চাইবে না।" রানীর নির্দেশে মমিগুলো এবং সেথ সেনের দিকে এগোতে লাগল। সেন আর না দাঁড়িয়ে প্রাণপণ ছুটতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু যেদিকেই যাচ্ছেন সেইদিকেই সেথকে দেখতে পাচ্ছেন। একসময় কিওপেট্রা এগিয়ে এলেন, সেন চিৎকার করে বললেন,"ভুল হয়ে গেছে, আমাকে ছেড়ে দাও, বাঁচতে দাও আমায়।"

মুখের মধ্যে জলের স্পর্শ পেয়ে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসলেন তিনি। "বাবা তুমি ঠিক আছো? স্বপ্ন দেখছিলে? বেলা হয়ে গেছে উঠছো না দেখে শোবার ঘরে দেখি নেই, তখন এলাম তোমার লাইব্রেরিতে। এসে দেখি চেঁচাচ্ছ।"

-"হ্যাঁ রে স্বপ্নই বটে। ঠিক আছে আমি আসছি তুই যা।"

মেয়ে যাওয়ার পর ভাবলেন কি ভয়ানক স্বপ্ন! কিন্তু জামার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলেন! পিরামিডের ভেতরে গ্রানাইট বাক্সের সেই লাল তরল তখনও জামায় লেগে আছে,স্বপ্নই যদি হবে তবে এই লাল রঙের দাগ এলো কোথা থেকে? বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন দাগটার দিকে।

আত্মার মুক্তি

রীনা চক্রবর্তী

আমি টিনা আমার বাবা কোল ইন্ডিয়ার ম্যানেজার। বাবার বদলীর চাকরির কারনে আমাদের এক জায়গায় বেশিদিন থাকা হয়না। বর্তমানে আমরা আসানসোল কোলিয়ারির বিশাল বাংলোয় থাকি। খুব মনোরম পরিবেশ, এক কথায় আমাদের বাংলোটাকে শান্তিনিকেতন বলা যায়। গাছগাছালিতে ভর্তি। এখানে এসে নতুন স্কুলে ভর্তি হয়েছি ক্লাস নাইনে। স্কুলটা অবশ্য বাড়ি থেকে বেশ দূরে, বাড়ির গাড়িতে যাতায়াত করতে হয়।

আমি ভীষণ চুপচাপ থাকতে ভালবাসি। আমার এই স্বভাবের জন্য এই স্কুলে এসেও নতুন সহপাঠীদের হাসির পাত্রী হয়ে যায়। আমি কাউকে বলতে পারি না।' তোমরা আমার বন্ধু না, আমার বন্ধুদের দেখা যায় না, ওদের সাথে মেশা যায় না।' সেই কারণে কাউকে আমি বন্ধু করতে পারিনা। আপনারা ভাবছেন তো আমি কি পাগলের মতন কথা বলছি! তবে আপনাদের বলি শুনুন।

আমার একটা অদ্ভুত শক্তি আছে, আমি জ্ঞান হবার পর থেকে অদৃশ্য কিছু দেখতে পাই, বা ওদের অনুভব করি। যেটা কিনা কেউ বিশ্বাস করবে না। যদিও আমি সেটা বাবা-মাকে ছাড়া কাউকে বলিনি। অবশ্য ওনারা হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন, বিশ্বাস করেননি। আমি অনেক সময় অনুভব করি এইসব অদৃশ্য শক্তিরা আমাকে পছন্দ করে, আর বিপদ থেকে উদ্ধার করে।

আমার যখন চার কি পাঁচ বছর বয়স, ঠিক এই রকম একটা বড়ো বাংলোয় থাকতাম। ছাদে ওঠার জন্য ছিল ঘোরানো লোহার সিঁড়ি। পড়ে যাবো সেই ভয়ে মা আমাকে কখনো ছাদে যেতে দিতেন না। একদিন মা সংসারের কাজে ব্যস্ত আমি চুপিচুপি ছাদে যাব বলে সবে দুই সিঁড়ি উঠেছি। আমার মনে হলো সেটা যেন নড়ে উঠল। আমি ভাবলাম মা, পেছনে তাকিয়ে দেখি কেউ নেই। চুপ চুপ করে ছাদে উঠে গেলাম কিন্তু বুঝতে পারলাম কেউ যেন আমার পেছন পেছন ছাদে আসলো, সিঁড়িতে কাউকে দেখতে পেলাম না। ছাদে গিয়ে দেখি একটা ছোট্ট প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে। আমি প্রজাপতিটা ধরার জন্য ছুটছি কিন্তু ধরতে পারছি না,ওটা অনেক উপরে উড়ছে। আমি ছাদের রেলিংয়ে উঠে

প্রজাপতিটা ধরতে গেলাম হঠাৎ পা ফসকে নিচের দিকে পড়ে যাচ্ছি, আর কিছু মনে নেই। যখন বোধ আসলো, দেখলাম আমি ছাদে বসে আছি! কে বাঁচালো আমাকে? ভয়ে মাকে কিছু বললাম না। সেই প্রথম অনুভব। আর একবার দশ বছর বয়সে বাবা-মায়ের সাথে পুরী বেড়াতে গিয়েছি, সেটা প্রথমবার পুরীর সমুদ্র দর্শন। আমি আনন্দে আত্মহারা। বাবা -মা বিচে চা খাচ্ছে, আমি সমুদ্রের ঢেউ'এর সাথে খেলছি। হঠাৎ সমুদ্র খেলা ফেলে আমাকে ক্রমশ নিজের দিকে টেনে নিচ্ছে। আমি তলিয়ে যাচ্ছি। কে যেন আমাকে ঠেলে পারে নিয়ে আসলো। কে!? তারপর অনেক বার এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে।

তখন থেকেই আমি ভাবুক প্রকৃতির হয়ে গেলাম। আমার এই চুপচাপ স্বভাবের জন্য সময় পেলেই স্কুলের লাইব্রেরীতে গিয়ে বসে থাকি।বই পড়ি। বই আমার বন্ধু। অলৌকিক, ভৌতিক বই আমি ভালোবাসি। এই বইয়ের মধ্যে আমার বন্ধুরা যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে । লাইব্রেরীতে বই পড়ায় মনোযোগ বসানোর জন্য সমস্ত বড় আলো নিভিয়ে যার যার ডেস্কে আলো জ্বালিয়ে রাখা হয়। একদিন লাইব্রেরীতে একমনে বই পড়ছি হঠাৎ একটা উজ্জ্বল আলো আমার চোখে এসে পড়লো, তাকিয়ে দেখি আমার দুটো ডেস্ক পরে আমার বয়সী একটা মেয়ে একটা বই মনোযোগ দিয়ে পড়ছে। সেই বইয়ের মলাট থেকে তীব্র উজ্জ্বল আলোর উৎপত্তি। আমার কৌতুহল হলো কি বই ওটা? আমি আস্তে আস্তে উঠে মেয়েটার পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তড়িৎ গতিতে উঠে মেয়েটা বইটা আড়াল করল, এক লহমায় দেখে নিলাম বইটার নাম, 'আত্মার মুক্তির উপায়' শরীরে একটা শীতল স্রোত আমাকে কাঁপিয়ে দিলো। মেয়েটার চোখে একটা অবাক দৃষ্টি। আমি ভালো করে কিছু বোঝার আগেই ও দরজা দিয়ে বের হয়ে বাগানের দিকে চলে গেল । আমি ওকে অনুসরণ করে বাগানে গেলাম ...কিন্তু বাগান জনশূন্য সারা স্কুলময় ওকে খুঁজে বেড়াতে লাগলাম। কোথাও ওকে দেখতে পেলাম না । ওর হাতের বইটা কোথায় রাখল খুঁজে পেলাম না।

আমার ভেতর জেদ চেপে গেল.. কি রহস্য জানতেই হবে। লাইব্রেরীতে এত ছাত্রী অথচ আমার মনে হল ওকে কেউ যেন দেখতে পাই নি । আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় জানান দিল, 'তুমি আবার কিছু দেখেছো, অন্য ছাত্রীদের উপস্থিতিতে তুমি ওর সাথে কথা বলতে পারবে না।' পরের দিন মাকে জানালাম,' স্কুলে দরকার আছে এক ঘণ্টা দেরিতে গাড়ি পাঠাবে'। আমি নির্জন স্কুলে ওকে একা দেখতে চাই, কথা বলতে চাই। কোন ক্লাসে পড়ে ও! ওকে তো সারা স্কুলে কোথাও দেখছি না! স্কুল ছুটির পর বাগানে আসলাম সেখানে দেখতে পেলাম না । শীতের বিকেল অন্ধকার হয়ে আসছে ... স্কুল বিল্ডিং এর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি...

হঠাৎ সশব্দে লাইব্রেরীর দরজা খুলে গেল। ভয়ে ছুটে বের হয়ে আসলাম, দূর থেকে দেখলাম লাইব্রেরী রুমের দরজার পাশে ঝাপসা একটা অবয়ব আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। আমি নিশ্চিত হলাম এই রুমেই ওকে পাওয়া যাবে। তবে আমি ভয় পাচ্ছি কেন? ওকে তো আমি খুঁজছি।

পরের দিনও একটু দেরি করে গাড়ি পাঠাতে বললাম। আজ ওর সাথে আমি কথা বলবই, আমি জানতে চাই, কে ও? আমাদের লাইব্রেরী রুম বিল্ডিং-এর দ্বিতীয় তলায়। তার ঠিক উল্টো দিকে বাথরুম। কিন্তু ওটা সব সময় তালা দেওয়া থাকে। কেন ? আমি যেহেতু চুপচাপ থাকি তাই এই বিষয়ে কৌতুহল থাকলে কাউকে প্রশ্ন করিনি। এর মধ্যে দিন সাতেক ওকে আর লাইব্রেরীতে দেখতে পাইনি, কিন্তু আমার সব সময় মনে হয় আমার পেছনে দাঁড়িয়ে কেউ আমার হাতের বই ঝুঁকে দেখছে। ও কি আমাকে দেখা না দিয়ে অনুসরণ করছে, কেন?

একদিন আমি খাতায় লিখলাম-' তুমি আমার বন্ধু হবে?'

কোন উত্তর নেই।

এরপর থেকে আমি এই বাংলোতেও অদৃশ্য কারোর উপস্থিতি টের পাই। একদিন রাতে আমার বাথরুম যাবার প্রয়োজন। বেডসুইচ জ্বালাতে যাব হঠাৎ আলো জ্বলে উঠলো, মনে হল একটা হাত সরে গেল! আমার একটু ভয় ভয় করল, কিন্তু কেন আমাকে অনুসরণ করছে?

পরের দিন ও অতিরিক্ত ক্লাসের অজুহাত দেখিয়ে গাড়ি দেরীতে যেতে বললাম। জানুয়ারি মাস বিকাল পাঁচটায় অন্ধকার নেমে এসেছে , একা স্কুল গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছি.. যদি ও দেখা দেয়। আমার অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে পেছন থেকে এসে চারটে ছেলে আমায় ঘিরে ধরলো। আমি ওদের মুখ চিনি, স্কুলের অদূরে বসে থাকে, আর স্কুলের মেয়েদের নানান রকম কটূক্তি করে। স্কুল কর্তৃপক্ষ থানায় জানিয়েও কোনো ফল হয়নি। কিছুদিন বন্ধ থাকে আবার ফিরে আসে। ওদের দেখে ভয়ে আমি চিৎকার করে উঠলাম, ওরা অবাক চোখে আমাকে দেখতে লাগল, আমার মনে হল ওদের চোখগুলো যেন আমাকে ভেদ করে অন্য কিছু দেখছে। তারপর দৌড়ে পালিয়ে গেল। আমি পেছন ঘুরে দেখলাম স্কুলের ছাদের উপর দুটো চোখ ভাটার মতো জ্বলছে। পাথরের মূর্তির মতন দাঁড়িয়ে আছি, আমার মনে হলো কে যেন কানের কাছে বলল- 'ওদের সময় এসে গেছে।' ঠিক সেই সময় আমার গাড়ি এসে পড়ায় আমি ঘোরের মধ্যে গাড়িতে উঠে বসলাম।

মাঝ রাতে কিসের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল , শুনতে পেলাম বারান্দা কার পায়ের আওয়াজ।

-কে?

-'আমি '-একটা অস্ফুট আওয়াজ। তারপর আবার সব নিশ্চুপ।

পরের দিন স্কুল ছুটি, বাবার ফোনে স্কুল থেকে ম্যাসেজ পাঠিয়েছে। খবর নিয়ে জানা গেল স্কুলের অদূরে চারটে ছেলের ক্ষতবিক্ষত দেহ পাওয়া গেছে। পুলিশ চারিদিক ঘিরে রেখেছে। কথাটা শুনে আমি হেসে ফেললাম। দেখে বাবা- মা অবাক হয়ে গেলেন। আমি নিজেকে সামলে নিলাম ।ওনারা কি করে জানবেন.. আমি জানি কে করেছে ওদের এই দশা।

সন্ধ্যাবেলায় ছাদে হাঁটছি আর ভাবছি এখন যদি ও দেখা দেয়, কি বলতে চায় জানতে পারবো। আমার মনের কথা কি ও শুনতে পারলো!

-'এই তো এসেছি।' ঝাঁপসা একটা অবয়ব আস্তে আস্তে আকার নিল। আমার গলার স্বর কেঁপে উঠল, 'তুমি?'

-'আমি রুপসা, তোমাকে কিছু বলতে চাই, ভয় পেয়োনা।

আজ থেকে দুই বছর আগে তোমার স্কুলে আমি ক্লাস নাইনে পড়তাম। খুব শান্ত আর বই পাগল মেয়ে ছিলাম। মাঝে মাঝে লাইব্রেরীতে চলে যেতাম। কখন স্কুল ছুটি হয়ে যেত খেয়াল থাকব না। সেই সুযোগে একদিন আমাদের দারোয়ান আমাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে, আমি চিৎকার করে উঠি, ও ভয়ে ছেড়ে দেয়। তারপর থেকে ও আমাকে সবসময় অনুসরণ করতো। তখন থেকে একটা ধারালো ছুড়ি আমার কোমরে লুকিয়ে রাখতাম।

এর মধ্যে আমাদের স্কুলে ফেস্ট এসে গেল। আমাদের স্কুলে ফেস্টে প্রতিবার আলাদা রকম আয়োজন করা হতো। সেই বার ঠিক হয়েছিল জাপানের 'সাসসুবুন' উৎসবের অনুকরণে উৎসব হবে। টিচার,ছাত্রী,অশিক্ষক কর্মী সবাই রাক্ষসের মত মুখোশ পরবে। এমন ভাবে সাজবে যাতে কাউকে আলাদা ভাবে চেনা না যায়। সবাই আলখাল্লা পরেছিল। ফেস্ট যখন জমে উঠেছে টিচাররা ক্যান্ডি ছুড়ছে, সবাই ছুটে ছুটে কুড়াচ্ছি হঠাৎ একজন আমাকে জড়িয়ে ধরে, আমি বুঝতে পারি এ আমাদের দারোয়ান, আমি আমার কোমর থেকে ছুড়ি বার করে পাগলের মতো ওর বুকে আঘাত করতে থাকি। ওর চিৎকারে আমার ঘোর কাটে, এ তো দারোয়ান না! সবাই হৈ চৈ করে ওর মুখোশ খুলে দেয়, আমি অবাক হয়ে দেখি আমার প্রিয় বান্ধবী মধুজা।

অনুতাপে, ভয়ে আমি দৌড়ে লাইব্রেরীতে যাই, চেয়ারের উপর চেয়ার রেখে আমার পরনের আলখাল্লা গলায় পেঁচিয়ে ঝাড়বাতির সাথে ঝুলে পড়ি। আমার দেহের সদ্গতি হয় কিন্তু আমার আত্মা মুক্তি পায় না। আমার মৃত্যুর জন্য যে দায়ী তাকে শাস্তি দিতে হবে। দুই দিন পর দারোয়ানের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ ঐ বাথরুমে পাওয়া যায়। তারপর থেকে ঐ বাথরুম বন্ধ থাকে।

আজও আমার আত্মা মুক্তি পায়নি। মুক্তির উপায় খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। তুমি তো দেখেছ 'আত্মার মুক্তির উপায়' বইটা আমাকে পড়তে। কিন্তু একজন মাধ্যম দরকার। যার মাধ্যমে আমি মুক্তি পাবো। তোমার মত কাউকে খুঁজছিলাম। হবে তুমি সেই মাধ্যম? আমাকে মুক্তি দেবে?

তুমি আমার বন্ধু তোমাকে মুক্তি দিলে আমি আমার বন্ধুকে হারাবো, তবুও তোমার আত্মার শান্তির জন্য তোমায় আমি মুক্তি দেবো। বলো কিভাবে?

কাল লাইব্রেরিতে গিয়ে ঐ বই'টা দেখো লেখা আছে, পেজ'টায় আমি মার্ক দিয়ে রেখেছি। তারপর রাতে ছাদে এসো, আমি অপেক্ষায় থাকবো।

পরের দিন লাইব্রেরীতে গিয়ে বইটা খুঁজে পায়, কিন্তু মার্ক দেওয়া পেজ কোথায়? হঠাৎ চোখে পড়ে দুটো পেজ একসঙ্গে ভাঁজ করা। খুলে দেখি ইংলিশে কিছু শব্দ লেখা। আমি ছিড়ে নেই সেই পেজ। কয়েকবার পড়ার পর মুখস্থ হয়ে যায়।

রাত দুটোয় ছাদে আসি দোটানা মনে। আমি কি ঠিক পথে চলেছি? কোনো বিপদ হবে নাতো ? কিন্তু কেন রুপসা কে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করছে?

-'টিনা কাছে এসো... আমার চোখের দিকে তাকাও... কাগজের লেখা মন্ত্রটা জোরে জোরে বলো।

আমি যন্ত্রচালিতের মত কাজ করে যাচ্ছি। রূপসার অবয়বটা ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে পরিণত হলো। তারপর আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। এতদিন আত্মার সাহায্য পেয়েছি, কখনও তাদের কাউকে সাহায্য করতে হবে ভাবিনি।

কবর থেকে উঠে

রিয়া মিশ্র

"ঠিক এই মুহূর্তে আমার হাতে আর বিশেষ সময় নেই। এটা লিখতে লিখতেই আমি স্পষ্ট দেখতে পারছি, তারা আসছে, এসে গেছে। এমনকি আয়না দিয়ে আমি আর আমাকে দেখতে পারছি না, তার বদলে রয়েছে তাদেরই এক জন। আমার ভুলটা কোন্ জায়গায় হয়েছে, আমি বুঝতে পারছি এখন কিন্তু এটা শোধরানোর সময়টুকু আর আমার হাতে নেই বোধহয়।"- এই অবধি পড়ে ডায়রিটা বন্ধ করে একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ছাড়ল কাব্যিকা, উঠে গিয়ে কিচেনে কফি তৈরী করতে লাগল সে। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে, কফিটা না খেলেই নয়, ঘুমটা চোখ থেকে সরাতেই হবে, জানতেই হবে তাকে সব সত্যিটা। জানলার বাইরে নিকষ কালো অন্ধকার ছাড়া বিশেষ কিছু দেখা যাচ্ছে না। এই সময়টা ইতালি শহরে বেশ ঠাণ্ডা থাকে, বিশেষ করে রাতের দিকটা খুবই ঠাণ্ডা পড়ে। ফায়ারপ্লেসের আগুনটা আরেকটু বাড়িয়ে দিয়ে কফি মগ হাতে সোফায় আয়েশ করে বসে আবার ডায়রিটা খোলে সে।

রোজ ডায়রি লেখা অভিমন্যুর বরাবরের অভ্যাস ছিল। প্রথম পাতাগুলো পড়া হয়ে গেছিল কাব্যিকার, তবু প্রথম পাতাগুলোর দিকে তাকিয়ে সজল চোখে একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলল সে, আলতো আঙুলে পাতাগুলোর ওপরে হাত বুলাতে লাগল। মনে হচ্ছিল, যেন প্রথমের পাতাগুলো বারবার পড়ে। ওর প্রতি অভিমন্যুর যে ভালোবাসা ছিল, তা এই পাতাগুলোর প্রতিটা লাইনে ফুটে উঠেছে। তাহলে কেন এত তাড়াতাড়ি চলে গেল অভিমন্যু?! চোখ দিয়ে দ্রুতবেগে একটা জলের ধারা গড়িয়ে পড়ল ডায়রির ওপর।

-"দেশ ছেড়ে যাওয়ার কি খুব প্রয়োজন আছে, অভি ?"

কাব্যিকার কথা শুনে ব্যাগ গোছাতে গোছাতে হেসে ওকে কাছে টেনে নিয়ে অভিমন্যু বলল, "খুব তাড়াতাড়ি তোমাকেও নিয়ে যাব।" কাব্যিকা ওর বাহু বন্ধন ছাড়িয়ে নিয়ে অভিমান করে বলল, "আমি নিজের দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে চাই না।"

"রাগ কোরো না, কাব্য। তুমি তো জানো, এই কাজটা আমার প্যাশন,

তাছাড়া জীবিকাও বটে। তোমাকে যতটা ভালোবাসি, ঠিক এই কাজটাকেও আমি ততটাই ভালোবাসি। এটা একটা নেশার মতো, গ্র্যাজুয়েশন্ করার পর যখন সকলে সায়েন্সের কোনো সাবজেক্ট নিয়ে কেরিয়ারটা এগিয়ে নিয়ে যেতে বলছিল, তখন আমি সকলের বিপরীতে গিয়ে অ্যানথ্রোপোলজি সাবজেক্টটাকেই বেছে নিই শুধুমাত্র নিজের প্যাশনটাকে বজায় রাখার জন্য। আর এখন সময় এসেছে, আমার এই প্যাশনটাকে পুরোপুরি কাজে লাগানোর।"

কাব্যিকা সজল চোখে বলল, "বুঝতে পারছি, অভি। কিন্তু তোমাকে ছেড়ে এত দিন ?" অভিমন্যুর চোখটা জ্বলজ্বল্ করে উঠল, দশ তলার ফ্ল্যাটের ব্যালকনি দিয়ে বাইরের আকাশটার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি বুঝতে পারছ না, কাব্য, এই প্রোজেক্টটায় যদি আমাদের টিমটা সাকসেসফুল হয়, তাহলে মানব সভ্যতার ইতিহাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ ও অভাবনীয় অধ্যায় বিশ্বের তাবড় বিজ্ঞানীদের সামনে উন্মোচিত হবে। প্রাচীন ইতালি শহরে খনন-কার্য চালানোর সময়ে প্রাচীন যুগের মানুষের কিছু হাড়গোড় আর দেহাবশেষ পাওয়া গেছে, যার গঠন সাধারণ মানুষের শারীরিক গঠনের থেকে অনেকটাই আলাদা। আমাদের ধারণা, ঐ বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে আরও প্রচুর এমন দেহাবশেষ পাওয়া যাবে। সেগুলো মানুষের শারীরিক বিবর্তনের ইতিহাসে একটা দৃষ্টান্তের সৃষ্টি করবে। তাহলে তুমিই বলো, আমি কি এরপরেও না গিয়ে থাকতে পারি?!" কাব্যিকা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হেসে বলল, "না, আমি তোমায় আর আটকাব না। তোমার প্যাশন, তোমার ভালোবাসার পথে আমি বাধা হয়ে দাঁড়াব না, শুধু এটুকুই বলব, তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে ফিরে এসো। তোমাদের পরিশ্রম যেন বিজ্ঞানের পাতায় স্বীকৃতি পায়।" অভিমন্যু বেরিয়ে যেতে গিয়েও আরেক বার ঘুরে এসে ওর কপালে একটা চুম্বন করে বলল, "কাজ তাড়াতাড়ি মিটে গেলে ফিরে আসব আমি আর যদি দেরি হয়, তোমাকে আমার কাছে ডেকে নেব।" কাব্যিকা হেসে বলল, "আচ্ছা, এবার বেরিয়ে পড়ো, নাহলে ফ্লাইট্ মিস্ হয়ে যাবে কিন্তু।"

অভিমন্যুর সেদিনের কথাগুলো যেন এখনও কানে ভাসছে কাব্যিকার। সেদিন যদি অভিমন্যুকে আটকানোর চেষ্টা করত আরেক বার, তাহলে আজ হয়তো এই দিনটাই আসত না। খালি কফি মগটা টেবিলে রেখে ডায়রির প্রথম দিকের পাতাগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল সে, ঘটনাগুলো এত জীবন্ত ও শিহরণ জাগানো যে, মনে হচ্ছে, ওর চোখের সামনেই যেন ঘটে চলেছে।

অভিমন্যু জিপ থেকে নেমে একটা আড়মোড়া ভেঙে চারদিকটা দেখে নিল। কাব্যিকাকে ছেড়ে আসতে খুব খারাপ লাগছিল ওর, এখনও মনটা খচখচ্ করছে ওর জন্য। কাব্যিকাকে সে সত্যিই খুব ভালোবাসে, ওকে ছেড়ে থাকতে

কষ্ট হচ্ছে ভীষণ। দরজায় ঠকঠক্ শুনে চিন্তাটা কেটে গেল ওর, সামনে দুজন তরুণ এসে দাঁড়িয়ে হেসে বলল, "ওয়েলকাম, স্যার্। আমি অ্যান্টনি আর ও জর্জ। আমরা দুজনেই আজ থেকে আপনার আন্ডারে কাজ করতে চলেছি।" অভিমন্যু ওদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে হেসে বলল, "আজ থেকেই কাজ শুরু করা যাক্ তবে?"

-"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, স্যার্। চলুন আপনাকে সাইটে নিয়ে যাই।"

অভিমন্যু মাটি ও দেহাবশেষগুলো পরীক্ষা করতে করতে নিজের মনেই বলে উঠল, "সত্যিই বিস্ময়কর!" জর্জ সামনের কিছুটা অংশ দেখিয়ে বলল, "স্যার্, এই জায়গাটায় খনন করার সময়েই আমরা এগুলো পাই।" অভিমন্যু কিছু চিন্তা করতে করতে বলল, "হুমম্, আমার ধারণা কোনো কালে এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে কবরস্থান ছিল।"

-"একজ্যাক্টলি, স্যার্। আপনি কিন্তু একদম ঠিকই ধরেছেন।"

-"তাহলে এই পুরো জায়গাটাই খননের ব্যবস্থা করো।"

জর্জ একটু ইতস্তত করে বলল, "স্যার্, আমরা সেটাই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম কিন্তু..।" অভিমন্যু অবাক হয়ে বলল, "কিন্তু কী?! এত হেসিটেট কেন করছ?!"

-"আসলে স্যার্, এখানকার স্থানীয় মানুষরা খুবই বাধা প্রদান করছেন।"

-"কিন্তু কেন? তোমাদের কাছে তো এখানকার সরকারের পারমিশন রয়েছে?"

-"হ্যাঁ, স্যার্, তা রয়েছে কিন্তু স্থানীয় মানুষরা যে সমস্ত বোগাস কথা বলছেন, তাতে খননকারী শ্রমিকরা খুবই আতঙ্কিত, তারাও খনন করতে চাইছেন না কিছুতেই।"

-"আশ্চর্য! আমি তো বুঝতেই পারছি না, এমন কী ঘটনা ঘটেছে? এই অঞ্চলটা তো লোকালয় থেকে অনেকটাই দূরে, ওদের তো কোনো অসুবিধাই হওয়ার কথা নয়। তোমরা ওদের কনভিন্স করার চেষ্টা করোনি?"

-"হ্যাঁ, স্যার্, অনেক বার ওদের বোঝানোর চেষ্টা করেছি কিন্তু ওরা কোনো কথাই শুনতে নারাজ। আপনি একবার ওদের সঙ্গে কথা বলে দেখুন না, স্যার্, যদি ওরা।"

অভিমন্যু ব্যস্ত হয়ে বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওদের সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই। ওদের প্লিজ় ডেকে পাঠাও।"

-"শিওর, স্যার্।"

স্থানীয় তিন জন মানুষ হুড়মুড়িয়ে অভিমন্যুর অফিসে ঢুকল। অভিমন্যু একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "আসুন।" ওদের মধ্যে এক জন হাত জোড় করে বলল,

"বাবু, এই জায়গায় আপনারা এমন অনাচার করবেন না, নয়তো কেউ রেহাই পাবেন না।" অভিমন্যু বেশ অবাক হয়ে বলল, "কে রেহাই দেবে না?! তোমরা কি কোনো লোকাল গুন্ডার কথা বলছ?! দেখো, ওসবে আমরা ভয় পাই না। ওদের সঙ্গে বোঝাপড়া করার মতো যথেষ্ট সাহস আর বল আমাদের আছে।" লোকটি বিচলিত কণ্ঠে বলল, "না, না, বাবু, আপনি ভুল ভাবছেন। কোনো রক্ত-মাংসের মানুষ হলে তো আপনি তার সঙ্গে বোঝাপড়া করবেন, অশরীরী কারও সঙ্গে বোঝাপড়া করার মতো শক্তি কোনো মানুষেরই থাকে না।"

-"মানে?! কী বলতে চাইছ তোমরা?! পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার করে আমাকে খুলে বলো।"

লোকটি শিহরিত হয়ে বলল, "যে জমিতে আপনারা খনন-কার্য করছেন, তা আজ থেকে বহু বছর আগে একটি কবরখানা ছিল। আমরা অবশ্য স্বচক্ষে তা দেখিনি, বাপ-ঠাকুরদার মুখে শুনেছি। তাঁরাও আবার তাঁদের পূর্ব-পুরুষদের মুখে শুনেছিলেন।"

-"হ্যাঁ, তা তো আমরাও বুঝতে পেরেছি। তাতে কী হয়েছে?!"

-"ওখানে যে ওরা রয়েছে।"

-"ওরা! কারা!"

-"কয়েক বছর আগে আমাদেরই গ্রামের কয়েক জন এই জমিতে চাষ করতে চেয়েছিল। জমিটা খুবই উর্বর, চাষবাস করলে ভালো ফসলও হতো কিন্তু বীজ রোপন করার জন্য জমি খননের কাজ যখন শুরু হয়, তখনই ঘটে যায় সেই সাংঘাতিক ঘটনাটা। প্রথম দুদিন বেশ ভালোভাবেই তাদের কাজ এগিয়েছিল কিন্তু তিন দিনের দিন যা ঘটল, তা আমরা কেউ কল্পনাতেও ভাবতে পারিনি। জমি খনন করতে করতে বেলা পড়ে এসেছিল সেদিন। ইতোমধ্যে ওরা বুঝে গেছিল যে, মানুষের দেহাবশেষ এই জমিতে মিশে আছে বলেই জমি এত উর্বর। সূর্য ডুবে গেছিল অনেকক্ষণে, শেষ আলোর আভাটুকুতেই তারা দ্রুতবেগে হাত চালাচ্ছিল। হঠাৎই ওদের মধ্যে সান্তোর মনে হয়, ওর পায়ে সুড়সুড়ি লাগছে, মনে হচ্ছে, যেন অনেকগুলো পোকা পা বেয়ে বেয়ে ওপর দিকে উঠছে! হাত আটকানো থাকায় নিজের এক পা সে আরেক পায়ের সঙ্গে ঘষতে থাকে পোকাগুলোকে তাড়ানোর জন্য কিন্তু তারপরেও তার একই রকম অনুভূতি হতে থাকে। নিজের মনের ভুল ভেবে সে আরও কিছুক্ষণ ওভাবেই কাটিয়ে দেয়। এরপর হঠাৎ ওর মনে হয়, পোকাগুলো জোরে দাঁত বসিয়ে যেন ওর মাংস খুবলে নিচ্ছে, যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠে সে এবার তার পায়ের দিকে

তাকায়। অস্বাভাবিক ভয়ে শিউরে ওঠে সে। যে জমিটা তারা খনন করছিল, সেই জমি ভেদ করে পচা গলা একটি রোমশ হাত উঠে এসে জড়িয়ে ধরেছে ওর পা, তীক্ষ্ণ নখর দিয়ে খুবলে নিচ্ছে পায়ের মাংসগুলো। আতঙ্কে সব কিছু ফেলে দিয়ে দৌড়ে পালাতে যায় কিন্তু জমি থেকে উঠে আসে অসংখ্য হাত, ভয়ে চিৎকার করে পড়ে যায় সে। ওর চিৎকার শুনে বাকিরা তাকিয়ে এই দৃশ্য দেখে পালাতে যায় কিন্তু সেই মুহূর্তেই জমি থেকে উঠে আসে পচা গলা অসংখ্য মৃতদেহ। তারা সকলে মিলে সান্তোকে ছেড়ে ওদের সবাইকে ধরে নিজেদের ধারালো দাঁতগুলো বসিয়ে দেয় ওদের ঘাড়ে। রক্ত শুষে নিতে নিতে তাদের মাংসগুলো খাবলা দিয়ে খেতে মত্ত থাকে ঐ ভয়ঙ্কর মৃতদেহগুলো। সেই সুযোগে সান্তো কোনো রকমে নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে গ্রামে ফিরে আসে, তারপর আমাদের সকলকে ডেকে এই ভয়ঙ্কর ঘটনার বর্ণনা দেয়। ওর কথা শুনে হতবাক হয়ে যায় সকলে। তারপর থেকে গ্রামবাসী আর ওদিকে পা বাড়ায়নি কখনো। এখন এত বছর পর আপনারা এসে দয়া করে আর ওদের জাগিয়ে তুলবেন না।"

ওদের কথা শেষ হতেই ঘরে পিন পড়লেও শব্দ পাওয়া যাবে, এমন নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে থাকে। রেনেসাঁর শহরে থেকেও এখানকার মানুষেরা যে এসব উদ্ভট কথা বলতে পারে, এটা ভেবেই অবাক হয়ে যায় অভিমন্যু! নিস্তব্ধতা ভেঙে সে-ই প্রথম কথা বলে, "তোমরা এক বার আমাকে সান্তোর সঙ্গে কথা বলাতে পারবে?" ওর কথা শুনে ওদের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে যায়, শিহরিত হয়ে ওরা বলল, "সান্তোকে আমরা বাঁচাতে পারিনি। ওখান থেকে সে বেঁচে ফিরে এসেছিল ঠিকই কিন্তু তারপরে সেই আতঙ্কেই কিনা জানি না, কিচ্ছু খেতে পারত না, খালি বলত, ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে কিন্তু জল দিলেও খেত না। আতঙ্কে, না খেয়ে, পিপাসার্ত হয়ে দিন কয়েকের মধ্যেই মৃত্যু হয় ওর।" অভিমন্যু দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, "ঠিক আছে, তোমরা চিন্তা কোরো না। এবার এরকম কিছু ঘটবে না। আমরা ঐ জমি শুদ্ধ করে নেব, তারপরেই কাজ শুরু করব।" ওর কথা শুনে লোকগুলো একে অপরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করে বলল, "এতে কি কোনো কাজ হবে, বাবু!"

-"নিশ্চয়ই হবে, ভরসা রাখো, ভয় পেও না। এই কাজটা যেভাবেই হোক্, আমাদের করতেই হবে। তাই, কাজটা করার জন্য যা যা করতে হবে, আমি সবই করব। যদিও এই বিজ্ঞানের যুগে রেনেসাঁর শহরের এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে দাঁড়িয়ে এই কথাগুলো আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য নয় তবুও তোমাদের কথার সম্মান রক্ষার জন্য আমি নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেব।"

-"স্যার্, কাল কি এখানকার লোকেদের সঙ্গে আপনার কথা হয়েছে?"

অ্যান্টনির কথায় অন্যমনস্ক অভিমন্যু বলল, "হ্যাঁ, ওদের মধ্যে একটা কুসংস্কার কাজ করছে, এই কাজটা করতে গেলে সেটা কাটানো খুব প্রয়োজন। তাই, আমি ঠিক করেছি, স্থানীয় চার্চের পাদ্রী সাহেবকে নিয়ে এসে জমিটা এক বার শুদ্ধ করিয়ে নেব। তুমি ওঁকে খবর দাও। উনি কাজটা সেরে গেলে আমরা আমাদের কাজ শুরু করে দেব।"

-"ওকে, স্যার্।"

অভিমন্যু ফিল্ডে দাঁড়িয়েই কাজ করছিল। বেলা প্রায় শেষের পথে, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আজকের কাজ শেষ করতে হবে। জর্জ এসে বলল, "স্যার্, পাদ্রী সাহেব এসে গেছেন।" অভিমন্যু কাজ থামিয়ে বলল, "হ্যাঁ, আপনি যদি জায়গাটা পবিত্র করে দেন....।" পাদ্রী সাহেব ওর দিকে প্রশান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, "আমি আমার সাধ্য মতো চেষ্টা করব কিন্তু স্ট্রিগোয়রা আমাদের থেকে আরও অনেক বেশি শক্তিশালী।" অভিমন্যু চমকে গিয়ে বলল, "স্ট্রিগোয়?!! সেটা কে?!!" পাদ্রী সাহেব চারপাশটা এক বার দেখে নিয়ে বললেন, "রোমান মাইথোলজির এক ভয়ঙ্কর স্পিরিট হলো স্ট্রিগোয়। এরা কবর থেকে উঠে এসে অদৃশ্য হয়ে বা কোনো জন্তুর রূপ ধরে আক্রমণ করে ও নরমাংস, রক্ত ভক্ষণ করে।" মুহূর্তের জন্য অভিমন্যুর সারা শরীরটা শিউরে উঠল, তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "আমি সর্ব শক্তিমান ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি, তিনি নিশ্চয়ই আমাদের রক্ষা করবেন। আপনি শুরু করুন, বেলা শেষ হয়ে আসছে।" ওর কথা শেষ হতে না হতেই হঠাৎ চারদিকটা ভূমিকম্পের মতো দুলে উঠল, ধুলোর ঝড় শুরু হলো।" অভিমন্যু অবাক হয়ে দেখল, মাটি ফুঁড়ে কবর থেকে উঠে আসছে কতকগুলো অদ্ভুত ভয়ঙ্কর প্রাণী! কঙ্কালসার শরীরগুলো থেকে গলে গলে পড়ছে পচা মাংস, কান দুটো কুলোর মতো বড় বড়, মুখটা দেখে হঠাৎ করে কোনো তৃণভোজী চারপেয়ে প্রাণী মনে হলেও আসলে যে সেগুলো রোমান স্পিরিট স্ট্রিগোয়, তা বুঝতে আর বাকি রইল না অভিমন্যুর। ততক্ষণে তারা উপস্থিত বাকি সকলের রক্ত শুষে মাংস খুবলে খেতে শুরু করে দিয়েছে। অভিমন্যু কী করবে বুঝতে না পেরে নিজের কোয়ার্টারের দিকে ছুটতে শুরু করে। পা দিয়ে বেয়ে ওর শরীরের ওপর দিকে কিছু একটা উঠছে, তা স্পষ্ট বুঝতে পারছে ও। যেভাবেই হোক্, ওকে বাঁচতেই হবে, কাব্যিকার মুখটা মনে পড়ে ওর। ছুটতে ছুটতে ঘরে ঢুকে সমস্ত জানলা-দরজা বন্ধ করে দেয় সে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে চমকে যায়। কোথায় সে! বরং তার জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে এক স্ট্রিগোয়, হঠাৎ করেই খুব তেষ্টা পেতে

শুরু করেছে ওর, জল নয়... জল নয়, রক্ত তৃষ্ণা।" নিজেকে উন্মাদগ্রস্ত লাগছে ওর। কাচের জানলা দিয়ে তাকিয়ে ওদের ছুটে আসতে দেখতে পারছে সে। কাব্যিকার সঙ্গে কি শেষ দেখাটা হবে না?! ও তো জানতেও পারবে না কিছুই.... ডায়রি, ইয়েস ডায়রিতে লিখে যাবে ও....। ঐ এসে পড়েছে ওরা! মুহূর্তের মধ্যে জানলা ভেদ করে ভিতরে ঢুকে অভিমন্যুর রক্ত শুষে নিয়ে ওর মাংস খুবলে খেতে শুরু করে দিল স্ট্রিগোয়ের দল।

রাত শেষ হতে এখনও অনেক দেরি। ডায়রিটা পড়া শেষ হতেই বেরিয়ে পড়েছে কাব্যিকা। অভিমন্যুর মৃত্যুর খবর পেয়ে বিধ্বস্ত অবস্থায় এ দেশে ছুটে এসেছে সে। এখানে এসে অভিমন্যুর আধ-খাওয়া, ফ্যাকাশে, নিথর শরীরটা দেখে সে বারবার জ্ঞান হারিয়েছে। তবে আজ এসব যন্ত্রণা থেকে মুক্তি।

হাঁটতে হাঁটতে ঠিক সেই জমিতেই এসে দাঁড়াল কাব্যিকা। জমির ওপর দিয়ে হাঁটা শুরু করতেই দুলে উঠল মাটিটা। নিমেষের মধ্যে অসংখ্য হাত মাটি ফুঁড়ে উঠে টেনে নিল কাব্যিকার শরীরটাকে।

আমাজনের গভীরে

রূপালী সামন্ত

আমাজনের গভীর অরণ্য, যেখানে প্রতি পদে বিপদের হাতছানি। তবুও এই বিশাল অরন্যের সৌন্দর্য ও সম্পদ মানব সমাজকে চিরকাল আকর্ষন করেছে। এর অমোঘ আকর্ষণে অজানা ভয়কে উপেক্ষা করে বহু মানুষ এর গভীরে গিয়ে চিরতরে হারিয়ে গেছে। সৌন্দর্য পিপাসু ও নির্লোভ কিছু মানুষ যথাসময়ে বিপদ কাটিয়ে সশরীরে ফিরে আসতে পেরেছে।

এই জঙ্গলের গভীরে সতত বিপদের আশঙ্কা, প্রতি পদে শ্বাপদের ভয়, বিষাক্ত পোকা-মাকড় সব কিছুকে উপেক্ষা করেই কিছু মানুষকে এর গভীরে জীবিকার সন্ধানে যেতেই হয়। কেউ মাছ ধরতে, কেউ মহার্ঘ ঔষধি গাছ পালা সংগ্রহ করতে, কেউ বুনো ফল বা কাঠ সংগ্রহে বিপদকে উপেক্ষা করেই প্রতিদিন এগিয়ে যায়। এর গভীরে বেশকিছু কিলোমিটার জুড়ে একটা নির্দিষ্ট জায়গা আছে যেখানে কেউ গেলে আর কোনদিনই ফিরে আসেনি। তাদের খুঁজতে যাওয়া ব্যক্তিদের ও পরবর্তীকালে আর কোন হদিস পাওয়া যায়নি। অথচ সেই নির্দিষ্ট জায়গায় কোন রকম হিংস্র জন্তু জানোয়ারের না কোনদিন দেখা পাওয়া গেছে না তাদের কোন আওয়াজ শোনা গেছে। এমনকি কোন জানোয়ারের পদচিহ্ন কোনদিন পরিলক্ষিত হয় নি। এর কারন আজো কেউ জানেনা, এখনো তা রহস্যের আড়ালেই চাপা পড়ে আছে, উদঘাটন হয়নি।

এর নিকটবতী জায়গায় অবস্থিত কায়ামো উপজাতি অধ্যুষিত এক ছোট গ্রাম আছে। সেখানের কএকটি পরিবারের সাহসী বেশ কিছু পুরুষ সেই জঙ্গলে কারন খুঁজতে গিয়ে হারিয়ে গেছে, তারা আর ফিরে আসেনি। তাই তাদের বাড়ির মেয়েদের মনের গভীরে স্বজন হারানোর আশঙ্কা চিরকাল থেকে গেছে। তারা পুরুষদের বা পরিবারের অন্য কোন সদস্যকেই জঙ্গলের ঐ নির্দিষ্ট জায়গায় যেতে দিতে ভয় পায়, যেতে বাধা দেয়।

এমনি এক ছেলে মোয়ামো যার বাবা, কাকা এমনকি ঠাকুর্দাও ঐ জঙ্গলে গিয়ে হারিয়ে গেছে আর কোনদিন ফিরে আসেনি। মোয়ামোর মা চোখের জলে ভেসে একমাত্র ছেলেকে বুকে আঁকড়ে অভিশপ্ত জঙ্গল ছেড়ে, উপজাতিদের

অন্য লোকেদের থেকে দূরে শহরের দিকে চলে এসে অন্য জীবিকা খুঁজে নিয়েছে। ছেলেকে আর কখনো সেখানে যেতে দেয়নি। মোয়ামো পরবর্তীকালে লেখাপড়া শিখে শহরেই চাকরি পেয়েছে, সেখানেই থেকে গেছে।

মোয়ামোর ছেলে মিয়ামো ঠাকুমার কাছে ছোটবেলা থেকেই জঙ্গলের বিভিন্ন রকম গল্প শোনে। সেই রকম ভাবেই এই গল্পও ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছে। যথারিতী ঠাকুমা তাকেও বারন করেছে,

--কক্ষনো কোনদিনও ওই ভয়ংকর জঙ্গলের পথ মাড়াবে না, মনে থাকে যেন।

--ওখানে কি আছে দাদিমা ?

--জানিনা বেটা, যারা ওখানে গেছে তারা কেউ ফিরেই আসেনি বলবার জন্য যে ওখানে কি আছে, তাই কেও জানে না। হয়তো ডাইন আছে, হয়তো এমন কোনো জানোয়ার আছে যার হাত থেকে কারোর মুক্তি নেই, হয়তো অভিশাপ আছে। যাই থাক তুমি কক্ষনো ওখানে যাবে না কথা দাও।

--না দাদি ওখানে ভয় আছে আমি যাবো না।

শিশু মনে তখন থেকেই অভিশপ্ত জঙ্গল নিয়ে একটা ভয় ঢুকে গেছে যার ফলে মিয়ামো কোন দিনই আর এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেনি। শুধু দাদি মাঝে মাঝেই চুপচাপ হয়ে গিয়ে কোথায় হারিয়ে যায় আর নিরবে চোখের জল ফেলে। আসলে বৃদ্ধা পুরনো স্মৃতিগুলো মনে করে চোখের জলে ভাসেন। তিনি যদি সেদিন তাঁর স্বামী কে অর্থাৎ মোয়ামোর বাবাকে জঙ্গলে যেতে না দিতেন তাহলে আজ এই দিনটাকে দেখতে হতো না বা তাঁকে একমাত্র ছেলেকে মানুষ করতে এতো কষ্ট করতে হতো না।

তবে এটাও ঠিক ঐ জঙ্গলের ভেতরে উপজাতিদের মধ্যে পড়ে থাকলে আজ তার ছেলে শিক্ষিত হতো না, তাদের শহুরে জীবনও হতো না। তারাও অন্যদের মতো জঙ্গলী রয়ে যেতেন। তিনি সেদিন ঐ পরিকল্পনা নিয়েছিলেন বলেই আজ তার পরিবার শিক্ষিত হয়ে সমাজের মূল স্রোতে মিশতে পারছে। এর জন্য তাঁকে অনেক খেসারত দিতে হয়েছে।

পুরনো ঘটনা মনে পড়লে বৃদ্ধা আজও কেঁপে কেঁপে উঠেন। একদিন তাঁর শশুর মশাই রাতে জানালেন তিনি পরদিন ছোট খাড়ি পেরিয়ে দক্ষিণের জঙ্গলে যাবেন। যেহেতু সবাই উত্তরের জঙ্গলে যায় সেদিকে ফলমূল বা খাদ্য খুঁজতে অনেক দূরে যেতে হয়। দক্ষিন দিকের জঙ্গলে কেউ যায়না বলে সেখানে নিশ্চয়ই খাদ্য অন্বেষণে বেশি দূরে যেতে হবে না বা খুব বেশি পরিশ্রম করতে

হবে না। বাড়িতে যেহেতু অনেক সদস্য খাদ্যের পরিমানও তাদের পরিবারে বেশি প্রয়োজন হয়। ছেলেরা অন্যদের সঙ্গে দলবদ্ধ হয়ে তীর-ধনুক নিয়ে শিকারে যায়।

সেই মতন ছেলেরা অন্যদের সঙ্গে বেরিয়ে গেলে তিনি ধীরেসুস্থে ডিঙি নৌকোয় ছোট খাঁড়ি পেরিয়ে দক্ষিণের জঙ্গলে একাই প্রবেশ করেন। তাড়াতাড়ি চলে আসবেন বললেও সারাদিনেও তিনি ফিরে আসতে পারেন নি, এমনকি সন্ধ্যের আগে গ্রামের অন্যান্য লোকেরা জঙ্গল থেকে সবাই ফিরে আসে কিন্তু সেই মানুষটা ফিরে আসেনি। প্রচন্ড উৎকণ্ঠায় সারা রাত কাটানোর পরে পরদিন সকালে তার বড় ছেলে মোয়ামোর বাবা নিজের বাবাকে খুঁজতে জঙ্গলে যায়। যথারীতি সারা দিন কেটে যায় এবং সন্ধ্যা অব্দি তারও কোনো দেখা পাওয়া যায় না। এইবারে গোটা বাড়িতে প্রায় কান্নার রোল ওঠে। তখন গ্রামের আরো কিছু সাহসী ছেলেদের নিয়ে একসঙ্গে ছোট ছেলেও ঐ জঙ্গলে খুঁজতে যায়। কিন্তু তারাও সেই গভীর জঙ্গলে রহস্যজনক ভাবে হারিয়ে যায়। তারপর থেকে ওই জঙ্গলের দিকে আর কেউ পা বাড়ায়নি। কেউ বলে ওখানে দেও আছে, কেউ বলে ডাইন আছে। সেসব না হলেও এমন কিছু আছে যার কবল থেকে কেউ গেলে আর বেরিয়ে আসতে পারে না। তারপর থেকে ওই জঙ্গল নিয়ে কেউ আর উৎসাহ দেখায় নি কিন্তু সাবধানে এড়িয়ে চলে। মিয়ামো কে বুকে করে তার মাও জঙ্গল ছেড়ে শহরের দিকে পা বাড়ায়।

দাদীর কাছে এই সব গল্প শুনে শিশু বয়স থেকেই মিয়ামোর মনের কোণে কিছু প্রশ্ন রয়েই গেছে যেটা কাওকে জিজ্ঞাসা করতে পারেনি আর জানতেও পারেনি। পরবর্তীকালে বন্ধুদের কাছে কথায় কথায় তা প্রকাশ হয়ে পড়ে। শিক্ষিত শহুরে ছেলেদের দল ভয়ঙ্কর জঙ্গল সম্বন্ধে অজ্ঞ হওয়া সত্তেও অজানা কে জানবার দূর্নিবার আকর্ষনে সেখানে যাবার ইচ্ছে প্রকাশ করে।

--চলো আমরা একদিন ওখানেই এ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়ে পড়ি, কি আছে ওখানে দেখে আসি। তারা আধুনিক, সাহসী, শিক্ষিত। বয়সের ধর্ম অনুযায়ী তারা অজানাকে জানতে, অদেখাকে দেখতে চায়, আর যেকোনো রহস্যের অনুসন্ধান করতে জীবনের মায়া না করেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা জঙ্গলের গভীরে লুকানো রহস্য উন্মোচনে যেতে চায় জেনে মিয়ামো তাদের প্রথমে বাধা দেয়।

--না আমার ঠাকুমা কিন্তু বারন করেছিল, মনে হয় ওখানে যাওয়া ঠিক হবে না, আমাদের না যাওয়াই ভালো।

--আরে বয়স্কা মহিলারা বারন করেই, তুই তো পুরুষ মানুষ, জোয়ান ছেলে এতো ভয় পেলে চলবে? চল চল আমরা তো আছি সঙ্গে।

একরোখা ছেলেদের দল সে বাধা উপক্রম করেও যাবে ঠিক করে। রহস্য জানতেই হবে, তারা জোর করে মিয়ামোকেও সঙ্গে নেয়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বন্ধুদের জেদের কাছে হার মানে মিয়ামো। একটা দিন ঠিক করে তারা ভোর ভোর বেরিয়ে পড়ে, মিয়ামো বাড়িতে শুধু বলে যায় বন্ধুদের সাথে কাছে পিঠেই বেড়াতে যাচ্ছে। জঙ্গলের কাছাকাছি এসে কায়ামো উপজাতির লোকেদের কাছেই ঐ জঙ্গলে যাওয়ার পথনির্দেশ চেয়ে বলে

-সামনের ঐ জঙ্গলে কি আছে, তোমরা কেউ জানো?

-না বাবু, আমরা কেউ জানি না কি আছে ওখানে। বলে দুহাত তুলে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে প্রণাম করে

-আমরা যেতে চাই, কি আছে ওখানে আমরা দেখবো আমাদের কেউ পথ দেখাতে পারবে?

-নানা আমরা কেউ যাই না ঐ অভিশপ্ত জঙ্গলে। তোমরাও যেও না বাবু।

-সবাই ভয় পেলে রহস্য কি করে জানা যাবে? আমাদের কাছে ক্যামেরা আছে, আমরা সাবধানে যাব। কেউ একজন সাথে চলো ?

-না এখানকার কেউ যাবে না।

-আমরা টাকা দেবো, খাবারও দেব। কিছুটা রাস্তা দেখাবে চলো।

-গরিব আদিবাসীদের টাকার লোভ দেখাবেন না, আমরা জান দিতে রাজি নই। আপনারা চলে যান এখান থেকে। আদিবাসীরা শহুরে ছেলেদের জঙ্গলে না যাওয়ার জন্য অনুনয় করে কিন্তু জেদী ছেলের দল বারন না মানলে অঙ্গুলি প্রদর্শনে পথনির্দেশ দিয়ে খান্ত থাকে।

সাহসী চার বন্ধু জন, পীট, নোগা ও মিয়ামো আদিবাসীদের দেখানো পথে এগিয়ে চলেছে। ওরা সঙ্গে শুকনো খাবার, জল, কিছু ওষুধ, ছুরি, দড়ির মতো প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র নিয়ে এসেছে আর এনেছে ভিডিও ক্যামেরা যাতে সেই রহস্যময় জঙ্গলের প্রতিটি কোনের ছবি তুলে রাখতে পারে এবং অস্বাভাবিক কিছু ঘটনা হলে তা ক্যামেরায় ধরা পড়ে। যদি ওরা সেই রহস্য আবিষ্কার করতে পারে ও প্রমাণ হিসেবে ছবি তুলে দেখাতে পারে তাহলে ওরা একটা আবিষ্কারের অগ্রদূত হতে পারে। সেই উত্তেজনায় তাদের উৎসাহ আরো দ্বিগুন হয়ে ওঠে।

চতুর্দিকে কড়া নজর রেখে একসঙ্গে জঙ্গলের পথে এগিয়ে চলেছে খুব সাবধানে। আগে চলেছে অত্যুৎসাহী জন তারপরে পীট, মিয়ামো আর পিছনে ক্যামেরা কাঁধে নোগা। বেশ কিছুটা পথ ওরা গভীরে এসেছে এখন অব্দি কোন

রকম পাখি কোন জন্তু জানোয়ার এমনকি সাপও নজরে পড়েনি। মিয়ামো শহরে মানুষ হলেও নোগার জঙ্গলের অভিজ্ঞতা আছে, বাকি দুই বন্ধু পুরোপুরি শহুরে। নোগার একটা বিশেষ গুন আছে, সে ভয়ঙ্কর শ্বাপদের গায়ের গন্ধ বুঝতে পারে। , তাই ওরা নোগাকে সঙ্গে এনেছে। সেও এখন অব্দি কোন সতর্ক বার্তা দেয়নি।

খুব সাবধানে এগোচ্ছে, হঠাৎই একটা সরসর আওয়াজে সবাই থমকে দাঁড়ালো। নোগা সবাইকে সাবধান করলো, কিন্তু আশেপাশে কোন প্রানী চোখে পড়েনি। জঙ্গলের মধ্যে নির্দিষ্ট দূরত্বে মাছ ধরার বড়ো বড়ো জাল টাঙানো। এখানে কোন মানুষ ঢুকতে ভয় পায় জাল কে টাঙাবে!! দিলেও নদীর কাছাকাছি দেওয়ার কথা, ওখানে রোদে শুকনো হবে। আবার সেগুলো ঠিক মাছ ধরার জালের মতোও দেখতে নয়। নোগা সবাইকে দাঁড়াতে বলে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছে। একটা পাথরের টুকরো তুলে জালে ছুঁড়ে দিয়েছে। এমন সময় হঠাৎ জন এগিয়ে গিয়ে অন্য একটা জাল ছুঁয়ে দেখে বলছে

-এগুলো মাছ ধরার জাল তো নয়! কি বলতো?

সঙ্গে সঙ্গে নোগা চেঁচিয়ে উঠলো,--জন পেছনে এসো তাড়াতাড়ি। ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। জন জালের আঠায় জড়িয়ে গেছে।

-আরে কি আছে এতে ছাড়াতে পারছি না।

তখনই গাছের থেকে লুকনো বিশাল বিশাল পাঁচ ছটা মাকড়সা নেমে এসেছে তাদের দেখেই সকলে ভয়ে বাক্য হারা, কি করবে ঠিক করতে পারে না। প্রানীগুলো তাদের ধারাল বড়ো দাঁত দিয়ে জনকে বন্ধুদের চোখের সামনেই টুকরো টুকরো করে জাল টেনে তুলে আরামে চিবচ্ছে। এই ভয়ঙ্কর ঘটনা মূহুর্তে চোখের সামনে ঘটতে দেখে সকলেই ভয়ে হতবাক হয়ে গেছে। জন আটকা পড়ার পর মূহুর্তে পীট জনকে বাঁচাতে এগিয়ে যেতে গেলে নোগা ও মিয়ামো তাকে নিরস্ত করে। তখনি পীট রেগে গিয়ে, "তোমরা কি রকম বন্ধু? একজন বিপদে পড়েছে তাকে না বাঁচিয়ে মরতে ছেড়ে দিচ্ছ!"

-ও বাঁচবে না কাছে গেলে তুমি ও মরবে।

-জঙলী স্বার্থপর তোমরা। আমরা একসাথে এসেছি, ওকে বাঁচানো র চেষ্টা ও করবে না। ঐ প্রানীগুলোকে আমরা একসাথে মেরে ফেলতে পারতাম।

-তুমি পাগোল হয়েছো? তাকিয়ে দেখো।

ওদের কথায় পীট পেছন ফিরতেই কিছুক্ষন পরেই সেখানে কয়েক ফোঁটা

রক্ত ছাড়া আর কোন চিহ্নই অবশিষ্ট নেই। সকলেই আকস্মিক এই দূর্ঘটনায় হতবাক, শুধু ভয়ঙ্কর হিংস্র ঐ প্রানীগুলো তাদের পুঞ্জাক্ষি দিয়ে নির্নিমেষ আগত অতিথিদের নিরীক্ষণ করতে থাকে। হয়তো নতুন শিকার দেখে লোলুপ হয়ে অপেক্ষা করে কখন ওরা এগিয়ে এসে জালে আটকা পড়বে।

কিন্তু বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ নোগা সকলকে সাবধানে জাল বাঁচিয়ে জঙ্গল থেকে বার করে নিয়ে আসে। যদিও তাদের ক্যামেরায় ধরা পড়া ছবি বিশ্ববাসীর সামনে প্রকাশ করে ওরা অজানা রহস্য সমাধান করেছিল কিন্তু সেই আবিষ্কারের আনন্দ তারা ঠিকমতো উপভোগ করতে পারেনি কারন তারা সেই যাত্রায় তাদের এক বন্ধুকে অযাচিত ও দুঃখজনক ভাবে হারিয়ে ছিল।

ঐরকম ভয়ঙ্কর, হিংস্র, ক্ষিপ্র, অতিকায় মাকড়সা আমাজনের ঐ নির্দিষ্ট এলাকায় বাস করে এটা আগে কেউ জানতো না। ওরাই প্রমান করে এতো বড়ো মাকড়সা হয় যারা নিমেশে পূর্নাঙ্গ মানুষের মতো বড়ো প্রানী চিবিয়ে খেয়ে নেয়।

ওরা কারা

সঞ্চিতা দে

গাড়ির কাঁচটা নামিয়ে দিলাম। আঃ জানালা দিয়ে ফুরফুরে হাওয়া এসে শরীরটাকে বেশ শীতল করে দিল। প্রকৃতির কাছে কোথায় লাগে এসি! বাইরে জমাট বাঁধা অন্ধকার! তার মধ্যে দিয়ে হেডলাইট জ্বেলে এগিয়ে চলেছে আমাদের স্করপিওটা। দুপাশে জঙ্গল আর মাঝখানে সরু পিচ রাস্তা। নাহ্ এতো দেরি করে না বেরোলেই ভালো হতো। কখন গেস্ট হাউসে পৌঁছবো কে জানে!

-"তপুদা আমার কিন্তু ভয় লাগছে! এই জঙ্গলে জন্তু জানোয়ার আছে কিনা কে জানে।"

-"চিন্তা করিস না পিকলু, আমি তো আছি।" বলতে বলতেই আমাদের গাড়িটা হঠাৎ জোরে ব্রেক কষে থেমে গেল। তপুদা গাড়ি থেকে নেমে দেখতে গেল কেসটা কি? আমি চুপচাপ বসে রইলাম। চারদিকে প্রেতপুরীর মত নিস্তব্ধ শীতলতা।

হঠাৎ বাইরে গলা শোনা গেল, -"গাড়ির টায়ারটা গেছে, ধুর! রাতটা জঙ্গলেই কাটাতে হবে বলে মনে হচ্ছে রে। কাছাকাছি কোনও দোকানও তো নেই। " আমি দরজা খুলে টর্চটা নিয়ে বাইরে এলাম। নাকে কিছু একটা উগ্র ফুলের গন্ধ পেলাম। দূরে হাল্কা আলো টিমটিম করছে। বোধ হয় জঙ্গল থেকে অনেক ভেতরে কোনো গ্রাম রয়েছে। কিছু দূরেই আধ-ফালি চাঁদের আলোয় চকচক করছে একটা ডাকবাংলো।

-"তপুদা! আমার ভীষণ ভয় করছে কিন্তু"!

-"ধুর বোকা, কিসের ভয়! গাড়িটা কিভাবে ঠিক হবে আমি তাই ভেবে পাচ্ছি না, কোন লোকজনেরও দেখা পাওয়া খুব মুশকিল মনে হচ্ছে"।

ইতিমধ্যে বৃষ্টির দু-এক ফোঁটা আমার গায়ে পড়তেই আকাশের দিকে তাকিয়ে বললাম, -"তপুদা, বিপদ বুঝি আমাদের কিছুতেই ছাড়বে না! এখনি মনে হয় আকাশ ভেঙে বৃষ্টি শুরু হবে"। বলতে বলতেই জোরে বৃষ্টি নেমে এলো, সাথে বেশ জোরে হাওয়া বইতে লাগলো। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝলকানি। তপুদা

আমার হাতে টান মেরে বলল, "চল তাড়াতাড়ি! ওই ডাকবাংলোতে গিয়ে উঠি"। বলেই দুজনে জোরে দৌড়াতে শুরু করলাম। ডাকবাংলোর কাছে পৌঁছাতেই আমাদের খুব কাছেই কি বিকট জোরে একটা বাজ পড়লো। আমরা দুজনে যেন এক লাফে ডাকবাংলোর বারান্দায় লাফিয়ে পড়লাম। এত ঘুটঘুটে অন্ধকারে যেন কেউ কাউকে দেখতেই পেলাম না। শুধু আমি ভয় পেয়ে তপুদা! বলে ডেকে উঠতেই তপুদা কাঁপা গলায় বললো, "চুপ করে দাঁড়া, আমি এখানেই আছি"। তপুদা যেন বেশ ভয়ে আছে সেটা আমাকে বোঝাতে চাইছিল না। আমি বারান্দার মেঝের এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে চোখ বন্ধ করে বসে রইলাম। এমন ভাবেই খানিক সময় কেটে গেল। বৃষ্টি ও ঝড় একটু একটু করে কমতে লাগলো। আমার যেন ক্লান্তিতে চোখ বন্ধ হয়ে আসতে লাগলো। আচমকা আমার পিঠে যেন একটা স্পর্শ অনুভব করতেই, -মাগো! বলেই ভয় চেঁচিয়ে উঠলাম। "আরে, আমি রে, তোর তপুদা!" আমি উঠেই তপুদাকে জড়িয়ে ধরে বললাম, "আমি বাড়ি যাব! আমি মায়ের কাছে যাবো!' তপুদা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "আমি আছি তো কোনো চিন্তা নেই! এখন যা পরিস্থিতি তাতে মনে হচ্ছে আজ বাকি রাতটা এখানেই কাটাতে হবে"'। পকেট থেকে দেশলাই বার করে জ্বালিয়ে চারিদিকে তাকিয়ে বলল, "বারান্দাতে বেশিক্ষণ থাকা নিরাপদ নয়, দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে দেখি কি হয়!" দরজাতে হাত ছোঁয়াতেই যেন বিকট আওয়াজ করে এমনিই খুলে গেল। আমিতো তপুদার হাত বেশ শক্ত করে ধরলাম।

"আরে চল ভয় নেই"! দেশলাই কাঠির আলোতে ভেতরে ভালো করে ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না। পা টিপে টিপে একটু এগোতেই মাথার উপর দিয়ে আচমকা কি যেন একটা উড়ে গেল। ভয়ে যেন আমার প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার জোগাড়। তপুদা আমাকে বেশ শক্ত করে ধরে কানে কানে বললো, "ভয় পাস না পিকলু! এখন আমাদের কিছুই করার নেই, আজ বাকি রাতটা এভাবেই কাটাতে হবে"। আর একটু এগোতেই পায়ে যেন কিছুর একটা গুঁতো খেলাম। তপুদা দেশলাই জ্বালিয়ে দেখলো একটা তক্তপোষ। "এইতো পিকলু! এই তক্তপোশে শুয়ে এই বাকি রাতটা কাটিয়ে দেব"। তপুদার গলার স্বরে যেন খুশির প্রকাশ পেল। "কিরে পিকলু দেখলি তো, বরাত কাকে বলে! ঠিক রাতের ঘুমানোর জায়গাটাও পেয়ে গেলাম"। বলেই তপুদা আমার হাত টেনে নিয়ে তক্তপোশের উপরে বসে পড়ল। বসতেই তক্তপোষ মড়মড় করে বিকট আওয়াজ হলো, মনে হল যেন এক্ষুণি ভেঙে পড়বে। আমি জোরে চিৎকার করে উঠে বললাম, " না! না! আমি এখানে বসবো না, দরকার হলে সারারাত দাঁড়িয়ে থাকবো তাও ভাল"।

"আরে ধুর! কিচ্ছুটি হবে না, বোস তো"! বলেই তপুদা আমাকে টেনে বসিয়ে দিল। অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে বালিশের মত কিছু একটা হাতে ঠেকলো। "এই দেখ! বালিশও আছে"! বলেই তো তপুদা টানটান হয়ে শুয়ে পড়লো।

-"তপুদা, আমার ভীষণ ভয় করছে"!

-"আরে শুয়ে পড়, দেখবি ভয়টয় সব উড়ে গেছে"। বলেই তপুদা ঘুমিয়ে পড়ল। অগত্যা বাধ্য হয়ে আমিও গুটিসুটি মেরে শুয়ে রইলাম। তপুদা রীতিমতন নাক ডাকতে শুরু করলো। বাইরে ঝিঁঝিঁ পোকার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। হাওয়াতে মাঝে মাঝে যেন পোড়া গন্ধ নাকে আসতে লাগলো। এক ভয়ঙ্কর পরিবেশ মনে হতে লাগলো। আমার কিছুতেই ঘুম আসছিল না। শুয়ে মায়ের কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি ঠিক মনে নেই। আচমকা মনে হলো আমাদের তক্তপোষটা ধরে কেউ যেন উপরে উঠিয়ে দিচ্ছে আবার নিচে নামিয়ে দিল। আমার ঘুম ভেঙে গেল। বুকের মধ্যে অজানা ভয় ধড়াস করে উঠল। তপুদা কে ধাক্কা দিয়ে বললাম।

-"ওও তপুদা! ওঠোনা! দেখো আমাদের তক্তপোষটা কেউ যেন উপরে উঠিয়ে দিচ্ছে আবার নিচে নামিয়ে দিচ্ছে"'!

-"ধুর! ঘুমাতো! ডিস্টার্ব করিস না"! বলেই তপুদা পাশফিরে আবার নাক ডাকতে শুরু করলো। কিন্তু আমার কিছুতেই ঘুম আর আসলো না। অজানা ভয়ে শরীর যেন কেমন ঠান্ডা হয়ে যেতে লাগল। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার কিছুই দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎই কানে এল অস্পষ্ট একটি গানের সুর। কিন্তু এত রাত্রে এখানে গান কে গাইছে! উঠে বসলাম। বাইরের বিদ্যুতের ঝলকানিতে জানালার দিকে নজর যেতেই, আমার যেন হৃৎকম্পন বেড়ে যেতে লাগল। যা দেখলাম তা অবিশ্বাস্য! একটি মহিলা ও একটি পুরুষ দুজনে একটি দোলনায় বসে দোল খাচ্ছে, আর মনের সুখে গান গাইছে। কিন্তু,এরা কারা !এই ঝড়বৃষ্টির রাতে এরা এখানে এলো কিভাবে! কখনই বা এলো! নাকি, আগে থেকেই ছিল। নানান প্রশ্ন যেন মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগল। চোখের পলক যেন আমার কিছুতেই পড়ছে না। একদৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। আমার সম্পূর্ণ শরীর যেন পাথর হয়ে গেছে। সামান্য নড়ার শক্তিটুকুও নেই।

কিছুক্ষণের মধ্যে ধীরে ধীরে আকাশের কালো মেঘ কেটে গিয়ে চাঁদ উঠল। আর সেই চাঁদের আলোয় আরও যা দেখলাম তাতে আমার শরীরের রক্ত হিম হয়ে গেল। দেখলাম চাঁদের আলোয় সেই মানুষ দুটোর শরীরের সব

মাংস ধীরে ধীরে সরে গিয়ে কঙ্কালে পরিণত হচ্ছে! আর ওই দুটো কঙ্কাল যেমন বসেছিল ঠিক তেমনি বসে আছে। মাগো! বলেই আমি পড়ে গেলাম। তপু দা যেন ধড়মড়িয়ে উঠে আমাকে না দেখেই খোলা জানালার দিকে তার চোখ চলে গেল। জানালা দিয়ে দেখল সে হাড় হিম করা দৃশ্য! মুখের কথা মুখেই থেকে গেল, তপুদার মতো সাহসী ছেলেও অজ্ঞান হয়ে গেল।

লোকজনের কোলাহলে যখন আমাদের জ্ঞান ফিরল, তখন ঝাপসা চোখে দেখলাম আমরা একটা ফাঁকা মাঠের মধ্যে পড়ে আছি। সেখানে কোন ডাকবাংলোর চিহ্নটুকুও নেই। কয়েকজন লোক আমাদের চোখে মুখে জলের ছিটা দিতেই সম্বিৎ ফিরে এলো। তারা জিজ্ঞেস করল, আমরা কিভাবে এখানে এলাম। তপুদা তাদের গতরাতের সব ঘটনার বর্ণনা দিলো। সব শুনে গ্রামের লোকেরা একে অপরের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। তার মধ্যে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক বললেন, -"চলো, এদের সকলকে গ্রামের মধ্যে নিয়ে গিয়ে কিছু জলখাবারের ব্যবস্থা করা যাক। সারারাত বেচারিদের উপর যা অত্যাচার হয়েছে"!

সকলে আমাদের নিয়ে একটি বাড়িতে উঠলো। চা, জলখাবার খাওয়ার পর, গ্রামের লোকেরাই আমাদের দেখা গতরাতের অবিশ্বাস্য ঘটনা কিভাবে ঘটেছিল তার বর্ণনা করতে লাগলো। এই গ্রামে বাস করত রূপাই ও সাজু নামে দুজন যুবক-যুবতী। তারা একে অপরকে ভীষণ ভালোবাসতো। রূপাই হিন্দু ঘরের মেয়ে সাজু মুসলিম ঘরের ছেলে বলে তাদের পরিবার কখনই এই সম্পর্কটা মেনে নিতে পারেনি। কিন্তু তারা একে অপরকে এতটাই ভালোবাসতো যে কাউকে এক মুহূর্ত না দেখে থাকতে পারতো না। একদিন রূপাই,সাজু নদীর পাড়ে দুজনে বেশ ঘনিষ্ঠভাবে প্রেমালাপে ব্যস্ত ছিল। তাদের এই ঘনিষ্ঠতা গ্রামের কোনো এক মানুষের চোখে বিঁধে যাওয়ায়, তারা দুই পরিবারের লোকজনদের খবর দিয়ে ডেকে নিয়ে আসলো। রূপাই আর সাজু এমন নিজেদের ঘনিষ্ঠতায় ব্যস্ত ছিল যে তাদের চারিদিকে এত লোক জমে গেছে সেদিকে তাদের ভ্রুক্ষেপ ছিলনা। দুই পরিবার এমন দৃশ্য দেখে তাদের যেন শরীরের রক্ত গরম হয়ে ফুটতে লাগলো। রূপাই ও সাজুর পরিবারের লোকেরা তাদের আলাদা করার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু কোনোভাবেই তারা একে অপরকে ছেড়ে যেতে নারাজ ছিল। বাড়ির লোকেরা এতটাই রেগে ছিলেন তাদের হিতাহিত জ্ঞান ভুলে গেল। তারা দুজনকে দড়ি দিয়ে বেঁধে কেরোসিন তেল দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিল। দুটো প্রাণ, ভালোবাসার ছোঁয়াতে একে অপরের দিকে দৃষ্টি রেখে নিঃশব্দে প্রাণ ত্যাগ করে ফেলল! তাদের বাড়ির লোকেরা পরে অবশ্য অনেক আফসোস করেছিল

কিন্তু সেই সময়ের নিষ্ঠুরতা তাদের মধ্যে মানবিকতার অনুভবকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। এত কথা বলে এই লোকটি যেন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, তিনি আরো বললেন যে, এরকম রাতবিরেতে পূর্ণিমার রাত্রে তাদের দু'জনকেই অনেক সময় এই জায়গাতেই দেখা যায়, ঠিক এরকমই একে অপরের সাথে জড়িয়ে থাকে। এই ভালোবাসার আত্মত্যাগ এই গ্রামের স্মৃতির পাতাতে জ্বলজ্বল করে সকলের মনের কোণে রূপাই ও সাজু একটি ভালোবাসার জলজ্যান্ত উদাহরণ হয়ে রইল। বলতে বলতে সেই ভদ্রলোকের দুচোখ বেয়ে অশ্রুধারা নেমে এল, এমন ভালোবাসা হয় ইহলোক পরলোক! এভাবেই একে অপরের তরে বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে।

আমি আর তপু দা এতক্ষণ নিরবে সব শুনলাম, তারপর তপুদা হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল যে বেলা বারোটা বাজে, তখন তড়িঘড়ি করে উঠে আমাকে ডেকে বললো, "চলো, এবার আমাদের গাড়ি সারাতে হবে, আর বাড়ি ফিরতেও হবে"। আমি তপুদার হাত ধরে বেরিয়ে পড়লাম এই দুঃসাহসিক এক অভিজ্ঞতাকে সঙ্গে নিয়ে।

ও আমার ভিনদেশী তারা

সায়ন্তী সাহা

টেবিলের ওপর থেকে পেন দানিতে রাখা হোয়াইটনারটা দুই আঙ্গুলে তুলে নিয়ে ক্যানভাসে আঁকা ক্ষয়িষ্ণু চাঁদটার পাশেই একটা সাদা রঙের আঁচড় কাটে রণিতা। "এই তো এইবার, এইবার এক্কেবারে পারফেক্ট হয়েছে..!" ছবিতে খসে পড়া তারা'টায় শেষটান দেওয়া ততক্ষণে সমাপ্ত। ঠোঁটের কোণায় জ্বলজ্বলে একচিলতে হাসি সাক্ষ্য দিচ্ছে আত্মতুষ্টির।

প্যালেট থেকে তুলিটা পুনরায় হাতে তুলে ক্যানভাস থেকে আন্দাজ পাঁচ-পা মতো পিছিয়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে ও। একমনে তাকিয়ে থাকে সদ্য প্রস্তুত ছবিটার দিকে। ছবিটায় এতোটুকু খামতি রাখতে চায়না রণিতা; তাই শিক্ষার্থী জীবনে অর্জন করা সমস্তরকমের কলাকৌশল দিয়ে এটাকে নিঁখুতভাবে সাজিয়ে তুলেছে ও, প্রতিটা স্ট্রোক থেকে যেনো চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে শিল্পের নির্যাস। অনেকক্ষণ ধরে একমনে বিভোর হয়ে ছবিটার দিকে চেয়ে সেটাকে নিরীক্ষণ করে চলে রণিতা। যদিও নিরীক্ষণ করছে বললে ভুল হবে; ছবিটার মধ্যে অদ্ভুতভাবে যেনো হারিয়ে গেছে রণিতা।

ঝকঝকে নক্ষত্রের আলোকমালায় সেজে ওঠা চৈত্র মাসের রাত। মৃদুমন্দ বাতাসের আন্দোলনে ধীরলয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে সবুজ-শ্যামল তরুদল। মাঝ আকাশে একাদশীর ক্ষয়প্রাপ্ত চাঁদের মরা আলোয় উদ্ভাসিত চারদিক। নিঃসঙ্গ, একাকী চাঁদের সঙ্গী হতে চাওয়ার অপরাধে, সুদূর ছায়াপথ থেকে নির্বাসিত হয়ে পৃথিবীর বুকে খসে পড়ছে অভিশপ্ত এক কলঙ্কিনী তারা। জনশূন্য প্রান্তরে মরা গাছের শুকনো ডালে টাঙানো আছে দোলনাখানি, বেয়াড়া লতাপাতা চারদিক থেকে আষ্টেপৃষ্ঠে আঁকড়ে ধরেছে দোলনাটিকে। আনমনে সেই দোলনাতেই বসে একদৃষ্টে আকাশপানে চেয়ে আছে বছর তেইশের এক মেয়ে। মধ্যযামের চন্দ্রমার মতোই সে'ও সঙ্গীহীন, বন্ধুহীন, পরিত্যক্ত। মাথা বেয়ে নেমে আসা একঢাল কালো চুল অবাধ্য হাওয়ার শীতল স্পর্শে বহুপূর্বেই দিকভ্রান্ত। নাম না জানা কোনো এক ফুলের সুমিষ্ট গন্ধে ম ম করছে চারদিক। আলো-আঁধারি পরিবেশে জোনাকিরা যেন আজ লুকোচুরি খেলছে।

মেয়েটির অন্যমনস্কতার সুযোগে দোলনার ঠিক পিছনটাতেই ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে আরও একজন, হাতে ধরা একগুচ্ছ টাটকা লাল গোলাপ। মেয়েটি অবশ্য আগন্তুকের এই উপস্থিতির ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। যদিও পিছনের এই আগন্তুকের শরীরটাকে সবেমাত্র এই এঁকে ফিনিশিং টাচটা দিল রণিতা। উম্মম, নাহ্ ছবিটায় একটু ভুল আছে। প্যালেট থেকে লাল রংটা তুলিতে লাগিয়ে পুনরায় আবার ক্যানভাসের দিকে এগিয়ে যায় ও।

প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী রণিতা বসুর কাছে এই ছবিটা ভীষণ ভীষণ ভীষণরকমেরই স্পেশাল। আসলে ক্যানভাসে সযত্নে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তার নিজের জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। দেবব্রতও ঠিক এভাবেই, একেবারে নিঃশব্দেই হুট করে একদিন ওঁর জীবনে এসে প্রবেশ করেছিল, নিজের নিঃস্বার্থ ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়েছিল রণিতার জীবন। কাল দেবব্রতের জন্মদিন, তাই আজকে এতো পরিশ্রম করে সম্পূর্ণ করা হয়েছে অসমাপ্ত এই ছবিটা।

* * *

"তুমি কে? কি...ক্কি..কিভাবে এলে এখানে? এখানে তো আমার একার ছাড়া আর কারোর আসার কথা নয়!"-চমকে গিয়ে দোলনা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় মেয়েটা। "আমি? ধরে নাও না আমি তোমার বন্ধু!" মিষ্টি হেসে উত্তর দেয় ছেলেটা। "কিন্তু...কিন্তু তুমি এখানে এমন হুট করে এলে কিভাবে? এর আগে তো কোনদিন দেখিনি তোমায়! এমনকি আমায় ছাড়া অন্য কারোর অস্তিত্বও যে আছে আমি তো সেটাই জানতাম না! কী চাও তুমি? উদ্দেশ্যই বা কী তোমার? ক্ষতি করতে চাও আমার?"- মেয়েটির কণ্ঠস্বরে সন্দেহের ছাপ স্পষ্ট। "ভয় পেয়োনা, তোমার ক্ষতি করার অভিপ্রায় আমার নেই, কস্মিনকালেও ছিলনা। স্রষ্টা আমার সৃষ্টি'ই করেছেন শুধুমাত্র তোমায় ভালোবাসার জন্য, তোমাকে পরিপূর্ণ করার জন্য। একাকী তোমায় সঙ্গ দেওয়ার জন্য।"-প্রণয় জাড়িত দৃষ্টিতে, নক্ষত্রখচিত রাতে, প্রাণহীন প্রান্তরে মরা গাছ, ভাঙা দোলনা আর ক্ষয়াটে চাঁদকে সাক্ষী রেখে হাতে ধরা গোলাপগুচ্ছ হাঁটু গেড়ে বসে মেয়েটার দিকে বাড়িয়ে দেয় ছেলেটা।

আশ্চর্য হয়ে যায় নির্বাসিতা। ছেলেটার গোলাপ ধরা হাত দুখানি কাঁটার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত, হাতের তালু থেকে ইতিমধ্যেই চিঁইয়ে চিঁইয়ে রক্ত পড়ছে। দুইচোখে অসময়ে বৃষ্টি নামে। হৃদয়াকাশে উথাল-পাতাল ঝড় উঠেছে তখন। একেই কি ভালোবাসা বলে?

* * *

মাথায় আগুন জ্বলছে রণিতার। ক্ষণিক আগে ঘটে যাওয়া ঘটনার পর সবকিছু একেবারে তছনছ করে দিতে ইচ্ছা করছে। প্রতারিত, অপমানিত রণিতা বিছানায় মুখ গুঁজেছে, অসময়ের অশ্রুধারায় চোখদুটো ইতিমধ্যেই টকটকে লাল। এটা কী করল দেবব্রত? কেন করল? শেষপর্যন্ত ওর চোখের সামনেই... ওরই বান্ধবীর সঙ্গে শারীরিকভাবে...ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ! আর ভাবতে পারেনা ও।

এই তাহলে ভালোবাসার নমুনা? আনুগত্যের জন্য শেষপর্যন্ত এই পুরস্কার'ই জুটল তবে? রাগে কাঁপতে থাকে ও। সোফায় অবহেলায় পড়ে আছে যত্ন করে দিনরাত জেগে তৈরী করা দেবব্রতের জন্মদিনের উপহার। বিছানায় উঠে বসে রণিতা, তারপর ধীর পায়ে নেমে আছে বিছানা ছেড়ে। সোফার দিকে এগিয়ে গিয়ে প্রবল আক্রোশে সুন্দর করে প্যাক করা গিফ্ট প্যাকেটটা একটানে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে দেয় ও, তারপর ছবিটাকে উন্মুক্ত করে মেঝের ওপর সজোরে আছাড় মারে। মুহূর্তেই ঝনঝন শব্দে কাঁচের ফ্রেম ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। সেইসবের ওপর পা ফেলেই সামনের দিকে অগ্রসর হয় ও, হাতে তুলে নেয় ছবিটা, এগিয়ে যায় রং-তুলির দিকে। ছিন্নভিন্ন পদতলের রুধীর ধারা অস্পষ্ট আঁক কাটে মাটির ওপর।

* * *

দোলনার ওপর বসে আছে মেয়েটা, পিছন থেকে তাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছে ছেলেটা। শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে, শরীর দুটো একে অন্যের সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে মিশে যেতে চাইছে। হঠাৎ... হঠাৎ করেই দ্রুতলয়ে পরিবর্তিত হতে থাকে আশেপাশের পরিবেশে। শান্ত-নির্বিঘ্ন পরিবেশে হঠাৎ করেই যেনো মনে হয় অদৃশ্য ঝড় আছড়ে পড়েছে। দেখতে দেখতে চোখের সামনেই একটু একটু করে হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে থাকে ছেলেটার শরীর...কেউ যেন সযত্নে ঘষে তুলে দিতে চাইছে ছেলেটার অস্তিত্ব। সেই শূন্যস্থান ততক্ষণ দখল নিতে শুরু করেছে নিঃসীম কালো অন্ধকার। চিরতরে সঙ্গীহীন হওয়ার আশঙ্কায়, বিচ্ছিন্নের প্রাক্কালে তীব্র আকুতিতে ককিয়ে ওঠে নারীসঙ্গীটি। সঙ্গীকে শেষবারের মতো ছুঁয়ে দেখার চলতে থাকে প্রাণপণ ব্যর্থ প্রচেষ্টা।

তীব্র হাহাকার, চরম অতৃপ্তি বুকে নিয়ে ক্ষণিকেই চিরতরে মুছে যায় ছেলেটা। পা-বুক-হাত-গলা-মুখমণ্ডল ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হতে হতে একসময় পুরো মানুষটাই..! নিকষ কালো আঁধার মুহূর্তেই যেনো গিলে ফেলে ওকে। কালের গর্ভে চিরতরে হারিয়ে যাওয়ার প্রাক্কালে প্রেয়সীর উষ্ণ ওষ্ঠের স্পর্শ থেকে

বঞ্চিত হয় হতভাগ্য পুরুষটি। সবই স্রষ্টার মর্জি! স্রষ্টার তুলির ওপর কী আর কথা চলে! তিনিই যে স্বয়ং বিধাতা! কোনো এক ভীন জগতের জনহীন প্রান্তরে, মাটির ওপর লুটিয়ে পড়া সঙ্গীহীন মেয়েটার বুকফাটা আর্তনাদ কর্ণগোচর হয়না চিত্রশিল্পী রণিতা বসুর। শুনতে পেলে হয়তো গতকাল ক্যানভাসের ওপর অঙ্কিত পুরুষটিকে এইভাবে কালো রং দিয়ে তিনি মুছে দিতেননা। যতই হোক, প্রেমে প্রতারিত মানুষ বোঝে সঙ্গী হারানোর কষ্ট, জানে বিচ্ছেদের যন্ত্রণা!

পাকাপোক্ত হাতের ছোঁয়ায় ছবিতে মুহূর্তেই বদল আসে। সুন্দর করে কালো রং দিয়ে মুছে দেওয়া হয়েছে পুরুষটিকে, শুধুমাত্র ক্যানভাস থেকেই নয়, সম্ভবত নিজের জীবন থেকেও। নিঁখুত রংয়ের ছোঁয়ায় বোঝার উপায় নেই দৃশ্যপটে আদৌও কোনো পুরুষের অস্তিত্ব কস্মিনকালেও ছিল বলে! বরং মেয়েটার পাশে এখন জায়গা করে নিয়েছে একটা ছোট্ট, ধবধবে সাদা বিড়ালশাবক। আর যাইহোক পশুরা প্রতারণা করতে শেখেনি!

"ছেড়ে যেওনা, ছেড়ে যেওনা
কী করি বলো, তুমি হীনা?
আমি পারিনি তোমাকে
আপন করে রাখতে,
আমি পারিনি তোমাকে
আবার আমার করে রাখতে..."

কান্নার দমকে ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে আসছে হোমথিয়েটারের গানটা...। "ম্যাঁও... ম্যাঁও...ম্যাঁও...তারস্বরে চিৎকার করে চলেছে মার্জারশাবকটি। দোলনা ছেড়ে নেমে এসেছে মেয়েটা। নরম ঘাস আঁকড়ে কেঁদে চলেছে ও। বুকের মধ্যেটা এমন হ্যাঁচোড়-প্যাঁচোড় করছে কেন, গলাটা এরকম জ্বালা জ্বালা করছে কেন? একেই কি তবে বিচ্ছেদ বলে ? জানেনা ও সঙ্গীর গাঁথা জুঁইয়ের মালাখানি হাতের মুঠোয় শক্ত করে চেপে ধরে ককিয়ে ওঠে ও...বুকফাটা আর্তনাদে ফালাফালা হয়ে যায় মাঝ রাতের নিঃস্তব্ধতা।

জনমানবপূর্ণ পৃথিবীতে থেকেও রণিতা বসু একা, ভীষণ একা, ঠিক জনমানবশূন্য ছবির ওই মেয়েটার মতোই। নিজ নিজ সৃষ্টির স্রষ্টার খামখেয়ালীপনায় আজ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে দুই জগৎ, দুই কাল, দুই মাত্রা...

পোট্রেট

শুভব্রত বসু

যদিও তার আঁকার প্রথাগত শিক্ষা নেই, তবুও ছবি আঁকা তার হবি। এতদিন সে মূলতঃ ল্যান্ডস্কেপ এঁকে এসেছে। শরতের আকাশ, সবুজ দিগন্ত জোড়া চাষের জমি, নদীর তীরে সূর্য অস্ত যাচ্ছে, এই সব ছবিই সে চমৎকার আঁকে। আঁকে আর ফেসবুকে পোস্ট করে, ফেসবুকে ছবি এঁকে ইদানিং তার বেশ নাম হয়েছে। সেই সূত্রেই সে বিভিন্ন ছবি আঁকিয়েদের বেশ কিছু গ্রুপে আমন্ত্রণ পাচ্ছে। আজকাল ফেসবুকে অনেক দিশি-বিদেশী গ্রুপ হয়েছে, যেখানে মাঝে মাঝে ওয়েবিনার হয়। এমন একটা গ্রুপের ওয়েবিনারে পোট্রেট আঁকার টেকনিক শেখানো হয়েছে কয়েকদিন আগে। সেই টেকনিক শিখে ইদানীং পোট্রেট আঁকার ভূত ওর ঘাড়ে চেপেছে।

এদিকে মুশকিল হল পোট্রেট আঁকতে গেলে দরকার অন্ততঃ কয়েকজন মডেল। তার মত আনাড়ি লোকের কেই বা মডেল হবে? অগত্যা বিখ্যাত লোকজনের ছবি দেখে সে ক্যানভাসে তুলি চালায়, আর আঁকা শেষ হওয়ার পর ক্যানভাসে যে ছবিটা তৈরী হয়, সেটা দেখে নিজেই হাসি চাপতে পারে না। ছবিগুলোকে পোট্রেট না বলে কার্টুন বললেই ঠিক হয়। মুখ চোখ কান চুল কোনোটাই যেন ঠিকঠাক হয় না। এই যেমন গত চারদিন ধরে হিন্দি ফিল্মের বিখ্যাত নায়িকা পায়েল সোরাবজির ছবি এঁকেছে। গতকাল ছবিটা শেষ করে ও কিছুক্ষণ দেখল। দেখে, তার মনে হচ্ছিল পায়েল সোরাবজি তো হয়েই নি, বরং যে ছবিটা সে এঁকেছে তার অর্ধেক মুখ অমিতাভ বচ্চন আর কপাল চুল লতা মঙ্গেশকরের এঁকে ফেলেছে। আঁকা শেষ হওয়ার পর খানিকক্ষন দেখল তার নিজের আঁকা পোট্রেট। তারপর রাগের চোটে ক্যানভাসটাকে ছুঁড়ে ঘরের এক কোণে, আর ব্রাশের সেটটা জানলা গলিয়ে সটান রাস্তায় ফেলে দিয়েছে।

আজ সকালে উঠে তার নিজের ওপরেই বিরক্ত লাগছিল। শুধু শুধু পন্ডশ্রম, টাকা আর সময় নষ্ট। আর পোট্রেট আঁকবে না। আবার ফিরে যাবে ল্যান্ডস্কেপে। মনটা একটু খচখচ করলেও সে জোর করে নতুন উদ্যমে ফেসবুক খুলল। অনেকগুলো নোটি। নোটি ধরে ধরে গ্রুপের পোস্টগুলো স্ক্রল করছিল সে। হঠাৎ একটা পোস্টে তার চোখ আটকে গেল। একজন একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছেন,

তাঁর স্বর্গত পিতৃদেবের ব্যবহৃত ব্রাশের সেটটা তিনি বিক্রি করে দিতে চাইছেন। দাম ও ফোন নাম্বার নীচে দেওয়া আছে। সেকেন্ড হ্যান্ড? তা হোক, যদি ভালো কন্ডিশন হয়, দামেও বেশ কম। পোস্টটা আধঘন্টা আগে দেওয়া হয়েছে, এখনও কোনো লাইক কমেন্ট নেই। সে তাড়াতাড়ি ফোন নম্বর টা ডায়াল করল। রিং হচ্ছে...।

* * *

ব্রাশের সেটটা হাতে সে নিয়ে ফ্ল্যাটে ঢুকল। এত কম দামে এত ভালো কন্ডিশন আশাই করেনি সে। নতুন উদ্যমে ইজেলে ক্যানভাস চাপালো, প্যালেটে রং নিলো। আবার সে পায়েল সোরাবজির পোট্রেটই আঁকবে। পায়েল সোরাবজির ছবি দেখে ক্যানভাসের ওপর সে ব্রাশ টানতে শুরু করল।

টানা তিনদিন নেশার মত ছবি এঁকেছে, চোখ টনটন করছে, কিন্তু আশ্চর্য! ছবিটা হয়েছে জীবন্ত! কাছ থেকে, দূর থেকে, নানা ভাবে ছবিটা দেখে নিজেই মুগ্ধ হয়ে গেল। কি করে এমন পোট্রেট আঁকল ভেবেই পেল না। রাত হয়ে গেছে, পরিশ্রান্ত, পরিতৃপ্ত শিল্পী ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে ঘুম থেকে উঠে ঝরঝরে লাগছিল তার। গুনগুন করে একটা গান গাইতে গাইতে কফি আর খবরকাগজ হাতে সোফায় আরাম করে বসল। খবরকাগজটা খুলে চোখের সামনে ধরল। এ কি! নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না, কাগজে খবর বেরিয়েছে, গতকাল রাতে পায়েল সোরাবজি মুম্বাইয়ে আত্মহত্যা করে মারা গেছে।

* * *

কাকতালীয় কত ঘটনাই না ঘটে। কালকেই পায়েলের ছবিটা আঁকা শেষ হল আর কালকেই পায়েল আত্মহত্যা করল। গতকাল আঁকা শেষ করে ক্যানভাসটা একটা কাপড় দিয়ে ঢাকা দিয়েছিল, এখন ঢাকা সরিয়ে আরেকবার পোট্রেটটা দেখল। পায়েল সোরাবজির চোখের দিকে তাকিয়ে তার গা হঠাৎ শিরশির করে উঠল। জীবন্ত দুটো চোখ তার দিকে তাকিয়ে আছে। আবার ক্যানভাস ঢাকা দিয়ে দিল। কিন্তু ওর ভেতরে একটা উত্তেজনা কাজ করছে। ও ঠিক করেছিল ওর প্রিয় গায়ক রঞ্জন চক্রবর্তীর পোট্রেট আঁকবে। সেইমত একটা ছবিও বেছে রেখেছিল। নতুন ক্যানভাসে ব্রাশের আঁচড় লাগালো সে। আঁকতে আঁকতে অদ্ভুত একটা ঘোর লাগছিল ওর। সে যেন শুধুমাত্র ব্রাশ ধরে আছে। ব্রাশগুলো নিজেই যেন পোট্রেট এঁকে চলছে। রঞ্জনবাবুর চোখদুটো খুব বাঙ্ময়, চোখের মণিদুটো আঁকার সময় ওর লোমগুলো খাড়া খাড়া হয়ে যাচ্ছে, ও ঠিক বুঝতে পারছে না, কোনো অজানা শক্তি ওকে দিয়ে যেন আঁকিয়ে নিচ্ছে।

চারদিন ধরে ক্যানভাসে ধীরে ধীরে যে অবয়বটা ফুটে উঠল, সেই অবয়ব

দেখে নিজেই চমকে উঠল সে। এমন জীবন্ত ছবিটা হয়েছে, যে ওর মনে হচ্ছে এক্ষুনি বোধহয় রঞ্জন ক্যানভাসের ভেতর থেকে গান গেয়ে উঠবে। সেই চোখ, সেই ঠোঁট, সেই মুখে হালকা হাসির ঝিলিক। এ যেন একজন নতুন পোট্রেট শিল্পী জেগে উঠেছে তার ভেতরে। দুচারবার ছবিটার দিকে তাকিয়ে একটা হালকা হাসি খেলে গেল তার মুখে। এমনভাবে চলতে থাকলে সে শুধু পোট্রেট আঁকার প্রদর্শনী করতে পারবে ছ মাসের মধ্যে।

রাতে শোওয়ার আগে ফেসবুকটা খুলল ও। নিউজ ফিডে চোখ বুলিয়ে ওর হৃৎপিণ্ড যেন মুখের সামনে চলে এল। কিছুক্ষণ আগে অনুষ্ঠান সেরে ফেরার পথে পথদুর্ঘটনায় মারা গেছে রঞ্জন চক্রবর্তী। তার ঘুম মাথায় উঠলো। এমন কাকতালীয় ঘটনা কি বারবার ঘটতে পারে ? এ কি সম্ভব ? ব্রাশগুলো তাকে দিয়ে যেন জোর করে আঁকিয়ে নিচ্ছে একের পর এক পোট্রেট, আর সেই পোট্রেট গুলো আসল মানুষের আত্মায় জীবন্ত হয়ে উঠছে! কিন্তু এ কি সত্যি হতে পারে? সামান্য রঙ, তুলি ক্যানভাসের কি সেই ক্ষমতা আছে? তার আঁকার ক্ষমতারই বা এমন সাংঘাতিক পরিবর্তন হল কি করে? তার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছিল।

সে ঠিক করলো, পরের দিন ও আরোও একজনের ছবি আঁকবে। কিন্তু কার ? যদি ও যেটা ভাবছে সেটা সত্যি হয় ? কোনো মুখ ওর মনে এলো না, যার ছবি আঁকতে পারে।

সারাদিন পাগলের মত ঘুরে বেড়ালো এদিক সেদিক। একবার ভাবল আর ছবি আঁকবে না, সব দূর করে ফেলে দেবে। তারপরেই তার মনের ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠল- না না, ছবি আমাকেই আঁকতেই হবে। আর তা হবে একমাত্র পোট্রেট। পোট্রেট না আঁকলে যেন তার শান্তি নেই।

সন্ধ্যে নেমেছে শহরের বুকে। ওকে চুম্বকের মতো টানছে ইজেল... প্যালেট... ক্যানভাস... ব্রাশ...। কার পোট্রেট আঁকবে? কার জীবন কেড়ে নেবে ঐ সর্বনাশা ব্রাশ? একটা অজানা ঘোরের মধ্যে সে ছুটে এলো তার ফ্ল্যাটে। ইজেলটাকে টেনে এনে সেট করল আয়নার পাশে। প্যালেট হাতে নিয়ে রং ঢালল, তুলে নিল ব্রাশ...।

ক্ষেপে উঠেছে ওর হাত দুটো। তার নিজের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। ঝড়ের মত আয়নার প্রতিবিম্ব ক্যানভাসে ফুটে উঠছে। ব্রাশ দুটো নিজেই রং তুলছে, আঁচড় কাটছে, ক্যানভাসে তৈরি হচ্ছে ওর নিজের চুল, কপাল, গাল চিবুক ঠোঁট নাক। কাঁপছে ও, থরথর করে কেঁপে উঠছে গোটা শরীর। ব্রাশ চলছে...।

ঢলে পড়ছে, মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে শরীরটা.... ব্রাশ চোখ দুটোকে নির্মমভাবে জীবন্ত করে ফুটিয়ে তুলছে। অবিকল সে, শিল্পী নিজে, নিজের জীবন্ত পোট্রেট হয়ে ক্যানভাসে বন্দী। শিল্পীর প্রাণহীন দেহটা মাটিতে পড়ে আছে। ব্রাশের সেট খুঁজে চলেছে নতুন একটা ক্যানভাস।

পাহাড়ি পথে

শুভঙ্কর সাহ

১০টা- ৫টা নাগরিক জীবনের অস্বস্তি আর ক্লান্তি যখন গ্রাস করে, তখন মন চায় একটু ব্রেক... এক বুক হাওয়া... কারণ নিজেকে মাঝেমধ্যে নিজের মতো করে পেতে হয়, হতে পারে একা বা একা এবং কয়েকজন। বহুদিন থেকে ভাবছিলাম। কোথাও যাবো, কিন্তু ঠিকঠাক হয়ে উঠছিল না।হঠাৎ করে এসে গেল একটা সুযোগ। ক্রিস্টমাস উইকের শেষ দিকের তিনটে দিন মানে ২৭-২৯ শে ডিসেম্বর আমাদের চতুর্ভুজের (আমি, গোপাল দা, সাম্য আর আবীর) ডেস্টিনেশান -'অ্যাপার্ট ফ্রম স্যারাউণ্ডিং' ফিক্সড হলো। ডেস্টিনেশান- দেবকুণ্ড-পঞ্চলিঙ্গেশ্বর, কুলডিহা (ওডিশা)।

যথারীতি ২৭ তারিখ আমি খড়গপুরে ওয়েট করছি, ওরা গাড়িতে আসবে আর আমাকে পিক করবে, গাড়িটা সাম্যের। বেশিক্ষণ ওয়েট করতে হলো না, ২টো নাগাদ সাম্যের কালো স্করপিও NH60-এর দূর দিগন্তের বিন্দুবৎ রেখা থেকে ধীরে ধীরে আমার কাছে মূর্ত হল। চললাম, ব্যস্ত জীবনকে কয়দিন হাইবারনেশনে রেখে। ট্যুর অপারেটর কাম প্ল্যানার আবীরের প্ল্যান অনুযায়ী আজ আমাদের রাত্রিবাস হবে বারিপাদা টাউনে।পরদিন ভোরে আবার সুহানা সফর... সেই অনুযায়ী গাড়ি ছাড়লো। মনে হচ্ছিলো, এক কালো যমুনার জল সর্বপ্রাণী খায়, আরেক কালো আমি কৃষ্ণ সকল রাধে চায়।

মানে কালো রাস্তা আর কালো চাকার যৌথ আলাপনে আমাদের শকট যেন পরিণত হলো পক্ষীরাজে। যাওয়ার পথে পশ্চিমবঙ্গের শেষ জনপদ হাতিবাড়ি জঙ্গল পেরিয়ে গেলাম। মাঝে দু'একবার নিশ্বাস ও প্রকৃতির ডাকে নামলাম, প্রায় সন্ধ্যে ৭.৩০ নাগাদ আমরা বারিপাদা টাউনে পৌঁছোলাম। কিন্তু আবীরবাবুর উইকি এখানে কাজ করলো না... পিক টাইম, প্রত্যেকটা লজে একই বোর্ড- Room not available... কি করা যাবে, পাহাড়ি অঞ্চল, ভীষণ ঠাণ্ডা, অচেনা জায়গা - গাড়িতে তো আর রাত কাটানো যাবে না। কি করি, কি করি ভাবছি... এমন সময় লজের হাউসকিপিং -এর একটা ছেলে এসে বললো - "আপনারা একটা কাজ করুন, এখান থেকে ৬০ কিমি দূরে রেমুনা বলে একটা জায়গা

আছে, ছোট তবে ভালো। ওখানে অনেক লজ আছে পেয়ে যাবেন, রাতটুকু থেকে সকালে বেরিয়ে পড়ুন, ওখান থেকে দেবকুণ্ড একদম সামনে। তবে রাত হয়ে গেছে তো, একটু সাবধানে যাবেন। রাস্তাটা খুব একটা ভালো নয়।"

আমরা অ্যাডভেঞ্চার মোডে 'চলো লেটস গো' বলে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু বারিপাদা টাউনের আলো ঝলমলে শহর পেরোতেই গ্রাস করলো ঘুটঘুটে অন্ধকার। এবড়ো খেবড়ো রাস্তা, চারিদিকে লাল ধুলোর স্তর, হালকা থেকে মাঝারি জঙ্গল... হঠাৎ একটা ইউ-টার্ন বাঁকের কাছে এসে যা ঘটলো, তার জন্য আমরা কেউই প্রস্তুত ছিলাম না। ঝপ করে গাড়ির হেডলাইটগুলো গেল বন্ধ হয়ে। নিকষ কালো অন্ধকারে আমরা চারজন, শুনশান রাস্তা... মাঝে মাঝে দু'একটা ট্রাক বা ট্রেলার তীব্র গতিতে আর জোরালো আলোতে চলে যাচ্ছে। অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে গাড়িতে বসে আমরা চারজন। গা ছমছমে পরিস্থিতি। বেশি ভয়, যদি আশপাশের থেকে কোন জন্তুজানোয়ার চলে আসে। যাইহোক, সাম্যের তৎপরতায় সমস্যা বোঝা গেল। ওয়্যারিং ফল্টের জন্য ফিউজ হয়ে গেছে। ফিউজ রিপ্লেস করে লাইটের সমস্যা মিটলো। আমরা রওয়ানা হলাম, আর ৮-৩০ টা নাগাদ রেমুনাতে পৌঁছোলাম।

প্রথম কাজ কোনো আস্তানা খোঁজা, বেশি খুঁজতে হলো না, পেয়ে গেলাম একটা ভালো লজ।ট্রিপল বেডরুম পেয়ে গেলাম একটা, চারজনের জন্য এনাফ। ফর্মালিটিজ সেরে রুমে ঢুকে ফ্রেশ হয়ে নিলাম। ইতিমধ্যে আমরা রিসেপশনে ডিনারের অর্ডারটা করে দিলাম। দেশী মুরগির ঝোল আর রুটি। এছাড়া সময় কাটানোর জন্য দু প্লেট চিকেন পকোড়ার অর্ডার দিয়ে আমরা লজের সামনের লনে এসে বোসলাম।

লনটা খুব সুন্দর, অনেকটা ফাঁকা জায়গা, পাশ দিয়ে হাইওয়ে চলে গেছে, অনেকগুলো কংক্রিটের চেয়ার আছে, যেখানে বসে সারারাত কাটিয়ে দেওয়া যায়। পাহাড়ি এলাকা, শেষ ডিসেম্বরের ঠাণ্ডা - আমরা বসে আড্ডা দিচ্ছি, এমন সময় রুম সার্ভিসের ছেলেটা নিয়ে এলো গরম গরম পকোড়া।আর এই পরিবেশে একটু আধটু পানীয় না হলে জমবে না, সবকিছু নিয়েই আমাদের আড্ডা জমে উঠলো। আমরা পকোড়ার সঙ্গে মানানসই সোনালী তরলে একটু একটু ঝিম ধরাচ্ছি, হঠাৎ দেখি রিসেপশনিস্ট ছেলেটি আসছে। যেকোনো নতুন জায়গায় স্থানীয় মানুষের সঙ্গে আলাপ আর নতুন নতুন তথ্য সংগ্রহ আমার বহুদিনের স্বভাব। তাই ছেলেটির সঙ্গে আলাপ জমানোর জন্য ছেলেটিকে বসতে বললাম। এটা ওটা হালকা দু'একটা ক্যাজুয়াল কথা হওয়ার পর এই ঠাণ্ডা, পাহাড়ি পরিবেশে ভূতের প্রসঙ্গ তো আসবেই। আমিই জিজ্ঞেস করলাম

ছেলেটিকে -"তা ভাই, তুমি অলৌকিক কিছুতে বিশ্বাস করো, মানে তোমার কোনো অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতা আছে?"

ছেলেটি বললো- "আপনারা বিশ্বাস করেন?"

আমি বললাম -"বিশ্বাস সেইভাবে করি না, আবার একইভাবে অবিশ্বাসও করি না, হয়তো কিছু আছে... কিন্তু আমি সেইভাবে কোনো প্রমান পাইনি... তবে অভিজ্ঞতামূলক গল্প শুনতে অসুবিধা নেই। তোমার আপত্তি না থাকলে, তোমার এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করতে পারো।" ছেলেটি বললো- "আমি সাধারণত এগুলো কাউকে বলি না, তবে আপনারা যখন এত করে বলছেন তখন শুনুন..." আমাদের অনুরোধে রিসেপশানের ছেলেটি বলা শুরু করলো। ছেলেটির বক্তব্য এখানে 'আমি ' করে বললাম।

স্যার, আমি জীবনে অনেক স্ট্রাগল করেছি। আমি এখানে কাজ করছি ৪-৫ বছর। তার আগে আমি সেলসে কাজ করতাম। আমার এরিয়া ছিল ঢেঙ্কানল ডিস্ট্রিক্টের বিভিন্ন পাহাড়ি রিমোট এরিয়া। আমি ওইসব জায়গার বিভিন্ন আদিবাসী অঞ্চলে ঘুরতাম, আর বিভিন্ন মহল্লা, গ্রাম্যহাট থেকে মেয়েদের উঠে যাওয়া মাথার চুল সংগ্রহ করে মহাজনের কাছে এনে দিতাম। যেখানে চুলগুলি প্রসেসড হয়ে ফরেনে এক্সপোর্ট হতো। আমাদের টিম ভাগ করা থাকতো। আমরা সপ্তাহে ৪-৫ দিন কাজ করতাম। একটা করে রুটম্যাপ থাকতো, তখন তো মোবাইল ফোনের চল ছিল না, আর থাকলেও ব্যবহার করার ক্ষমতা ছিল না। সঙ্গী ছিল সাইকেল। আমরা রুটম্যাপ অনুযায়ী সাইকেলে করে সপ্তাহে ৮-১০ টা স্পট কভার করতাম, পথে যেখানে সন্ধ্যা হতো, সেখানে কোনো ধর্মশালায় বা কারুর বাড়িতে রাতটা কাটিয়ে পরদিন সকালে আবার বেরিয়ে পড়তাম নতুন স্পটের উদ্দেশ্যে।

ঢেঙ্কানল জেলাটা স্যার পাহাড়, ঘন অরণ্যে ঢাকা একটা জায়গা। আমি তখন এই জেলার ভুবন নামের একটি গ্রামে কাজ করছি। ভুবনের সিনিক বিউটি অসাধারণ। দুদিকে অনুচ্চ পাহাড় আর সামনে বিস্তীর্ণ ক্ষেত, মাঝেমাঝে ছোটখাটো অজানা নদী। ভুবনের বুক ছুঁয়ে চলে গেছে টাটা কোল মাইনিংয়ের ছোট্ট একটি সাইট, যেখানে বিভিন্ন শিফটে কাজ হতো। আমি আমার সাপ্তাহিক টার্গেটের তিনদিন মতো ফুলফিল করেছি, ব্যবসাও ভাল হচ্ছিলো, মনটা ফুরফুরে আছে- আর দুদিনে যা ইনকাম হবে, তাতে ইনসেন্টিভ ভালই আসবে। ৫ম দিনের দিন আমি একটা গ্রাম্য হাটে এলাম।বিকেলের হাট। হাটটি লালমাটির রাস্তা দিয়ে তিনদিক থেকে সংযুক্ত। বহু লোকের সমাগম, আমার আমদানি

ভালোই হলো। কদিন মিলে প্রায় ২০-২৫ কেজি চুল সংগ্রহ হলো।

পাহাড়ি অঞ্চলে ঝুপ করে সন্ধ্যা নামে, নেমেও গেল। প্রত্যন্ত গ্রাম হওয়ায় কোন ধর্মশালা না পেয়ে আশ্রয় নিলাম এক আদিবাসী বাড়িতে। আদিবাসীরা স্যার ভীষণ সরল আর অতিথিপরায়ন হয়। অতিথি কে নিজেদের সবচেয়ে ভালো জিনিসটা ব্যবহার করতে দেয়। আমার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। দাওয়ায় পাতা সুন্দর বিছানা আর পাতে দেশী মুরগির ঝোল সহ মোটা চালের ভাত, আহা যেন অমৃত। এবার ঘুমের পালা, দূরে কোনো পাড়া থেকে ভেসে আসছে - ধামসা/ মাদলের দ্রিমিদ্রিমি আওয়াজ, ফাগুনের দখিনা বাতাসের সঙ্গে তীব্রভাবে ভেসে আসছে মহুয়ার ঝিম ধরা গন্ধ। যাইহোক, এইভাবে আবেশিত হয়ে কখন যেন আমার ঘুম ধরে গেল। হঠাৎ পাখির শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। চারিদিক যেন ফর্সা হয়ে গেছে। ঠান্ডা হাওয়ায় যেন সারা শরীর স্নিগ্ধ হয়ে গেল। আমি তাড়াতাড়ি চোখেমুখে জল দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম, কেননা তাড়াতাড়ি না বেরোলে পৌঁছোতে দেরী হয়ে যাবে। এত ভোরে আর বাড়ির লোকেদের না জাগিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম। সাইকেল চালাচ্ছি, প্রায় মিনিট ৪৫ পরেও কেন যেন মনে হোল, সকাল হচ্ছে না কেন? এইসময় আমার একটা সিগারেট খাওয়ার খুব ইচ্ছে হলো। সিগারেট তো আছে... কিন্তু যাঃ! ম্যাচবক্স তো ওই বাড়িতে ফেলে এসেছি। কি করি? এগোই... ওখানকার একটা রীতি আছে - পথচলতি কারোর কাছ থেকে আগুন চাইতে নেই, তবে যদি কেউ বা কারা বসে থাকে সেক্ষেত্রে চাওয়া যেতে পারে। আমি চলতেই আছি, না কোন পথচারী , না কোন বিশ্রামরত পথিক। আশ্চর্য! ভোর হয়ে গেছে! এখন তো মাইনিং লেবাররা উঠে যাবে, কিন্তু কে কোথায়? চলতে চলতে আরও ২ কিমি মতো চলে এলাম। ঘন জঙ্গলময় রাস্তা, চারিদিকে শুনশান একটানা ঝিঁঝিঁ পোকার আওয়াজ। আমি কিন্তু একমনে সিগারেটের কথা ভাবছি, বাকী সবচিন্তা মাথা থেকে উড়ে গেছে।হঠাৎ! আরে ওই দূরে আলো দেখে যাচ্ছে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই তো দেখতে পাচ্ছি একটা ছোট্ট ঘর, সামনে দাওয়া মতো, ভেতর থেকে ক্ষীণ আলো যেন আসছে। আমি তাড়াতাড়ি সাইকেল চালিয়ে ঘরের কাছে এলাম। ঘরের দরজা খোলা, আমি জোরে, "বললাম আগুন আছে?" দেখলাম, একজন বৃদ্ধ, ঠিক মুখ দেখতে পাচ্ছিনা, একটা কাগজে আগুন ধরিয়ে আমার মুখে ধরলো, আমি সিগারেটটা ধরিয়ে, ধন্যবাদ জানিয়ে আবার সাইকেলে স্টার্ট দিলাম।

এক মিনিটও যায়নি, হঠাৎ ফিল করলাম... কি রে বাবা, সাইকেলটা এতটা ভারী লাগছে কেন, ছিলো তো ২০-২৫ কেজি মাল, তা টানতে তো এত কষ্ট হওয়ার কথা নয়। আমি কি চড়াইতে উঠছি? কে জানে? উঃ! ভীষণ ভারী

লাগছে, আর টানতে পারছি না।আমার সর্বশরীর ঘেমে-নেয়ে একসা অবস্থা। পরিষ্কার ফিল করছি যেন কেউ পেছনে বসে নাড়াচাড়া করছে। কে? কেউ তো নেই, শুধু চুলের বস্তা ছাড়া... উঃ! যেন লোহা বইছি। ফাঁকা জঙ্গলময় রাস্তা, আর সকালও যেন হচ্ছে না। আমি আর পারছি না, এইভাবে কোনোরকমে আর কিলোমিটার দুয়েক গিয়ে, দূর থেকে একটা জোরালো আলোর রেখা দেখতে পেলাম। আর একটু এগোতে দেখলাম হলুদ ক্যাপ পরা কয়েকজন বসে আছে। আমার যেন ধড়ে প্রাণ এলো, আমি কোনোরকমে জোরে চালিয়ে, ওদের কাছে আসলাম, আশ্চর্য! ওদের কাছাকাছি আসা মাত্রই সাইকেলটা আবার আগের মতো হালকা হয়ে গেল। আমি সাইকেল স্ট্যাণ্ড করে কোনোরকমে ওদের কাছে গয়ে বসলাম। আমার সর্বাঙ্গে অবগাহন আর জিভ বের করে হাঁপানো দেখে ওরা আমাকে ফ্যানের তলায় নিয়ে গেল।তারপর জিজ্ঞাসা করলো- "ব্যাপারটা কী?এই রাত ২-৩০ এর সময় কোথা থেকে আসছো?

কোথায় যাবে?" আমি বললাম- "মানে এখন ২-৩০?" ওরা বললো- "আমরা শিফটের কাজ সেরে এই খেতে বসেছি, এখন ২-৩০ বাজে।" মানে আমি ১-১৫ কে সকাল ভেবে বেরিয়ে পড়েছি। আমি সব বললাম, ওরা তখন এর ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে ওদের লোকাল ভাষায় কিছু বললো, যা আমি ঠিক বুঝলাম না। তবে এটুকু বুঝলাম ওরা কিছু লুকোচ্ছে। একজন শুধু বললো- "খুব বেঁচে গেছো, এখন কোথাও যেয়ো না, খাওয়া হয়েছে, তাহলে এখন শুয়ে পড়ো, ভোর হলে বেরোবে।"

আমি বুঝলাম না কি ব্যাপার... যাইহোক, সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে শুয়ে পড়লাম। ভোরের দিকে ঘুম ভেঙে গেল। ফ্রেশ হয়ে, চানটান করে ওদের বলে বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু মনের মধ্যে খচখচানিটা রয়েই গেল। তাই একবার রিভার্সে যাবো কিনা ভাবলাম, আর গেলামও। দেখলাম কোনো চড়াই রাস্তা নয়, পুরোটাই সমতল। ২ কিমি মতো পিছিয়ে এলাম, কোথাও কোনো ঘর নেই। হঠাৎ, চোখ আটকে গেল... রাস্তার একপাশে একটা স্মৃতিমন্দির, মানে ১.৫'×১.৫'×৫' এর একটা স্মৃতিস্তম্ভ। যেখানে একটা ফলকে প্রায় মুছে যাওয়া - নাম, জন্ম ও মৃত্যু লেখা। অত ভোরেও আমার মাথা ঘুরে যাওয়ার অবস্থা। দ্বিতীয়বার শক খেলাম- দেখলাম স্মৃতিমন্দিরের পাশে একটা পোড়া কাগজ।

আমাদের চারজনের শেষ হওয়া গেলাসগুলো তখনো আমাদের হাতে, হঠাৎ রুম সার্ভিসের ছেলেটা এসে বললো -"স্যার আপনাদের ডিনার রেডি, কোথায় সার্ভ করবো?"

পাহাড় ডেকেছিল

শুভ্রা বেজ

সালটা ১৯৮৯ আমার কলেজে ফার্স্ট ইয়ার। আমি রেলকন্যা, রেলশহরে বেড়ে ওঠা। সারাবছরে ঐ পুজোর ছুটি ছাড়া তেমন ছুটি পাওয়া যেতনা বেড়াতে যাওয়ার জন্য। মুখিয়ে থাকতাম। তখন মনে হয় রিজার্ভেশনের অত ঝামেলা ছিল না। আর পাশ তো ছিলই। তাই বাবা রেলে ভ্রমণ বেশি পছন্দ করতেন। বিয়ের পরে আমি প্লেনে চেপে হানিমুন গেছি। যাই হোক, হরিদ্বার যাওয়া ঠিক হ'ল। কিন্তু প্রথম থেকেই যাওয়াটা ঠিক মসৃণপথে হচ্ছিল না। প্রথমেই ওয়েটিং লিস্ট। আমাদের সঙ্গে আরও একটি পরিবার যাচ্ছে। অনেকদিন ধরেই প্রোগ্রাম, তাই শেষে নাকচ হলে মন খারাপ হয়ে যেত এবং এখনও সেই অভ্যাস বজায় আছে। মুখ ঝুলিয়ে পড়তে গেলাম। বিজয়ার পরে, স্যার মিষ্টিমুখ করাচ্ছেন। আমার বিষণ্ন বদন। হঠাৎই বাবা এসে ডাকছে বাইরে থেকে। স্যার উদ্বিগ্ন হয়ে কিছু জিজ্ঞেস করলেন ও আমাকে ছুটি দিলেন। যাওয়া হচ্ছে! কিশোরী বেলার সেই আনন্দ প্রকাশ করার নয়।

দুন এক্সপ্রেসে যাওয়া। টু-টায়ার এসি। ওয়েটিং বললেও আমরা দিব্য আটজনেই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চলে গেলাম। আমরা চারজন, সেনকাকুরা চারজন। সকাল হ'ল। বাবা দেখাচ্ছে ছোটছোট পাহাড়। এরও অনেক পরে আমরা গন্তব্যে পৌঁছে তো গেলাম, কিন্তু রেলের যে লোকটিকে থাকতে বলা হয়েছিল তিনি লা-পাতা। তখন তো মুঠোফোনের সুবিধা ছিল না। আমাদের একজায়গায় দাঁড় করিয়ে বাবা- কাকু গেলেন হোটেল খুঁজতে। এরকম কখনও হয়না, সবার চোখে মুখেই বিরক্তি। আজ হোটেলের নাম মনে নেই তবে" হর কি প্যায়রী" থেকে হাঁটাপথে মিনিট পাঁচেক, দোতলায় দুটো ঘর পাওয়া গেল। বেশ ভাল। বোর্ডাররাও বেশিরভাগ বাঙ্গালী, যা হয়, ভ্রমণপিপাসু বাঙ্গালী।

পরেরদিন স্নানে গেলাম। আমার জলে খুব ভয়, সাঁতার তো জানি না। শৃঙ্খলাবদ্ধ ঐ জলের আস্ফালন দেখে বুক কাঁপছে। এর মধ্যে সেন কাকুর ছোটছেলে চেন ধরে স্নান করতে গিয়ে একহাত ছেড়ে গেল। আমরা পাড়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছি। একজন ভদ্রলোক এক হ্যাঁচকা টান দিয়ে সোজা

সিঁড়িতে যেন আছড়ে ফেললেন সোমুকে।

একটা গাড়ি করে মোটামুটি সব দর্শনীয় জায়গা পাঁচদিন ধরে দেখা হ'ল। শেষদিন মনসা পাহাড়। ইতিমধ্যে আমার অ্যাপেনডিক্স একটু করে চাগাড় দিচ্ছে। ওটা আগে থেকেই ছিল। সেদিন রাতে ট্রেন। মনসা পাহাড় আমাকে টানল না। আমি হোটেলেই থাকলাম।

এখানে একটু বলি, আমার ভাই একজন স্পেশাল চাইল্ড। খুব ছোট তখন। বাবা- মা ভাইকে নিয়ে একটু সন্ত্রস্তই থাকত। রোপওয়ে বা উড়নখাটোলায় ভাইয়ের যদি কোন অসুবিধা হয়, এই ভেবে ওরা হাঁটাপথ ধরে। আমি সঙ্গে ছিলাম না। পরের কথাগুলো বাবা মায়ের মুখেই শোনা। ভাবলে আজও শিহরিত হই। বলে রাখি ১৯৮৭ তে বাবার ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। সেনকাকুরা রোপওয়ের লাইনে লাইন দিয়েছিল, বাবা-মা-ভাই স্থানীয় লোকজনের দেখানো রাস্তায় উঠতে থাকে। সেরকম পাকদন্ডী নেই তবে খাড়াই। মা একটু ভীতু টাইপের। সেরকম লোকজন না দেখে ফিরে আসতে বলেছিল বাবাকে। ভাইয়ের নাকি কোন কষ্টই হচ্ছিল না। বাবা মাঝে মাঝে দম নিয়ে হাঁটছিল। অন্ধকার নেমে আসছে। মা বাবাকে ক্রমাগত বলে চলেছে ফিরে যেতে, তার আরও একটা কারণ হোটেলে আমি একা। ঐ হোটেলেই উঠেছিলেন স্বর্গত গনেশ ঘোষ তিনবন্ধু সমেত। আমি তীর্থের কাকের মত জানলা দিয়ে দেখছি। ট্রেনের সময় এগিয়ে আসছে। অনেকেই হোটেল ছাড়ছে দেখছি। বাবা-মা-ভাই ফিরছে না কেন? অজানা আশঙ্কা গ্রাস করছে। পরে শুনেছি অনেকটা দূর ওঠার পরে একজন লোককে দেখতে পেল, উনি ওপর থেকে হেঁটে আসছেন।

বাবাকে জিজ্ঞেস করেন, আপলোগ কিধার যা রাহা হ্যায়। মাতাজীকে পাশ?

-হাঁ, লেকিন ঠিক সে রাস্তা মালুম নেহি। বাবার উত্তর। যেন ডুবন্ত মানুষ খড়কুটো পেয়েছে।

-পাগল হ্যায় কেয়া। আভি আগে তো বহত রাহ বাকি হ্যায়, রাত হো যায়েগা। লৌট যাইয়ে। ব'লে নাকি ঐ লোকটি হনহন করে নীচে নেমে যায়। আমার বাবা ঘোর কমিউনিস্ট ছিল। মায়ের কথায় বাবা নাকি প্রচন্ড ঘামছিল। তীর্থযাত্রী সকালে গিয়ে ফিরছে, এ তো সাধারণ ঘটনা। তবে রাস্তা কি এতটাই দূরে? চূড়া দেখা যাচ্ছে মাঝেমাঝে। মা অনড় রইল। বাবা জেদ ধরেছিল উঠবেই। শেষমেষ ফিরতি রাস্তা ধরে। সেই ভদ্রলোক চোখের নিমেষেই ধাঁ। যতদূর চোখ যায় তাঁকে আর দেখা যায় নি। ফেরার সময় রাস্তা গুলিয়ে ফেলেছিল ওরা। আমি হোটেলে কাঁদোকাঁদো ভাবে অপেক্ষায়। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে যে হোটেলের

ছোকরাগুলো সমানে ঘরের বারান্দায় পায়চারি করছে কোন অসৎ উদ্দেশে হয়তো। সবচেয়ে অবাক হ'লাম আমাদের সহযাত্রীরাও চেক আউট করে গেল। একটু আগে স্টেশনে পৌঁছনোর জন্য। আমি তখন সত্যিই ফোঁপাচ্ছি।

বাবা মা যখন দিগভ্রান্ত তখন দেখা মেলে মাথায় কাঠের বোঝা চাপানো এক বুড়িমার। সে সব শুনে তাঁকেই অনুসরণ করতে বলে। মেইন রাস্তায় আসার আগেই তাঁকে আর খুঁজে পায়নি। অসহায় বৃদ্ধার উপকারের বদলে কিছু টাকা দেবে ভেবেছিল। বাঙ্গালীদের যা অভ্যাস। রোপওয়ের লাইন ফাঁকা। রিস্ক নিয়ে তাতেই চেপে মন্দির দর্শন করে। ভাইয়ের কিছুই হয় নি। ফটোতে দেখে মনে হল সে বেশ এনজয় করেছে। ভয় কি, এই ভাবনাটা তখনও তো ওর মধ্যে নেই, জানেনা।

যত সহজে এবং যত তাড়াতাড়ি লিখলাম, তত তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা মেটেনি। অনেক্ষণ পরে ওদের আসতে দেখেই কেঁদে ফেললাম। তাড়াতাড়ি চেক আউট করে রিক্সায়। স্টেশনে এসে খেলাম। বাবাকে খুব চিন্তিত লাগছে। বারবার বলছে যে কি ভুল করতে যাচ্ছিল। কিন্তু ভুলটা শুধরে দিলেন যিনি তিনি কে? অনেকেই শুনে বলল স্বয়ং ভগবান।

বলতে ভুলে গেছি, জলে নেমে স্নান করতে পারব না তাই ওখানে একটা মগ কেনা হয়েছিল। প্রথম দিন হঠাৎই একটি নুড়ি ঠক করে মায়ের হাতে ধরা মগের মধ্যে এসে পড়ে। ফেলতে গিয়েও ফেলেনি। অনেকজনকেই দেখানো হয়েছে, সবাই একবাক্যে বলে ওটা নারায়ণ শিলা। এখনও আমাদের বাড়িতে রয়েছে, নিত্যসেবা পায়। সেই শিলারও অনেক ঘটনা আছে। আমি সব শুনে থ। সহযাত্রী কাকু কাকিমা সহানুভূতি অনেক দেখালেন।

সবেতেই বিজ্ঞান ও যুক্তি খোঁজা আমার বাবাই শুধু থম মেরে আছে। আরও উপরে উঠলে কি হত? ফেরার সময় ঐ বৃদ্ধার দেখা না পেলেই বা কি হত? বুঝতে পারছি, আত্মদংশনে ভুগছে। আমি আমার ব্যথা ভুলে আরও অনেক কিছুই ভাবছি।

এও কি সম্ভব? ফিরে এসে ঐ গল্প সবার কাছেই করেছে। সেনকাকুরাও সাক্ষী ছিল যে বাবা- মা হাঁটা পথ বেছেছিল। অনেকে আন্তরিকভাবে আবার অনেকেই বিদ্রূপের ছলে বলেছে, আপনারা স্বয়ং ভগবানের দেখা পেয়েছেন! কি সৌভাগ্য!

সৌভাগ্য কি না জানিনা, তবে আমি থাকলে হয় তো ভগবান দর্শন হ'ত না। কারণ আমি হাঁটার বিপক্ষে। বিশেষত পাহাড়ে। আমার বাবা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বিশ্বাস করেছে যে হয়তো বা মানুষরূপী দেবতাই সেদিন তার ছেলে সহ পরিবারকে রক্ষা করেছেন। নরের মধ্যেই তো নারায়ণ! মা তো সেই বিশ্বাসে

আজও অটল। আমি উপস্থিত ছিলাম না বলে হয়তো শোনা কথা লিখতে পারলাম। সত্যিই ওটা একটা অলৌকিক ঘটনা ছিল। পথ থেকে ফেরানো আর ঠিক রাস্তা দেখানো! যে রাস্তায় গেছে সেই রাস্তা আমার বাবা ভুলে গেল কি করে আজও ভেবে পাই না, কারণ অচেনা কোন রাস্তায় গেলে ল্যান্ডমার্ক করে রাখত। লৌকিকতা বহির্ভূত এই ঘটনা আমার পরিবার ভোলেনি। নারায়ণ শিলাকেও প্রতিষ্ঠা করা হয় খড়্গপুরে ফিরে এসে।

পরে অনেকবার হরিদ্বার গেছি, হরিদ্বারকে কেন্দ্র করে অনেক জায়গায় যেতে হয়। মনসা পাহাড়েও উঠেছি রোপওয়েতে। কিন্তু আমার আঠারোর স্মৃতি আজও অমলিন।

সন্তান

স্নিগ্ধা চক্রবর্তী

আমরা তখন সবে নতুন ফ্ল্যাটে শিফট করেছি, আমরা থাকি তিন তলায়। রোজই একটা দুটো করে নতুন ফ্যামিলি আসতে শুরু করেছে, ঠিক তেমন ভাবে এখনো কারোর সাথে আলাপ করা হয়নি। একদিন রাত প্রায় দুটো নাগাদ, ফ্ল্যাটের সামনে একটা লরি এসে দাঁড়ালো, বুঝতে পারলাম নতুন কোনো ফ্যামিলি এলো। সিঁড়িতে মালপত্র তোলার শব্দ আর লেবারদের চিৎকারে রাতের ঘুমের বারোটা বেজে গেল। পরের দিন সকালে আটটা নাগাদ কলিংবেলের আওয়াজে ঘুম ভাঙল, দরজা খুলে দেখি পাজামা পাঞ্জাবী পরিহিত বয়স্ক খুবই সৌম্যদর্শন এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। আমি দরজা খুলতেই উনি বললেন, "দরজা বন্ধ করে রেখেছো কেন? তুমি জানোনা, সিঁড়ির দরজা খোলা রাখতে হয়" এই কথা বলে উনি আমার পাশ দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লেন। আমি হাঁ হাঁ করে উঠলাম, আরে যাচ্ছেন কোথায়? ততক্ষনে উনি সারা বাড়ি ঘুরে ফেলেছেন আর খুব রেগে গিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করছেন, সিঁড়িটা কোথায় লুকিয়ে রেখেছো বলতো? আমি নিচে নামবো! আমি বুঝলাম ওনার একটু মাথার গোলমাল আছে।

ফ্ল্যাটে এখনো পর্যন্ত যাঁরা এসেছেন,তাঁদের কে আমি চিনি,মানে মুখচেনা কিন্তু এনাকে আগে কখনো দেখিনি,বুঝলাম ইনিই কাল রাত্রিবেলা এসেছেন, বললাম আপনি চা খাবেন? খুব খুশি হয়ে বললেন, খাওয়াবে? আমি তো চা খেতেই যাচ্ছিলাম, কিন্তু সিঁড়িটা খুঁজে পেলামনা, কাল রাতে তো এখানেই ছিল সিঁড়িটা আজ কোথায় গেল বলতো? যতক্ষণ উনি চা খেলেন আমার স্বামী বাইরে বেরিয়ে জেনে আসলো উনি কোন ফ্লোরে এসেছেন, তারপর ওনাকে দিয়ে আশা হলো ওনার ফ্ল্যাটে। আস্তে আস্তে পরিচয় হলো। ভদ্রলোকের নাম 'অনাদি ধর' উনি একজন ডাক্তার ছিলেন। আগে বাঁকুড়ায় থাকতেন, এক মেয়ে এক ছেলে ছিল ওনার, কোনো অজ্ঞাত কারণে ছেলেটি মারা যায়, এখন মেয়ে, স্ত্রী আর উনি এই তিনজনের পরিবার। মেয়েটি সুন্দরী, বাংলায় এম.এ করেছে বয়স প্রায় ২৫ বছর মতো। ওনার স্ত্রীর দুটো হাতই পোড়া, কোনো কাজই উনি করতে পারেন না, আর অনাদিবাবু এখন বদ্ধ উন্মাদ। অনাদিবাবুর স্ত্রী কেমন

যেন আতঙ্ক গ্রস্ত হয়ে থাকেন সবসময়, কারোর সাথেই উনি কথা বলেন না, যা কথা বলার মেয়েই বলে, সেই বাজার দোকান সব করে। সব মিলিয়ে কেমন যেন রহস্যময় একটি পরিবার। মেয়েটির নাম নন্দিতা, আমার সাথে ওর বেশ বন্ধুত্ব হয়ে যায়।

নন্দিতা আমাকে বলে, বৌদি একটা রান্নার লোক ঠিক করে দেবে? মা তো রান্না করতে পারেনা, দুটো হাতই পোড়া আঙুলগুলো জোড়া লেগে গেছে। আমি বলি, প্লাস্টিক সার্জারি করে নিলেই তো আঙুলগুলো ঠিক হয়ে যাবে, সেটা করাওনি কেন? নন্দিতা বলে, কি হবে ওইসব করে? কদিন বাদে তো মরেই যাবে! আমি খুব অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকালাম কেমন যেন নৃশংস লাগলো মুখটা ওর।

ফ্ল্যাটে ওদেরকে নিয়ে একটা চাপা গুঞ্জন শুরু হলো, সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার ছিলেন যে মানুষটা, সেইমানুষ এইরকম উন্মাদ কি করে হয়ে গেলেন? ওনার স্ত্রী কেন অমন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে থাকেন? আর ওনাদের ছেলের মৃতুই বা কি ভাবে হলো? সবটা কেমন যেন একটা রহস্যময় ব্যাপার! ক্রমশ বোঝা যেতে লাগলো, নন্দিতাই ওর বাবা মা কে চালনা করে, মেয়েকে ওনারা যমের মতো ভয় পান, গভীর রাতে ওদের ঘর থেকে চিৎকার চেঁচামেচির আর কান্নার শব্দ শোনা যায়, ওরা চার তলায় থাকে রাতের নিস্তব্ধতা ভেদকরে কানে আসে আকুল কাকুতি, "আর মারিস না, তুই যা বলবি তাই করবো, কেউ কিচ্ছু জানতে পারবেনা, আর মারিসনা সহ্য করতে পারছিনা"। নন্দিতাকে জিজ্ঞেস করলে বলে আমি তো নাটক করি,তারই রিহার্সাল করছিলাম, তোমরা যা শুনেছ সবটাই টেপে রেকর্ড করা নাটকের সংলাপ।

কোনোভাবে ছাড়া পেলেই অনাদিবাবু আমার ঘরে চলে আসতেন, এসেই বলতেন পেট, পেট, সবই এই পেটের জন্য, সব খাবে ওই রাক্ষসী সব খেয়ে নেবে, সাবধান! ও কিন্তু সাংঘাতিক একটা রাক্ষসী, আমার ছেলেটাকে ওইই খেয়ে ফেলেছে। নন্দিতা এসে ওনাকে নিয়ে যেত, খুব ভালো ব্যবহার করেই নিয়ে যেত। তাও কেমন যেন ভয়ে সিঁটিয়ে থাকতেন অনাদিবাবু। এক দিন বিকেল বেলা আমি আমার মেয়ে দুটোকে নিয়ে ছাদে গিয়েছিলাম ছাদের একটা কোন থেকে নন্দিতাদের ঘরের ভেতরটা দেখা যেত। কৌতূহল বশত ওখান থেকে উঁকি মেরে দেখি, অনাদিবাবু বিছানায় বসে আছেন। আর ওনার হাতে পায়ে শেকল দিয়ে বেঁধে তালা দেওয়া! প্রচন্ড অবাক হলাম সেই দৃশ্য দেখে। মানুষটা পাগল হতে পারে কিন্তু ভায়োলেন্ট তো নয়। তা হলে ওনাকে এইভাবে

কেন বেঁধে রাখা হয়েছে? রাতে আমার স্বামীকে সব বললাম, সব শুনে ও বললো, ওদের ব্যক্তিগত ব্যাপারের মধ্যে ঢুকতে যেও না, যা করছে নিজের বাড়িতেই তো করছে তুমি অতো গোয়েন্দাগিরি কোরোনা! বাদ দাও যা হচ্ছে হোক। কিন্তু আমার মন বলছিলো কিছু একটা রহস্য নিশ্চই আছে!

নন্দিতা দের ঘরে ওরা কাউকে এলাউ করতো না, কেউ কথা বললে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ও কথা বলতো, কাউকে ভেতরে ঢুকতে দিতো না, আর ওর মায়ের সাথে কাউকে কথা বলতে দিতনা। একদিন রাত্রিবেলা বিকট চিৎকার শুনে সকলে ওদের দরজার সামনে এসে জড় হলো, আমরা সমানে দরজা পেটাতে লাগলাম, আর ডাকতে লাগলাম ওকে, "নন্দিতা দরজা খোলো, কি হয়েছে তোমাদের ঘরে? দরজা খোলো প্লিজ, কিন্তু কিছুতেই দরজা খোলেনা নন্দিতা। থানায় ফোন করা হয়, কিছু ক্ষণের মধ্যেই পুলিশ এসে যায়, দরজা ভেঙে ওরা ভেতরে ঢোকে। অনাদিবাবু নিজের ঘরের সিলিং থেকে ঝুলছেন জিভটা বাইরে বেরিয়ে এসেছে। চোখদুটো বিস্ফারিত ভয়ানক সেই দৃশ্য দেখে শিউরে উঠলো সকলে। নন্দিতা মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে মেঝেতে, আর ওর মা অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে পড়ে আছে। পুলিশ বডি নামাবার ব্যবস্থা করতে লাগলো। নন্দিতা বললো আমি নিজের ঘরে ঘুমাচ্ছিলাম। মা ও ঘুমের ওষুধ খেয়ে আমার পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে ছিল, রাত দুটো নাগাদ মা উঠে বাথরুমে যায়। তখনই দেখে বাবা পাখার সাথে একটা শাড়ি দিয়ে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে। কোনো মতে আমাকে ধাক্কা দিয়ে ডেকে মা অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়।

তখন অন্যান্য ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা বলে, কিন্তু রাত বারোটা থেকেই তো তোমাদের বাড়িতে খুব চিৎকার চেঁচামেচি হচ্ছিল। নন্দিতা একেবারে অস্বীকার করে যায়, বলে বাবা তো দশটার মধ্যে খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়েছিলো। আর মা আমার সাথে কিছুক্ষন গল্প করে এগারোটা নাগাদ শুয়ে পড়েছিলো। আপনারা কিসের চিৎকার শুনেছেন? মা যখন বাবাকে এইভাবে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখে আমাকে ধাক্কা মেরে জাগিয়ে দিয়ে নিজে অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ে তখন তো আমি চিৎকার করবোই, এটাই তো স্বাভাবিক!

কেউ আর কোনো কথা বাড়ালো না, পুলিশ বডি নিয়ে চলে গেল। সবাই নিজের নিজের ঘরে চলে গেল কিন্তু একটা খটকা থেকেই গেল, ওদের ঘর থেকে চিৎকার চেঁচামেচির আওয়াজ সবাই শুনেছে, কিন্তু নন্দিতা কথাটা পুরো উড়িয়ে দিলো। পোস্টমর্টেম রিপোর্টে কি এলো কেউই কিছু জানতে পারলোনা। দাহ সংস্কার হয়ে গেল, কেউ নন্দিতাকে কিছু জিজ্ঞেসও করেনি আর সেও কাউকে

কিছু বলেনি। কিছুদিন পর নন্দিতা ওর এক বন্ধুর বিয়েতে গেল জামশেদপুরে। বাড়িতে যে মহিলাটি রান্না করতো তাকে রেখে গেল ওর মায়ের কাছে।

মেয়ে চলে যাওয়ার পর নন্দিতার মা সব কথা খুলে বলেন ওই রান্নার মেয়েটির কাছে। যখন নন্দিতা আর ওর দাদা নিলয় ছোট ছিলো, তখন থেকেই নন্দিতা খুব হিংসা করতো ওর দাদাকে। দাদার খেলনা ভেঙে দিতো কথায় কথায় দাদাকে মারতো। নিলয় কিন্তু খুব ভালোবাসতো ছোট বোনকে। মাধ্যমিক দেওয়ার পর নন্দিতা বাজে ছেলেদের সাথে মিশতে শুরু করলো। বারণ করলে শুনতে চাইতো না, বাড়িতে অশান্তি করতো, ড্রাগ নেওয়া শুরু করলো। বাবা শাসন করলে আত্মহত্যার হুমকি দিতো। নিলয় অনেকবার বোনকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু অশ্রাব্য গালিগালাজ করতো নন্দিতা। একদিন রাতে নিলয় ওকে বোঝাবার জন্য ওর ঘরে গেল। কিছুক্ষণ বাদেই ভেতর থেকে ধস্তা ধস্তির আওয়াজ আসতে লাগলো। দরজা বন্ধ ছিলো তাই আমি বাইরে থেকে কিছু করতে পারছিলাম না। এক সময় নন্দিতা বিধ্বস্ত বেশে চিৎকার করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়েই নিজের এক বন্ধুকে ফোন করে আসতে বলে। আর এও বলে যে ওর দাদা ওকে রেপ করার চেষ্টা করছিল। ও থানায় যেতে চায়। নন্দিতার বাবার নাইট ডিউটি ছিলো তাই উনি বাড়িতে ছিলেননা। ওনাকে ফোন করে ডাকা হয়। নিলয় বলে বোনকে বোঝাবার চেষ্টা করছিলাম হঠাৎ ও দরজা বন্ধ করে দিয়ে ওর জামা ছিড়তে আরম্ভ করে, আর আমার জামা প্যান্টও খুলে ফেলতে থাকে। আমি বাধা দিতে গেলে আমাকে আঁচড়ে কামড়ে দেয়। তারপর ঘর থেকে বেরিয়েই বন্ধুকে ডেকে কোথায় যেন চলে যায় ওই বেশেই।

এরপর পুলিশ এসে নিলয়কে ধরে নিয়ে যায়। নন্দিতা কেঁদে কেঁদে বয়ান লিখিয়েছিল থানায়, আমার নিজের দাদা রাতের অন্ধকারে আমার ঘরে ঢুকে আমাকে রেপ করার চেষ্টা করছিলো। কোনোমতে ওর হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে এই বন্ধুকে ফোন করে ডেকে আমি থানায় এসেছি রিপোর্ট করতে। আপনারা আমাকে বাঁচান। ওর কথা মতো পুলিশ বাড়িতে আসে, এবং নিলয়কে ধরে নিয়ে যায়। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে নিলয়কে বেল করাতে পারেন অনাদিবাবু, বাড়ি ফিরে একদম চুপ হয়ে যায় নিলয়। ভয়ঙ্কর অপমানটা সে হজম করতে পারেনা। একদিন সন্ধ্যা বেলা গায়ে আগুন লাগায় সে, ওর গায়ের আগুন নেভাতে গিয়ে আমার দুইহাত পুড়ে যায়। নন্দিতা সব দেখেও নিজের ঘরে বসে পড়তে ব্যস্ত থাকে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষনের মধ্যেই মারা যায় নিলয়। ছেলের এই বীভৎস মৃত্যু দেখে পাগল হয়ে যায় ওর বাবা। নির্বিকার নন্দিতা নিজের পড়াশোনার সাথে নিজের বদ কাজকর্ম

গুলোও চালাতে থাকে। আর আমরা ওকে কিছু বললেই কপালে জোটে মার। ওর একটা চাবুক আছে, প্রায়ই ওই চাবুক দিয়ে আমাদের পেটাত ও। নিজের বাবাকে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখতো, চিকিৎসার নামে যে ওষুধগুলো খাওয়াতো সেই ওষুধ খেয়ে আরো বেশি মাথা খারাপ হয়ে যেতে লাগলো ওর বাবার। যেদিন উনি মারা গেলেন সেদিন অশান্তি করে নিজের বাবাকে দিয়ে সব সম্পত্তি লিখিয়ে নেয় ও তারপর বলে এবার লাথি মেরে তোমাদের দুজনকে তাড়িয়ে দেবো। আমি বাধা দিতে গেলে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় আমায়। আমি অজ্ঞান হয়ে যাই তারপর জ্ঞান আসার পর তো দেখি পুলিশ এসেছে আর আমার স্বামী সিলিং থেকে ঝুলছে! কে জানে উনি নিজে নিজে গলায় দড়ি দিয়েছেন নাকি মেয়েই ওনাকে ঝুলিয়ে দিয়েছে জানিনা! এইসব কথা শুনে কাজের মেয়েটি ফ্ল্যাটের অন্য লোকদের ডেকে এইসব কথা জানায়।

কি ভয়ানক মেয়ে! এই রকম সন্তান থাকার চেয়ে নিঃসন্তান হওয়া ভালো। সবাই মিলে পুলিশের কাছে নন্দিতার মাকে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রমাণের অভাবে নন্দিতাকে অ্যারেস্ট করতে পারেনা পুলিশ। কিন্তু এই ফ্ল্যাটে ঢোকাটা বন্ধ করে দেয়। এরপর যতদিন উনি বেঁচে ছিলেন, ওনার স্বামীর পেনশনের টাকায় ওনার জীবন কেটেছে। কিন্তু ফ্ল্যাটটা বাবাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছিল তাই মায়ের মৃত্যুর পর ওই ফ্ল্যাট নন্দিতা বিক্রি করে দেয়। আর নন্দিতাকে ওই তল্লাটে কোনোদিনও দেখতে পাওয়া যায়নি।

ঘুণপোকা

শুচিস্মিতা চক্রবর্তী

এই চিলেকোঠার একরত্তি ঘরটাই আমার লেখাপড়ার ঘর।অফিস থেকে ফিরে রাতের খাওয়ার আগে পর্যন্ত আমি এই ঘরেই সেঁধিয়ে যাই। ঘরে আসবাব খুবই সামান্য। একটা ছোট্ট চৌকি আর লেখার জন্য একটা টেবিল আর চেয়ার।টেবিলের কোণা করেই একটা মাটির কলসিতে জল রাখা থাকে।তেষ্টা পেলে নিজেই নিয়ে নিই।লেখার সময় লোকজনের আনাগোনা হলে মনোযোগ দিতে খুব অসুবিধা হয়।টেবিলের পিছনে একপাল্লার একটা জানালা।ওটা দক্ষিণের জানালা।তাই ঘরের আবহাওয়া বেশ মনোরম। লিখতে লিখতে ক্লান্তি এলে অবশ্য রমাকে বললেই এক কাপ গরম চা এসে যায়। তার জন্যও একটা অভিনব ব্যাবস্থা আছে। ছোট্ট একটা কলিংবেল নীচে রান্নাঘরের সাথে কানেক্ট করা। একবার বাজালেই চা হাজির।

আমার বেশি লোকজন একদম পছন্দ নয়। রমা সকলের সাথে মিশতে পছন্দ করলেও আমার বারণ শুনে এখন আর এর ওর সঙ্গে বেশি গল্প করেনা। দুধওয়ালা, পেপারওয়ালা,ধোপা সবাই আমি থাকতে থাকতেই আসে।নচেৎ রমাকে দরজা খুলতে মানা করে দিয়েছি।পাড়ার সকলেরই আমাদের প্রতি যেন একটা চাপা কৌতুহল। আমার এ সবে বড় বিরক্ত লাগে।

আজকেও একটু আগেই রমা এককাপ গরম চা দিয়ে গেছে।জানলাটা দিয়ে বাইরে নারকেল গাছটা দেখছি আর কাপে চুমুক দিচ্ছি।মনে মনে ভাবছি কতদিনের পুরোনো এই গাছ।কারোর কোনোরকম যত্ন ছাড়াই একভাবে বছরের পর বছর হাওয়া-বাতাস দিয়ে চলেছে।কারোর প্রতি কোনো অভিযোগ নেই।আমরা মানুষেরাই শুধু প্রতিনিয়ত দেনা-পাওনার হিসেব কষে হিংসা দ্বেষ আর ঋণের বোঝা বাড়িয়ে চলেছি।একদৃষ্টে বাইরে তাকিয়ে আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে হঠাৎ যেন মনে হল নারকেল গাছটার পাতাগুলোর ফাঁকে সাদা মতন কি যেন নড়ে উঠল। কই, বিকেলে অফিস থেকে ফিরে তো গাছে কিছু দেখিনি! ছেলেপিলেরা ঘুড়ি ওড়ালে অনেক সময় গাছে তা আটকে যায়।কিন্তু তেমন হলে তো বিকেলেই দেখতাম।উঠে দেখতে গিয়ে কাপের চা ছলকে

খানিকটা টেবিলের উপর পড়ল।যাঃ বইপত্তর, লেখা কাগজগুলো সব ভিজে যাবে যে! তাড়াতাড়ি উঠে একটা ছেঁড়ামতন কাপড় দিয়ে জায়গাটা মুছে দিলাম। আমারই সাদা একটা পুরোনো ফতুয়ার টুকরো। ঘরের এককোণেই পড়ে থাকে।বহুবার মোছামুছি করে সাদা রঙ ধূসর বর্ণ ধারণ করেছে।কিন্তু আজ টেবিলটা মোছার পরেই মনে হল কাপড়টায় কেমন যেন লাল লাল ছোপ। চায়ের রঙ তো এতটা লাল নয়। মনের মধ্যে একটা চোরা অস্বস্তি হতে লাগল। ছুঁড়ে ফেলে দিলাম কাপড়ের টুকরোটা।জানলাটার সামনে গিয়ে খানিক সন্দেহ নিয়ে আবার তাকালাম বাইরের গাছটার দিকে।এবার যেন মনে হল নীচের দিক থেকে অতি দ্রুত কেউ গাছটার গা বেয়ে উপরে উঠে এল।আমি কেমন হকচকিয়ে গেলাম। এত রাতে এমন আবার হয় নাকি? কে উঠবে ঐ গাছ বেয়ে? তার উপর সাদা নাইটি পরা কোনো মহিলা বলেই তো মনে হল!

নারকেল গাছের পাতাগুলো খুব জোরে জোরে নড়তে আরম্ভ করল। মনে হল যেন ঝড়ের দাপটে পাতাগুলো এক্ষুনি খসে পড়বে। কিন্তু বাইরে কোনো হাওয়াও দিচ্ছে না।শুধু পাতাগুলোই যেন অদ্ভুতভাবে নড়ে চলেছে। আমার হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে আসার জোগাড়। আমি দ্রুত কলিংবেলটা টিপতে আরম্ভ করলাম। আমাদের রান্নাঘরের ঠিক পাশেই পাঁচিলের গায়েই তো গাছটা। এইসময় রমার তো রান্নাঘরেই থাকার কথা। ও কি কিছু দেখেছে? ওর কিছু বিপদ হোলো না তো? ভাবতেই আমার গলা শুকিয়ে এল। নিষিদ্ধের প্রতি অমোঘ আকর্ষণই মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। না চাইতেও আবার বাইরে চোখ চলে গেল। এবার স্পষ্ট দেখলাম চোখদুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসা এক নারীর অবয়ব। কপালের কাছটা রক্তে মাখমাখি। গাছ থেকে লম্বা দুটো হাত বাড়িয়ে যেন জানলার গরাদগুলো ধরতে চাইছে। মুখের আদলটা খুবই পরিচিত। এমনকি পরণের নাইটিটাও।

বেশ গাছপালা দিয়ে ঘেরা পুরোনো আদলের বাড়ি আমাদের। আম, জাম, পেয়ারা, বেল তো আছেই, দুটো সবেদা, লিচু আর একটা কাঁঠাল গাছও আছে। আর ঐ নারকেল গাছটা। তবে আজ পর্যন্ত একটা কচি ডাবও ধরেনি তাতে। সবাই বলে ওটাতে ঘুণ লেগেছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বহুবার কাটব কাটব মনস্থ করেও গাছটা কাটা আর হয়ে ওঠেনি। রমা সারাদিন এই ফল আর ফুলের বাগান নিয়েই ব্যস্ত থাকে। আর কিই বা করার আছে! বিয়ের দশবছর হতে চলল, রমার কোল শূন্য। গাছপালা ঘেরা আলোআঁধারি বাড়ির মত দুজনের মনেই তাই আঁধার ঘনিয়ে থাকে। এখন আর নিয়ম করে কাছে আসাও হয়না। আমাদের সম্পর্কেও ঘুণ লেগেছে।

অফিস থেকে ফিরে চিলেকোঠার ঘরটাই আমার লুকোনোর জায়গা। লেখার মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত রাখি নিজের ব্যর্থতা লুকোতে। কারণ একজন ডাক্তারও রমার কোনো ত্রুটি বের করতে পারেনি। দোষ আমার মধ্যে। কিন্তু কাগজপত্র আমি সমস্ত লুকিয়ে রেখেছি। ঘুণাক্ষরেও রমাকে কিছু জানতে দিইনি। আমার পুরুষত্বের দাগ বাঁচিয়ে রমাকে বারংবার আঘাত করেছি। বাগানের ঐ বাঁজা নারকেল গাছটার সঙ্গে অহরহ তুলনা করে গেছি। ওর নারীসত্ত্বাকে আঘাত করে করে নিজের অপূর্ণতা ঢাকার চেষ্টা করেছি। কিন্তু যত্ন, সার আর বহুল কর্ষণে বন্ধ্যা জমিতেও মাঝে মাঝে সোনা ফলে আর এ যে উর্বর উপোসী জমি। নিজের উপর এক অদ্ভুত আক্রোশে রমাকে গৃহবন্দি করেছি। বাইরের পরিবেশ, লোকজনের সাহচর্য থেকে বিচ্ছিন্ন করেছি। আমি যত দূরে চলে যেতে চেয়েছি, রমা ততই আমায় আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে। নিষ্ফল প্রচেষ্টা জেনেও মোহময়ী রূপে রাতের পর রাত নিজেকে আমার কাছে উজাড় করে দিয়েছে। বিকেলে অফিস থেকে ফিরতেই রমা লাজুক মুখে খবরটা দিয়েছিল। সাথে সাথেই 'কড়-কড়-কড়াৎ' করে ভয়ঙ্কর বাজ পড়েছিল কাছে পিঠেই।

"এবার বোধ হয় ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন"।

"কি প্রসঙ্গে বলছ রমা?"

"আমি এবারের পিরিয়ড মিস করেছি। বাড়িতে টেস্টও করেছিলাম আজ সকালে, পজিটিভ"।

তখনই মনে হল বাড়ির ছাদ ভেঙে বাজটা পড়ল। ঠিক সময়ে কারেন্টটাও গেল। মাথার আগুন চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসার আগে ছদ্ম খুশি দেখাব না সত্যিটা বলে সত্য জানতে চাইব সেটাই ঠিক করতে পারছিলাম না। এতকিছুর পরেও কি করে সম্ভব! সন্দেহের থেকে ক্ষতিকর ঘুণপোকা বোধ হয় আর কিছু হয়না। সমস্ত বিশ্বচরাচর যেন আঁধারে ডুবে যাচ্ছে তবু রমার আলো আলো মুখটা যেন হাজার ঝাড়বাতি জ্বেলে আমার চোখদুটো অন্ধ করে দিচ্ছে। রান্নাঘর থেকে দার্জিলিং চায়ের হালকা সুবাসে আমার ঝিম ধরা স্নায়ু চঞ্চল হয়ে উঠল। রমা মোমবাতি জ্বালিয়ে গ্যাসের দিকে ফিরে একটা খুব প্রিয় গানের কলি গুনগুনিয়ে চলেছে- "আজ ফির জি নে কী তমন্না হ্যায়/আজ ফির মরনে কা ইরাদা হ্যায়..."

অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে রান্নাঘরের দিকে এগোতে থাকলাম। রমা বোধ হয় মোমবাতি জ্বালানোর চেষ্টা করছে। হঠাৎ দরজায় লাগানোর মোটা কাঠটাই হাতে লাগল। ওটাই শক্ত করে ধরে নিঃশব্দে রমার পেছনে এসে

দাঁড়িয়ে রইলাম।রমা বোধ হয় আমার নিঃশ্বাসের শব্দও চেনে। "তুমি আবার অন্ধকারে আসতে গেলে কেন?আমিই তো চা নিয়ে আসছিলা..."

নাঃ,কথাটা শেষ করা হলনা। তার আগেই কোঁত করে একটা আওয়াজ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। চারিদিক আলোয় আলোময় হয়ে ঝলমল করে কারেন্ট চলে এল। রান্নাঘরের সাদা মার্বেলের মেঝে আর রমার সাদা নাইটি লালে লাল। কপালের কাছটা ফেটে দুভাগ। জানলার বাইরে বাঁজা নারকেল গাছটার গুঁড়িটা চোখে পড়ছে একমাত্র।ওপাশটা বেশ নিরিবিলি। গোড়ার মাটিটা খুঁড়তে বেশ খানিকটা সময় লেগে গেল। চিলেকোঠার ঘরটাতে আসতেও বেশ রাত হল। আজ আর লেখা আসছেনা। টেবিলের উপর মাথাটা রেখে এলিয়ে পড়লাম। তন্দ্রা ভাঙল রমার ডাকে।

-"কি গো চা টা না খেয়েই চলে এলে? এইখানে রেখে গেলাম..."

কেমন যেন ঘোরের মধ্যে চায়ের কাপে চুমুক দিলাম। প্রাণটা জুড়িয়ে গেল। এতক্ষণের ঘটনাগুলো স্বপ্নে দেখলাম না সত্যি, মনেই করতে পারলাম না। তখনই ঐ নারকেল গাছে সাদা নাইটি পরা আহত মহিলার অবয়ব দেখতে পেলাম। শিরদাঁড়া বেয়ে ঠান্ডা একটা শিরশিরে অনুভূতি শরীরের নীচ থেকে উপরে উঠে আসছে। আমার প্রচন্ড শীত করতে লাগল। ঘরের তাপমাত্রা হঠাৎ করে নেমে গিয়ে মনে হল হিমাঙ্কের নীচে চলে এসেছে। কাঁপা কাঁপা পায়ে সিঁড়ি বেয়ে আবার নীচের ঘরে নেমে এলাম।

ধীরে ধীরে নীচে গিয়ে রান্নাঘরে ঢুঁ মারতেই দেখি একটা রক্তমাখা সাদা নাইটি পরে রমা কি সব করে চলেছে। টুং টাং চুড়ির আওয়াজের সাথে চায়ের মিষ্টি গন্ধটা নাকে এল। এখনও চায়ের গন্ধ? চা তো খাওয়া হয়ে গেল! গলা শুকিয়ে গিয়ে একটা ক্ষীণ আওয়াজ বেরোলো "রমা..."। চকিতে রমা পেছন ফিরতেই ওর ফেটে চৌচির হয়ে রক্তে ভেসে যাওয়া মাথা দেখে হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে এল। আমি ধপ করে মাটিতে পড়ে গেলাম। রক্তমাখা সেই সাদা নাইটিটা তখন ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছে। রমা এক পা এক পা করে আমার দিকে এগোতে শুরু করল। আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। আমি কোনোরকমে পড়িমরি করে উঠে আবার চিলেকোঠার ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে চেয়ারে গুটিসুটি মেরে বসে পড়লাম।

মনে মনে ঠিক করলাম, 'যাই হয়ে যাক, কিছুতেই দরজা খুলব না'। টেবিলের নীচের লুকোনো ড্রয়ার থেকে পুরোনো সব রিপোর্ট গুলো টান মেরে মেরে বের করতে থাকলাম। পুরো ঘরের মেঝে সাদা কাগজের ছড়াছড়ি। সমস্ত

রিপোর্টগুলো যেন দাঁত বার করে আমার দিকে তাকিয়েই ক্ষিক্ ক্ষিক্ করে হাসছে। আমার পুরুষ হওয়া বৃথা। রমা জিতে গেল। ওর নারীত্ব ও ঠিক প্রমাণ করে দিল। কিন্তু কিভাবে? কার ঔরসে? রমা এতটা নীচে নামতে পারল? শুধুমাত্র এই জন্যই তো বাইরের জগত থেকে রমাকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা। তখনই দরজার বাইরে থেকে কান্নার আওয়াজ ভেসে এল।-"কেন ভুল বুঝলে সমরেশ? একবার জিজ্ঞেস করলে না পর্যন্ত? এতটা অবিশ্বাস!"

ঘুণ, ঘুণ! আমার স্বাভাবিক ভদ্রতাবোধ পর্যন্ত ঘুণপোকায় শেষ করে দিয়েছে। বিচ্ছিরি ভাবে মুখ বেঁকিয়ে রমাকে বললাম-"কি জিজ্ঞেস করব শুনি? কখন, কার সঙ্গে ঠিক কিভাবে ফস্টিনষ্টি করে তুমি 'মা' হচ্ছ? ছিঃ!"

"ভুল ভাবছ সমরেশ। আমি এতটা নীচে নামব কিকরে ভাবলে? তোমার টেবিল গোছাতে এসে একদিন তোমার রিপোর্টগুলো যে আমি দেখেছিলাম। তাই লুকিয়ে ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করেছিলাম। ওনার পরামর্শেই প্রতিদিন গরম চায়ের সাথে তোমায় ওষুধ মিশিয়ে দিতাম। এতদিনে ফল পেয়েছিলাম গো... আর তুমি ভুল বুঝে, সন্দেহের বশে সব শেষ করে দিলে?"

-"মিথ্যে কথা। আমি একটুও বিশ্বাস করি না তোমায়। চলে যাও এখান থেকে। দূর হও"

-"কোত্থাও যাব না আমি সমরেশ,অনেক হয়েছে। সব অন্যায়ের হিসেব নেব আমি। নিজের অক্ষমতা ঢাকতে আমার উপর দিনের পর দিন অত্যাচার করে গেছ। অকারণ সন্দেহ করে আমাকে বাইরের জগত থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছ। তুমি একটা মানসিক রুগী সমরেশ..."

এবার আর কান্না নয়। খ্যাসখ্যাসে গলায় রমা দরজা ভেদ করে চিলেকোঠার ঘরের একদম মধ্যিখানে চলে এল। আমি চেয়ারের হাতল জাপটে ধরে বসে রইলাম। এতটুকু নড়ার শক্তিও বোধ হয় হারিয়ে ফেলেছি। রমা ধীরে ধীরে আমার টেবিলের কাছে এগিয়ে এসে আমার সন্তানসম সমস্ত লেখা, সৃষ্টি ছিঁড়ে ছিঁড়ে গোগ্রাসে গিলতে আরম্ভ করল। ওর ঠোঁটের দুই কষ বেয়ে কাঁচা রক্ত গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে। জ্বলন্ত দুই চোখ দিয়ে আমায় যেন ভস্মীভূত করে দিতে চাইছে। অতি ভয়ঙ্কর সেই দৃশ্য। কিন্তু প্রবল প্রতিহিংসার বশেও রমা আমার কোনো ক্ষতি করল না। শুধুমাত্র ওর না হওয়া সন্তানের জীবনের বিনিময়ে আমার সন্তানসম লেখাগুলোকে ও চিরনিদ্রায় শায়িত করে দিল। রমার ঐ বীভৎস রূপ আমি বেশিক্ষণ সহ্য করতে না পেরে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লাম। সেই অবস্থাতেই মাথার ভেতর কেমন যেন উথাল পাথাল হতে

থাকল। অতীত,বর্তমান, ভবিষ্যৎ সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। লেখা হয়ত চিরতরে আমার জীবন থেকে হারিয়েই গেল। আমি ধী-শক্তি হারালাম।

নারকেল গাছটার ফাঁক দিয়ে ভোরের নরম ভিজে রোদ্দুর আমার টেবিলের উপর এসে আমাকেও ভিজিয়ে দিতে লাগল। আমার জ্ঞান ফিরল। ধীরে ধীরে চোখ মেলে চাইলাম গাছটার দিকে। আশ্চর্য! এতদিন যে গাছ বাঁজা বদনাম বয়ে এসেছে, আজ তারই অজস্র পাতার ফাঁক দিয়ে একগুচ্ছ নারকেলের মঞ্জুরি চোখে পড়ল। মনে হল রমা তার জীবনরস দিয়ে গাছটার বাঁজা বদনাম ঘুচিয়ে দিয়ে গেল। ও যে ঐ গাছের নীচেই চিরনিদ্রায় শায়িত। আর আমি উঠে ধীরে ধীরে পুলিশ স্টেশনের দিকে পা বাড়ালাম।

পারাপার

সুলেখা তরয়াল

To the earth and those who lie beneath
To the paths we are about to walk
and to those who tread them before us
To the homes we will enter and
to whom they once housed
To this city and its echoes
Know we come in blessing and we wish you only peace

ইনভেস্টিগেশনের পূর্বে এবং পরে রিচুয়াল থাকে। সাথে ওনাদের পারমিশন নেওয়াটাও প্রয়োজন। যেহেতু এটা প্রাইভেট প্রপার্টি, সম্পত্তির মালিকের পারমিশনও নিয়েছি, সাথে স্থানীয় প্রশাসনেরও। তাই আজ কয়েকজন সিভিক ভলেন্টিয়ারও পাহারায় রয়েছে।

এখন ঘড়িতে এগারোটা বেজে সতের; টেম্পারেচার রিডিং কম ছাড়া নাইট ভিশন ক্যামেরায় এমন কোনো ভিডিও বা ইমেজ আসেনি। কে টু তেও কোনো ই এম এফ অস্তিত্ব সেন্স করেনি যাতে এই প্লেসকে হন্টেড বিবেচনা করা যেতে পারে। দিনের আলোতে একবার ঘুরে দেখে গিয়েছি তখন নেগেটিভ এনার্জির অস্তিত্ব অনুভব করেছি। যে জায়গাটায় আমরা ইনভেস্টিগেশন চালাব তার আসেপাশের এলাকাটা একটু দেখে নিচ্ছি। মূল জায়গায় গেলে তখন রেজাল্ট কি হবে জানিনা। অনেক সময়ই লোক মুখে শোনা বা নিউজ পেপারে আসা হন্টেড প্লেসে গিয়েও কোনো সন্তোষজনক ফল পাইনি।

"আমরা যাদের সাথে যোগাযোগ করতে এসেছি তারা আমাদের সাথে কমিউনিকেট করতে নাও চাইতে পারেন। তাদের বাসস্থানে আমাদের উপস্থিতি তারা কিভাবে নেবে এটা তাদের উপর ডিপেন্ড করে। আমাদের উচিত তাদের ইচ্ছেকে সম্মান করা।"

আমার পুরো টিমের সাথে আর তিনজন আছে; আমার ডিরেক্টর বন্ধু রজত, ওর ক্যামেরাম্যান আর ওর অ্যাসিস্ট্যান্ট। পুরো প্রসেসটা আমাদের সাথে ওরাও রেকর্ড করতে চায়। রজতাভ, ওকে কলেজে রজত বলেই ডাকতাম সবাই, একজন নামি ফিল্ম ডিরেক্টর। সপ্তাহখানেক আগে রজতের ফোন পাই, "ফ্রি থাকলে স্টুডিওতে একবার আসতে পারবি ?" দুজনেই কলকাতায় থাকার সুবাদে যোগাযোগটা আছে, যদিও ও ভীষণ ব্যস্ত থাকে তবুও বছরে এক দুবার মিট হয়েই যায়।

"বাবু, তেরে অঙ্গনা মে হমারা ক্যায়া কাম হ্যায়!"

"আছে। কখন আসতে পারবি বল। এখানে আমাকে অনেক্ষণ থাকতে হবে।"

ও যখন ডেকেছে কোনো ইম্পর্ট্যান্ট ব্যাপার ঘটে থাকবে বুঝেই বললাম, "জ্যামে আটকে না পড়লে কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে যাব স্যার!" ফোনটা রেখেই বেরোবো, পার্সেলটা হাতে পেয়ে থমাসকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মেসেজ পাঠালাম। পালো স্যান্টো ওই পাঠায়। মেসেজ করেই টু হুইলারটাই নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

ওরা একটা ফিল্মের অ্যাকশন সিনের ওপর কাজ করছিল। যেতেই ওর পাশের চেয়ারটা ছেড়ে দিল একজন। কোনো কথা হওয়ার আগেই ও একটা স্ক্রিন শট জুম করে দেখালো।

"হরর ফিল্ম?"

"না! এই ফিল্মের প্রায় পুরোটা শ্যুট হয়েছে প্রয়াগ ফিল্ম সিটি আর চন্দ্রকোনার আসেপাশের এলাকায়। এই শ্যুটটার জন্য আমরা জঙ্গলকন্যা ব্রিজ এবং তার পাশের শালের জঙ্গলকে বেছে নিয়েছিলাম। একটা পার্ট আছে যেখানে হিরো হিরোইন গুন্ডাদের থেকে বাঁচতে ওই জঙ্গলে রাত কাটাতে বাধ্য হবে।"

"আচ্ছা! দেন ?"

"রাতে শ্যুট ভালোভাবেই হয়। শুধু কয়েকজন গ্রুপ মেম্বার এবং আমাদের হিরোইন বলছিল জায়গায়টায় ওদের নাকি অস্বস্তি হচ্ছিল, ভয় করছিল। আজ যখন এই পোরশনটা নিয়ে বসি তখন একটা দৃশ্যে অস্পষ্ট ছায়া মতো কিছুর মুভমেন্ট লক্ষ্য করি।"

একজনকে ইশারায় বলল,"চালাও।" ওই অংশে সত্যিই কিছুর মুভমেন্ট আমিও লক্ষ্য করলাম।

"ওই পোরশন টা!"

"এখানে অডিওটা শোন।"

নায়িকার ডায়লগের সাথে সাথে দ্বিতীয় কারও অস্পষ্ট আওয়াজ। বললাম,

"দেখলাম, শুনলাম ও। তুই কি চাইছিস ওখানে গিয়ে ইনভেস্টিগেট করি!"

"শুধু তাই না আমিও সঙ্গে যেতে চাই।"

প্যারানর্ম্যাল অ্যাক্টিভিটির ওপর রিসার্চ করছি। আগে মিস্টার কে বক্সিকে অ্যাসিস্ট করতাম এখন একাই করি। হন্টেড প্লেসগুলোতে ইনভেস্টিগেট করি, ব্লগ বানাই; বেশ কিছু ব্লগ ইউটিউবে খুব পপুলার হয়েছে। বিশেষ করে যেটাতে আমি আমার গুরুর সাথে কমিউনিকেট করেছিলাম। "উনি একটাই কথা বলেছিলেন,' ব্লেস ইউ'।" ওনার আশীর্বাদ আমার সাথেই আছেন। ভেবে দেখলাম এই জায়গায় টায় ইনভেস্টিগেট করলে দুজনেরই লাভ। আমার ব্লগের ভিউয়ার বাড়বে আর ওর মুভিটাও বেশ পাবলিসিটি পাবে।

আমরা চারটি দলে ভাগ হয়ে কাজটা করছি। ঘটনাটা যেখানে ঘটেছিল তার কাছাকাছি আসতেই টেম্পারেচার রিডিং হঠাৎ করে ছয় ঘর নেমে গেল। জঙ্গলের অন্য অংশ থেকে এই অংশটা আলাদা করা কঠিন। যদি না সপ্তাহ খানেক আগে এখানে শুটিং হতো। তবুও প্রকৃতি নিজেই শহুরে শাসনের ছাপ ঢাকতে ছড়িয়ে দিয়েছে কিছু মৃত পাতা আর কিছু সবুজ লতা।

প্রায় ঘন্টা দুয়েক হবে জঙ্গলে ঢুকেছি। ওর স্ক্রিনে দেখা জায়গাটায় আসতে কে টু তে সেন্সর কাজ করল।

"আপনি বা আপনারা যদি এখানে থেকে থাকেন দয়াকরে আমার এই যন্ত্রে তিনবার আলো জ্বেলে আপনাদের অস্বস্তি জানান দিন।" আমার বন্ধু একদৃষ্টি লাইটের দিকে তাকিয়ে। "লাইট তো জ্বলল না।"

"আমি আপনার বা আপনাদের সাথে কথা বলতে চাই। যদি আপনারা কেউ থেকে থাকেন দয়াকরে করে আমার এই যন্ত্রে তিনবার আলো জ্বালুন। চেষ্টা করে দেখুন আপনি নিশ্চয়ই পারবেন।"

অনেক সময় ওনাদের কাছে আমাদের ব্যাবহৃত ইন্সট্রুমেন্ট নতুন লাগে। কিংবা অনেকে নিজেদের অস্তিত্ব গোপন রাখার জন্য কোনো রকম ইঙ্গিত দেন না। কিছু সময় পর ইএম এফ সেন্সর তিনবার বিপ করল।

"আপনারা কতো জন আছেন? একজন হলে পাঁচবার আলো জ্বালুন একের বেশি হলে দু বার আলো জ্বালুন।" বেশ কিছুক্ষণ পর দ্বিতীয়বার অনুরোধে দুটো আলো জ্বলল। সাথে ভয়েস রেকর্ডারে অস্পষ্ট আওয়াজ। ততক্ষণে আমার গ্রুপের মেম্বারের একটা দল এগিয়ে এসে একটা ছবি দেখাল তাতে ওর হেডল্যাম্পের আলোয় তিনটে ছায়া মূর্তির মুভমেন্ট লক্ষ্য করলাম। বার বার

রিপ্লে করে দেখলাম, ভুল না।

"আপনাদের সাথে কথা বলতে চাই, যে কেউ আপনাদের মধ্যে কথা বলতে ইচ্ছুক? তিনবার আলো জ্বেলে জানান।"

"সাথে সাথেই তিনটে আলো জ্বলতে লাগল।"

"আমার প্রশ্নের উত্তর তিনবার লাইট জ্বলে দিন।" কথাটা বার বার রিপিট করলাম।

"আপনি মহিলা, পুরুষ, না শিশু?" প্রতিটা প্রশ্ন বার বার রিপিট করেছি এবং দুটো পৃথক প্রশ্নের মাঝে বেশ কিছু সময় উত্তরের অপেক্ষা করেছি। উত্তরে বুঝলাম শিশু। প্রতিটা উত্তরে আলো জ্বালার সাথে সাথে অস্পষ্ট আওয়াজ ও ভয়েস রেকর্ডারে রেকর্ড হতে লাগল। আমাদের কনভারশেশন চলাকালীন একটা কান্ড ঘটল। রজতের ক্যামেরাম্যান উঁই মাটিতে পা লেগে ক্যামেরাসহ উল্টে পড়ল। সাথে সাথে কে টু তে আলো এলোমেলো ভাবে জ্বলতে লাগল। গম্ভীর অস্পষ্ট আওয়াজ, যেন কেউ আদেশ দিতে থাকল। বুঝি এ আদেশের মানে, 'চলে যাও এখান থেকে'। খুব সামনে একটা বড় মরা ডাল উত্তর থেকে উড়ে রজতের পয়ের উপর পড়ল। ওর পায়ে গভীর চোট সৃষ্টি করল। এই অবস্থায় বিচলিত হলে চলবে না, খুব শান্ত গলায় ওনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে, স্যারের শেখান পদ্ধতি অনুসরণ করে বিদায় নিলাম। গ্রামীণ হসপিটালে রজতের পায়ের চিকিৎসা করে হোটেলে ফিরলাম।

সবাই আমার রুমে। ফিরে যা রিচুয়াল করতে হয়, করলাম; এ আমার গুরুর শেখানো। রজতকে ঘুমের ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে ওর রুমে ওর দুজন মেম্বার থাকবে। ফিরেছি তখন ভোর সাড়ে চারটে। আমার মন বড়োই অস্থির যা ঘটলো তা ঠিক না। আমার রুমে আজ আমি একা নই জানি। আমি সিগারেট ধরিয়ে ল্যাপটপে ক্যামেরার ছবিগুলো দেখতে লাগলাম। দুটো ক্যামেরায় তিনশো বাহান্নটি ছবি। ভিডিও, অডিও সকালে দেখব। ঘুম আমার আসবে না আজ। রোহিতের ক্যামেরার যে ছবিতে অস্পষ্ট ছায়া ছিল তা আর খুঁজে পেলাম না।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানিনা। দরজায় রোহিত, "ম্যাডাম, দরজাটা খুলুন।" দরজা খুলতেই, "রজতাভ বাবুকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না।"

"কি বলছো !"

রোহিত আর রজতের অ্যাসিস্ট্যান্টকে নিয়ে সোজা জঙ্গলে গেলাম। রজত

অচৈতন্য। ওকে তুলে নিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম। ওকে আমার রুমে নিয়ে এলাম। জ্ঞান ফিরতে, আমাকে ছাড়া কাউকে চিনলো না। রোহিতকে ভিডিও ক্যামেরা অন করতে বললাম। থার্মাল সেন্সরে আমার রুমের টেম্পারেচার অন্যগুলোর তুলনায় দু ডিগ্রি কম।

"আপনি বিছানাতেই বসতে পারেন কিংবা এই খালি চেয়ারটাতেও।"

ওনাদের সাথে যখন কথাবলি আমার গলার আওয়াজ যতটা পারি সফট রাখি। ও ঘাবড়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে চেয়ারে এসে বসল।

"কাল আপনাদের বাসস্থানে গিয়ে যা ঘটেছিল তার জন্য ক্ষমা চাইছি। আপনারা আমাদের ক্ষমা করবেন।"

রজত কখনো শিশুর মতো দুষ্টু হাসি হাসছে, কখনো ঘাবড়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। বুঝলাম একা নন।

"আপনারা কি কিছু বলতে চান?" কয়েক বার প্রশ্ন করে ওনাদের আশ্বস্ত করলাম।

"ওরা শোনেনি কোনো কথা। তুমি খুব ভালো।" দুটো বাক্য এমনভাবে উচ্চারণ করল যেন দুজন আলাদা ব্যক্তি।

"কারা কথা শোনেনি।"

"ওরা আমাদের বেঁধে পাথর ছুঁড়ল। আগুন লাগিয়ে দিল।"

"সত্যিই দুঃখজনক ঘটনা। জেনে কষ্ট পেলাম। রজতকে ছেড়ে দাও। কথা দিচ্ছি আমাদের কেউই আপনাদের শান্তি ভঙ্গ করবে না।"

কিন্তু সারা দিন কেটে গেলেও রজত যেমন ছিল তেমন থেকে গেল। ওর অ্যাসিস্ট্যান্ট রোহিতকে বলল, "শুনুন আমার মনে হয় স্যারকে একবার ডাক্তার দেখানো উচিত। আমাদের কলকাতা ফিরে যাওয়াই ভালো।"

"আমি রজতকে নিয়ে ঘন্টাখানেক একা এই রুমে থাকতে চাই। রোহিত প্লিজ ক্যামেরা অফ করো আর সবাইকে নিয়ে বাইরে যাও।"

"ওকে! রুমেই আছি। ফোন করলেই আসব।"

রোহিত, ছেলেটা ভীষণ ভালো। খুব কেয়ারিং। তবু ওর সাথেই কেন যে এমন হল। শুধু এই কাজের জন্য তিয়াসা ওকে ডিভোর্স দিল।

"আপনাকে আমার ভীষণ প্রয়োজন। আমি জানি আমার প্রতিটা কাজে আপনি সঙ্গে থাকেন! এবার কেন আপনার আশীর্বাদ পেলাম না!"

কোনো ডিভাইস অন রাখিনি। প্রয়োজন নেই। ওনার উপস্থিতি আমি কোনো ডিভাইস ছাড়াই ফিল করতে পারি। ইউটিউবে আমার পেজের মিলিয়ান ভিউয়ার্স আছে। ওনাদের অনেকের ইচ্ছে ছিল স্যারের সাথে আমি কমিউনিকেট করি। স্যারের এটা পছন্দ হয়নি, এভাবে ওনাকে নিয়ে ব্লগ বানানো। যদিও ওই ব্লগে স্যারের আত্মার অস্তিত্ব রেকর্ড করতে পারিনি।

"আমার যতটুকু শিক্ষা আপনার কাছেই, আমি এখনো ভুল করি। আমার ইনভেস্টিগেশন অভিজ্ঞতা বাড়ানো বা অন্যের উপকারের চেয়ে বেশি ফেমাস হবার জন্য ছিল। শপথ করছি উপকার আর শিক্ষা ছিড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য আমার থাকবে না।"

রুম টেম্পারেচার অনেকটাই কম। আমার শীত করছে। সামনে পাথরের মতো বসে রজত। কে টু হঠাৎ ব্লিংক করতে লাগল। ভয়েস রেকর্ডারে দুটো অস্পষ্ট শব্দ "ব্লেসিং ইউ"!

সে রাতে যা যা রেকর্ড হয়েছিল। ছবি, ভিডিও কোনো কিছুতেই কোনো নেগেটিভ এনার্জির প্রমাণ দেয় না। ভয়েস রেকর্ডারে শুধু আমার ভয়েস ছাড়া আর কোনো আওয়াজ নেই। অথচ জঙ্গলে রিপ্লে করে বার বার শুনেছিলাম।

নয়াগ্রামের ওই গেস্ট হাউসে আরো কিছুদিন কাটিয়েছি আমরা। ওখানের প্রাকৃতিক পরিবেশ বাধ্য করেছিল ওখানে থাকতে। জঙ্গলকন্যা ব্রিজ হবার পর ওখানে যাতায়াত অনেক সহজ হয়েছে। ট্যুরিস্ট টানতে ঢেলে সাজিয়েছে প্রশাসন; ইকো পার্ক হয়েছে; রাজাবাঁধ, কালুয়াষাঁড়, পাথরা ঘুরে ঘুরে দেখেছি।

রজতরা থাকেনি, ফিরে এসেছিল। ফোন করে প্রায়ই। আমদের কলকাতা ফেরার কয়েকদিন পর বলা নেই কওয়া নেই রজত দেখা করতে এলো।

"জানতাম, তোকে পাব। তুই তো নিশাচর, দিনে কোঠরেই থাকবি।"

"আয়! বলে ঘরে নিয়ে গেছি।"

মাকে বলেই রেখেছিলাম ও আসতে পারে। মা আর জিজ্ঞাসা করে না কি করে জানলাম।

"বলতো, সেদিন আমার সাথে ঠিক কি হয়েছিল আর কেন?"

"ভুত চেপেছিল!" বলেই হেসে উঠলাম।

"আসলে রাতের ঘটনাগুলোতে তোর মন দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সব কিছু সাইকোলজিকাল ব্যাপার। তোকে ভালো সাইকলজিস্ট রেফার করলাম, উনি তো বুঝিয়ে বলেছেন আর কি শুনবি!"

"ওখানে সত্যিই আত্মা ছিল তাই না।"

"ওখানে যে কটাদিন ছিলাম খোঁজ নিয়ে এক অতি বৃদ্ধের কাছে জেনেছি একটা পরিবারকে ডাইনি সন্দেহে অনেক বছর আগে পুড়িয়ে মেরে ফেলা হয়েছিল। হতে পারে ওটা তাদেরই আবাসস্থল।"

"তার মানে আমার মধ্যে ..."

"ওঁরা আর আমরা দুই ভিন্ন দুনিয়ার বাসিন্দা। আমাদের মধ্যে এক অদৃশ্য কিন্তু উপেক্ষা করা যায় না এমন ব্যবধান রয়েছে। তোদের ঘরে ওদের প্রেজেন্স যেমন তোদের পছন্দ না তেমনি ওনাদেরও। ওনাদের অস্তিত্বকে সম্মান দেয়া উচিত!"

"ডেফিনেটলি!"

"মনে হচ্ছে একটা ভালো বাংলা সিনেমা খুব শীঘ্রই রিলিজ হবে যেটা বানাতে গিয়ে ডিরেক্টর, প্রডিউসর মুনাফা দেখবে না!"

"তুই সিনেমায় কাজ করবি!"

"টলিউডে অনেক অভিনেত্রী আছে ওই সিনেমার চরিত্রে মানানসই হবে।"

"এই ব্রেসলেটটা নে পরে থাকিস খারাপ নজর পড়বে না আর, এই নে 'পালো সান্টো' জঙ্গল মহলে যাওয়ার আগে অর্ডার করেছিলাম। এখন এসবের আর প্রয়োজন নেই।"

আমি শিখেগেছি আত্মার সাথে আত্মীয়তা!

সে ফিরে এসেছে

ইয়াসমিনা পারভীন

গ্লাসের তলানিতে পড়ে থাকা অবশিষ্ট সোনালী তরল টা এক চুমুকে গলস্হ করে প্লেটের অঙ্কুরিত মুগের চাট থেকে একচামচ মুখে ফেলে তড়িঘড়ি উঠে দাঁড়ালাম আমি। পকেট থেকে দ্রুত গতিতে ফোন টা বের করে দেখলাম, যা! শ্লা! ব্যাটারি টার কখন চার্জ ফুরিয়ে কেলিয়ে গিয়েছে। রিস্ট ওয়াচ -এর অভ্যাস বহুদিন হল ছেড়ে গেছে আমাকে। সামনে বসে থাকা নিলয়ের দিকে তাকিয়ে বললাম..." দোস্ত কটা বাজে দেখত? ও একটু চোখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে গ্লাসে চুমুক দিয়ে জড়ানো গলার বলে উঠল, এত তাড়া কিসের বস? আরেকটু বস না! সবসময় তো আর পার্টিতে আসবিনা। নিলয়ের কথার ধরণে বেশ বুঝলাম ওর নেশা চড়েছে। আমার ও নেশাটা বেশ রক্তে একটা ঝিম ধরিয়েছে, আর একটু বসলে খুব একটা ক্ষতি নেই। পনের কিলোমিটার পথ গাড়িতে পাঁচ দশ মিনিট লাগবে। কিন্তু না! আসার সময় রুমার শরীর খারাপ দেখে এসেছি, যদিও বছরে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন ওর ঠাকুর পূজা আর মাথা যন্ত্রণা লেগেই থাকে।

তাও, কোথাও যেন একটা কুটকুট করে কামড়াচ্ছে যে এবার বাড়ি ফিরে যাওয়া ভালো। সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে আর একবার নিলয় কে জিজ্ঞেস করলাম... "এই বলনা কয়টা বাজে?" নিলয় মাথা নীচু করে ঝিমাচ্ছে। বুঝলাম মাল খেয়ে ঘুড়ি বেশ গোত্তা খেয়ে পড়েছে। তাই আর বেশি বাক বিতন্ডা না করে ওর পকেট থেকে ফোনটা বের করে দেখলাম একটা দশ বাজে। তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে উঠলাম। নিলয় কে একটু ঝাঁকিয়ে বললাম,"চল ওঠ! বাড়ি যাবিনা?"

ও শুধু মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট আওয়াজ করে ঝিমোতে লাগল। ধুত্তোর নিকুচি করেছে! মরুকগে পড়ে। সকাল হলে বাড়ি থেকে এসে কেউ নিয়ে যাবে। এই ভেবে আমি বার থেকে বেরিয়ে এলাম। হঠাৎ যেন একটা দমকা ঠান্ডার ঝোঁক এসে লাগল আমার শরীরে। বেশ শীত শীত করে উঠল। আশ্চর্য ব্যাপার তো! সময়টা বৈশাখ মাস। আর এসি থেকে নরম্যাল ওয়েদারে বেরোলে তো গরম হলকা লাগার কথা। সেখানে শীত অনুভব হল কেন ?

চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার।তার মধ্যে বারের চোখ ধাঁধানো আলো যেন

অন্ধকার কে আরো দ্বিগুন করে দিয়ে আগুনের মত জ্বলছে। চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়া তীব্র আলোর বাইরে পড়ে থাকা অন্ধকার এর দিকে তাকিয়ে কেমন যেন গা টা ছমছম করে উঠল। নীরবতা আর নিশুতি যেন ওখানে জমাট বেঁধে আছে। কি এক আশ্চর্য টানে যেন নড়তে ভুলে গেলাম। কিছু কি লুকিয়ে আছে ঐ আঁধারে। কিছু কি শুনতে চাই ঐ আঁধার থেকে! নীরবতা ও মাঝে মাঝে এমন বাঙ্ময় হয়ে ওঠে যে অভিভূত হতেও ভুলে যায় স্নায়ু। বেশ কিছুক্ষণ অন্ধকারের মধ্যে চোখ হাতড়ে সম্বিত ফিরলে অবশেষে পার্কিং জোনে পার্ক করা গাড়িটাতে বসলাম। সিটবেল্ট বেঁধে গিয়ার টেনে স্টার্ট করতে গেলাম, ঘড়ঘড় করে একটা শব্দ রাতের বুক ফালা ফালা করে একেবারে আমার বুকের মধ্যে এসে যেন ধাক্কা দিল। আবার চেষ্টা করলাম। সেই একই ঘড়ঘড়ে শব্দ। নিশুতি হওয়ায় শব্দটা তীব্র ভাবে বুকে বেজে উঠছে। আরে এতো মহা ফ্যাসাদ। গাড়িতে তো তেল ভরেই এসেছিলাম। তাহলে! যদিও গাড়িটার অনেকদিন সার্ভিসিং করানো হয়নি। সেই কারণে কি! কিন্তু আজকে এত রাতেই হতে হল! এখন উপায়! হেঁটে যাওয়া ছাড়া আর যে গতি নেই।

ভাবতেই যেন কুলকুল করে ঘাম আসতে লাগল। মাথাটা বেশ ঝিমঝিম করছে। ধুর! এইতো অল্প পথ হেঁটেই চলে যাব। মনে মনে সাহস সঞ্চয় করে গাড়ি থেকে নামলাম। এখন আর ভয় ওত লাগছেনা। বেশ হাল্কা মনে হল। শিস দিতে দিতে পার্কিং জোনটা পেরিয়ে রাস্তায় পড়লাম। স্ট্রিট লাইটের আলোগুলো গোটা রাস্তা জুড়ে বহুদূর অবধি লম্বা লম্বা ছায়া ফেলেছে। স্ট্রিটলাইটের পিছনে জমে থাকা আঁধার আর আলোর খেলায় আমার শরীরেরও বেশ লম্বা ছায়া পড়েছে গোটা রাস্তা জুড়ে। মনে হচ্ছে যেন সামনে পিছনে আমার সাথে সাথে অনেকগুলো ছায়াও এগিয়ে চলেছে পাল্লা দিয়ে। গা টা যেন একটু শিরশির করে উঠল। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম,একটু ঘোলাটে বর্ণের চাঁদ উঠেছে। সামুদ্রিক মাছের গায়ে লেগে থাকা বরফের মিহি গুঁড়োর মত আলো ছড়িয়েছে চারিদিক। ঐ জন্যই কি শীত শীত লাগছে!না কি হ্যাংওভার! যাকগে! মানে মানে বাড়ি ফিরতে পারলেই হয়! তারপর স্নান করে একটু ফ্রেশ হয়ে সোজা বেডে। এই ভাবনার মধ্যে চোখে পড়ল একটা লাল টকটকে আলো জ্বলা ড্যাশবোর্ড। রাতের অতিথি লেখা। এই তো! এই তো! প্রায় এসেই পড়েছি! এই হোটেলটা পেরোলেই আর অল্প একটু গেলেই বাড়ি। হঠাৎ যেন মনে হল পিছনে কেউ খুটখুট করে হেঁটে আসছে। বুকটা ধড়াস করে উঠল। এত রাতে কে হেঁটে আসছে ? কোন আততায়ী! ভাবতেই বুকের রক্ত চলকে উঠল।

যদিও বেশি কিছু কাছে নেই। তবুও কিছু না পেয়ে যদি ঐ আক্রোশে গলার

নলিটা... উফফ! মা গো! ও ঠাকুর! একটু দাঁড়িয়ে পড়লাম। দেখলাম খুটখুটানি শব্দটা থেমে গিয়েছে। যাক! হয়ত কোনো মনের ভুল। এই ভেবে আবার যেই চলতে লাগলাম ওমনি খুটখুট শব্দ ধেয়ে আসতে থাকল পিছন। একটা হাঁফানোর শব্দও পাচ্ছি। একটু জোরে জোরে পা চালালাম। খুটখুট শব্দটা পাল্লা দিয়ে ধেয়ে আসছে। হার্টবিট বেশ দ্রুত হচ্ছে বুঝতে পারছি, চোখমুখ দিয়ে একটা গরম হলকা বেরোচ্ছে। এর বেশি দ্রুত হাঁটলে হয়ত পড়ে যেতে পারি। ভাবলাম! এবার আমাকে থামতে হবে। আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম, শব্দটাও আমার পিছনে থম মেরে রইল। ভয়ে ভয়ে ঘাড় ঘোরালাম। দেখলাম একটা কুকুর। তার লম্বা জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে। কিন্তু এই কুকুরতো রাস্তার নয়, এর ব্রীড তো জার্মান শেফার্ড এর মত। তাহলে এতো রাতে কোনো পোষা কুকুর রাস্তায় কেন! কুকুরের চোখে চোখ পড়ায় একটু ঘাবড়ে গেলাম, চোখগুলো যেন পাথরের চোখের মত। তাতে হাল্কা আলো পড়ায় সবুজ রঙা হয়ে জ্বলে উঠছে। আমি দাঁড়িয়ে যাওয়ায় কুকুর টাও দাঁড়িয়ে ঠান্ডা দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইল। একটা ভয়ের স্রোত যেন নামছে শরীর জুড়ে। হঠাৎ গোঁ গোঁ করে ফোনটা ভাইব্রেট হয়ে আমার বুকের পাঁজর টা কে একেবারে ঝাঁকিয়ে তুললো যেন।

ঘটনার আকস্মিকতায় আমি আঁ আঁ করে চিৎকার করে উঠলাম। কুকুরটাও ভৌ ভৌ করে চেঁচিয়ে রাতের নিস্তব্ধতা কে একেবারে খান খান করে তুলল। আমি একটু ধাতস্থ হয়ে বুক পকেট থেকে ফোনটা বের করে বিস্মিত হয়ে গেলাম। ফোনটা দিব্যি সুইচ অন আছে, তাহলে কি আমি ভুল দেখলাম! ফোনের হোমবাটনে চাপ দিতে হাল্কা নীল আলো ছড়িয়ে পড়ল স্ক্রিনে। এবং বিস্মিত হওয়ার আরো তখনও বাকি ছিল, দেখলাম একটা দশ বাজে। কি অদ্ভুত ব্যাপার! বেরোবার সময় দেখেছিলাম একটা দশ। তাহলে সময় একটুও কেন পেরোলনা! আরো চমক তখন ও অপেক্ষা করছিল আমার জন্য। ফোন থেকে মুখ তুলতেই চোখে সজোরে এসে ধাক্কা খেলো ড্যাশবোর্ডের টকটকে সেই লাল আলো। যাতে লেখা রাতের অতিথি। আমার শরীরটা হিম হতে লাগল। তাহলে এতক্ষণ ধরে কি আমি একই জায়গায় ঘুরেছি। একটু ও পেরোয়নি। কাঁপা কাঁপা হাতে গুগল ম্যাপ ওপেন করে সামনে এগোতে থাকলাম। এবং বেশ খানিকক্ষণ একটা ঘোরের মধ্যে হেঁটে আসলাম। পিছনে কুকুরটাকে আর দেখতে পেলাম না। বাড়ির পাঁচিলের কাছে এসে দাঁড়াতে যেন ধড়ে প্রাণ ফিরে এল।

* * *

প্রায় দু তিন ঘন্টা পেরিয়ে গিয়েছে পাওয়ার কাট হওয়ার,তাও এখনো

ইলেকট্রিক এলোনা।ইদানীং এই সমস্যা টা মাঝেমধ্যেই হচ্ছে। ঘরের মধ্যেটা ভীষণ গুমোট লাগায় ব্যালকনি তে গিয়ে বসলাম। একটা গোল্ড ফ্লেক ধরিয়ে সুখ টান দিচ্ছি। রিং রিং ধোঁয়ায় বেশ মৌতাত জমে উঠেছে। গোটা পাড়ার বাড়িগুলো অন্ধকার গায়ে মেখে নিঝুম দাঁড়িয়ে আছে একটার পর একটা।হঠাৎ আমার চোখ পড়ল পাঁচিল সংলগ্ন রাস্তার ওপর। সেখানে যেন এবড়ে খেবড়ো কিসের আঁচড়ের মত রেখা পড়েছে। ফোনের ফ্ল্যাশলাইট অন করে সোজাসুজি রাস্তার ওপর ফেললাম। দেখলাম কিছু নেই। আবার ফ্ল্যাশলাইট অফ করতেই সেই একই রেখা। ব্যাপারটা ভালো করে অনুধাবন করতে উঠে দাঁড়ালাম ওমনি ব্যালকনির জানালার কাছে কি যেন সরসর করে সরে গেল। থপ করে বসে পড়লাম, ভাবলাম ড্রিংক করার পরিমাণ বেড়েছে এবার না কমালেই নয়, কিসব হ্যালুসিনেশন হচ্ছে দিনরাত। আমি ব্যালকনি থেকে উঠে বেডরুমে গেলাম।

রুমার ভারী নিঃশ্বাসের শব্দে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে ও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। এমনি সময় ইলেকট্রিক চলে এল। ঘরের মধ্যে থকথকে জমে থাকা অন্ধকার ফিকে হয়ে গেল নীলচে ডিমলাইটের আলোয়। রুমা সাদা চাদর গায়ে দিয়ে শুয়েছে। নীলের মধ্যে সাদা যেন একেবারে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। মেয়েটা কেন যে সাদা চাদর গায়ে দেয়, কেমন বুকটা যেন শিরশির করে ওঠে। যাকগে! বেডে শরীর এলিয়ে দিতেই চোখে ঘুম জড়াচ্ছে। এমন সময় রুমার ডাক... "এই অম্লান! এই! শুনতে পাচ্ছ?

-আহ! রুমা চুপ করে ঘুমাও।

-আরে শুনতে পাচ্ছনা? ছাদের ওপর কি যেন ঘষটে ঘষটে হাঁটছে।

-আরে ধুর!বিড়াল টিড়াল হবে।

এই বলে আমি আবার ঘুমে ঢলে যাচ্ছি। আবার রুমার চিৎকার...এই ওঠো বলছি!

-রুমা কিসব শুরু করেছ বলতো?

-প্লিজ তুমি উঠে গিয়ে দেখনা। ছাদে না কে হাঁটছে।

আমি বিরক্ত হয়ে উঠলাম। একটু একটু করে এগিয়ে যেতে থাকলাম ছাদের সিড়ির দিকে। দেখলাম ছাদের গেট খোলা আর কে যেন হাঁটু তে মুখ গুঁজে বসে আছে। আর সেই অবয়বের ছায়া ততধিক বেশি লম্বা হয়ে দুমড়ে মুচড়ে পড়ছে সিড়ির ওপর। আমি প্রচন্ড আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলাম।

-কে ওখানে? ওখানে কে?

হঠাৎ মুখের মধ্যে হাত দিয়ে হুলুলুলু করে শব্দ করে বুকের রক্ত হিম করে

দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল অবয়ব টি। তারপর খ্যাকখ্যাক করে হেসে বলল "আমি"

গলাটা শুনে একটু আশ্বস্ত হলাম। এ সেই সেকেন্ড ফ্লোরের পাগল ন্যালাখ্যাপা ছেলেটি। কিন্তু বিশ্বনাথ বাবু যে কেন রাতে ওকে ঘরে আটকে রাখেনা। আমি ছাদ থেকে নেমে আসতে গিয়ে হঠাৎ রাস্তার দিকে চোখ পড়ল। বুকটা ছ্যাৎ করে উঠল। সেই কুকুরটা আমাদের বাড়ির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমার গলা টা শুকিয়ে উঠতে লাগল। আমি দ্রুত নেমে বেডরুমে গেলাম। দেখলাম রুমা বসে আছে। ওর চোখটা কেমন ঘোলাটে মত। আমি বললাম...ভয় পেওনা! আমার কাছে সরে এসে শোও। ওর চোখটা কেমন লাল মত। আর থমথমে গলার বললো "না! তোমার গায়ে কুকুরের গন্ধ"

* * *

-আমার ভালোবাসা কে কেড়ে নিলি কেন অম্লান?

-আমি কেড়ে নিয়েছি? কি যা তা বলছিস?

-হ্যা! তুই! তোর জন্য রুমা আমার থেকে...

-শটআপ! আর একটুও বাজে বকবিনা!

-আব্বে চুপ কর শ্লা!

প্রবল ধস্তাধস্তি তে দম টা আটকে আসছে। টেবিলের ওপর থেকে ছুরি টা নিয়ে পেটে চালান...। রক্তে ভেসে যাচ্ছে চারদিক। এটা ঠিক করলিনা তুই! তুই ঠিক করলিনা! পেছন থেকে একটা নীল চোখের কুকুর ঝাঁপিয়ে পড়ল ভৌ ভৌ।

ট্রাফিকে আটকে থাকা গাড়ি টা স্টার্ট দিতে ই একেবারে ছিটকে উঠলাম। একটু চোখটা লেগে গিয়েছিল।তার মধ্যে এইসব কি দেখলাম আমি! ঘাড়ে গলার বিজবিজে ঘাম জমেছে। ব্যাগ থেকে জল বের করে খেলাম। মাথার মধ্যে হাবিজাবি প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে তাহলে কি রমেশ! নানা চিন্তার মধ্যে কখন যে বাড়ি পৌঁছে গিয়েছি খেয়াল করিনি। দুতিনবার কলিংবেল চাপলাম। অথচ রুমা দরজা খুলছেনা দেখে ভারী অবাক হলাম। ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে রুমের দরজা খুলে ঢুকে দেখলাম রুমা ব্যালকনি থেকে বাইরের দিকে চেয়ে বসে আছে।

-"এই রুমা! দরজা খোলোনি কেন?

রুমা কোন উত্তর দিলনা। শুধু গম্ভীর ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে উঠে গেল। ওর চোখ দেখে মনে হল ও যেন এ জগতে নেই। কেমন একটা ঘোরের মধ্যে আছে। ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লাম। রুমা কেন এমন করছে! ওকে আমার একটু বেশি সময় দেওয়া দরকার।

রাতের বেলা দুপেগ মত ঢকঢক করে গলায় ঢেলে বেডে গেলাম। রুমা পিছন ফিরে শুয়ে আছে। ওকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে গেলাম। ও আদুরে বেড়ালের মত আমার গা ঘেঁষে আসছে। হঠাৎ হাত টা ছ্যাৎ করে উঠল কি একটা বরফের মত ঠান্ডা জিনিসের স্পর্শে। আমি তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম। রুমা হিসহিসে গলায় বলল -"ঐ কি হলো?

-বেডে কিছু একটা আছে রুমা!

-কি আছে?

তড়িঘড়ি উঠে আলো জ্বাললাম, দেখলাম একটা দু ব্যাটারির স্টিলের টর্চ।

-"ধুর রুমা তুমি যে কি করো না! মাথার ধারে এই টর্চ রাখার কি দরকার?" কেঁচিয়ে যাওয়া মুডটা ঠিক করতে রুমার কবোষ্ণ বুকে মুখ ডুবিয়ে দিলাম। হঠাৎ রুমা আমাকে ধাক্কা দিয়ে বলল, অম্লান তুমি কুকরের মত লম্বা জিভ বের করে চাটছ কেন? সরে যাও আমার কাছ থেকে বলছি। তোমার গা থেকে কেমন একটা বোঁটকা গন্ধ আসছে। রুমার চোখটা অস্বাভাবিক রকমের লাল। আর ও লম্বা লাল জিভ বের করে প্রচণ্ড হাঁপাচ্ছে।

* * *

আজ দুইদিন হল রুমা বাপের বাড়ি গিয়েছে। আমি নিলয়কে রাতে আমার কাছে থাকতে বলেছি। ইদানিং রাত গুলো ভীষণ ছমছম করে। মনে হয় কোনো নীল চোখের কুকুর তার দিকে ঠান্ডা দৃষ্টি তে দেখছে। হঠাৎ ফোনটা গোঁ গোঁ করে ভাইব্রেট হয়ে উঠল। স্ক্রিনে রুমা ভিডিও কলিং। একসেপ্ট বাটনটা প্রেস করতেই রুমার হাসিখুশি মুখটা ফুটে উঠল। স্লিভলেস ট্রান্সপারেন্ট নাইটওয়্যারে ওকে সেক্স বোম্ব লাগছে।

"মাই সুইটহার্ট ইউ আর লুকিং অসাম"

রুমা মুখটা বেঁকিয়ে বলল "ঝুটি"

ঘরের নীলচে আলোয় ওকে বেশ মোহময়ী লাগছে। পিছনের সাদা পর্দা টা ফ্যানের হাওয়ায় দুলছে। হঠাৎ রুমার মুখের পাশ থেকে পিছনের দিকে একটা কি যেন হেঁটে গেল।

-তোমার পিছনে কে চলে গেল রুমা?

-কই কেউ বাড়িতে নেই তো! সবাই তো পাশের বাড়িতে অনুষ্ঠানে গেছে। তাই তো তোমাকে কল করলাম।

জানালার পর্দা টা তে একটা ছায়া পড়ছে। আমি আবার বললাম "তোমরা

কি কোনো পোষ্য পুষেছ?" ও গম্ভীর হয়ে বলল "কই না তো! আমি আবার ভালো করে লক্ষ্য করলাম,"ঐ তো তোমার পিছনে। হ্যাঁ হ্যাঁ ঐ তো। রুমা পিছন ফিরে দেখে বলল, কি বলছ! কি উল্টোপাল্টা বকছ তুমি! আমি তড়িঘড়ি নিলয় কে ডাকলাম। নিলয় বলল, "বৌদি আপনি দেখতে পাচ্ছেন ঐ তো আপনার পিছনে দাঁড়িয়ে।" রুমার পিছন দিয়ে নীল চোখের কুকুরটা ফোনের স্ক্রিনের মধ্যে দিয়েও হিম চোখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। রুমার আস্তে আস্তে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল। তারপর স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে কল টা ডিসকানেক্ট করে দিল। ওর চোখটাও তখন জ্বলছে।

আমার বুকের রক্ত যেন শুকিয়ে আসছে। মাথার মধ্যে যেন একশোটা হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে। ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের সহযোগিতায় কেসটা সালটে দিয়েছিলাম, কিন্তু পারলাম না! ও মনে হয় ফিরে এসেছে। সব শেষ করে দেবে। প্রচন্ড আতঙ্কে শীত শীত করতে লাগল আমার।

তৃষ্ণা

মোনালিসা সাহা দে

সকাল থেকেই আজ আমার গলা খুশখুশ করছে। ভয়ে ভয়ে তিন তিন বার গার্গল করলাম। তবু কিছুই ঠিক হলো না। আমার সত্যিই খুব ভয় করছে। এই গলা খুসখুসানিটা শুরু হলেই আমার খুব ভয় করে। আসলে আমার এই এক সমস্যা, যার সমাধান আমি ভেলোর-ব্যাঙ্গালোর করেও পাইনি। ওহো একটু ভুল হয়ে গেল! মাথাটা গুলিয়ে গেছে, বুঝলেন? আমি আবার ভেলোর - ব্যাঙ্গালোর করলাম কবে? গরিব বাড়ির মেয়ে। মা তো সেলাই মেশিনের ভরসায় শুধুমাত্র একটা ছোটোখাটো বুটিক চালিয়ে আমাকে লেখাপড়া শিখিয়ে বড় করলো। আর বাবা তো সেই কবেই আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছে। চলে গিয়েছে মানে মারা গিয়েছে এমনটা ভাববেন না যেন! আসলে আর একটা বিয়ে করে আমার মাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়েছিল আমার বাবা। আমাকেও পছন্দ করেনি কোনোদিন। আসলে বাবা যে ছেলে সন্তান চেয়েছিল! সে যাই হোক, বাবার কথা আমি আর ভাবি না। তো যেটা বলছিলাম, এই গলা খুশখুশ করার সমস্যাটার এদিক-ওদিক অনেক চিকিৎসা করেও কোনো সুরাহা হয় নি, বুঝেছেন? তো শেষে এখন হাল ছেড়ে দিয়েছি। হাল ছেড়ে দিয়েছি, তা অবশ্য ঠিক বলা যায় না। মায়ের জোরাজুরি আর আমার নিজের ভীতিতে হোমিও চিকিৎসা অবশ্য চালিয়ে যেতেই হচ্ছে। আর এক ধরণের ওষুধও চলে। সে যাই হোক!

তরুণ বয়স থেকেই আমার মধ্যে এই সমস্যা দেখা দিয়েছিলো। প্রথম দিন তেমন গুরুত্ব দিইনি। যদিও কমছিলো না একটুও। তার পরেই তো... কি যে আর বলি! আমারও ভয় পাওয়া শুরু। যদিও তা চলেছিল প্রায় বছর খানেক আগে অব্দি। ইদানিং তো এসব একেবারেই কমে গিয়েছিল, বলা যায় ঠিকই হয়ে গিয়েছিলো। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাতে কি কি ফল মিলেছিল? হতে পারে! আজ আবার নতুন করে উপদ্রব? ভালো লাগে না। কিছু ভালো লাগে না আর।

এখনও মনে পড়ে সেই দিনটার কথা। প্রীতম আমাকে হুট করে ছেড়ে চলে গিয়েছিলো। নাঃ! কোনো কারণ সে দর্শায়নি। ভালোবাসাকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিতে গেলে পিছনে বোধহয় তাকাতেও নেই। কারণ তাতে যে নিজের দোষটা

প্রকাশ হয়ে যায়। নতুন কাউকে পেলে পুরোনোরা সবসময় প্রাক্তনই হয়ে যায়। বিশেষ করে তার শরীরের অলিগলি জানা হয়ে যাওয়ার পরে আর কিছুই রহস্য থাকে না। কাজেই তাকে খুব সহজে সরিয়ে দেওয়া যায়। পুরো স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম সে দিন। না। চোখ দিয়ে জল পড়েনি, কেন পড়েনি তা নিজেও জানি না। প্রায় তিনটে দিন এক অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে ছিলাম। ঠিক করে খাবার খেতে পারতাম না, অথচ মা কে কিছু বলতে গেলে উল্টো ফল হবে ভেবে পুরো কষ্ট গিলে নিয়েছিলাম। বাথরুমে গিয়ে হাউ হাউ করে কাঁদতাম শাওয়ার অন করে। আবার বাইরে এসে আমি একেবারে স্বাভাবিক। কারো কিছু বোঝার উপায় নেই। তবু আমার শরীর বোধহয় বুঝতে পেরেছিল, তাই তো একটা কিছু উল্টো ফল দেখাচ্ছিলো। সেই তৃতীয় দিন সকাল থেকে প্রথম আমার শুরু হয় এই গলার সমস্যাটা। অবশ্য এটা কি খুব বেশি অস্বাভাবিক কিছু ছিল? তা তো নয়! বেশি কান্নাকাটি করলে গলা চুলকায়, সেটাই তো স্বাভাবিক। অথচ এই গলা ব্যথাই এখন আমার নিত্য সঙ্গী হয়ে গেলো।

এখনো মনে পড়ে সেদিন বিকেলে মায়ের কাজে সাহায্য করতে গিয়ে বঁটিতে কি বিভৎসভাবে আমার হাত কেটে গিয়েছিল। মা তো দৌড়াতে দৌড়াতে ছুটেছিল সামনের মেডিসিন শপে। ড্রেসিং করতে হবে এমনটাই ভেবে নিয়েছিল মা। যদিও পরে দেখা যায় রক্তপাত অনেকটাই কমে গিয়েছে। তবু দোকানের ছেলেটা ইনজেকশন দিয়ে যায়। ছেলেটার দৃষ্টিতেও কিছু একটা যেন ছিল! আসলে বাপ হীন মেয়েকে একাকী অসহায় তরুণীকে দেখলে অনেকেরই দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আসে। দোকানের ছেলেটাকে দোষ দিয়ে আর লাভ কি?

সেদিন রাতেও আমি প্রীতমের সাথে ফোনে যোগাযোগ করার অনেক চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ফোন বারবার অটোমেটিক্যালি কেটে যাচ্ছিল। বোধহয় প্রীতম আমায় ব্লক করে রেখেছিল। হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজও ডেলিভার্ড হয়নি ওই একই কারণে। শেষপর্যন্ত টেক্সট মেসেজ পাঠাই আমি। জানিনা সে ম্যাসেজও কোনদিন দেখতে পেয়েছিল কিনা, যদিও ডেলিভার্ড হয়েছিল এটুকু জানি। তবে কোনো রিপ্লাই ও দেয়নি। আমি বড্ড হ্যাংলা তাই বারবার ওকে মেসেজ করেছি। ও কি জানতে পেয়েছিল, সেদিন আমার কতটা হাত কেটে গিয়েছিলো! এটা আমার এটা অবশ্য বিশাল বড় কিছু জানানোর বিষয় ছিলো না, তবু যে প্রীতম একসময় আমার আঙুলে একটা ছুঁচ ফুটলেও বিচলিত হয়ে পড়ত, তাকে আমি আমার এতটা রক্তপাতের ঘটনাটা না জানিয়ে পারছিলাম না। হয়তো মনে আশা ছিল, প্রীতম আবার ফিরে আসবে। পরের দিন জানতে পারি প্রীতমের নাকি সেদিন একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিলো।

এই দেখুন, আপনাদের তো আসল কথাটা বলাই হয়নি! প্রীতম আমার জীবনে এসেছিল এক কোচিং সেন্টারের মাধ্যমে বন্ধুত্বের মারফত, তারপর আমরা হোটেলের নির্জনে অনেক সময় সময় কাটিয়েছি ঠিকই কিন্তু প্রীতমের সঠিক ঠিকানা আমার জানা আর হয়ে ওঠেনি। কোনোদিন জানার প্রয়োজনই মনে হয়নি। ওর পথদুর্ঘটনার খবরটুকু তো আমি জানতে পারি সংবাদপত্রের মাধ্যমে। সেদিন রোড এক্সিডেন্টে গুরুতর আহত যে হয়েছিল তার নামও ছিলো প্রীতম বিশ্বাস। এবার আপনারা বলতেই পারেন যে সেই প্রীতম আর এই প্রীতম একই তার প্রমাণ কি? না। কোনো প্রমাণ নেই। আপনাদের কোনো প্রমাণ দিতে আমার দায়বদ্ধতাও নেই। বয়েই গেছে। আমার মন জানে ও আমারই প্রীতম। আমার সাথে ও যেটা করেছে তার শাস্তি তো ওকে পেতেই হতো। তাই হয়ত ওর অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিলো। তবে সেদিন থেকেই আবার আমার মাঝে মধ্যেই ওই গলা খুশখুশানি শুরু হয়। কি জ্বালা বলুন তো? এভাবে পারা যায়? না, পারা যায় না। টনসিলের সমস্যা নেই, কিছু নেই তবুও আমাকে ডাক্তার দেখাতে হয় বৈকি! ডাক্তারই বলেছিল, "সব ঠিক আছে গলার ভিতরে কোন সমস্যা নেই।" নাও এবার বোঝো ঠ্যালা! আমার গলার ভেতরে কেমন একটা করে, ডাক্তারকে বিশ্বাস করাই কেমন করে! আমার যে বড্ড ভয় করে!

এর পর থেকেই এত অন্য মনস্ক হয়েছিলাম যে আমার হাত কাটতেই থাকে। মায়ের রান্নাবান্নাতেও আমি সাহায্য করতে থাকি। মনটাকে যতটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে রাখা যায়, এই আর কি! আগে আমি মাছ কাটতে পারতাম না। ওটাও শিখে ফেলেছি তখন থেকেই। বলা চলে মাছ কাটার কাজটা এখন আমার ভীষণ প্রিয়। যদিও আমি এখনও প্রীতম কে ভুলতে পারি না, মাঝেমধ্যেই সকল স্মৃতি মনে ফিরে ফিরে আসে, আমার গলার ভেতরটা চুলকাতে লাগে, আর তার পরেই...। সেদিন টুকটুক থেকে ফিরতে গিয়ে পায়ে ধাক্কা লেগে গোড়ালিতে অনেকটা কেটে গিয়েছিল, তারপর মোটামুটি সাত দিন আমি লম্বা ঝুলের নাইটিটা পরে থাকলাম। খুব ভয় লাগছিলো। তবু মাকে বুঝতে দিইনি যে আমার পা কেটে গিয়েছে। কি হবে এসব বলে? অকারনে চিৎকার চেচামেচি শুরু করবে। আর পা কেটে তো আমার তেমন কোনো সমস্যা হয়নি! শুধু ভয় লাগে, এটুকুই যা!ভোরের দিকে অবশ্য আমি রোজই প্রীতমের অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখি। মানে ওই রক্তারক্তির স্বপ্ন, ব্যস এটুকুই। ভোরের স্বপ্ন কি সবসময় সত্যি হয়ই? কী জানি!

এখন আমি রোজ একবার করে প্রীতমের নাম্বারে ডায়াল করি, তবে আমার ধারণা ও ওই নাম্বারটা ছেড়ে দিয়েছে। তাই তো নাম্বারটা বলে সুইচ অফ।

আমার থেকে দূরে সরে যাওয়ার জন্য ও কিনা নিজের ফোন নম্বরও বদলে দিলো। দিক গে! কম্পিউটার সেন্টারের এক বন্ধুর সাথে আমার একদিন রাস্তায় দেখা হয়েছিল। ও বলছিল প্রীতমের নাকি বিয়ে হয়ে গিয়েছে। আমি ওই বন্ধুর কাছ থেকে প্রীতমের বাড়ির ঠিকানা নিতেই পারতাম, কিন্তু নিইনি। আসলে মুখে যাই বলি না কেন, মনে মনে সেদিন খুব কষ্ট পেয়েছিলাম খবরটা শুনে। আচ্ছা সব পুরুষই কি তাহলে একই রকম? প্রীতমের মতো? আমার বাবার মতো? আমার এদের সাবাইকেই মেরে ফেলতে ইচ্ছা করে এখন।

যাহ। কী সব ভেবে ফেলেছিলাম সেদিন! তার পরেই তো মা আমাকে এক মনের ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। যদিও আমি সেই ডাক্তারের দেওয়া ওষুধ একটাও খাইনি, তবু আমি জানি আমার মা আমাকে ভাতের মধ্যে মিশিয়ে মিশিয়ে সেই সব ওষুধ আমার খাওয়াতো। আমি আর কিছু মা-কে বলতামও না। মোট কথা আমার গলার জ্বালাটাও তখন থেকে বেশ কমে গিয়েছিল। তারপরে এই এক বছর হলো আমি ভালোই ছিলাম। হুট করে আজ সকাল থেকে আবার সেই এক উপদ্রব শুরু।

আসলে কদিন ধরে তো আমার মায়ের সাথে আমার একটু তর্কাতর্কি লেগেছিল। মানে ঐ টুকটাক তর্কাতর্কি, মা-মেয়ের ঝগড়াঝাটি বলতে যেটা বোঝায়, সেটাই। আসলে মায়ের আমাকে নিয়ে অনেক অভিযোগ। সে সব অভিযোগ যদি আপনাদের সামনে এখন আমি তুলে ধরি তাহলে মহাভারত তৈরি হবে। তো যেটা বলছিলাম, মায়ের সাথে আমার একটু রাগারাগি শুরু হয়েছিল। গতকাল একটু বেশীই রেগে গিয়েছিলাম আমি। কেন রাগ করব না বলুন? নিজের মা-ই যদি আমাকে 'পাগল' বলে, তাহলে মাথার ঠিক থাকে? প্রীতম আমাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার কয়েকদিন আগে এমন ভাবেই সেন্টারের সকলের সামনে আমাকে 'সাইকো' বলেছিল। যদিও সেদিন একটু পরে আবার সব মিটমাট হয়ে গিয়েছিল। মায়ের সাথেও তো আমার মিটমাট হয়েই গেছে, অন্ততপক্ষে আমার দিক থেকে। কিন্তু মা কি মন থেকে কোনো মিটমাট করলো? কাল মধ্য রাতে তো আমি মাকে জড়িয়ে ধরে একটানা কতক্ষণ কেঁদে গেলাম। মনে হয়েছিল, সত্যিই তো! আমার এ পৃথিবীতে সবথেকে বড়ো আপনজন তো আমার মা-ই। অথচ আমি কিনা সারাজীবন বাবার কথাই ভেবে গেলাম।

নাঃ! গলাটা বড্ড জ্বালাচ্ছে বুঝলেন? ফ্রিজটা খুলতেই হবে। কী অদ্ভুত! খোলা মাত্র মায়ের ফাটা মাথার রক্তাক্ত দেহটা হুড়মুড় করে আমার ঘাড়ে পড়ে গেলো। আমার কান্না পাচ্ছে। আমি তোমাকে মারতে চাইনি মা। কেন যে এমন

মাথা গরম হয়ে গেলো! আমার আবার এখন বড্ড ভয় করছে। সেই আগের মতো ভয়! আমি যেটা চাই না, সেটাই আবার আমাকে করতে হবে। কিছু করার নেই। এই তৃষ্ণা যে আমাকে মেটাতেই হবে। না হলে আমার গলার অসুস্থতা কমবে না। তা বলে নিজের নিজের মায়ের শরীর থেকে রক্ত নেব? এ কি সম্ভব? অবশ্য কি করেই বা নেবো? সব রক্ত এতক্ষণে জমাট বেঁধে গেছে বোধ হয়। যাই, নিজের হাতই কাটি! চাকু কই চাকু?

সঠিক সময়ে চাকু খুঁজে পাওয়া যায়ও না। মাছ কাটার বঁটি কই গেলো? কাঁচা মাছও তো এখন নেই ধারে কাছে। দূর! রক্ত চাই রক্ত! সকল রক্ত পান করে আমি পৃথিবীর যাবতীয় অন্যায়কে গিলে নিতে চাই। গিলে নিতে চাই আমার বাবাকে। গিলে নিতে চাই প্রীতমকে। তবে আমি আমার মাকে কখনও এমন করতে চাইনি। তবু কি ভাগ্যের পরিহাস দেখুন? মায়ের সাথেই এমনটা হলো! আরে ওই তো চাকু?

আহ! কী শান্তি! গলগল করে গড়িয়ে পড়া রক্ত পান করলেই সব জ্বালা জুরোয়। তবু যে কেন এত ভয় হয় আজও, বুঝিনা। শুধু এটুকুই বুঝি যে আইনের দরবারে যে শাস্তিই পাই না কেন, এই তৃষ্ণা থেকে আমার আর মুক্তি নেই।

শপিং হান্টিং

অনন্যা দাস মন্ডল

আজ তিন দিন হল জিমি সৌম্য এবং প্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখদর্শন করেনি। অবশ্য ওদের পরিবারের মানুষরাও এই কদিন ওদের মুখদর্শন করেছে কিনা সন্দেহ! কারণ প্রত্যেকেই এক অজানা আতঙ্কেনিজেদেরগৃহবন্দী করেছে। যে আতঙ্কের উৎপত্তিস্থল ওদেরই সহপাঠী রিচার বাসগৃহ।

রিচা এক সপ্তাহ কলেজ আসেনি উপরন্তু ফোনটাও বন্ধ। সে কারণেই বেশ খানিকটা উদ্বিগ্নতা নিয়েইসেদিনওরা রওনা দিয়েছিলরিচার বাড়ি। পৌঁছাতে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। মূল ফটকে দণ্ডায়মান দারোয়ান ওদের কিছুতেই ভিতর আসার অনুমতি দিচ্ছিল না। প্রিয়া আগে বহুবার রিচার সঙ্গে এবাড়িতেএসেছে। তাই শেষ পর্যন্ত প্রিয়ার অনুনয়-বিনয়ে অনুমতি মিলল। দারোয়ানওদের জানায় রিচার শরীর অত্যন্ত খারাপ। সেই কারণেই বাড়িতে বহিরাগতদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। এই মুহূর্তে যেহেতু রিচার মা-বাবা বাড়িতে নেই, সেহেতু শুধুমাত্র প্রিয়ার কথায় ওদের দশ মিনিটের জন্য রিচার সাথে সাক্ষাতের অনুমতি দিয়েছে।

অনুমতি পেতেই ওরা দ্রুত পা চালায়। মূল ফটক থেকে এক ছোট্ট বাগানের মধ্যে দিয়ে, সোজা একটি রাস্তা এসে পৌঁছেছে রিচাদের বাড়ির প্রবেশ দুয়ারে। বাগানে ঘেরা তিনতলা সুসজ্জিত বাড়িটা সত্যিই দেখার মতো। প্রিয়া দরজাটা খুলতেই সৌম্য এবং জিমি কয়েক মুহূর্তের জন্য বিভোর হয়ে যায়। বাড়ির অন্দরমহল এত সুসজ্জিত হতে পারে, তা হয়তো ওরা কেবলমাত্র সিনেমারপর্দাতেই দেখেছে। প্রিয়ার ঠেলায় ওদের সম্বিৎফেরে। ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে আসে। একটা লম্বা বারান্দার মধ্যে দিয়ে ওরা হেঁটে চলে। যার বাঁদিকে সারিবদ্ধ চারটি ঘর, দরজা গুলি সুন্দর কাঠের কারুকার্য করা। বারান্দার ডানদিকটা অ্যালুমিনিয়াম রেলিং দিয়ে ঘেরা। যেখানে দাঁড়ালে নীচেবসার জায়গা, বাইরে যাবার দরজা এবং মডিউলার কিচেনটি সুন্দরভাবে দেখা যাচ্ছে। সেইসঙ্গে একেবারে হাতের নাগালে আছে বিরাট একটি ঝাড়বাতি।

ধীরে ধীরে ওরা এসে পৌঁছায় একেবারে দক্ষিণের অন্তিম দরজার সামনে। প্রিয়া দরজায় দুবার টোকা দিয়ে রিচার নাম ধরে ডাকে। কোনো উত্তর পায়

না। শেষ পর্যন্ত নিজেই আলতো করে দরজাটায় চাপ দিতেই খুলে যায়। ঘরের ভিতরটাবেশ অন্ধকার, জানালা দরজা বন্ধ হবার ফলে একটা কটু গন্ধ সাথে সাথেই ওদের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে। প্রিয়া আবার রিচার নাম ধরে ডাকে। এবারমৃদুকণ্ঠেরিচা বলে ওঠে,

-প্রিয়া? তুই এসেছিস?

-হ্যাঁরে সৌম্য আর জিমিও এসেছে।

-না না ওদের চলে যেতে বল।

-কেন? আমরা সবাই তোকে দেখতে এসেছি! চলে যাবো কেন?

-তোরা চলে যা সৌম্য।

-চুপ কর! সব সময় তোর কথাতেই চলতে হবে নাকি? কেমন আছিস আগে বলতো? তারপর আমি যাব। কতদিন কলেজ আসিসনি, আমাদের মন খারাপ করে না বুঝি!

-কলেজ আর বোধ হয় যাওয়া হবে না রে।

-কি হয়েছে বলতো তোর? এরকম কথা বলছিস কেন? আর এই অন্ধকারের মধ্যে শুয়েআছিস? তোকে তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি না। প্রিয়া আলোটা জ্বালা তো!

-না! না! প্লিজ প্লিজ! আলো জ্বালাস নারে!

-ওরে আমার মেকআপ কুইন,মডেলিং এর স্বপ্ন দেখিস, আর লাইট-ক্যামেরা-অ্যাকশন জানিস না?

-জিমি প্লিজ।

রিচার কথা শেষ হবার আগেই প্রিয়া আলোটা জ্বেলে দেয়। সত্যিই লাইট-ক্যামেরা-অ্যাকশন এর মতই রিচার অবস্থা দেখে, ওদের রিয়াকশন, আর্তনাদ আকারে বেরিয়ে আসে। বিছানার উপরে শায়িত দেহটি আসলে রিচার ? নাকি কোন ভয়ঙ্কর সরীসৃপ এবং রিচার দেহের সংমিশ্রণ, বোঝার উপায় ছিল না। গলার নীচ থেকে থাই-এর পর্যন্ত একটি পাতলা চাদর দিয়ে ঢাকা ছিল। রিচার শরীরেরবেরিয়ে থাকা অংশের মধ্যে মুখের বাঁ দিক থেকে শুরু করে গলা এবং বাহাত বরাবর এবং বাম পায়ের থাই থেকে শুরু করে গোড়ালি পর্যন্ত অংশ গিরগিটির চামড়ার মত খসখসে এবং সবুজ রঙের হয়ে গিয়েছিল। হাত পায়ের কিছু জায়গা ফেটে পুঁজ-রক্ত বেরোচ্ছিল। দৃশ্যটা এতটাই ভয়ঙ্কর ছিল যে, ওরা ঘরের মধ্যে আর দাঁড়াতে পারেনি। দৌড়ে বেরিয়ে এসেছিল রিচাদের বাড়ি থেকে।

এই ঘটনারপরওরা একে অপরের সঙ্গেও কোন যোগাযোগ করেনি। তবে তিন দিন পর সৌম্য আর পারছিল না। তাই প্রিয়া এবং জিমিকে কনফারেন্সে ফোন করে। জড়তা কাটিয়ে ধীরে ধীরে বলেই ফেলে, পুনরায় রিচার বাড়ি যাবার কথা। জিমি কিছুতেই রাজি হয়না, প্রিয়া অবশ্য চুপচাপ থাকে। সৌম্য ওদেরকে বুঝিয়ে বলে "দেখ রিচা আমাদের বন্ধু।ওর কি হয়েছে আমাদের জানা দরকার। সেদিন আমরা ভয় পেয়ে চলে এসে ঠিক করিনি। বেচারি নিশ্চয়ই খুব যন্ত্রণার মধ্যে আছে রে। বন্ধুত্বের খাতিরে একবার অন্ততপক্ষে চেষ্টা করা উচিৎ। যদি কোনো সুরাহা করা যায়" ।সৌম্যর কথার ভঙ্গিমায় এমন কিছু একটা ছিল যে ওরা রাজি হয়ে যায়। ঠিক হয় পরেরদিন সকালেই ওরা যাবে রিচা দের বাড়ি।

* * *

যথারীতি পরেরদিন গুটিগুটি পায়ে ওরা তিন মূর্তি হাজির হয় রিচাদের বাড়িতে। প্রথমে রিচার বাবা-মা আপত্তি করলেও শেষ পর্যন্ত ওদের বাড়িতে আসার অনুমতি দেয়। অন্দরমহলে প্রবেশ করেই প্রিয়া সুবিমল বাবু এবং সুপ্রিয়া দেবীকে বলে, "কাকু-কাকিমা আপনারা কি রিচার সমস্যাটার ব্যাপারে কিছু জানতে পেরেছেন?"

-শহরের সমস্ত বড় ডাক্তারদের সাথে যোগাযোগ করেছি, কিন্তু প্রত্যেকেই বলেছেন চিকিৎসা শাস্ত্রে এই রোগনিরাময় প্রায় অসম্ভব।

-(সৌম্য) আপনারা যদি অনুমতি করেন তাহলে একটা কথা বলি?

-হ্যাঁ বাবা বলো!

-রিচাকে সেদিন আমি যে অবস্থায় দেখেছি, আমার মনে হয়নি যে এটা কোন চিকিৎসা শাস্ত্র জনিত সমস্যা। হয়তো বিশ্বাস করবেন না, তবে আমার মন বলছে এটা কোন অতিপ্রাকৃতিক ঘটনার সঙ্গে জড়িত। একটা সুস্থ সবল হাসিখুশি মেয়ের দেহ দশ দিনের মধ্যে সরীসৃপের চামড়ার মতো হয়ে যাচ্ছে, এটা কিভাবে সম্ভব?

-ভুল কিছু বলোনি। এই চিন্তা আমাদের মনেও এসেছে। হাসিখুশি মেয়েটা দুই হাতে শপিং এর ব্যাগ নিয়ে বাড়ি ঢুকলো। কত খুশিনা ছিল সেদিন। বোধহয় কোন উপহার পেয়েছিল। তারপরেই রাত্রির বেলা থেকে শুরু হল গা হাতের অসহ্য যন্ত্রণা,এরপর ধীরে ধীরে বদলাতে শুরু হলো ওর দেহের চামড়ার রং।

-(প্রিয়া) দাঁড়ান দাঁড়ান রিচা সেদিন শপিং-এ গিয়েছিল? আপনি ঠিক বলছেন?

-হ্যাঁ আমাদের তো তাই বলেছিল।

-প্রিয়া ১৪-ই আগস্ট রিচা শেষবার কলেজ এসেছিল। সেদিন ক্লাস বেশি না থাকায় আমাদের সঙ্গে সিনেমা দেখতে যাবার পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু ওয়াশরুম থেকে আসি, বলে আর ফেরেনি ।আমরা করিডোরে ওয়েট করছিলাম। তারপর হঠাৎ করেই ওর মেসেজ আসে একটা আর্জেন্ট কাজে ওকে বেরিয়ে যেতে হচ্ছে। আমরাও ব্যাপারটা গুরুত্ব দেইনি, কারন ও সবসময়ই খুব মুডি মেয়ে। তবে আমি অবশ্য কলেজের মেন গেটে দাঁড়িয়ে থাকা একটি কালো রঙের গাড়িতে উঠতে দেখেছি।

-কি বলছো তুমি? আমার মেয়ে তো বলেছিল তোমাদের সঙ্গেই শপিং করতে গিয়েছিলো!

-(সৌম্য) এর উত্তর একমাত্র রিচাই দিতে পারে। আমরা সবাই এখানে বসছি। প্রিয়া তুই একাই যা রিচার কাছে।আমার কেন জানিনা মনে হচ্ছে ও সেদিন তোকে কিছু বলতে চাইছিল।

সৌম্যর কথায় সম্মতি জানিয়ে প্রিয়া ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে যায় রিচার ঘরের দিকে। প্রিয়াকে দেখে রিচা অত্যন্ত খুশি হয়ে, ইশারায় নিজের পাশে বসতে বলে। একটি চেয়ার টেনে নিয়ে প্রিয়া বসে। তবে ঘরের মধ্যে থাকা একটা কটু আঁশটে গন্ধে গা গুলিয়ে আসেতার। তবুও বন্ধুর জন্য দাঁতে দাঁত চেপে বিভিন্ন কথোপকথনের মাধ্যমে সেদিনের জন্যে ক্ষমা চায় প্রিয়া। এবং ১৪ ই আগস্ট ঠিক কি হয়েছিল রিচার সাথে সেটা জানার চেষ্টা করে।এদিকে রিচার শরীর আগের থেকে আরও খানিকটা অবনতি হওয়ায়, আজ কথা বলতেও বড় কষ্ট হচ্ছে মেয়েটার। তবুও অত্যন্ত মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে যে কথাগুলো সে প্রিয়াকে বলে তা খানিকটা এইরকম-

সেদিন তোদের মিথ্যে বলেছিলাম রে, আমার কোন আর্জেন্ট কাজ ছিলনা। বন্ধুদের মিথ্যে বলার শাস্তি এখন হাড়ে হাড়ে পাচ্ছি। তোদের সঙ্গে যদি সিনেমা যেতাম তাহলে আজ আমার এই অবস্থা হতো না। তোকে পুরো ঘটনাটা খুলে বলছি,৩রাআগস্ট থেকে আমি অনলাইনে একটা গেম খেলতে শুরু করি। যার নাম 'শপিং হান্টিং'। নাম শুনেই বুঝতে পারছিস গেমটার প্রতি আমি কেন ইন্টারেস্টেড হয়েছিলাম! গেমের নিয়ম ছিল ফিফটি লেভেল ক্রস করলেই একটি শপিং কুপন পাওয়া যাবে। যার দ্বারা নিজের শহরের যেকোনো বড় শপিং মল থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত শপিং করা যেতে পারে। আমি খুব কম দিনেই ফিফটি লেভেল ক্রস করি এবং প্রতিটা লেভেলেই তিনটিকরেস্টার পাই।

যে কারণে ওরা স্পেশালি আমাকে কনগ্রাচুলেশন মেসেজ পাঠিয়ে জানায় যে, আমাকে আনলিমিটেড শপিং করার অফার দেওয়া হয়েছে। অতি শীঘ্রই ওরা আমার সঙ্গে পার্সোনালি যোগাযোগ করবে। যেহেতু এই ধরনের পারফরম্যান্স খুব একটা দেখা যায় না, তাই ওদের অনুরোধ ছিল আমি যেন ব্যাপারটা কাউকে না জানাই। তুই তো জানিস শপিং করার নেশা আমার বরাবরের। তাই কাউকে জানানোর প্রশ্নই ওঠেনি। সেদিন ওয়াশরুমে আমি একটা আননোন কল রিসিভ করি। আমাকে বলা হয় যদি আমি শপিং এর অফারটা নিতে চাই, তাহলে যেনদ্রুত কলেজের গেটে পৌঁছে যাই। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে,"আপনারা আমার লোকেশন জানলেন কি করে?" ওরা বলেছিল"যেহেতু শপিং হান্টিং অনলাইন গেম, সেহেতু আপনার লোকেশন ট্রেস করা আমাদের কাছে কোন বড় ব্যাপার না"। আমিও বিশেষ কথা না বাড়িয়ে ঝটপট রওনা দিয়েছিলাম শপিংয়ের নেশায়।প্রথমে একটি বিরাট শপিংমলে যাইআমার পছন্দের ব্র্যান্ডের জামাকাপড়, জুয়েলারি বিপুল সম্ভার দেখে চোখ ধাঁধিয়ে যায়।প্রাণভরে শপিং করি।তারপর দৃষ্টি আকর্ষণ করেহ্যান্ড ব্যাগ এর কালেকশন গুলি।

আমি পছন্দ করে দুই তিনটে ব্যাগ হাতে নিয়ে দেখছিলাম। ঠিক তখনই শপিং হান্টিং গেমের যে প্রতিনিধি আমার সঙ্গে ছিল, সে আমাকে বলে,"আপনার যদি এক্সক্লুসিভ ব্যাগের শখ থাকে, তাহলে আপনার জন্য একটি গেম আছে। তবে এটা কিন্তু বেশ ডেয়ারিং গেম। আপনাকে একটি বন্ধ দরজা খুলে একাই একটি ঘরে প্রবেশ করতে হবে। যেখানে এক্সক্লুসিভলি একটিমাত্র ব্যাগ রাখা থাকবে। ঘরের চারিপাশে থাকবে নানান রকমের বিপদ। সেগুলো কাটিয়ে আপনাকে ব্যাগটি অর্জন করতে হবে।এই ব্যাগটিরকিন্তুদ্বিতীয় কোন কপি নেই। এই কোম্পানি এক্সক্লুসিভলি কয়েকটা স্যাম্পল বানিয়ে ছিল, যেগুলো একটি অপরটির থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অর্থাৎ বুঝতেই পারছেন That is priceless। একমাত্র আপনার কাছেই থাকবে সেই অমূল্য ব্যাগটি"।

কথাগুলো শোনার পর আমার এক্সক্লুসিভ কালেকশন এর ক্ষিদেটা আরও বেড়ে গিয়েছিল। আমি এক কথায় রাজি হয়ে যাই।ওনার সাথে এগিয়ে যাই একটা বন্ধ দরজার সামনে। দরজার লকটা খুলে দিয়ে উনি একপাশে দাঁড়িয়ে পড়েন। আমি প্রবেশ করি একটি সংকীর্ণ গলির মধ্যে। এক মুহূর্তের জন্য বেশ ভয় লেগেছিল। মনে হয়েছিল কোন ট্র্যাপে পড়লাম না তো?প্রবেশের সময় উনি বলেছিলেন একটি সংকীর্ণ গলির মধ্যে দিয়ে, বিভিন্ন বাধা অতিক্রম করে, আমাকে পৌঁছাতে হবে একটি ঘরের মধ্যবর্তী অংশে। সেখানে থাকা চ্যালেঞ্জ পূরণ করে ব্যাগসহ অপর একটি দরজা দিয়ে বেরোতে হবে। মৃদু নীলাভ

আলোয় জায়গাটা রহস্যময় এবং গা ছমছমে হয়ে উঠেছিল।প্রথম পদক্ষেপেই আঁতকে উঠেছিলাম।পায়ের কাছে শুয়ে ছিল একটা বিরাট পাইথন।কোনোক্রমে পাশ কাটিয়ে একটু ভিতরে ঢুকতেই দেখি মাথার উপর থেকে সুতো দিয়ে বাঁধা রয়েছে বেশ কিছু বল।এবংসেগুলির উপর বসে আছে একেকটি বড় লোমশ ট্যারেন্টুলা ।আমার গোটা গা শিরশিরিয়ে উঠেছিল। কিন্তু পালানোর পথ ছিল না।এমনিতেই মাকড়শা আমি ভীষণ ভয়পাই। কোনরকমে হামাগুড়ি দিয়ে ঐ অংশটা পেড়িয়েছিলাম। তবুও কোথা থেকে মাথায় একটা ট্যারেন্টুলা পড়ে যায়। আমি চিৎকার করে ওটাকে মাথা থেকে ফেলে দিয়েদৌড়ে পালাবার চেষ্টা করি। কিন্তু সামনেই শুয়েছিল চার-পাঁচটা মনিটর লিজার্ডের বাচ্চা।ওগুলো ভীষণ অ্যাগ্রেসিভ ছিল। জানিস লেজ ধরে এক একটাকে সরিয়ে ওখান থেকে পালাতে হয়েছে আমাকে। তারপর প্রবেশ করি একটা মাঝারি মাপের ঘরে। যার মাঝখানে একটা টেবিল সাদা চাদর পাতা। ঠিক তার ওপর রাখা একটি হ্যান্ড ব্যাগ। আরেকটি টেবিলে শুয়ে ছিল একটি মেয়ে। যার শরীরের নিম্নাংশ, মুখের খানিকটা অংশ এবং বাম হাতটিআঁশযুক্ত কোন সরীসৃপে রূপান্তরিত হয়েছে। তখন ভেবেছিলাম মেকআপ আর্টিস্ট দিয়ে এত সুন্দর করে মেকআপ কি করে করিয়েছে? কিন্তু এখন বুঝতে পারছি ওটা মেকআপ ছিলনা। আমার মতোই ঐ মেয়েটি সরীসৃপে রূপান্তরিত হচ্ছিল। মেয়েটি অত্যন্ত ক্ষীণ গলার আমাকে বলে ব্যাগটা হাতে নিয়ে তার কাছে যেতে। তারপর ওর পুজ রক্ত পড়া হাত দিয়ে ব্যাগটা ধরে আমাকে বলে "আজ থেকে আমার সবকিছু তোমায় দিলাম। তুমি এইসব কিছু গ্রহণ করতে ইচ্ছুক তো"? আমি তখন "হ্যাঁ" বলি। মেয়েটির তিনবার একই প্রশ্ন করে,এবং আমি হ্যাঁ বলি। ঘরটি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার রাস্তা মেয়েটি নিজেই দেখিয়ে দেয়। আমি সানন্দে ব্যাগটা হাতে করে সেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসি।মনেমনে ভাবি" ঘরটিতে প্রবেশ করাটা ডেয়ারিং কাজ হলেও, মেয়েটির কাছ থেকে ব্যাগ হাসিল করাটা এমন কিছু ডেয়ারিং ছিল না"। তখনও বুঝতে পারিনি যে নিজের জন্য কি বড় বিপদ সাথে করে নিয়ে আসছি। আজ দেখ আমার কি অবস্থা।

প্রিয়া বলে" অর্থাৎ ব্যাগটি হল সমস্যার উৎপত্তি স্থল। তুই বল কোথায় আছে ব্যাগটা? ওটাকে এখনই নিয়ে গিয়ে আমি গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিচ্ছি ! তাহলে সব সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। রিচা বলে"এত সহজ না রে! আমার মা-বাবাএতকিছু না জানলেও, তাদেরকে দিয়ে সেই চেষ্টা বহুবার করিয়েছি। কিন্তুব্যাগটা আমার কাছ থেকে দূরে নিয়ে গেলেই আমার তীব্র শ্বাসকষ্ট আরম্ভ হয়ে যায়। আমার মৃত্যু আসন্ন রে।

এটুকু বলেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে রিচা। সৌম্য কখন যে দরজার পাশেএসে দাঁড়িয়ে ছিল, ওরা দুজনে লক্ষ্যেইকরেনি। হঠাৎ করেই ঘরের মধ্যে ঢুকে এসে রিচার ডান হাতটা নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে, সজল চক্ষে বলে ওঠে,"তুই কোন চিন্তা করিস না, আমি আছি। তোকে কোনভাবেই আমি হারাতে পারবো না। সেই কলেজের প্রথম দিন থেকে তোকে বড্ড ভালোবাসি। কোনদিন বলতে পারিনি রে, তবে আজ বলছি, জীবনের শেষ বিন্দু দিয়েও, তোকে মূল জীবনস্রোতে আমি অবশ্যই ফেরাবো। উত্তরটা না হয় সেদিন দিস!"

* * *

What a game!Amazing! I have to try this game! তিন লাখ পর্যন্ত ফ্রী শপিং? জাস্ট ভাবা যায় না! নাম টাও জবরদস্ত,"শপিং হান্টিং"! প্রস্তুত হয়ে যান মশাই আপনাদের তিনলাখ খসাতে আমি শীঘ্রই আসছি!

মেয়েটি ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে বন্ধ দরজারদিকে। আর মাত্র পাঁচটি পদক্ষেপ। মেয়েটির ঠিক পিছনে আর একজনের পদক্ষেপ বোধহয় একটু স্খলিত। নীতি-নিয়ম, ভালোবাসা, অপরাধ বোধের মিশ্র অনুভূতিতে হুডির নীচে থাকা সজল চোখ দুটি কারোর নজরে পড়েনি।বন্ধদরজারওপারে মেয়েটি অদৃশ্য হতেই কয়েক ফোটা জল গাল বেয়ে চিবুকের কাছে নেমে এল। তবে বোঝা মুশকিল সেটা আনন্দাশ্রু, নাকি অনুশোচনার বহিঃপ্রকাশ!

বিস্মরণ

সুদীপ হাজরা

কাজগুলোকে সমাপ্ত করে অফিস থেকে বেরোতে বেরোতে বড্ড দেরি হয়ে গেল আজ। রাত প্রায় সাড়ে বারোটা বাজতে চলেছে। ভাগ্য ভালো লাস্ট ট্রেনটা পেয়ে গিয়েছিলাম, নয়তো প্ল্যাটফর্মে বসেই মশার কামড় খেয়ে রাত কাটাতে হতো। তবে এত রাতে যে কেউ আমার জন্য গ্যারেজ খুলে রাখবে না, সেটা নিশ্চিত ছিলাম। অগত্যা পায়ে হেঁটেই এগোতে থাকি বাড়ির পথে। স্টেশন থেকে খুব একটা দূর নয়।

রাস্তাঘাট একেবারে শুনশান, নিস্তব্ধ রাতের অন্ধকারে ঘুমিয়ে রয়েছে। গুড়িগুড়ি বৃষ্টিও পড়ছে। পলে পলে বিদ্যুতের ঝলকানিতে সামনের পথটা ফ্যাকাশে হয়ে উঠছে। "কে জানত, এই অসময়ে বৃষ্টি নামবে? জানলে ছাতাটা সঙ্গে রাখতাম। ধুর, আজকের দিনটাই খারাপ!" নিজের মনে কথাগুলো বিড়বিড় করতে করতে এগিয়ে চলেছি ভেজা রাস্তাটার উপর দিয়ে। কিছুটা এগোতে আচমকাই কানে এল একটা ক্ষীণ শব্দ। বহু পুরোনো কোনো লোহার বাক্সকে ধীরে ধীরে খুললে যে রকম শব্দ হয়, অনুরূপ সেই শব্দ। কয়েক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে রইলাম একই জায়গায়। মনে কৌতূহলের সঙ্গে একটা মৃদু ভয়ও যে বাসা বেঁধেছিল, সেটা বুঝতে পেরেছি। আসলে যে পথ দিয়ে হেঁটে চলেছি তার পাশেই একটা বিস্তীর্ণ সীমানা জুড়ে রয়েছে কবরস্থান। সেটা মনে পড়তেই আমার বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। সময়ের চলনের সাথে সাথে শব্দটাও মিলিয়ে গেল বাতাসের দমকে। আর দাঁড়ালাম না। এমনিতেই অনেক লেট হয়ে গেছে। মনের ভুল ভেবে অন্য কোনো দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে দ্রুত পায়ে এগোতে থাকি। কিন্তু যতই চলি পথ যেন কিছুতেই শেষ হতে চায় না। বোধহয় খানিক ভয় পেয়েছি বলেই হয়তো অন্য।দিনের তুলনায় আমার পায়ের গতি শ্লথ হয়ে গেছে আজ। বুকের ভিতরেও একটা মৃদু কম্পন অনুভব করতে পারছি। থেকে থেকে জানি না কেন এমন মনে হচ্ছে, যেন কেউ বা কারা আমাকে অনুসরণ করে হেঁটে চলেছে। হাওয়ার শব্দের মাঝেও স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি কারোর ফিসফিসানির শব্দ। কিন্তু বেশ কয়েকবার ঘাড় ঘুরিয়েও কাউকে

দেখতে পেলাম না। চারিদিক শূন্যতায় খাঁ খাঁ করছে। পায়ের গতি বাড়িয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে বাড়ির সামনে এসে স্বস্তি পেলাম। কাজের সূত্রে এখানে একাই থাকতে হয় আমাকে। ব্যাগ থেকে চাবি বের করে তালাটা খুলতে যাব, হঠাৎ আমার পাশ থেকে ভেসে আসা একটা কণ্ঠে চমকে উঠলাম। চাবিটা পড়ে গেল আমার কম্পিত হাত থেকে।

"প্রায় চার ঘন্টা ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে আছি এখানে। তোর যে এতটা লেট হবে বলতে পারতিস ভাই। কোনো হোটেলে থেকে যেতাম তাহলে।" পাশ ফিরে দেখি আমার ক্লাসমেট কুশল দাঁড়িয়ে। একটু বিরক্তিভরে ও আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আমি বললাম, "তুই যে এখানে আসবি সেটা আগে বলিসনি কেন? তাহলে তো আমি..." আমাকে থামিয়ে কুশল বলে, "ভাই আফতাব, কাল সকালে আমার একটা ইন্টারভিউ আছে, সেটা তুই ভালো করেই জানিস। প্লিস এখন ইয়ার্কি না মেরে দরজাটা খোল। দ্যাখ, রাত একটা বাজতে যায়। এখন না ঘুমোতে পারলে সকালে উঠতেই পারব না।"

"যাহ্ বাবা! আমি কোথায় ইয়ার্কি মারলাম? ও কি আমায় এখানে আসার ব্যাপারে আগে জানিয়েছিল? কী জানি! এত কাজের চাপে ভুলে গেছি হয়তো।" কিছুক্ষণ ভেবেও বিস্মৃত কথাগুলো কিছুতেই যেন মনে পড়ল না। চাবিটা কুড়িয়ে তালা খুলে ভিতরে ঢুকলাম। ফ্রিজে কিছু খাবার রাখা ছিল। সেগুলোকেই গরম করে খেয়ে নিলাম দু'জনে। তারপর শুয়ে পড়লাম। বেশ কিছুক্ষণ পর, সময় ঠিক ক'টা হবে জানি না, তেষ্টায় গলাটা শুকিয়ে গেল আমার। ঘুমের চোখেই টেবিলে হাত বাড়িয়ে দেখি, জলের গ্লাসটা ফাঁকা। কুশল তখন বেঘোরে নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে। বিছানা থেকে নেমে জল আনতে আমি কিচেনের দিকে যাই। বাইরে তখনও ফোঁটা ফোঁটা শব্দে বৃষ্টি হয়ে চলেছে। ফ্রিজ খুলে একটা জলের বোতল বের করলাম। তারপর সেটাকে নিয়ে বেডরুমের দিকে যাচ্ছি; না চাইতেই আমার চোখ পড়ল কিচেনের জানালাটির দিকে। ধোঁয়ার রাশি যেন আবৃত করে রেখেছে ঘরের জানালাটিকে। "কিন্তু এখন তো শীতকাল না, যে কুয়াশা জমবে। তাহলে ওটা কিসের ধোঁয়া?" কৌতূহলী মনে এগিয়ে গেলাম সেইদিকে। জানালার কাছে যেতেই অনুভব করলাম, একটা হিমসিক্ত বাতাস খেলে গেল আমার ঘাড়ের আশেপাশে। হাওয়ার স্বরে ফিসফিসিয়ে কেউ কিছু বলল বলে মনে হলো। শীতল শিহরণের চকিত স্পর্শে সামান্য কেঁপে উঠল শরীরটা। মুহূর্তেই দেখি, একটা কদাকার মূর্তি এসে হাজির হয়েছে জানালার বাইরে। তার রক্তাভ চোখদুটো তীব্র জ্বলজ্বল করছে। বিষম, অদ্ভুত একটা গোঙানিতে আমি সজোরে ছিটকে পড়ি মেঝের উপর। সেইসাথে হাতে থাকা

বোতলটা নিচে পড়ে গড়িয়ে গেল। গলা থেকে তখন আর্তনাদের স্বরটাও হারিয়ে গেছে। কিছু মুহূর্তের জন্য হতভম্বের মতো থমকে বসে রইলাম একই জায়গায়। বুকের ভিতর শিহরণের হিমস্রোত ঢেউয়ের ন্যা য় আছড়ে পড়ে করাঘাত করে চলেছে সমানে। জানালার দিকে পুনরায় ফিরে তাকানোর সাহস হলো না আমার। কোনোক্রমে নিজের অবসন্ন শরীরটাকে মেঝে থেকে তুলে দৌড়ে গেলাম বেডরুমে। দ্রুত লাইটের সুইচ অন করে কুশলকে জাগালাম ঘুম থেকে। কম্পিতকণ্ঠে অনর্গল বলে চললাম, "ভাই... ভাই, কিচেনের বাইরে কেউ একটা আছে জানিস। চল না একবার..."

আধঘুমো চোখদুটো মুছতে মুছতে কুশল আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। বোধহয় ঘুমের ঘোরে আমার বলা কথাগুলোকে ঠিক করে শোনেনি সে। আমি কুশলের হাতটা ধরে তাকে টানতে টানতে নিয়ে গেলাম কিচেনে। অবাক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম জানালার কাঁচের দিকে। সেখানে তখন আর কাউকে দেখতে পেলাম না। বোতলটা দরজার এক কোণে মুখ লুকিয়ে স্থিরভাবে পড়ে রয়েছে। কুশল বলে উঠল, "কই? কোথায় কে?"

"জানি না। একটু আগে জল নিতে এসে ওই জানালার বাইরেই আমি একজনকে দেখেছিলাম। ক্রুদ্ধচোখে সে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। ওই দ্যাখ ভাই, বোতলটাও আমার হাত থেকে ছিটকে মেঝেতে পড়ে গেছে।"

পড়ে থাকা বোতলটার দিকে একবার তাকিয়ে কুশল বলল, "যেকোনো সিরিয়াস বিষয় নিয়ে ইয়ার্কি মারাটা তোর চিরকালের স্বভাব। শান্তিতে একটু ঘুমোতেও দিবি না দেখছি! বুঝতে পারছি যে, আমার এখানে আসাতে তুই বিরক্ত হয়েছিস। ফোনেই তো সেটা ডিরেক্ট বলে দিতে পারতিস। তাহলে আর আসতাম না।"

"না'রে ভাই, না। একদমই সেরকম না। তুই ভুল বুঝছিস। আমি সত্যিই..."

আমার কথাকে উপেক্ষা করে কুশল চলে গেল বেডরুমের দিকে। বরাবরই ও একটু বেশিই বদমেজাজী আর খিটখিটে। কাঁচা ঘুম ভাঙানোর কারণে আমার উপর ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ হয়েছে সে। কিন্তু আমি তো কোনো মজা করিনি। আমি যেন কুশলকে বোঝাতেই পারলাম না যে, একটু আগে আমি কী দেখেছি? বোতলটাকে তুলে আমিও বেরিয়ে গেলাম কিচেন থেকে। চোখ না চাইতেও দরজাটা বন্ধ করার আগে কৌতূহলবশত গিয়ে পড়ল জানালাটির দিকে। সেখানে পুরু হয়ে জমে থাকা বৃষ্টির ফোঁটাগুলোই নজরে পড়ল কেবল। বুকের উপর থেকে ভয়ের পাহারটা ক্রমশ হালকা হতে লাগল। "এতটা ভুল দেখলাম?

কী জানি! হয়তো ঘুমের চোখে ভুলই দেখেছি। তার উপরে কাজের যা প্রেসার, তাতেই হয়তো..." নিজের মনকে সান্ত্বনা দিতে দিতে বেডরুমে চলে গেলাম। কিন্তু আমার উদ্বিগ্ন মন কিছুতেই শান্ত হতে চাইছে না।

বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করতে থাকি। কিছুতেই আর ঘুম আসছে না আমার দু'চোখে। চোখ বুজলেই মনের অজান্তে যেন চোখের সামনে ফুটে উঠছে পলকের জন্য দেখা সেই ভয়ানক মূর্তিটি। আরও কিছুক্ষণ পর গভীর নিস্তব্ধতার মাঝে প্রবল বেগে দরজার ঠকঠকানিতে কেঁপে উঠলাম রীতিমতো। আমার সারা শরীর কোনো এক অজানা ভয়ের ভাবনায় আড়ষ্ট হয়ে আসতে থাকে। বুক চিরে হৃদপিণ্ডটা বেরিয়ে আসার উপক্রম! "কে এল এত রাতে? সেই ভয়ংকর মূর্তিটি নয়তো?" মনের আকাশে ছায়ার মতো খেলে বেড়াতে লাগল আতঙ্কের হাতছানি। সেই মুহূর্তে কুশলকে ডাকার শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমার গলার স্বর পুরোপুরি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ পর দরজার আওয়াজ থেমে গেলে ঘরের ভিতরেই উপলব্ধি করলাম কারোর উপস্থিতি। একজন নয়, বেশ কয়েকজন। তারা যে মানুষ নয়, তা বিলক্ষণ বুঝতে পারছি। সারা ঘরময় একটা হিমশীতল উষ্ণতা। হাওয়ার স্বরে তারা ফিসফিসিয়ে কথা বলে চলেছে পরস্পরের সাথে। চাদরটাকে আপাদমস্তক ঢেকে জড়োসড়ো হয়ে কাঁপতে থাকলাম থরথর করে। গলা বেয়ে, বুক বেয়ে কীটের ন্যায় খেলে বেড়াচ্ছে ভয়ের বিভীষিকা। সচকিতে আমার ভাবনায় ফুটে উঠল একটা কথা। "ঘরের ভেতর এতসব ঘটনা ঘটছে, আর কুশল কেমন দিব্যি নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে। আশ্চর্য তো! কিছুই কি ওর কানে যাচ্ছে না? নাকি ওর জন্যই এসব..." রাত শেষ হয়ে সকাল হওয়ার অপেক্ষায় প্রহর গুনতে থাকি অনবরত। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল, অশরীরীরা যেন আমার শরীরের উপর চেপে বসছে। ভারী হয়ে আসতে থাকে অবসন্ন শরীরটা। তবুও মুখ বুজে গুটিসুটি পাকিয়ে শুয়ে থাকি বিছানার একপাশে ফিরে। "কাল সকাল হলেই ওকে বিদায় করব বাড়ি থেকে। কুশল আসার পর থেকেই এসব ঘটছে আমার সাথে।" ভয়ার্ত মনে চিন্তা করে চলি কথাগুলো। তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, বা আদৌ ঘুমিয়েছিলাম না অচেতন হয়ে ছিলাম; সেসব কিছু মনে নেই আমার।

চোখ খুলতেই দেখি, জানালার কাঁচ ভেদ করে মৃদু আলো এসে পড়েছে ড্রেসিংটেবিলের উপর। বৃষ্টি থেমে গেলেও আকাশ মেঘের অন্ধকারে অস্পষ্ট। পাশ ফিরতেই দেখলাম, কুশল বিছানাতে নেই। "নিজে থেকেই বিদায় হয়েছে মনে হয়। কে জানে, কী মতলব নিয়ে এখানে এসেছিল? যাক বাবা! কাল রাতে যা ঘটল..." কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর বিছানা ছেড়ে উঠে ড্রইংরুমের দিকে

গেলাম। শরীরটা যেন বড্ড ফ্রেশ লাগছে। ঘড়িতে তখন ন'টা বাজে। সহসা চোখ পড়ল পাশে চলতে থাকা টিভিটার দিকে। "নিশ্চয়ই কুশল ওটাকে চালিয়ে বন্ধ করতে ভুলে গেছে। আজ ওর ইন্টারভিউ আছে বলেছিল। সেখানেই গেছে হয়তো।" ভাবতে ভাবতেই রিমোটটা হাতে নিয়ে টিভিটা অফ করতে যাব, কিন্তু কিছু মুহূর্তের জন্য আমার চোখদুটো যেন থমকে গেল। খবরের হেডলাইনে মোটা মোটা অক্ষরে লেখা ওটা কী? "আজ সকালে রেললাইনের নিকটবর্তী একটি জায়গা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে এক যুবকের মৃতদেহ। লাশের অবস্থা খুবই মর্মান্তিক। মৃত ব্যযক্তির ওয়ালেট থেকে পাওয়া গেছে একটি ছবি ও কিছু কাগজপত্র।" পড়তে পড়তে টিভির স্ক্রীনে ফুটে উঠল যুবকের ছবিটা। সেটিকে দেখামাত্রই প্রবল বেগে করাঘাত পড়ল আমার হৃদয়ে। অসাড় শরীরে আমি ধপ করে পড়ে গেলাম মেঝের উপর। "টিভিতে কিসব দেখাচ্ছে ওগুলো? আমার মৃত্যু হয়ে গেছে? একটা জীবন্ত মানুষকে এভাবে মৃত বানিয়ে দিল?" উদ্ভ্রান্তের মতো ভাবতে ভাবতেই পুনরায় অনুভব করলাম, গতকালের সেই হিমশীতল তাপমাত্রাটির সাথে হাওয়ার স্বরে কথা বলার শব্দ। চোখের পলক না পড়তেই দেখি, কালো ধোঁয়ার মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে জেগে উঠছে অশরীরীরা, চারিপাশ থেকে ওরা ঘিরে ফেলেছে আমায়। আমি আর্তনাদ করার চেষ্টা করলেও মুখ দিয়ে বের হয় কেবল অস্পষ্ট গোঙানি। দিনের আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে তাদের মুখগুলো। তারা যে আমারই পরিচিত অতীত। কিন্তু আমার থেকে কী চায় তারা? মুখে হাত চেপে বসে রইলাম অনেকক্ষণ, অশরীরীদের ছায়ার মাঝে। মনের অকপটে আবছা আলোর মতো ক্রমশ ভেসে উঠছে গত রাতের হওয়া অ্যাক্সিডেন্টের দৃশ্যটা। "ট্রেন থেকে নেমে আমি যখন লাইন ক্রস করছিলাম, ঠিক তখনই বিপরীত প্রান্ত থেকে ধেয়ে আসা একটা ট্রেনের ধাক্কাতে অজানায় ছিটকে পড়েছিল আমার শরীরটা। কিন্তু আমার মৃত্যু ঘটল কখন? এই তো আমি দিব্যি বেঁচে আছি।"

ধীরে ধীরে লক্ষ্য করি আমার শরীর চুঁইয়ে স্রোতের মতো বেরিয়ে আসছে রক্তধারা। তবে আমার একটুও যন্ত্রণার অনুভূতি হচ্ছে না তাতে। সারা শরীর যেন প্রাণহীন পাথরের ন্যাআয় নতজানু হয়ে রয়েছে আমার পরিজনদের অতীতের সম্মুখে। তারপর একসময় অনুধাবন করি, ক্রমশ আমার শরীরটা হালকা হতে হতে ভেসে চলেছে শূন্যরতার অভিমুখে। ততক্ষণে বুকের মধ্যে থেকে সমস্ত ভয়ের অনুভূতিগুলো মেঘলা আকাশে হারিয়ে গেছে। আমি ভেসে চলেছি কোনো এক অজানা ঠিকানার প্রান্তে, সাথে রয়েছে আমারই চেনা পরিজন।

কুজাম্মা

মৌলী কুন্ডু

বিবেকানন্দ উইমেন্স কলেজের বোটানি বিভাগের ত্রিশজন ছাত্রী ,দুই প্রফেসর,দুজন ননটিচিং স্টাফ ও ট্রাভেল এজেন্সির চারজন লোক সকাল সাতটায় দুটো মিনিবাসে ব্যাঙ্গালোর থেকে রওনা হলো কোদাইকানালের পথে। কলেজের বোটানি বিভাগের এবারের এক্সকারশান ঠিক হয়েছে ব্যাঙ্গালোর, কোদাইকানাল,উটি ও মাদুরাইতে। নির্দিষ্ট দিনে যশোবন্তপুর এক্সপ্রেসে ব্যাঙ্গালোরে আসার পর সেখানেই দুদিন কাটে।

এরপর ব্যাঙ্গালোর থেকে কোদাইকানাল। পথে বন্দীপুর ফরেস্টে থেমে সেখানেই দুপুরের খাওয়াদাওয়া করে নিয়েছে সকলে। সেখানে ফরেস্ট দেখে ছাত্রী শিক্ষক সবার মন খুব উৎফুল্ল। বন্দিপুর ফরেস্ট থেকে তাদের বাস ছাড়তে বেশ একটু দেরীই হয়ে যায়। পরন্ত বিকেলে সূর্যের কমলা হলুদ আলোয় কোদাইকানালের পথে নীল সবুজ পাহাড় দেখে মনে হচ্ছিল স্বর্গ যদি থাকে, তা বোধহয় এখানেই আছে। তারা যখন কোদাইকানাল পৌঁছালেন তখন সন্ধ্যে সাতটা বেজে গেছে। কিন্তু সেখানে পৌঁছে তো মাথায় হাত, যে হোটেলে তাদের বুকিং ছিল সেখানে গিয়ে শোনা গেল সেখানে নাকি ট্রাভেল এজেন্সির লোকেরা কোনো বুকিংই করেনি। আর পুরো হোটেল নাকি বুকড সেখানে কোনো জায়গাও ফাঁকা নেই। এ.জি স্যার তো রেগে আগুন, কি ব্যাপার সব পেমেন্ট করা হয়েছে বুকিং হয়নি কেন?

ট্রাভেল এজেন্সির হেড রমেশবাবু জানান কোনো কারণে ব্যাংক ট্রান্সফার নাকি আটকে যাওয়ায় বুকিং হয়নি। সকলে তখন অকূল পাথারে পড়ে, এই মার্চের সময়টা এখানে টুরিস্ট সিজন । এখন এতগুলো মানুষের থাকার কোনো জায়গাও পাওয়া যাবে না। এই ভর সন্ধ্যে বেলা এতগুলো মেয়েকে নিয়ে তারা যাবেন কোথায়? মেয়েদের বাসে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে তারা হন্যে হয়ে থাকার জায়গা খুঁজতে লাগলেন। এই সময়েই রমেশ বাবু বাবু একটা গেস্ট হাউসের খবর নিয়ে এলেন। আর কোনো উপায় না থাকায় সেখানেই যাওয়া ঠিক হলো।

সেখানে যখন বাস গিয়ে পৌঁছলো তখন চারিদিকে অন্ধকার ঘুটঘুট করছে।

তাই আশপাশে কি আছে বোঝার উপায় নেই। তবে বাস যে কোনো জনবসতি হীন জায়গা দিয়ে বেশ কয়েক কিলোমিটার এসেছে তা বেশ বোঝা গেল। গেস্টহাউসে পৌঁছাতে রাত বারোটা বেজে যায়। সবার চোখ তখন ঘুমে বুজে আসছে। সেই গেস্টহাউসে শুধু দুজন লোক একজন মালিক কাম ম্যানেজার আর একজন কেয়ারটেকার। সারাদিনের ক্লান্তিতে কোথায় কি কারোর আর দেখার কোনো ইচ্ছা ছিল না। ট্রাভেলএজেন্সির রাঁধুনিরা ঝটপট খিচুড়ি বানিয়ে দিলে তাই খেয়ে সবাই মোটামুটি কয়েকটা ঘর দেখে নিয়ে শুয়ে পড়ল।

সকালে সবারই উঠতে বেশ বেলা হলো। কিন্তু উঠে সবাই যখন বাইরে এল বাইরের দৃশ্য দেখে সবার মনটা বেশ ভালো হয়ে গেল। এ.জি স্যার তো আরো খুশী। সেখানে চারিদিক পাহাড়ে ঘেরা, আর তার মাঝখানে বিভিন্ন জংলী রংবেরঙের ফুলের গাছ আর লতা গুল্মের মেলা। যাকে বলা যায় বোটানির স্বর্গ। না জানি সেখানে কতরকম গাছের স্পিসিস পাওয়া যাবে। তার মাঝখানেই দাঁড়িয়ে আছে ওই দোতলা সাদা রঙের ম্যাগনোলিয়া গেস্টহাউস। সেখানকার জঙ্গলেই ঠিক হলো ফিল্ডওয়ার্ক অর্থাৎ গাছসংগ্রহ ও অন্যান্য কাজ হবে। সেইমতো সব মেয়েরা বেরোতে যাবে এমন সময় ম্যানেজার এসে বললো, "গেস্টহাউস থেকে দক্ষিণে একটা জায়গা কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা আছে সেখানে যেন কোনো গাছ ছেঁড়া না হয়।"

তাই কেউ আর ওদিকটায় গেল না। কিন্তু পৌলমী একাই দক্ষিণে এগিয়ে গেল। সেখানে দেখলো প্রায় তিনশ স্কোয়ারফুট অঞ্চল কাঁটাতারে ঘেরা। তারমধ্যে একটা চকচকে নীলপাতা ও দেহবিশিষ্ট লতানো গাছ মাটিতে ছড়িয়ে আছে। অবশ্য মাটি ঠিক না কিছুটা পাথরের মেঝের মতো জায়গাটা। লতাটা দেখতে অনেকটা আলপোনায় যে লতার নকশা আঁকা থাকে ঠিক সেইরকম। পৌলমী ভাবলো এর একটা ছোটো ডাল ছিঁড়লে কি আর ক্ষতি হবে, লতাটা দেখতে বেশ অদ্ভুত এর আগে এরকম লতা কখনো সে দেখেনি। এ.জি স্যার এরকম একটা গাছ দেখে নিশ্চই খুব খুশী হবেন। কিন্তু সে নেবে কিভাবে? তখনই তার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। একটা কাঁচির দুটো দিকের সাথে রাবার ব্যান্ড দিয়ে সে আশপাশ থেকে জোগাড় করা দুটো গাছের ডাল বেঁধে নিল। তারপর কাঁটাতারের বেড়ার গায়ে যে ফাঁক ছিল তার মধ্যে দিয়ে সেটা গলিয়ে লতাটার একটা ডাল সন্তর্পনে কেটে নিল। ঠিক একই ভাবে সেটা একটা চিমটি দিয়ে তুলে আনল। এসব জিনিস তার বায়োলজি বক্সের মধ্যেই ছিল।

কিন্তু অদ্ভুতভাবে সেই ডালটা ভাঙার সাথে সাথে সেটা শুকিয়ে গেল আর

যেখান থেকে সেটা ভাঙা হয়েছে সেই জায়গাটা থেকে গাছটাও শুকাতে শুরু করল। পৌলমী কিরকম যেন ভয় পেয়ে সেখান থেকে পালাল।

অন্য মেয়েদের কাছে পৌঁছাতে তারা বলে উঠল, "কিরে এরকম ভাবে ছুটে এলি কেন? আর খুব ভয় পেয়েছিস মনে হচ্ছে, কিছু দেখেছিস নাকি?"

-"না না কিছু হয়নি।"

তখন দুপুর হয়ে যাওয়ায় তারা গেস্টহাউসে ফিরে গেল লাঞ্চের জন্য। তাদের যখন খাওয়াদাওয়া শেষ হলো তখন মাঝদুপুর। চারদিকে ঝকঝকে রোদ। কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে যেন চারিদিক কালো ধোঁয়ার মতো ফগে ঢেকে গেল। সমস্ত চরাচর যেন সেই ধোঁয়ায় অন্ধকার করে এল। তার মধ্যেই ম্যানেজার ছুটে এল বোটানি টিমের কাছে। ওনার সঙ্গে যে কথাবার্তা হলো তার তর্জমা করলে দাঁড়ায় কিছুটা এইরকম,-"আপনাদের এত করে বারণ করলাম তাও আপনারা দক্ষিণের লতা ছিঁড়লেন?" ছাত্রীরা সবাই সমস্বরে বলল, "নানা আমরা তো কেউ ঐদিকে যাইনি।"

শুধু পৌলমী চুপ করে ছিল, ধীরে ধীরে সে মুখ খুলল, "ইয়ে... মানে... আসলে আমি ভুল করে..." ম্যানেজার ওকে মাঝ পথে থামিয়ে বললেন,-"ছিঁড়েছেন তো? এইজন্যই এই গেস্টহাউস বন্ধ করে দেবো ঠিক করেছিলাম।" শংকর স্যার বললেন," আসলে ব্যাপারটা কি বলুন তো?" ম্যানেজার স্বভয়ে বললেন, "আপনার ওই ছাত্রী এখানকার এক অভিশাপকে মুক্ত করে দিয়েছে। প্রায় দুহাজার বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষ ওদের বন্দী করেছিল। কিন্তু আর কোনো কথা নয় আমাদের এখন পালাতে হবে।"

এ.জি স্যার বলে উঠলেন, "ঠিক আছে, তবে আমাদের সাথে বাস আছে ওতেই যাওয়া যাবে। সবাই জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও।" ম্যানেজার আবারও বললেন "এত টাইম নেই স্যার। যে অবস্থায় আছেন পালান।" এই বলে সে বাসের দিকে দৌড়ালো। সেখানে আর যারা ছিল তারাও এক আজানা আশঙ্কায় পড়িমরি করে বাসে গিয়ে উঠল। বাস ছাড়ল। এ.জি স্যার ম্যানেজারকে বললেন -"এবার বলুন তো কি ব্যাপার?"

"আজ থেকে প্রায় দু হাজার বছর আগে এই জায়গায় একটা গ্রাম ছিল। কিন্তু হঠাৎ সেই গ্রামে নেমে আসে অভিশাপ। কোথা থেকে যেন সেখানে উপস্থিত হয় কুজাম্মা নামে একটা রাক্ষসগোষ্ঠী। তারা যখন আসতো চারিদিক এরকম কলো ধোঁয়ায় ভোরে যেত। গ্রামের মানুষকে ওরা কাঁচা চিবিয়ে খেতো। ওরা অমর কোনোভাবে ওদের শেষ করা যায় না। ওদের এমন ক্ষমতা আছে

যাতে ওরা সামনের মানুষদের হিপনোটাইজ করে চেনা মানুষের ছদ্মবেশে দেখা দিতে পারে। এই ছদ্মবেশে ওরা শিকারকে বশীভূত করে নিজেদের দলের কাছে নিয়ে যায় আর সবাই মিলে খেয়ে শেষ করে ফেলে। কুজাম্মার একমাত্র দুর্বলতা নিলামধরী লতা । এই লতা ওদের সামনে নিয়ে গেলে ওরা দুর্বল হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। তবে এই লতার কোনো ডাল যদি ছেঁড়া হয় তাহলে গাছটা মারা যায়। গ্রামবাসীরা কুজাম্মাকে শেষ করার জন্য একটা কৌশল করে। গ্রামের বাইরের দিকে এক শুকনো কুয়ায় গ্রামের সব মানুষ গিয়ে নামে। যেন কুজাম্মাদের হাত থেকে বাঁচার জন্যই তারা সেখানে লুকিয়েছে। কুজাম্মারা সেই কুয়ায় শিকার আছে বুঝতে পেরে তারমধ্যে নামে । সেখানেই নরমেধযজ্ঞ চালায়। কিন্তু সেইসময় চারজন গ্রামবাসী বাইরে ছিল। তারা কুয়ার মুখ পাথর দিয়ে বন্ধ করে দেয় । তার চারদিকে আর পাথরের ওপর নিলামধারী লতা লাগিয়ে দেয় যাতে ওই কুয়ার নিচেই কুজাম্মারা আজন্মকালের জন্য ঘুমিয়ে পড়ে। তারপর সেই গ্রামের চারিদিকে নিলামধারী লতা লাগিয়ে তারা আশপাশের গ্রামেও এই ব্যাপারটা জানিয়ে দেয়। প্রকৃতির নিয়মে আর গরম বেড়ে যাওয়ায় সেই সব লতা ধীরে ধীরে মরে যায়। শুধু সেই কুয়ার উপরের লতাটুকু থেকে যায়। এত বছর পর আমরা এখানে জমি পাওয়া সহজ ছিল বলে গেস্টহাউস তৈরী করি রোজগারের আশায়। ওই কুয়ার জায়গাটাও ঘিরে দি। কিছুদিনের মধ্যেই আমরা আমাদের ভুল বুঝতে পারি। এখানে থাকা ঠিক নয় তাই গেস্টহাউস তুলে দেবো ঠিক করি। সেই সময়েই আপনারা এলেন। মানুষকে কোনো কাজে আটকালে তারা সেটাই বেশী করে। আপনারাও তাই করলেন।"

ঠিক সেইসময়েই দেখা গেল বাসে যে হেল্পার ছিল সেতো নেই। আর যে বাস চালাচ্ছে সে ড্রাইভার না। সবাই ভয়ে চিৎকার করে উঠল, "বাস থামাও"। বাস থামলো, আর ড্রাইভারের সিট থেকে যে এগিয়ে এল তার চামড়া সাদা কাগজের মতো ফ্যাকাশে, পেশীবহুল কালো ছোপযুক্ত শরীর সম্পূর্ন উলংগ,উচ্চতা আট ফুটের কাছাকাছি। মাথায় কোনো চুল নেই ,চোখের কোটরে দুটো কালো মনি, নাক বা কান নেই মাথার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত বিস্তৃত লাল ওষ্ঠবিশিষ্ট মুখে তীক্ষ্ণ ছুঁচালো দাঁতের সারি। বাসের জানালা ও দরজা ভেঙে আরো কিছু ওরকম জীব উঠে এল। তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল বাসের মানুষগুলোর উপরে। তবে কয়েকজন ছাত্রী বাস থেকে পালিয়ে গেস্টহাউসে গিয়ে ঢুকলো। ওরা জানে না কুজাম্মাদের ওই গেস্টহাউসের বাধা আটকাতে পারবে না। পৌলমী ছুটলো গেস্টহাউসের বিপরীতে। কিন্তু এভাবেও তো সে কুজাম্মার হাত থেকে বাঁচতে পারলো না।

* * *

ছুটতে ছুটতে পৌলমীর পা দুটো মনে হলো এত ভারী হয়ে গেছে যে সেগুলো টানতে টানতে আর এগোনো যাচ্ছেনা। কিন্তু মৃত্যুভয় যে বড়ো বালাই, শরীরের সব কষ্টই তার সামনে তুচ্ছ। আচ্ছা এটা কি স্বপ্ন? এরকম স্বপ্ন তো সে অনেকবার দেখেছে। এইভাবে ছুটতে ছুটতে শরীরে আর এগোনোর এক ফোঁটা ক্ষমতা নেই। ভয় আতঙ্কের সীমা যখন অতিক্রম করে যায় তখনই দুঃস্বপ্নের জগৎ তাকে একটা সজোরে ধাক্কা মেরে বাস্তবের জগতে ফিরিয়ে দেয়। কিন্তু এবারে সেরকম কিছুই ঘটলো না, কারণ এটাই বাস্তব চরম বাস্তব। হঠাৎ কাঁধের উপর একটা ঠান্ডা হাতের স্পর্শে সে পিছন ফিরে তাকাল। পৌলমীর সব ভয় যেন গলে জল হয়ে গেল। এ.জি স্যার, যাক স্যার বেঁচে আছেন, আর কোনো ভয় নেই। এ.জি স্যার বলে উঠলেন, "আরে পৌলমী তুমি এইদিকে কোথায় যাচ্ছ আমার সাথে চলো।" পৌলমী বিনাবাক্যব্যয়ে কোনো কিছু চিন্তা না করেই স্যারের সাথে এগিয়ে চলল।

গাঢ় কালো অন্ধকার এতই নিরেট, যে তা যেন ছুঁড়ি দিয়ে কাটা যাবে। সেই অন্ধকারে পৌলমী যেন এক কাল্পনিক অস্তিত্বের পিছনে এগোচ্ছে। বেশ খানিকক্ষণ হাঁটার পর পৌলমী আবার সেই অভিশপ্ত গেস্টহাউসটার সামনে এসে পড়ল। ওটার দোতলার ঘরের কাঁচের বন্ধ জানলায়, হলদে বাল্বের আলোয় এখনও কতকগুলো লাল রক্তমাখা হাতের ছাপ স্পষ্ট হয়ে আছে। পৌলমীর গলা থেকে তীক্ষ্ম একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল। ওর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে কিছু ভয়ঙ্কর মূর্তি। পৌলমী সেই ঘর থেকে নীচের দিকে আসা বাল্বের আলোর হাল্কা আভায় দেখতে পেলো এ.জি স্যারের শরীরটা যেন লম্বা হয়ে যাচ্ছে, দৈর্ঘ্যে প্রায় আট ফুট। সমস্ত জামাকাপড় ছিঁড়ে বেরিয়ে আসছে ফ্যাকাশে সাদা কাগজের মতো চামড়াযুক্ত পেশীবহুল শরীর। মাথা থেকে সমস্ত চুল নিমেষের মধ্যে খসে পড়ল। মাথাটা পিছনদিকে ঘুরিয়ে সেই জীবটা কালো গোল দুটো চকচকে চোখের দৃষ্টি নিয়ে পৌলমীর দিকে তাকালো। সেই চোখের দিকে তাকিয়ে পৌলমীর মনের মধ্যে দলা পাকানো ভয়টা নিজের চরম আত্মপ্রকাশ ঘটালো। পৌলমী অজ্ঞান হয়ে ধপ করে মাটিতে পড়ে গেল।

পৌলমীর পিছনে থাকা মূর্তিগুলি এরপর সামনে এগিয়ে এল। তারাও দেখতে সামনের জীবটির মতোই হয়ে গেল। তারা একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়ল পৌলমীর লুটিয়ে পড়া দেহটার উপর। কয়েক সেকেন্ড পর জীবগুলি সেখান থেকে চলে যেতে দেখা গেল, সেখানে চাপচাপ রক্ত আর মানুষের হাড়গোড়, জামাকাপড়ের টুকরো স্তূপীকৃত হয়ে আছে। জামাকাপড় গুলো যে পৌলমীর তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

শেষ দৃশ্য

সায়নী ঘোষ

অরণ্য এবার ফাইনাল ইয়ার দেবে। হোস্টেল ছেড়ে দিয়ে গ্রামেই ফিরে যাবে ঠিক করেছে। বহু পুরোনো জমিদার বাড়ি ওদের। বাবা মা কাকা কাকিমা বার বার চলে আসতে বলছেন। কাছাকাছি কোথাও মাস্টার্স করে নেওয়া যাবে। দিদিয়া কলকাতাতেই থাকে। রোজ সকালে একবার করে ফোন করে চলে আসতে বলে। আজ এখনো বলে নি। অরণ্য আজ কেমন জিতে যাওয়ার অনুভূতি পেল। প্রথমে ফোন করে কিরে আমাকে ভুলে গেলি বলার আনন্দই আলাদা। গ্রামে ফেরার সিদ্ধান্তটা যে শেষ পর্যন্ত নিয়েই ফেলেছে সেটাও তো জানাতে হবে। দুয়েক বার রিং হল কিন্তু ফোনটা কেউ তুললো না। দিদিয়া তো এরকম করে না। জিজুকে ফোন করেই ফেলল। জানে এখন মিস্টার গাঙ্গুলী দা কাজে ব্যস্ত থাকে। তাও একবার ফোন করে দেখল ও।

-হ্যালো জামাইবাবু দিদিয়া কোথায় তুমি জানো?

-না তো। আমি দুদিন হল বাইরে। কাল ফিরব। তুমি ওকেই ফোন করে নাও না।

-আসলে দিদিয়া ফোন ধরছে না।

-ওহ বোধহয় শপিংয়ে গেছে তাই । আমায় মেসেজ করেছিল ।

-তুমি সুখবরটা জানো তো মিস্টার গাঙ্গুলী দা? নাকি তোমাকেই এখনো বলে নি। আমি তো মার মুখে শুনলাম।

-কি বলতো?

-এবাবা তোমাকে এভাবে বলা বোধহয় আমার ঠিক হচ্ছে না। আসলে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

-কি কথা?

-আরে তুমি বাবা হতে চলেছো। বলবে না কিন্তু আমি বলেছি। আরও কয়েকটা কথা বলে ফোনটা রেখে দিল অরণ্য। আজ ওরও কলেজ নেই। দিদিয়াও ফ্ল্যাটে একা থাকবে। একবার কি ঘুরে আসবে দিদিয়ার কাছ থেকে!

ভাবল কিছুক্ষন। তারপর ঠিকই করে নিল। যদি এরমধ্যে ফোন ধরে তো ভালো নাহলে অযাচিতর মতোই হানা দেবে ও। হোস্টেলে রামু'দাকে এককাপ চা এনে দিতে বলে রেডি হতে লাগলো অরণ্য। বালিগঞ্জের এক বহুতল আবাসন। পৌঁছতে পৌঁছতে বেলা দুটো বেজে গেল। ততক্ষনে বৃষ্টি নেমেছে ঝমঝম করে। সাতাত্তর নম্বর ফ্ল্যাট পাঁচতলায়। লিফ্ট থেকে বেরিয়ে ফ্ল্যাটের ডোরবেলটা কয়েকবার টিপলেতেও কেউ দরজা খুলল না। মিনিট দশেক পর একজন দরজা খুলল। অরণ্য জিজ্ঞেস করল, "আনন্দ তুমি এখন এখানে?"

-স্যার আসতে বলেছিলো তাই অপেক্ষা করছি। ভেতরে এস না।

-দিদিয়া মানে তোমার মহুয়া ম্যাম কোথায়? বাড়ি নেই?

-না উনি তো আমাকে এখানে বসিয়ে শপিং এ গেলেন।

অরণ্য ভেতরে ঢুকতেই আনন্দ দরজা বন্ধ করে দিল। আনন্দকে ও আগে থেকেই চিনত। আনন্দ জামাইবাবুর সেক্রেটারি। বেশিরভাগ সময় এই বাড়িতেই ওকে পাওয়া যায়। যাক ওর সঙ্গে একথা সেকথায় ঘন্টা খানেক কেটে গেল। কিন্তু দিদিয়া তাও এল না। এবার বেশ চিন্তিত হয়ে পড়ল অরণ্য। বলল,

-দিদিয়ার এতো কেন দেরী হচ্ছে ?

-হয়তো কোনো কাজে আটকে গেছেন?

-কাজ?

-ব্যাঙ্কের কিছু কাজ আছে বলেছিলেন তো।

-কিন্তু ফোনটা কেন ধরছে না ! এখন তো আবার সুইচ অফ আসছে।

-চার্জের জন্যও তো বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকতে পারে। এতো চিন্তা কর না।

-না না একবার পুলিশকে জানিয়ে রাখা দরকার।

-আচ্ছা আরেকটু দেখি। আর আধ ঘন্টা মত দেখে নয় পুলিশে যাওয়া যাবে। তুমি তো আছো। আমি নীচ থেকে কটা সিগারেট নিয়ে আসি। আনন্দ বেরিয়ে গেল। দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে এসে ফোনের দিকে কয়েকবার দেখল। না কোনো ফোন আসে নি। হঠাৎ কি মনে হতে ভাবল বেড রুমে গিয়ে একবার দেখবে কোনো কিছু পাওয়া যায় কিনা। হয়তো জানা যেতে পারে মহুয়া দি কোথায় গেছে। ঘরে ঢুকতেই অন্ধকার। আলো জ্বালাতেই বুকটা কেঁপে উঠল। মহুয়াদির নিথর দেহ মাটিতে পড়ে আছে। ভালো করে সামনে গিয়ে দেখতেই দেখল শ্বাস চলছে না। আর্তনাদ করে কেঁদে ফেলল ও। তাহলে আনন্দ কি সবটা জানত! ওই কি! না না এক্ষুনি একবার জামাইবাবুকে

সবটা জানানো দরকার। ফোনটা আনতে ডাইনিংয়ের দিকে ছুটল ও। তখনি ল্যান্ড ফোনের রিং কানে আসতেই ভেতরের ঘরে দৌড়ে ধরতে গেল অরণ্য। তাড়াতাড়ি ছুটে ফোনটা ধরতে গেল অরণ্য।

-হ্যালো কে বলছেন? হ্যালো?

ওপাশ থেকে কোনো উত্তর এল না। পেছনে আনন্দ এসে দাঁড়িয়েছে। হটাৎ অরণ্যর মাথায় ভারী কিছুর একটা আঘাত করলো ও। যখন জ্ঞান ফিরল তখন ও চেয়ারে বাঁধা অবস্থায় বসে আছে। দরজা ভেজানো। তার মানে কি আনন্দই...! অন্ধকার হয়ে আসছে, বৃষ্টি থেমেছে অনেকক্ষন। নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে ফ্ল্যাটটায়। যতটুকু দরজার ফাঁক দিয়ে দেখতে পাচ্ছে তাতে দেখল একজন সোফায় বসে কারুর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আনন্দ তো এখানেই কোথাও আছে! ও জামাইবাবুর কোনো ক্ষতি করবে না তো! ভাবতে লাগলো অরণ্য। কিছু বলতে পারারও উপায় নেই। মুখটা আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা। হটাৎ একটা কলিং বেলের শব্দ। দরজা খুলতেই পারফিউমের চড়া গন্ধে ভরে গেল সারা ঘর। মহিলার মুখটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না অরণ্য ।

* * *

নীলাঞ্জনার ওয়ান পিসটা মেরুন রঙের । ওর স্মোকিং আই মেকাপ করা চোখ দুটোর দিকে বেশ কিছুক্ষন চেয়ে রইল মিস্টার গাঙ্গুলী। জানলার দমকা হাওয়ায় ওর চুল গুলো উড়ছিল। মিস্টার গাঙ্গুলী আস্তে আস্তে উঠে কিচেনের দিকে গেল। নীলাঞ্জনা সোফায় বসে বক্সে মৃদু একটা সুর বাজালো। বারান্দার নীল আলোটা ছাড়া আর কোনো আলো জ্বলছে না। একটা মায়াময় সন্ধ্যে। নীলাঞ্জনা দেখল মিস্টার গাঙ্গুলীর স্থির দৃষ্টি জানলার অন্ধকার আকাশটার দিকে।

-ওখানে কেন দাঁড়িয়ে আছ। এদিকে এস, কথা আছে।

কোনো উত্তর এল না। আস্তে আস্তে নীলাঞ্জনার দিকে এগিয়ে এল লোকটা। এবার ওর দৃষ্টি নীলাঞ্জনার চোখের দিকে। শান্ত বরফ কঠিন একটা দৃষ্টি। মুখের অভিব্যক্তি বদলালো না। নীলাঞ্জনা হেসে হাতটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিল। ওর ঠোঁট হালকা হাসি ফুটে উঠল। একটা কাঁচের জগে ফ্রুট জুস রাখা ছিল। আস্তে আস্তে সেটা একটি সুদৃশ্য কাঁচের গ্লাসে ঢালতে লাগল মিস্টার গাঙ্গুলী। গ্লাসটা নীলাঞ্জনার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল,

-বাড়িতে কি বলে এলে?

-শপিংয়ে যাচ্ছি বলেছি। গাড়ি নিয়ে আসি নি। তুমি আজ কাজটা ঠিক করে

করেছো তো? কোনো অসুবিধা হয় নি তো?

-হুম । গন্ধটা কিসের নীল?

-ফ্রেঞ্চ পারফিউম। নন্দা এনে দিয়েছিলো।

-কে নন্দা ?

-আমার বন্ধু। তুমি ভুলে গেলে। একদিন সেই রয়্যালে গেলাম না একসঙ্গে।

-হ্যাঁ রাইট রাইট। যার ডায়মন্ড নেকলেস তোমার খুব পছন্দ।

-হুম দারুন দেখতে ওটা।

-আমার কাছে আছে। নেবে ?

-কবে কিনলে ? বল নি তো ?

বাইরে আবার বৃষ্টি নেমেছে। মিস্টার গাঙ্গুলী নীলের হাতটা ধরে এগোতে লাগল। অন্ধকার ডাইনিং পেরিয়ে ভেতরের ঘরের দিকে গেল ওরা। মৃদু সুরের ঝঙ্কারে কেমন যেন আবেশ লাগছে নীলাঞ্জনার। অদ্ভুত একটা ভালোলাগা। যেমন পাঁচ বছর আগেও লেগেছিলো। মডেলিংয়ের শুটিং শেষ করে যখন পৌঁছে ছিল মিস্টার গাঙ্গুলির চেম্বারে। ক্লান্ত আশাহীন জীবন কাটাচ্ছিল তখন নীলাঞ্জনা। শরীররেও নানান অসুবিধা। লিভারের অসুখ। বাবার বন্ধুর ছেলে বেশ বড় ডাক্তার। ডক্টর মিস্টার গাঙ্গুলী গাঙ্গুলি। নামটা বাবার মুখেই অনেকবার শুনেছিল ও। বাবাই ঠেলে পাঠিয়েছিলেন। দু তিন মাস কাটতেই কেমন যেন বদলে যাচ্ছিলো ওর জীবন। কোনো পরিস্থিতিই ওর হাতে ছিল না। দুনিয়াটা তখন অনেকটা রঙীন। ও যেন প্রথম বার খোলা আকাশ দেখতে পাচ্ছিলো। প্রজাপতির মত দুটো ডানা ছড়িয়ে উড়ছিল। এগিয়ে যাচ্ছিলো অনেক দূর। অনেক অনেক দূর। ওরা ভেতরের ঘরে ঢুকল। ঘরটা পুরো অন্ধকার। কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছিলো না নীলাঞ্জনা। মিস্টার গাঙ্গুলী ওর হাতটা ধরে ওকে ঘরের মাঝখানে দাঁড় করালো। তারপর কোথায় যেন চলে গেল। কিছুক্ষণ কোনো সারা শব্দ না পেয়ে নীলাঞ্জনা জোরে ডাকল

-মিস্টার গাঙ্গুলী। মিস্টার গাঙ্গুলী। কোথায় গেলে?

কোনো উত্তর এল না। হটাৎ আলো জ্বলে উঠল। নীলাঞ্জনা সামনে যা দেখল তাতে ওর গলা দিয়ে তীব্র আর্তনাদ বেরিয়ে এলো। সামনে তো একটা লাশ পড়ে আছে! ও চেনে এ কে। এ তো মহুয়া দি! কাল সন্ধ্যে বেলা এখানে একটা পার্টি ছিল। পার্টি শেষ হয়ে যাবার পরও নীলাঞ্জনা ছিল রাত পর্যন্ত। এখন নীলাঞ্জনা লাশটার দিকে তাকাতেই কেমন একটা লাগছে ওর। কাল ভোর

রাত্রেই তো এই লাশ সরিয়ে ফেলার কথা ছিল। কিন্তু! মিস্টার গাঙ্গুলিই বা কোথায়! এদিক ওদিক খুঁজতে লাগল নীলাঞ্জনা। নীলাঞ্জনার শরীর ঠান্ডা হয়ে এল কিন্তু তখনই হঠাৎ পেছন থেকে আমি ওর গলা শুনতে পেল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল নীলাঞ্জনা।

-কোথায় ছিলে তুমি? আমি তো এতোক্ষণ তোমাকে অনেক ডাকলাম কিন্তু সারা দিচ্ছিলে না তো! কোথায় ছিলে?

-তুমি ডায়মন্ড নেকলেসটা পেয়েছো?

-কই নাতো কোথায় তুমি ওটাই আনতে গেছিলে বুঝি আর মহুয়া দি র লাশটা এখনো সরাও নি আমাকে বলো নি তো! কেউ দেখে ফেলেছে নাকি? কি হলো পরিষ্কার করে বল না মিস্টার গাঙ্গুলী আমার চিন্তা হচ্ছে তো!

-তুমি নেকলেস টা তো আগে নাও তারপরে সব বলছি।

-কোথায় নেকলেস টা ?

-ওই তো। দেখ ভালো করে।

মিস্টার গাঙ্গুলীর আঙ্গুল ওই লাশের দিকে। ওর দৃষ্টি ঠান্ডা বরফের মত। নীলাঞ্জনার হটাৎ চোখ পড়ল মহুয়ার গলা র দিকে মহুয়ার গলাতেই জ্বলজ্বল করছে একটা ডায়মন্ড নেকলেস। নীলাঞ্জনার খেয়াল গেল কাল তো মহুয়ার গলার এই নেকলেস টা ছিল না। খুব ভালো করে মনে করার চেষ্টা করল। ওর কিছুতেই মনে পড়ল না। ভাবল কাল নানা রকম চিন্তা ছিল মাথায়। হয়ত চোখে পড়ে নি। মিস্টার গাঙ্গুলীর মুখে শুনে ছিল একটা ডায়মন্ড নেকলেসের কথা ! সেটাই বোধহয় এটা! মিস্টার গাঙ্গুলী এবার নীলাঞ্জনার কাঁধে হাত রেখে ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে মৃদু স্বরে বলল "যাও নীল। ওটা নেবে না?"।

ওরা একটু একটু করে সবটা প্ল্যান করেছিল। রাতের পার্টি, বিষ সবটাই। লাশ সরিয়ে দেবার ব্যাপারটাও সুক্ষ এবং নিপুন ভাবে প্ল্যান করা ছিল। তাহলে কেন যে মিস্টার গাঙ্গুলী সেটা করল না ভেবে পাচ্ছিলো না নীলাঞ্জনা। হয়তো কোন অসুবিধার মধ্যে পড়েছে মিস্টার গাঙ্গুলী। কিন্তু আজতো নীলাঞ্জনা আছে! রাতে দুজনে মিলে নয় লাশটা সরিয়ে ফেলবে ওরা।

বাইরে আরও জোরে বৃষ্টি নামলো বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে নীলাঞ্জনা। মহুয়ার গলা থেকে নেকলেসটা খুলতে লাগল বাইরের ঝরে দমদম করে জানলাগুলো পরছে হঠাৎ আলোটাও নিভে গেল। নিঝুম অন্ধকার হয়ে গেল। নীলাঞ্জনার হাতটা তখনও লাশের গায়ে। কেমন যেন ভয় করতে লাগল ওর। তাড়াতাড়ি

নেকলেসটা টেনে খুলে নিয়ে সরে এল ওখান থেকে। হটাৎ ওর মাথায় পেছন থেকে ভারী কিছুর একটা আঘাত লাগল। ও যন্ত্রনায় জোরে আর্তনাদ করে উঠল।

* * *

কিছুক্ষণ বাদে নীলাঞ্জনার জ্ঞান আসলো। তখন ও একটা ঘরে বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে ওর হাতদুটো চেয়ারে পিছমোড়া করে বাঁধা মুখেও অনেকখানি কাপড় গোঁজা। ও কিছুতেই কোনো শব্দ করতে পারছে না। ও শুধু ভাবতে লাগলো কে ওকে পেছন থেকে আঘাত করল! তবে কি ঘরে কোনো তৃতীয় ব্যক্তিও ছিল! ওর মাথার পেছনে ভীষণ চোট্ লেগেছে। ও বুঝতে পারল রক্ত বেরোচ্ছে। ব্যাথায় মাথা নাড়াতে প্রচন্ড পারছিলো না। চোখের সামনেও সব অস্পষ্ট। চোখ খুলে রাখতেও বেশ কষ্ট হচ্ছে। চেঁচিয়ে মিস্টার গাঙ্গুলীকে ডাকতেও পারছে না। পাশে আরেকজন লোক! তারও ওই একই অবস্থা।

অরণ্যর অনেকক্ষন জ্ঞান এসেছে। কে ওকে ওই ছোট ঘরটা থেকে বেসমেন্টে এনে বেঁধে দিয়েছে সেটাও দেখে নি ও। তবে কি আনন্দ! কিন্তু ওর পাশে বাঁধা এই মহিলা কে! হঠাৎ কানে কিছু কথা ভেসে এল। কথাটা বোধহয় পাশের মহিলাটিকে উদ্দেশ্য করে বলছিলো কেউ।

-আমরা শুধু মৌকে মারি নি। আর এক জনকেও মেরে ফেলেছি। আমার তো আর বাঁচা চলে না... বিদায়।

-কি বলছো। না তুমি কিচ্ছু করবে না। আমার কথা শোনো। তোমার এখন মাথার ঠিক নেই। প্লিজ। না।

-কিন্তু তার আগে।

-গানের আওয়াজটা একটু কমাও আমি তোমার কোন কথা শুনতে পাচ্ছি না। ওরকম কোরো না কিন্তু। আমার বাঁধনটা খুলে দাও আমরা কথা বলি। সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি নিজের মধ্যে নেই।

পাশের মহিলাটি অনেক বোঝালো। কিন্তু লোকটা নিজের মনে একটাই কথা বলতে লাগল। অন্ধকারে ঠিক করে দেখা যাচ্ছে না লোকটাকে। তাহলে কি আনন্দ!

-আমাকেই শাস্তি দিতে হবে। কি বল তাই না?

অরণ্য ঝাপসা চোখে শুধু দেখতে পেল কেউ দিকে ছুরি নিয়ে এগিয়ে আসছে। এ তো জামাইবাবু। বিড়বিড় করতে করতে এগিয়ে আসছে।

-আমাকে কেন আগে বললে না মৌ? আমি খুব খারাপ মৌ। আমি খুব খারাপ।

কি ভীষণ রোখ চেপেছে মিস্টার গাঙ্গুলী দার মাথায়। চোখ গুলো ঘোলাটে, হিংস্র। তাহলে কি অরণ্যরও শেষ সময় এসে গেল! ভয়ে বুকটা কেঁপে উঠল ওর।

নীলাঞ্জনা জানত সন্তানের জন্যই মহুয়া দি আর মিস্টার গাঙ্গুলীর মধ্যে অশান্তি। মিস্টার গাঙ্গুলী বাচ্চা খুব ভালোবাসে। মিস্টার গাঙ্গুলী ওর হাতের ছুরিটা একবার নয় পরপর তিনবার নীলাঞ্জনার বুকে বসিয়ে দিল। তারপর নিজের হাতের শিরাটা এক টানে কেটে ফেলল। দুটো মৃত্যু অরণ্যর চোখের সামনে হল। রক্তাক্ত মেঝে। রক্ত গড়িয়ে ওর পা পর্যন্ত চলে আসছে। এসব সহ্য না করতে পেরে অরণ্য জ্ঞান হারালো।

রাতে আনন্দ এসে অরণ্যকে বের করে নিয়ে গেল। আনন্দ সব কাজে মিস্টার গাঙ্গুলীকে সাহায্য করতো। তাই অরণ্য পুলিশের কথা বলতে ওকে বন্দী করা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না ওর। ও বলল--

-বৌদির খুনের কথাটা আমি জানতাম না তুমি বিশ্বাস কর। তাহলে আমি নিশ্চই আটকাতাম। আমি আজ সকালেই জানতে পারি। স্যার আমাকে পাহারা দিতে বলেন।

সকালের আগে বিল্ডিং এর কেউই কোনো খবর পায়নি। সকালে সীমাদি কাজে এসে বারবার বেল বাজিয়েও কেউ দরজা খোলেনি। ওর কাছে থাকা চাবিটা দিয়ে খুলে দেখে তিনটে লাশ! ও পুলিশে খবর দেয়। সেদিন আর বৃষ্টি হয় নি। শান্ত হাওয়া দিচ্ছিলো।

ইউ প্রমিসড

প্রদীপ্তা রায় চৌধুরী সেন

"রজত! রজত! এই দেখো অঘোরী মা ছবি পাঠিয়েছেন। দেখো তুমি! আমি গিয়ে সোনিয়াকে ডেকে আনি।" রজতের হাতে নিজের মোবাইলটা ধরিয়ে সোনিয়ার খোঁজে কিচেনের দিকে গেল মন্দিরা। হাতে ধরা মোবাইলের দিকে তাকাল রজত। নেট বড্ড স্লো চলছে আজ। একটা কোনও ছবি ডাউনলোড হচ্ছে।

মেয়েটা নিরুদ্দেশ হওয়ার পর থেকেই মন্দিরা হঠাৎ করে কেমন যেন অন্ধবিশ্বাসী হয়ে গেছে। কাল বাস্তুমাটি আর আরও কী কী সব হ্যানাত্যানা নিয়ে গিয়ে ছিল কোন এক মহিলা তান্ত্রিকের বাড়ী। রজতকেও যেতে বলেছিল, কিন্তু ও রাজি হয়নি। একবার ভেবেছিল মন্দিরাকে বারণ করবে, কিন্তু তারপর ওর মুখে যে আশার আলোটা দেখল... আর না বলতে পারেনি।

টেবিলে রাখা ফোনটা বেজে উঠতেই চমকে উঠলো রজত। মন্দিরার ফোনে তখনও ছবিটা লোড হচ্ছে। নিজের ফোনটা হাতে তুলে দেখল মেহুলের কল,

"হ্যাঁ বল!"

"শোন রজত একটা জরুরি খবর আছে। শিঞ্জিনীর বয়সী আরও একটা মেয়ে কিডন্যাপ হয়েছে স্কুল থেকে। তবে এবার কিডন্যাপারের মুখ দেখা গেছে। শুনছিস তুই?" ফোনটা কানে চেপে হাতে ধরা মোবাইলটার দিকে বিস্ফোরিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল রজত। এ কী দেখছে ও? স্ক্রিনে তখন দেখা যাচ্ছে হোমকুণ্ডের ছাইয়ের ভেতর ফুটে ওঠা এক অবয়ব, রজতের বহু চেনা এক মুখ... "হ্যালো রজত... হ্যালোও... শুনতে পাচ্ছিস? কিডন্যাপার কে সেটা জানা গেছে। আমাদের সন্দেহ শিঞ্জিনীর কিডন্যাপিংয়ের পেছনে ওরই হাত আছে। রজত! কিছু বলছিস না কেন? কিডন্যাপার আর কেউ নয়..."

-"মেধা!" মেহুলের কথা পুরো হবার আগেই বলে ওঠে রজত।

-"তুই...তুই কী করে জানলি? এ কথা তো আমি আর কমিশনার স্যর ছাড়া আর কেউ..." বিস্ময় ঝড়ে পড়ে মেহুলের কণ্ঠ থেকে।

-"তুই যত তাড়াতাড়ি হয় একবার বাড়ী আয় মেহুল।" বলে ফোনটা রেখে

দিল রজত। জুম করে স্ক্রিনের ছবিটা আরও একবার দেখল ও। চারকোল দিয়ে আঁকা একটা ক্রুড স্কেচের মতন মনে হচ্ছে ছবিটাকে। মিল স্পষ্ট। মেধাকে যারা দেখেছে তারা প্রত্যেকে এক বাক্যে বলবে এটা ওরই স্কেচ। এ কী করে সম্ভব? রজতের সমস্ত চিন্তা- ভাবনা যেন কীরকম গুলিয়ে যাচ্ছে। এতদিনের বিশ্বাস।

-"রজত ছবিটা লোড হয়েছে? দেখলে কার ছবি? চিনতে পারলে?" ঝড়ের গতিতে একের পর এক প্রশ্ন করে গেল মন্দিরা, "দাও তো মোবাইলটা, সোনিয়াকে দেখাই!" রজতের হাত থেকে ফোনটা নিয়ে সোনিয়াকে দেখায় মন্দিরা, "দেখো তো চিনতে পারো কিনা?"

মন দিয়ে ছবিটা দেখে মাথা নাড়ে সোনিয়া। না, চেনে না ও। সোনিয়াকে দেখেও আর চেনার উপায় নেই যে এই মহিলা জন মজুরের কাজ করতো। সেদিন রজতের সঙ্গে মন্দিরাও গিয়েছিল থানায়। সেখানেই দেখেছিল সোনিয়াকে একটা ডায়রি লেখানোর জন্য সবার হাতে-পায়ে ধরতে। ওরও মেয়ে নিখোঁজ হয়েছে। কিন্তু রজত-মন্দিরার মতন ওর কাছে নিজের মেয়ের কোনও ছবি ছিল না। রজতকে দেখেই ও চেঁচিয়ে উঠেছিল, "আমার মেয়ের চোখ এই সাহেবের মতন নীল গো। খুঁজে দাও না গো তোমরা আমার মেয়েটাকে! ও ছাড়া যে আমার আর কেউ নেই।"

মন্দিরার জোরাজুরিতেই সেদিন সোনিয়ার মেয়ে মুনিয়ার মিসিং কমপ্লেন নিয়ে ছিল পুলিশ। সন্তান হারানো দুই মা, সামাজিক ভেদাভেদ ভুলে একে অন্যকে জড়িয়ে কেঁদে উঠেছিল সেদিন। সোনিয়াকে জোর করে নিজের সাথে নিয়ে এসেছিল মন্দিরা। দুজনেই দুজনের মধ্যে এক অদ্ভুত মিল খুঁজে... ভাবতেই সোজা হয়ে বসল রজত। সত্যিই তো এই কথাটা আগে ওর মাথায় আসেনি কেন? মেহুলের নম্বর ডায়াল করল।

-"এসে গেছি আমি।" কল রিসিভ না করে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল মেহুল, "কী হল তোর?"

-"ওই যে অন্য মেয়েটা, যে আজ কিডন্যাপ হল। ওর কোনও ছবি আছে তোর কাছে?" উত্তেজিতভাবে বলল রজত।

-"হ্যাঁ, মোবাইলে হবে। দাঁড়া, দেখছি। কী হয়েছে বলবি?" পকেট থেকে নিজের মোবাইলটা বেড় করতে করতে বলল মেহুল, "হ্যাঁ, এই দ্যাখ!

-"শিট!" ছবিটা দেখেই বলে উঠল রজত, "মেহুল, জাস্ট চেক লাস্ট থ্রী টু ফোর মান্থসে কটা বাচ্চা মেয়ে কিডন্যাপ হয়েছে? স্পেসিফাই অন এজ এই ধর আট বছর, কোঁকড়া চুল, নীল চোখ।"

-"রজত হোয়াটস হ্যাপেনিং?" শুকনো গলায় প্রশ্ন করল মন্দিরা। ওর দিকে একবার তাকিয়ে রজত বলল, "মন্দিরা, তোমার ওই অঘোরী মাকে বল আমরা একটু দেখা করতে চাই ওঁর সঙ্গে।" মাথা নেড়ে নিজের ফোনটা নিয়ে অঘোরী মায়ের নম্বর ডায়াল করল মন্দিরা।

-"রজত এসব কী? অঘোরী মা, নীল চোখের বাচ্চা, হোয়াট?" জানতে চাইল মেহুল।

-"সব বলছি। তার আগে তুই একবার আমাকে এই ইনফোটা এনে দে। তাহলেই আমি বুঝতে পারবো আমি ঠিক ভাবছি নাকি ভুল। প্লিজ মেহুল!" কথা না বাড়িয়ে নিজের জুনিয়রদের ফোন করে ইন্সট্রাকশান্স দেয় মেহুল।

-"রজত! অঘোরী মা একটু তোমার সাথে কথা বলতে চান।"

হাত বেড়িয়ে ফোনটা নেয় রজত, "হ্যালো, নমস্কার আমি... আচ্ছা, করছি!" সবার দিকে তাকিয়ে রজত বলল, "উনি ফোনটা স্পীকারে দিতে বলছেন!" রজত স্পীকার অন করতেই ভেসে এলো এক মহিলা কণ্ঠস্বর, "রজতবাবু আপনার বন্ধু কি ওখানেই আছেন? যদি না থাকেন, তাহলে একটু ডেকে নিন।"

-"আমার বন্ধু? মানে... আচ্ছা মেহুল! মেহুল!"

-"রজত এই নে!" বলতে বলতে ঘরে ঢুকল মেহুল, "লাস্ট ছমাসের রিপোর্ট অনুযায়ী এই স্পেশিফিকেশানের ফোর্থ মেয়ে আজ কিডন্যাপ হয়েছে। সোনিয়ার মেয়ে, শিঞ্জিনী, আজকের এই মেয়েটা আর পাঁচ মাস আগে একটা মেয়ে।" নিজের মোবাইল থেকে ডাটা চেক করে বলল মেহুল, "এবার বলবি কী ব্যাপার?" ভুরু দুটো কুঁচকে উঠলো রজতের। মাথা নেড়ে বলে উঠলো, "হিসেব মিলছে না। চারটে বাচ্চার তো কথা ছিল না। তবে কি..."

-"কী ব্যাপার কিছু বলবি?"

-"আমাদের কাছে বেশী সময় নেই।" অঘোরী মা বলে উঠলেন, "রজত, মেয়েকে খুঁজে পাবার চাবিকাঠি কিন্তু তোমার হাতে। ওই মহিলাকে তোমার থেকে ভালো কেউ চেনে না।"

-"রজত প্লিজ বল এসব কী হচ্ছে?" কেঁদে উঠলো মন্দিরা। খুব ক্লান্ত শোনালো রজতের কণ্ঠস্বর, "আমার আর মেধার ব্রেক আপটা যে খুব স্মুদলি হয়নি, সেটা তো তুমি জানোই! ও এতো বেশী পজেসিভ হয়ে যাচ্ছিল যে আমি সাফোকেটেড ফিল করছিলাম। তারপর একদিন কথার মাঝে মেধা হঠাৎ আমাদের ফিউচার নিয়ে ডিসকাস করতে শুরু করলো। ওর নাকি ইচ্ছে

আমাদের তিনটে মেয়ে হবে।" একটু থেমে সবার মুখের দিকে তাকিয়ে রজত বলল, "নীল চোখ, কোঁকড়া চুলের তিনটে মেয়ে! আমি মজা করে জিজ্ঞেস করে ছিলাম যদি অমন দেখতে না হয় মেয়েগুলো তাহলে। কি ভীষণ নিস্পৃহভাবে মেধা বলে উঠেছিল যে ও গলা টিপে মেরে দেবে তাদের। আমি শিউরে উঠেছিলাম। দ্যাট ওয়াজ দ্য লাস্ট স্ট্র। এরপর আমি আর কোনও সম্পর্ক রাখতে পারিনি মেধার সাথে।"

-"তুই এই কথাটা তো আমাকে কখনও বলিসনি!" বলল মেহুল। কোনও উত্তর না দিয়ে শুধু মাথা নাড়ল রজত।

-"মা হওয়ার অতৃপ্ত বাসনা আর তোমাকে হারিয়ে ফেলার রাগ, এই দুটো মিলে মেধাকে পাগল করে তুলেছে। ও প্রতিশোধ নিতে বদ্ধ পরিকর। কোনও নিম্ন শ্রেণীর বশীকরণের সাহায্যে ও নিজের কাজ হাসিল করছে। যত তাড়াতাড়ি পারো ওকে খুঁজে বার করো। পরশু থেকে পিতৃপক্ষ শুরু হয়ে যাবে, যা করার কালকের মধ্যেই করে ফেলতে হবে। তা না হলে..." চুপ করে গেলেন উনি।

-"আপনি কি কিছু বলতে পারবেন মেধা কোথায় থাকতে পারে?"

-"যা আমি সাধনায় বসে বুঝেছি তাতে মনে হচ্ছে একটা পোড়োবাড়ি... তার কাছেই একটা ভাঙা মিল বা কারখানা কিছু আছে। আর...আর একটা কী যেন... হ্যাঁ, জল...পুকুর বা ডোবা এমন কিছু আছে।"

-"ভাঙা বাড়ি..." বিড়বিড় করে বলল সোনিয়া, "কারখানা...বাবু!" চেঁচিয়ে উঠলো ও হঠাৎ, "আমি এরকম একটা জায়গা জানি।"

-"কোথায়?" সোনিয়ার বলা মতন লোকেশানটা নিজের ডিপার্টমেন্টকে চেক করতে বলল মেহুল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফোন এল, "রাইট! ফোর্স রেডি করো।" ইন্সট্রাকশান্স দিয়ে মেহুল উঠে দাঁড়ালো, "ওই জায়গাটার খোঁজ পাওয়া গেছে। লোকাল থানা থেকে জানিয়েছে কদিন ধরে ওখানে এক মহিলাকেও দেখা গেছে। আমি যাচ্ছি।"

-"আমিও যাব।" বলল রজত। মেহুল কিছু বলার আগেই বললেন অঘোরী মা, "তোমরা দুজনেই যাও। সাবধানে থেকো। আমি এখন হোমে বসবো। মন্দিরা, তুমি আর সোনিয়াও আদ্যা স্তোত্র পাঠ করবে যতক্ষণ না রজত ফিরছে তোমাদের মেয়েকে নিয়ে। মায়েদের প্রার্থনার শক্তি অনেক।" ফোনটা কেটে দিলেন উনি।

"ইনি কে, রজত?" প্রশ্ন করল মেহুল।

-"চল, যেতে যেতে বলছি।"

লোকেশানে পৌঁছতে পৌঁছতে রজত জানাল মেহুলকে কি ভাবে ওদের বাড়ির রান্নার মহিলা মন্দিরাকে এক তান্ত্রিক মহিলার খোঁজ দিয়ে ছিল। তিনিই মেধার ছবি পাঠিয়ে ছিলেন হোয়াটস্যাপে।

-"এই দ্যাখ ছবিটা!" নিজের মোবাইলে ছবিটা ট্রান্সফর করে নিয়েছিল রজত।

-"এ তো পরিষ্কার মেধা রে!"

-"স্যর, এসে গেছি।"

গাড়ি থামা মাত্রই এগিয়ে এল একজন, "গুড আফটারনুন স্যর! আমি লোকাল থানার ওসি, অরবিন্দ ওঝা।"

-"গুড আফটারনুন, মিস্টার ওঝা! ওই বাড়িতে যে মহিলা আছেন তাঁর বিষয়ে কি কিছু জানা গেছে?" গাড়ি থেকে নেমে প্রশ্ন করল মেহুল।

-"হ্যাঁ স্যর, এই দেখুন!" নিজের মোবাইল অন করলেন মিস্টার ওঝা। খুব একটা ক্লিয়ার পিকচার নয়, তবে বোঝা যাচ্ছে। মেহুল আর রজত দুজনেই চিনতে পারল মেধাকে। হাতে একটা বড় ব্যাগ নিয়ে ভাঙ্গা বাড়িটার দিকে যাচ্ছে ও ছবিটাতে।

-"আমরা এক কন্সটেবলকে সাদা পোষাকে ওই বাড়িতে পাঠিয়েছি খোঁজ নিতে।" সামনের দিকে তাকাল রজত। ওরা যথেষ্টই দূরত্বে আছে বাড়িটা থেকে। ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে ইউনিফরমড আর সাদা পোশাকের পুলিশ। সবার নজর বাড়িটার দিকে। হঠাৎ যেন একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল সবার মধ্যে। বাড়িটার দরজা যেন খুলে গেল। বেরিয়ে আসছে কে একজন। এইদিকেই আসছে সে। লোকটা কেমন যান্ত্রিকভাবে চলছে, মাঝে মাঝে টলেও যাচ্ছে। সোজা মিস্টার ওঝার কাছে এসে দাঁড়াল সে, "বাড়িতে একা এক মহিলা আছে স্যর। আর কেউ নেই। মহিলার নাম মেধা চ্যাটার্জী। উনি বম্বেতে থাকেন। ওই বাড়িটা কিনেছেন, রিসর্ট বানাবেন।" একটানা বলে চুপ করল লোকটা।

কীরকম যেন একটু অস্বাভাবিক লাগল রজতের। একটু এগিয়ে গেলো ও। সামনের গাছের আড়াল থেকে তাকিয়ে রইল বাড়িটার দিকে। সন্ধের অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। ভাঙ্গা মিলের ছায়াতে ঢেকে আছে বাড়িটা, ঠিক যেন একটা অপার্থিব কোনও ছায়া। বেশিক্ষণ তাকানো যাচ্ছে না বাড়িটার দিকে, কি যেন একটা অস্বস্তি ছড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু তবুও একটা টান অনুভব করল রজত ওই বাড়িটার দিকে, যেন ওকে কেউ ডাকছে। এক পা, দু পা করে এগোতে চাইলো ও ওইদিকে...এমন সময়ে কেউ যেন ওর প্যান্টটা ধরে টানলো। চমকে তাকাল রজত। শিঞ্জিনীর বয়সী একটা মেয়ে, হঠাৎ দেখলে শিঞ্জিনী বলেই ভ্রম হবে। ওই

রকমই নীল চোখ, কোঁকড়ানো চুল, এও কি ওই কিডন্যাপড বাচ্চাগুলোর একটা?

-"আঙ্কেল শোনো! ওই লোকটার কোনও কথা বিশ্বাস করো না। ওই বাড়ির আন্টিটা ম্যাজিক জানে। ওই লোকটাকে দিয়ে ও যা ইচ্ছে তাই বলাচ্ছে।"

হাঁটু গেড়ে মেয়েটার সামনে বসলো রজত, "তুমি এত কথা কী করে জানলে?"

-"আমাকেও তো ওই আন্টি নিয়ে এসেছিল। আমি মা-মা করে কত কাঁদলাম। তবুও আমাকে মায়ের কাছে নিয়ে গেলো না।"

-"তুমি এখানে কি করে এলে মা?"

-"আমি পালিয়ে এসেছি। কিন্তু অন্যরা এখনও ভেতরে আছে, আঙ্কেল। কিছু করো। দ্যাট আন্টি ইজ ব্যাড।"

মেহুল আর ওসি তখন নিজেদের মধ্যে কিছু একটা আলোচনা করছিল। রজত গিয়ে পৌঁছতেই ওর দিকে তাকাল মেহুল। চোখে প্রশ্ন। মাথা নাড়লো রজত, "আই অ্যাম শিওর, বাচ্চাগুলো ওখানেই আছে। আই ডোন্ট ট্রাস্ট দ্যাট ম্যান।" যার বিষয়ে বলা হচ্ছে, সে তখনও নির্বিকার ভাবে ওখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে, চোখে যেন মড়া মাছের দৃষ্টি।

-"তো হোয়াট ডু ইউ সাজেস্ট?"

-"আমি নিজে যেতে চাই।"

-"পাগল হলি নাকি!" প্রতিবাদ করে ওঠে মেহুল, "আচ্ছা, দাঁড়া! দেখছি।" ওসির দিকে ঘুরে প্রশ্ন করল, "আপনাদের কাছে লাউডস্পীকার তো নিশ্চয়ই আছে?" মাথা নেড়ে সহমতি জানালেন মিস্টার ওঝা। ইশারায় আরেকজনকে বললেন লাউডস্পীকার আনতে।

স্পীকারের চোঙাটা হাতে ধরে এগিয়ে গেল মেহুল। বলল, "মেধা! মেধা! আমরা জানি তুই ওই বাড়িতেই আছিস। আমরা এটাও জানি যে বাচ্চাগুলোকে তুইই কিডন্যাপ করেছিস! বাচ্চাগুলোকে ফিরিয়ে দে। আই প্রমিস তোর কোনও শাস্তি আমি হতে দেবো না।" ওসি ওঝার ইঙ্গিতে ততক্ষণে বাড়িটার ওপর বড় বড় সার্চলাইটের আলো ফেলা হয়েছে। আর কেউ লুকিয়ে নেই, পুরো টিম চারিদিক থেকে বাড়িটাকে ঘিরে ফেলেছে। রজতও এগোতে চাইল মেহুলের সাথে সাথে, কিন্তু ওসি ওকে বারণ করলেন। ইঙ্গিত করলেন ওদের পেছনে থাকতে।

-"ইউ প্রমিস?" সবাইকে কাঁপিয়ে দিয়ে গেলো একটা খনখনে অপার্থিব স্বর, "বাচ্চাগুলো আমার কাছেই আছে। বাট আমি ওদের কাউকে দেবো না। ওরা আমার

বাচ্চা।" আরও একবার খুলে গেল বাড়িটার দরজা। বেরিয়ে এল এক নারী আর তার পিছু পিছু তিনটে বাচ্চা। সারি দিয়ে বাচ্চাগুলো দাঁড়াল ওই নারীর পাশে।

-"মেধা তুই ভালো করেই জানিস যে এই বাচ্চাগুলো তোর নয়। ফিরিয়ে দে ওদের। তোর কোনও ক্ষতি হবে না।"

-"না না! এরা আমার বাচ্চা। আমি এদের ফিরিয়ে দেবো না। কিছুতেই না।" চীৎকার করে উঠল মেধা, "ইউ ওয়ান্ট প্রুফ? এই দ্যাখ! কুহু আমি কে?"

-"মা!" বলে উঠলো একটা বাচ্চা।

-"মুনিয়া, আমি কে তোর?"

-"মা!"

-"শিঞ্জিনী, বল আমি কে?"

-"মা!"

-"দেখলে তোমরা? দেখলে? আমি ওদের মা! আমি ওদের কোথাও যেতে দেবো না।"

হতবাক হয়ে ওদিকে তাকিয়ে রইল সবাই। এ কী বলছে ওরা? রজত যেন নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারছে না। ওর শিঞ্জিনী, ওর আদরের শিনচ্যান। "আঙ্কেল! ও আঙ্কেল!" আবার প্যান্টে টান পড়ল রজতের, "আঙ্কেল, ওই বাচ্চাগুলোর কাছে যেভাবেই হোক যাও। আন্টি ওদের গলায় কালো সুতো দিয়ে একটা মাদুলি বেঁধে দিয়েছে। ওটা খুলে দাও। তাহলেই ওরা ঠিক হয়ে যাবে। প্লিজ যাও, আঙ্কেল!"

সামনে দাঁড়ানো সবাইকে ঠেলে এগিয়ে গেল রজত, "মেধা, লেট মি টক টু শিঞ্জিনী। আমি ওর সামনে দাঁড়িয়ে ওকে জিজ্ঞেস করতে চাই। তারপর যদি ও বলে যে তুমি ওর মা, আই... উই অল উইল লিভ।"

-"রজত কী করছিস? আমরা জানি না ওর কাছে কোনও উইপেন আছে কিনা? ইন ফ্যাক্ট, মেধা নরম্যাল কিনা আমার তাতেও সন্দেহ আছে।" হাত তুলে মেহুলকে আশ্বস্ত করল রজত। তারপর এগিয়ে গেল মেধার দিকে। ওর পিছু পিছু পুলিশ ফোর্সও একটু এগিয়ে গেল।

-"স্টপ দেয়ার!" চেঁচিয়ে উঠল মেধা।

-"ওকে, ওকে! আমরা এখানেই আছি। কেউ এগোবে না। আই প্রমিস!" ইঙ্গিতে সবাইকে রেডি থাকতে বলল মেহুল। বাচ্চাগুলোর অবস্থা দেখে চোখে জল এসে গেল রজতের। কতদিন পেটভরে খায়নি কে জানে। জটে ভরা চুল, নোংরা হাত-পা, ভাবলেশহীন মুখ, শূন্যদৃষ্টি, সবার গলাতেই ঝুলছে একটা

কালো কারে বাঁধা মাদুলি। শিঞ্জিনীর সামনে উবু হয়ে বসল রজত, "শিনচ্যান! বেটু আমার দিকে দ্যাখ!" ধীরেধীরে নিজের হাত দিয়ে আড়াল করে মেয়ের গলার মাদুলিটা খুলে নিল রজত, "বেটু আমি কে? বল! আমি কে?"

-"বাবা!" চেঁচিয়ে উঠলো মেয়ে, "বাবা আমি বাড়ী যাব।"

-"না না না! এ কী করে হতে পারে? ও আমার মেয়ে!" রজতের দিকে তেড়ে এলো মেধা। শুকনো খড়ের মতন চুল, উন্মাদ দৃষ্টি, কে বলবে এই মেয়েই একসময়ে কলেজ কুইন ছিল। নিজের হাতের বড় বড় নখ দিয়ে আঘাত করল রজতকে, "বল তুই কী করেছিস? কী করলি তুই আমার মেয়েকে?"

আহ! করে আর্তনাদ করে উঠলো রজত। ওর চোখের পাশ দিয়ে তখন রক্ত গড়াচ্ছে। সেই অবস্থাতেই ধাক্কা মেরে মেধাকে নিজের থেকে দূরে সরিয়ে দিয়ে অন্য বাচ্চা দুটোর গলা থেকেও মাদুলি টেনে খুলে দিল রজত। ওকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলো বাচ্চাদুটো। মাটিতে পড়ে থাকা একটা পাথর তুলে নিয়ে রজতকে আঘাত করতে চাইল মেধা। কিন্তু তখনই গর্জে উঠল মেহুলের হাতের পিস্তল। পড়ে গেলো মেধা। বুকে হাত দিয়ে গলগল করে বের হয়ে আসা রক্তের স্রোত বন্ধ করবার নিস্ফলা চেষ্টা করল। করুণ দৃষ্টিতে বাচ্চাগুলোর দিকে একবার তাকাল। তারপর মেহুলের দিকে তাকিয়ে বলল, "ইউ প্রমিসড!"

-"ইউ ওকে?" ভাঙ্গা গলায় রজতকে প্রশ্ন করল মেহুল। মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল ও। ওসি ওঝার নেতৃত্বে তখন বাড়ির ভেতর ঢুকে তল্লাসি চালাচ্ছে পুলিশবাহিনী। মেহুলের চোখ কিন্তু খুঁজছে সেই চতুর্থ বাচ্চাটাকে। গেল কোথায় সে? আরে ওই তো, গাছের পাশে, কেমন করে যেন তাকিয়ে আছে এদিকে। হাত নেড়ে ওকে ডাকল রজত। এ কী, অমন টাটা করার ভঙ্গীতে হাত নাড়ছে কেন ও?

-"স্যর! বাড়ী খালি। শুধু..."

-"শুধু কী, মিস্টার ওঝা?"

-"বাড়ির ভেতর একটা ডীপ ফ্রিজার পাওয়া গেছে আর তার মধ্যে একটা বাচ্চার বডি রয়েছে।" ওঝার কথাগুলো যেন কানে ঢুকছে না রজতের। ওর দৃষ্টি আটকে রয়েছে গাছের দিকে যেখানে সাদা ফ্রক পরা একটা কোঁকড়া চুলের বাচ্চা মেয়ে অনেক আশা নিয়ে ধীরেধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে জোনাকির আলোতে।

* * *

ঘুম ভেঙ্গে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসল মেহুল সেন। কে যেন কানের কাছে ফিসফিসিয়ে বলল, "ইউ প্রমিসড!"

জি-টক

শান্তনু চ্যাটার্জী

চান করতে করতে অর্পন শুনতে পেলো ফোন টা বাজছে। তারপরেই বুঝল, ওটা ফোন নয়, ল্যাপটপের শব্দ। চান করতে আসার আগে মেসেন্জারে লগ অন করে এসেছিল। নির্ঘাত বৌ বা মেয়ে অনলাইন হয়েচে। ভিজে গায়েই ছুট্টল অর্পন। এই এক কামরার স্টুডিও তে বাথরুম থেকে বেডরুম একটুখানি, সারা ঘরটা জলেজল হয়ে গেল, কোনরকমে তোয়ালেতে হাত মুছে, জি-টকের অ্যাকসেপ্ট বাটনটা টিপল। সাথেসাথেই ভেসে এল মেয়ের গলা, কোথায় গেসলে গো?

-আরে চান করছি রে বাবা, দৌড়ে এসেছি, সারা গায়ে সাবান লেগে।

ঘর ফেটে পরল মেয়ের খিলখিল হাসিতে, যাও যাও আগে চান করে এসো।

-ওক্কে, এটা অন থাক, আমি আসছি ১০ মিনিটের মধ্যে, কাটিস না লাইনটা।

অর্পন ফিরে এসে শাওয়ারের তলায় দাঁড়িয়ে পড়ল আর মাঝে মাঝেই জলের শব্দ ছাপিয়ে ভেসে আসতে লাগল ওর কলকাতার পাড়ার রিক্শার প্যাঁ পুঁ, ট্যাক্সির হর্ন আর সামনের মন্দিরের ঘন্টার শব্দ। এই টুকরো টুকরো শব্দগুলো অর্পনের ভীষণ ভালো লাগে। নিজেকে মনেই হয় না কলকাতার থেকে ৫৫০০ কিমি দূরে, মনে হয় যেন অফিস থেকে ফিরে কলকাতার ফ্ল্যাটেই বসে আছে।

কল বন্ধ করে, তাড়াতাড়ি করে গা মুছতে মুছতে অর্পন ভাবল, কেটে গেল আড়াই মাস। কোম্পানী হঠাৎ তাকে তিন মাসের জন্যে মধ্য এশিয়ার এই দেশটায় না পাঠালে, এই অদ্ভুত জীবনটার কথা সে কোনোদিন ভাবতেই পারত না। পরিবার ছেড়ে এতদুরে থেকেও যে তাদের এত কাছাকাছি থাকা যায়।

অফিসের খবরটা পেয়ে যখন সে মনস্থির করতে পারছেনা, এই কেরিয়ারের সুযোগ, মাগনায় বিদেশ ঘোরা, কিছু এক্সট্রা রোজগারের জন্য তার আনন্দ করা উচিত না বউ মেয়ে আর কলকাতা ছেড়ে তিন মাসের বনবাসের জন্যে দুঃখ, তখন তার প্রাণের বন্ধু এই বুদ্ধিটা দিয়েছিল আর সব ব্যবস্থাও করে দিয়েছিল। আইটি ফিল্ডে চাকরি করা সমীর বলেছিল, "দেখ বস, ঘুরে এস। দিনে ১০-১২

ঘন্টা চাকরি এখানেও করো আর ওখানেও করবে। চাকরি করার সময় কিবা কলকাতার বাড়ি আর কিবা তাদের দেশ। তবে অফিসের সময়টুকু কাটিয়ে তোর ফ্যামিলীর সাথে বাকি সময়টা কানে কানে থাকার ব্যবস্থা করে দেব।

খুব করবে, যতই সস্তা হোক, ফোনের বিলে ঢাকের দায়ে মনশা বিকিয়ে যাবে, অর্পন তেড়ে উঠেছিল।

-আরে দুর, শোন না, দিনে ১২ ঘন্টা তোকে ফোন করতে বলবো, আমি কি পাগল? তবে ব্যবস্থা এমনি হবে না বাওয়া, ফেরার সময় একটা জনি ওয়াকার আনতে হবে, আর এই না জেনে ফুট কাটার শাস্তি, লাল নয় অন্তত কালোটা।

-আনবো সিওর, এবার বল কি ব্যবস্থা করবি?

-তুই অফিস থেকে প্রেসেন্টেসন, পাওয়ার পয়েন্ট ইত্যাদি ঘাপলা করে একটা ল্যাপটপ ম্যানেজ কর, নেট কানেকসান ওখানে হোটেলের ঘরেই পাবি। আমি তোর বাড়িতে একটা পুরনো কমপিউটার লাগিয়ে ব্রডব্যান্ড কানেকসান দিয়ে দেব। ব্যাস, যে কোন মেসেঞ্জারে ঢুকে বউ বাচ্চার সাথে কথা বল, যখন খুশী, যতোক্ষন খুশী বল। দুটো ওয়েবক্যামও কিনে নিতে পারিস, দেখতেও পাবি। আর বেস্ট হলো, তোদের এই রাত রাত ভোর আন্তর্জাতিক দাম্পত্য প্রেমালাপ হবে একদম ফ্রী। বুঝতেও পারবিনা তুই বাড়িতে না বাইরে। ভাবতে পারছিস, আইটি কি করে ফেলেছে? নে এবার যাবার তোড়জোড় কর আর ফেরার সময় বোতলটা ভুলিস না।

সেই ব্যবস্থাই চলছে আর দিব্বি চলছে আজ আড়াই মাস ধরে। এই জিটকই জিইয়ে রেখেছে হোমসিক অর্পনকে। অফিস থেকে রুমে এসেই অর্পন অনলাইন হয়ে যায় আর তখন কলকাতায় প্রায় রাত নটা। বৌ চাকরি থেকে ফিরে ফ্রেশ হয়ে গেছে, মেয়ের স্কুল, টিউসন শেষ-দুতরফেরই হাতে অগাধ সময়। সারা দিনের সব খুটিনাটি, মেয়ে অন্য ঘরে গেলে, একটু মৌখিক দুষ্টুমি, এমনকি মেয়েকে অংক বুঝিয়ে দেওয়াও হয়ে যায়। আর সাউন্ড কোয়ালিটি পাশের বাড়ি ফোন করার মতো।

অর্পনের ঘোর কাটল বৌএর গলার আওয়াজে, চান করতে করতে ঘুমিয়ে পরলে নাকি?

আসছি আসছি, অর্পন দ্রুতহাতে একটা গ্লাসে ভদকা আর টোমাটো জুস নিয়ে, কম্পিউটারের কাছে এসে বলল, বাপরে কি তাড়া, এসে গেছি, বলো কি খবর?

-কোনো খবর নেই গো, প্রতিদিন আর নতুন নতুন কি খবর হবে?

-তাও বটে। ব্যস আর পনেরোটা দিন কাটতে পারলে, পাপের শাস্তি। ঘরের ছেলে ঘরে।

-পাপ কিসের? বেশ একটা নতুন রকম জীবন, কতো গল্প, কথা বললাম আমরা এই কদিনে। এই তোমায় আনতে যাবো দমদমে, সব গুছিয়ে ভালো করে প্যাক করে নেবে। তুমি যা ক্যাবলা, ফেলে এলে হয়তো কিছু।

-হবে হবে, এখনও ১৫ দিন বাকি, তা তোমরা যে আজ সাত তাড়াতাড়ি অনলাইন হয়ে গেছ? অন্যদিন আমার চান হবারও কিছুটা পরে তোমরা আসো।

-আমাকে একটু বেরোতে হবে, বাবার শরীরটা ভালো নেই, মা সকালে ফোন করেছিল। তারপর বোধহয় ওদের ফোনটাও গেছে, খালি ফলস রিং হয়ে যাচ্ছে, কবে থেকে বলছি একটা মোবাইল নিয়ে নাও। যাই হোক, মন টা খুঁত খুঁত করছে। তাই ভাবছি দেখে আসি একবার।

-অনেক রাত হয়ে গেল যে।

-আরে দুর, নটাও বাজেনি, তুমি যেন মনে হচ্ছে গ্রামে বসে আছো। একবার ঝপ করে দেখে আধঘন্টার মধ্যে চলে আসব, ফোনটা ঠিক থাকলে আর যেতে হতো না। তোমার সাথে এতো দুরে বসে কথা বলছি আর এই ঢাকুরিয়া থেকে পার্ক সার্কাসে ফোন করতে পারছি না, বিরক্ত লাগে। যাকগে, তুমি মেয়ের সাথে গপ্পো করো, আমি আধ ঘন্টার মধ্যে ঘুরে আসছি।

-ঠিক হ্যায়, সাবধানে গাড়ি চালিও আর মেয়েকে দাও, অর্পন গ্লাসে এক চুমুক দিয়ে বলল।

-এত দুরে বসেও, ফ্ল্যাটের নিচের মেন গেট খোলার শব্দ পেল অর্পন, গাড়ি নিয়ে বেরোলো বৌ। আর সাথে সাথেই মেয়ের গলা, যাঃ, মা মোবাইলটা ফেলে চলে গেল। কি হবে?

-কি আবার হবে, মা তো গাড়ি নিয়ে গেছে, দৌড়ে তো আর ধরতে পারবি না। তাড়াতাড়ি মনে পড়লে ফিরে আসবে আর না হলেও, এই তো আধ ঘন্টার ব্যাপার, থাকুক ফোন ছাড়া, এতো রাত্তিরে কে আর ফোন করবে? ফোন এলে তুই ধরিস।

-অর্পনকে ভুল প্রমাণ করতে, সাথে সাথেই বেজে উঠল মোবাইলটা। মেয়ের কথা শোনা গেল,

-মা তো নেই, একটু বেরিয়েছে, আপনি কে বলছেন?

-একটু কাজে গেছেন, আধঘন্টা পর আসবে, আপনি কে বলছেন?

- আরে, আচ্ছা অসভ্য তো, কেটে দিল।

এবার অর্পন কথা বলার সুযোগ পেল, নম্বরটা মায়ের ফোনের সেভ করা নয়?

-না, তাই তো জিগেস করছিলাম বারবার, কে উনি। তা এতো অসভ্য লোক, কেটেই দিল। দাঁড়াও, এই নম্বরটা লিখে রাখি, এর পর এলে রিসিভ করব না।

-করিস না, আচ্ছা তোর কোন বন্ধুর আজ বার্থডে ছিল না? কি হলো? কি খাওয়ালো?

-ও ইয়েস, হেব্বি মজা হয়েছে, বলছি এক এক করে। সকালে স্কুলে গিয়েই তো...। বলতে বলতে আবার ফোন, তবে এবার মোবাইল নয়, শোবার ঘরে রাখা ল্যান্ডফোন।

-পাপা এক মিনিট, দেখি কে আবার ফোন করল, উঠে গেল তিন্নি।

শীতের রাত্তির, সামনের রাস্তায় লোক চলাচল, গাড়ির আওয়াজ কমে এসেছে। কলকাতা শহরে শীত আসার সময় কিরকম একটা অদ্ভুত গন্ধ পাওয়া যায়। এত দুর থেকেও অর্পন ওদের কলকাতার পাড়ার নির্জনতাটা অনুভব করছিল। এখানে কাল রাত্তিরে হালকা বরফ পড়েছে, জানলা দিয়ে সামনেটা দেখা যাচ্ছে, সব সাদা, চাঁদের আলোয় চরাচর ভেসে যাচ্ছে। এবার একটা শিয়াল এসে চাঁদের দিকে তাকিয়ে উঁউঁউঁ করে ডাকলেই, পুরো হলিউডি সাসপেন্স মুভি।

এই মালটা বেশ ভালো, একটু খেলেই নেশা জমে যায়। ঘরটাও গরম হয়ে গেছে, হীটিংটা কমালো। ডিনার পরে খাবে, আরো একটা বড়ো পেগ বানিয়ে অর্পন ফিরে এল।

-কি অসভ্য সব লোক বাবা, আপনি কে বলছেন জিগেস করলেই ফোন কেটে দেয়, ধরে ঠাস করে চড় মারতে হয়, তিন্নি ফিরে এসে গজগজ করতে লাগল।

-দাঁড়া দাঁড়া, যে মোবাইলে ফোন করেছিল সেই না অন্য কেউ? কি চায়?

-কি জানি, অন্য কেউ, মা কে চাইছিল, তারপরেই কেটে দিল। আর এখন তো মা কে কোনভাবেই কন্ট্যাক্ট করা যাবে না, দাদুদেরও ফোন খারাপ। এবার কোন ফোন এলেই আগে বলবো, আপনি কে বলছেন বলুন, তারপর অন্য কথা।

-আচ্ছা ছাড়, সকালে স্কুলে গিয়েই কি হলো বলছিলি?

অর্পন কথা ঘোরালো বটে কিন্তু মাথার মধ্যে কেমন একটা অসোয়াস্তির বীজ নড়ে উঠল। ভালো রাত্তির হয়েছে, পরপর দুটো ফোন মোবাইলে আর

ল্যান্ডলাইনে, চেনা কেউ নয়, নাম বলল না কিন্তু জেনে গেল তিন্নি একা বাড়িতে। তারপর নিজেই ভাবলো, খামোকা এসব চিন্তা করছে? নির্ঘাত ভদকার এফেক্ট, পাশের ফ্ল্যাটেই তো তিন্নির মানুনদিদিরা আছে, দেওয়ালে টোকা মারলেই তিন্নিকে ডেকে নেবে। সেই ভালো, একা একা থাকার মানে হয় না, আলো-টালো যদি নিয়ে যায়।

মেয়ের স্কুলের গল্প থামিয়ে দিয়ে অর্পন বলল, তিন্নি, তুই একা আছিস, মামুন দিদিদের ফ্ল্যাটে তো চলে যেতে পারিস, মা এলে চলে আসবি।

-মামুনদিদিরা তো নেই, ওরা তো আমি স্কুল থেকে আসার পরই বারাসাত চলে গেল। মামুনদিদি বলে গেল এবার দেশ থেকে মিষ্টি দোমালা নাড়কেল আনবে আমার জন্যে।

মুহূর্তের মধ্যে সেই অসোয়াস্তির বীজটা মহীরুহ হয়ে গেল অর্পনের মাথায়। তার মানে এই পুরো চার তলাটায় তিন্নি একা আছে; আর তিন তলার দুটো ফ্ল্যাটই এখনো খালি। অর্পন প্রায় চীৎকার করে উঠল, মা জানে মামুনদিদিরা কেউ বাড়ি নেই?

-না মনে হয়, ওদের তো কালকে যাবার কথা ছিল আর আমিতো মাকে বলার সময়ই পেলাম না? আচ্ছা শোনো না, শ্রেয়া আজ এতবড় একটা কেকের বাক্স এনেছিল...।

তিন্নি কি সব বকবক করে যেতে লাগলো, অর্পনের কানে একবিন্দুও ঢুকছে না। একটা অসম্ভব ভয় করছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম গড়াচ্ছে, ভদকা না হীটিং, ক্যানো এত গরম লাগছে? নভেম্বরের রাত্তির সাড়ে নটা, তিনতলা চারতলা মিলিয়ে তিন্নি একা, হে ভগবান, তৃষা আজই মোবাইলটা নিয়ে যেতে ভুলে গেল, নাহলে এখুনি ফোন করে তৃষাকে ফিরে আসতে বলতো।

-পাপা, মায়ের মোবাইলটা বন্ধ করে দিলাম, সেই নম্বরটা থেকে আবার ফোন আসছে।

-শুনতে পেলাম না তো?

-একবার রিং হতেই দেখে বন্ধ করে দিয়েছি। ঝামেলা শেষ।

-বেশ করেছিস, আরে, মায়ের গাড়ি ঢোকার আওয়াজ পেলাম মনে হলো?

-পাপাআআ!! খুব ড্রিংক করছো, গাড়ির আওয়াজ কি করে শুনবে? ঠান্ডা আসছে বলে তো জানলাটা বন্ধ করে দিয়েছি।

-ও তাই বল।

অর্পন মনে মনে নিজের ওপরেই রেগে গেল, কলকাতায় ঘরের জানলা বন্ধ তাই সব চুপচাপ লাগছে, আর এখানে একা বসে সামনে নির্জন সাদা বরফ ওর মাথায় ভয়ের ভুত ঢুকিয়েছে। এই তো দিব্বি টুকুর টুকুর করে কথা বলতে বলতে সময় কেটে যাবে, তৃষা ফিরে আসবে। আজ আর বেশী রাত করবে না, শঅশুরের কি খবর জেনেই বাই বাই, ডিনার আর ঘুম।

টুং টাং, কলিং বেলের শব্দ ৫,৫০০ কিমি পেরিয়ে এসে অর্পনের কানে মধু ঝরালো। তৃষা ফিরেছে।

-মাম্মী এসে গেছে, দরজা খুলে আসছি।

তিন্নি ছুটল। অর্পন গ্লাসে এক চুমুক দিয়ে লহমায় পুরনো মেজাজে।

-তিন্নি ই ই, জিগ্গেস করে দরজা খুলিস।

আর জিগেস করা, সাথে সাথেই দরজা খোলার শব্দ আর 'পরমুহুর্তেই তিন্নির সজোরে ককিয়ে ওঠা, ঠিক যেন কেউ ওর গলাটা টিপে ধরল।

-তিন্নি, তিন্নি, পাগলের মতো চেচিয়ে উঠল অর্পন। হ্যালো হ্যালো তিন্নি শুনতে পাচ্ছিস? তৃষা, তৃষা এলে? কি হলো কথা বলছিস না ক্যানো? তিন্নি কে এলো? তিন্নি...!

আর কোনো সাড়া নেই, কোন শব্দ নেই। কয়েক সেকেন্ড, ল্যাপটপের পর্দায় তিন্নির নামের পাশের সবুজ আলোটা নিভে গেল। তিন্নি কলকাতার ফ্ল্যাটে অফলাইন হয়ে গেল।

আতঙ্কে উন্মাদ হয়ে যেতে যেতে অর্পনের মনে পড়ল, কয়েকদিন আগে তৃষা বলেছিল, ওদের পুরনো বুড়ো গেটম্যান চলে গিয়ে কে একটা নতুন চ্যাংড়া দারোয়ান এসেছে, হাবভাব মোটেই ভালো নয়, তকে তাড়ানো হবে। অর্পন পাগলের মতন বাড়ির ফোন ঘোরালো - রিং, কল ওয়েটিং, কিচ্ছু হলো না, ফোনটা নামানো। মোবাইল তো তিন্নি নিজেই বাবাকে বলে বন্ধ করে দিয়েছে, তাও, যদি... না! সুইচ অফ।

আবার, আবার নম্বর লাগালো বাড়ির ফোনের, বারবার সেই এনগেজড টোন। যে ফ্ল্যাটে ঢুকেছে, সে জানে, প্রথমেই ফোনটা নাবিয়ে দিয়েছে। ডুবন্ত মানুষের কুটো ধরার মতোন অর্পন পার্কসার্কাসে ফোন করলো, তৃষা কে বলবে এখুনি বাড়ি আসতে, রিং হচ্ছে, কি শান্তি, রিং হচ্ছে, রিং হতে হতে কেটে গেল, কেউ ওঠালোনা। তাহলে...।

শ্বশুর কি হসপিটালে, তাই তৃষার দেরী হচ্ছে, ভাবছে মামুনরা তো আছেই। আসে পাশে আর কারুর নাম্বার জানে না অর্পন। ওর দিদিকে উত্তরপাড়ায় ফোন করবে? কি লাভ? উত্তরপাড়া থেকে আসতে আসতে ওর ফুলের মতো

১৩ বছরের তিন্নি, ও নিজের কানে শুনল মেয়েটার আর্তচীৎকার। বাবা হয়ে, সব জেনেও, ও কতো অসহায়।

এখন ঘরে শুধু ঘড়ির টিকটিক শব্দ, যার প্রতি পলে তছনছ হয়ে যাচ্ছে ওর সুখের সংসার। অর্পন জানলাটা খুলে দিয়ে হাউহাউ করে কাঁদতে লাগল। বরফের ওপর দিয়ে বয়ে আসা হিম হাওয়া ওকে আসতে আসতে জমিয়ে দিতে লাগল।

তখন ঢাকুরিয়ার ফ্ল্যাটে তিন্নিও কাঁদছে পায়ের ব্যাথায়। ওর পা দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। মেয়েটা এত ছটফটে, দৌড়ে দরজা খুলতে গিয়ে, পায়ের ওপর দিয়ে ঘষে গেসল দরজাটা। খুব লেগেছে। তৃষা তাড়াতাড়ি বরফ দিল। ভাগ্গিস নিচের সেই পুরনো দারোয়ানটা ফিরে এসেছে, তাকে দিয়েই মলম এনে, ব্যান্ডেজ করে দিল। মেয়েকে খেতে দিয়ে শোবার ব্যাবস্থা করে দিল।

এই সব মিটিয়ে মনে পড়লো, মা তাড়া দিয়ে ফেরত পাঠিয়ে বলেছিল পৌছে খবর দিতে। বাবা ঠিকই আছে। ওদের ফোন খারাপ তাই ওদের পাশের ফ্ল্যাটে ফোন করে দিতে। ফোন করতে গিয়ে দেখল বাড়ির ফোনটা বাজে করে রাখা। জিগেস করতে কান্না ভুলে তিন্নি অম্লান বদনে বলল, ভালই হয়েছে, নাহলে পাপার সাথে কথা বলার সময় আরো ফোন আসত।

এতক্ষনে চোখ গেল কম্পিউটারে, নেট কানেকসান কেটে গেছে, মানে কেবলওলার সার্ভার ডাউন, এত রাতে আর ঠিক হবে না। সাট ডাউন করতে দিয়ে অর্পনের কথা মনে পড়লো,

- এই তিন্নি, বাবা জানে তো আমি এসে গেছি?

- হ্যা, আমি তো বলেই দরজা খুলতে গেলাম, বাবা বললো জিগেস করে খুলিস।

- ঠিক আছে, তাহলে আর এত রাত্তিরে বাবাকে ফোন করব না, নিশ্চই ঘুমিয়েই পরেছে, আবার তোর পা কেটে গেছে শুনলে চিন্তা করবে, কাল কথা হবে। চল শুয়ে পড়ি।

পরদিন অর্পনের মৃত্যুর কারণ লেখা হয়েছিল, হার্ট অ্যাটাক। ডাক্তার বলেছিল, খালি পেটে অনেকটা হার্ড ড্রিংক্স এবং গরমের থেকে অতিরিক্ত ঠান্ডায় দাঁড়ানোর জন্যে এটা হতে পারে।

সাবু

দেবাশিস ভট্টাচার্য 'শিবাজি'

সে বেশ অনেকদিনের কথা। তখন তারা থাকতো ময়মনসিংহ জেলায়, এখনকার বাংলাদেশে। তারপরে কি সব কারণে জানি দেশান্তরী হয়ে এই বঙ্গে আসা, খাস কোলকাতায়। তবে, সে দেশের ঠাটবাট হতে সময় লেগেছে অনেক। প্রায় পনেরো বছর বাদে কিছু সম্পত্তি উদ্ধারের পরে আস্তে আস্তে দালানকোঠা, পুকুর, বাগান সবই হয়েছে। কোলকাতায় দক্ষিণে বাঘাযতীন কলোনিতে, যেখানে একদিন প্রায় উদ্বাস্তু হয়ে এসেছিলো তারা, সেখানেই আজ চকমিলানো বাড়ী, দুর্গাপুজোর মন্দির না হলেও শানবাঁধানো বেদী, আরও অনেক কিছু। একসময়ে তো তাদের মনে হতো বাকি জীবনটা বোধহয় উদ্বাস্তু তকমা নিয়েই বয়ে যাবে। কিন্তু, তা হয়নি। জমিদার না বললেও এখনকার অবস্থা দেখে সবাই বলে বেশ অবস্থাপন্ন।

ছোট পুকুরের শানের সিঁড়ির ওপরের ধাপে বসেছিলো কল্যানী। কতো ছবি জলের ওপর ভেসে উঠছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে, ময়মনসিংহের সেই গ্রাম, গ্রামের জমিদার বাড়ীটা। সেই পুকুরঘাট, সেই গোয়ালঘর, সেই গোয়ালঘরের পাশের ঘরটা, যাকে বলা হতো সূতিকাঘর। সব হালকা হালকা ভাসছে আর নিভে নিভে থির হয়ে যাচ্ছে। নাঃ, আর ভালো লাগছে না। পুরনো সব কথা, কি হবে মনে করে? যে জীবন ফিরবে না তাকে আঁকড়ে ধরে লাভ কি? তার থেকে এই বেশ আছে সে। কল্যানী নিজের ফেলে আসা জীবন থেকে খানিকটা পালিয়েই বাঁচতে চায়।

উঠে পড়তে গিয়েও বসে পড়ে। পা'টা যেন ভারী হয়ে এসেছে। অনেকক্ষণ বসার ফলে বোধহয়। ময়মনসিংহের বাড়ীর পুকুর ঘাটটা যেন হাতছানি দেয়। সেদিনও কল্যানী বসেছিলো ঘাটলায়। হঠাৎ পেছন থেকে তার শাশুড়ি ননীবালা দেবী ডাক পাড়েন। কল্যানী উঠতেই যাচ্ছিলো। কিন্তু তাকে বসতে বলেই এগিয়ে এলেন ননীবালা।

-এখন ভরা পোয়াতি তুমি, দুম করে উঠে পড়লে চলবে? আমিই আসছি তোমার কাছে।

- আচ্ছা, মা।

-এই নাও, এই সুতোটা তোমার বাঁ হাতের বাজুতে বেঁধে দিই এসো।

-কেন মা? আরও তো কত গাছি এহাত ওহাতে বাঁধা আছে। আর আমার তো কোন অসুবিধে নেই।

-তা হলেই বোঝ! তুমি যদি সবই বুঝে যেতে বৌমা, তবে এদ্দিনে আমি নাতির মুখ দেখেই চোখ বুজতে পারতাম।

কল্যানী আর কথা বাড়ায় না। হাতটা বাড়িয়ে ধরে। ননীবালা সুতো বাঁধতে বাঁধতে পুকুরের জলে ছবিরা আবার মিলিয়ে যেতে থাকে। পুকুরঘাট থেকে উঠবে কি উঠবেনা ভাবছে কল্যানী, এই সময়ে বারান্দা থেকে কাজের মেয়ে রাধা চেঁচিয়ে ডাকে।

-ও মা, এবারে উঠে এসো। তোমার শাউড়ি তো শুয়ে শুয়েই পাগল করে দিচ্ছে। সন্দে হয়ে গেলো, এখনো সন্দেবাতি দেয়নিকো।

-সন্ধ্যা হতে তো বাকি আছে রে রাধা।

-তা কে বোঝাবে তেনাকে? মা জননী সবেতেই খেকিযে রয়েছে।

- ছিঃ, ওইভাবে কথা বলবেনা। আমাদের সবার গুরুজন উনি।

-তুমি এসো তো? এইবারে আমিও পালাবো।

রাধা সব কাজ শেষ করে, ননীবালার গা মুছিয়ে বিকেলের কাপড় পরিয়ে, মায় ঠাকুরঘরের দরজার সামনে পেতলের ধুনুচি রেখে তার পাশে নারকোল ছোবড়া কেটে, ধুনো গুগগুলের কৌটো রেখে চলে যায়। ঠিকে ঝি, কিন্তু কল্যানীর জন্যে ওর খুব মায়া। কল্যানীর চুপ মেরে থাকাটা ওর ভালো লাগেনা। বোঝে যে জাঁদরেল শাশুড়ির জন্যেই ওইরকম চুপ করে থাকে কল্যানী।

কল্যানী ভেতরে যায়। কাপড় ছেড়ে বসে থাকে নিজের ঘরে। সন্ধ্যে হতে সত্যিই দেরী আছে, জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। চোখ চলে যায় বিকেলের মৃদু হাওয়ায় পুকুরের জলের তরঙ্গের দিকে। আবার সেই জলে ছবিরা জেগে ওঠে ফিনফিনে হালকা মাকড়সার জালের মতন। কতদিনের কথা! সেই গ্রামের বাড়ীর আঁতুড়ঘর। সেইখানে মেয়েদের জন্ম। এক নয় বারে বারে দুইবার। বাচ্চার জন্ম হবার পরে ধাই বলে, ও মা কি সুন্দর বেটি এসেছে তোমার কোলে। বুকের দুধ হলে তখন তোমার কোলে শুইয়ে দেবো। কল্যানী শুয়ে শুয়ে ঘরের মধ্যে শোনে শাশুড়ি ধাইকে কি যেন বললো। বুঝতে পারেনা। ঘন্টাখানেক বাদে ধাই কাঁদতে কাঁদতে বলে তাকে তার বাচ্চাটা মরে গেছে।

কল্যানীর বুকটা ফেটে যায়। প্রসবযন্ত্রণা হার মেনে যায় সেই শোকবার্তায়। অনাহূত দেবশিশুটির জন্যে বুকের কাপড় ছাপিয়ে দুধের ধারা ছড়িয়ে পড়ে কান্নার মতো।

দু'বছরের মাথায় আবার পোয়াতি হয় কল্যানী। সেবারেও একইভাবে প্রসবের পরে জানতে পারে মেয়ে হয়েছিলো, মরে গেছে। ধাই কদিন বাদে এসে কেঁদে পড়ে কল্যানীর পায়ে।

-মা গো। আমায় মাফ করে দাও। তোমার দুটি পায়ে পড়ি। অমন চাঁদপানা বেটির মুখে আমি ধান দিয়েছি গো মা। সেই ধান চুষতে চুষতে চোখের সামনে গলায় আটকে নীল হযে মরে গেলো গো মা।

- কেন? কি দোষ করেছিলো আমার মেয়ে? আমার আগের মেয়ের বেলাতেও কি...?

- হ্যাঁ গো মা। তোমার শাশুড়ির কথায়। এই দ্যাখো, তোমার শাশুড়ি আমাকে এই গোটের হারখানা দিয়েছে। এই বলে মুঠি খুলে দেখায় ধাই।

-ওহ মাগো। কেন আমার ছেলে হলো না? তাহলে তো আমার বুকের দুধ এইভাবে শুকিয়ে যেতো না!

-আমি আর চুপ করে থাকবো না। আমি গ্রামের সবাইকে বলে দেবো জমিদার গিন্নী রাক্ষুসী।

কল্যানী বোবা হযেই থাকে। ধাই ঘর থেকে বেরিয়ে যায় আচলের খুঁটে চোখ মুছতে মুছতে।

কি যে হলো তারপরে কে জানে। একদিন শ্বশুর এসে বললেন যে এ তল্লাটে আর থাকা যাবেনা। যুদ্ধ লাগবে। আসেপাশের মুসলমান মুলুকের সবাই মুখিয়ে আছে জমিদারির শেষ করবে বলে। তারপরে হঠাৎ একদিন সবাই চলে আসে এপার বাংলায়। ঠাঁই হয় বাঘাযতীন কলোনিতে। কিন্তু, সে তো যুদ্ধের অনেক আগেই! তাহলে কি ধাইযের কথাতেই এলাকায় গণ্ডগালে বাঁধে? কল্যাণীর মনে আর কোন দ্বন্দ্ব নেই। তাহলে তার সাবিত্রীও কি একা একা জলে নামতে গিয়ে ডুবে যায় নি? তাহলে কি ? উফ আর ভাবতে পারেনা কল্যানী। ঢেউয়ে ঢেউযে ছবিরা আবার মিলিয়ে যায়। ছেলের ডাকে মায়ের বাস্তবে ফেরা।

-কি হলো মা? ইস্কুল থেকে এসে খেলতে চলে গেলাম। এখন ফিরে এসে দেখছি যে তুমি সেই বসেই আছো জানালার ধারে। তুমি খেতে দাও। খুব খিদে পেয়েছে মা।

- এই তো বাবা, দিচ্ছি। তুই হাত পা ধুয়ে জামাকাপড় বদলে নে। ততক্ষণে। আমি খাবার টেবিলে তোর পছন্দের খাবার দিচ্ছি।

-কি বানিয়েছো গো।

-বলবো না। তুই শিগগির আয়। তোর না খিদে পেয়েছে?

-উফ, বলোই না।

-চিড়ের পোলাউ।

-সত্যি? চিঁড়ের পোলাউ, চিঁড়ের পোলাউ...

নাচতে নাচতে কলঘরের দিকে ছুট লাগায় অর্ক। পুরো নাম অর্কজ্যোতি।

টেবিলে খাবার আগলে বসে বসে কল্যানী ভাবে। খোলা জানালা দিয়ে পুকুরের একাংশ দেখা যায়। সেইদিকে দৃষ্টিতে আসে পড়ন্ত বিকেলের রঙের জলছাপ। কাঁপতে কাঁপতে আবার ছবি হয়ে ফুটে উঠছে তারা। আনন্দের রঙের জমকালো ভালোলাগারা।

এই তো সেদিনের কথা। অর্কর জন্ম হলো। এইবারে আঁতুড় নয়, ধাই নয়; শিশুমঙ্গল হাস্পাতালে। ছেলের তো বয়সই হলো আট বছর। ঘটা করে ওর অন্নপ্রাশন হলো। বাড়ী সাজানো হলো, কতো নিমন্ত্রিত অভ্যাগত এলো। সবাই আশীর্বাদ করে গেলো আগামী প্রজন্মের বংশগতি রক্ষার শিবরাত্রির সলতেটিকে। কারণ এই ছেলের জন্মের সময়ে ডাক্তারবাবু বলে দিয়েছিলেন যে কল্যাণীর আর কোন ছেলেপুলে হবে না, ওর জরায়ু কেটে বাদ দিতে হয়েছে। তাই ছেলেকে সর্বক্ষণ আগলে রেখেছে কল্যানী। চোখে চোখে রেখেছে। বাড়ীশুদ্ধ সকলের নয়নের মণি সে। ননীবালার নাতি নিয়ে আহ্লাদে মাঝে মাঝে অবশ্য কল্যানীর বিরক্তি আসে, তবু কিছু বলেনা। সন্ধ্যে গাঢ় হয়। কল্যানী ঠাকুর ঘরে ধূপদীপ দেখিয়ে ঘরে ঘরে ধোঁয়া দিয়ে ফেরে। জলছবিরা ক্রমশ ঘন অন্ধকার পুকুরের জলে হারিয়ে যায়।

-কই মা, দিলে খেতে?

-এই তো দ্যাখনা। ঢাকা খুলে দেখায় কল্যানী।

-আজ অনেক কাজু বাদাম কিসমিস দিয়েছো, তাই না মা?

-হ্যাঁ, তুই ভালাবোসিস

-ওই সবুজ গুলো দাওনি তো?

-না, এই দ্যাখ।

-ওই কড়াইশুটি আমি দুচক্ষে দেখতে পারিনা।

- খেয়ে নিয়ে কিন্তু পড়তে বসবে সোনা। কাল না কি একটা পরীক্ষা আছে?

-এই তো দ্যাখোনা, গপগপিয়ে খেয়েই আমি আসছি তোমার কাছে বই নিয়ে।

কল্যানী শোবার ঘরে এসে সব আলো গুলো জ্বেলে দেয়। অর্ক পড়তে আসবে। কিছুক্ষণ পরে ছেলে এসে বসে মায়ের কোলের কাছে। মা ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

-সে কি রে। মাথাটাও মুছিসনি ভালো করে? এতো জল?

-কি করবো? যা খিদে পেয়েছিলো না! তুমি তোমার আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দাওনা মা প্লিজ।

-ওরে পাজি। তোর মনে যতো কুবুদ্ধি, তাই না?

- হেঁ হেঁ হেঁ।

অনেকক্ষণ কেটে যায় পড়াশোনায়, আদরে আহ্লাদে। অর্ক কাজ শেষ করে উঠে যাবার সময়ে টেবিলের ওপরে রাখা কাচের বোয়াম থেকে ঢাকা তুলে চারটে নারকোল তক্তি তুলে বেরিয়ে যায়।

-কি রে বাবা! পেট ভরেনি? বললেই তো তোকে আরও একটু পোলাউ দিতাম বাবা। অত গুলো তক্তি এখন খেলে রাতের খাবার কি করে খাবি সোনা?

মায়ের কথার উত্তর না দিয়েই এক ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় অর্ক। জানালার পর্দা সরানোই ছিলো। কল্যানী দেখে ঘাটের শানে ছেলে গিয়ে বসেছে। ও ছোটবেলা থেকেই সেখানে বসতে ভালাবোসে। সেই ঘাটের শানটা কল্যাণীরও প্রিয় জায়গা। বেশ কিছুক্ষণ পরে অর্ক ফিরে এসে আবার মায়ের কাছে আসে।

-কিরে? চলে এলি? আমি তো ভাবছিলাম তোর পাশে গিয়ে বসবো। দ্যাখ চাঁদ উঠেছে। কি সুন্দর লাগে না জলে চাঁদের ছায়া?

-আচ্ছা মা? সাবু কে?

-কে সাবু?

-ওই যে ছোট্ট মেয়েটা। যে আমার কাছে তোমার হাতের নারকোলের তক্তি খেতে চাইলো!

-কোথায়?

-সে তো চলে গেলো। বললো ও আমার দিদি, আমায় সাবু দিদি। বললো ওর ভালো নাম সাবিত্রী।

কল্যানী হঠাৎ চমকে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে পড়েই যাচ্ছিলো। কোনরকমে খাটের বাজু। ধরে নিজেকে সামলে নিলো। একথা তো বাঘাযতীনে আসার পরে একদিনের জন্যেও কেউ বলেনি? আলোচনাও হয়নি। তবে ওই ছোট্ট ছেলে জানলো কি করে!

-কোথায়? কোথায় সে? সে আমার হাতের তক্তি খেতে চেয়েছিলো।

-ওই তো, আমি গিয়ে পুকুরের ঘাটে যেখানে বসেছিলাম, সেখানে।

কল্যানী ছুটে যায় জানালার কাছে। দেখার চেষ্টা করে কেউ রয়েছে কিনা।

-জানো মা, কদিন থেকেই সাবু দিদি এসে বসে থাকে আমার খেলার মাঠে। তারপরে হঠাৎ করে চলে যায়। আজ আমাকে বললো তোমার হাতের তক্তি খেতে খুব ইচ্ছে করছে। সে নাকি ছোটবেলায় তোমার কোলে বসে তাই খেতো। তাই তো আমি নিয়ে গেলাম ওর জন্যে।

কল্যানী জড়িয়ে ধরে অর্ককে। দু'চোখ থেকে গাল বেয়ে জল গড়িয়ে বুক ভেসে যাচ্ছে। থরথর করে কাঁপা ঠোঁটে কি যেন বলতে যাচ্ছে। কারো নাম ধরে যেন ডাকতে চাইছে।

- হ্যাঁ বাবা, সাবু দিদি তোর নিজের সব থেকে বড়ো দিদি। সাবিত্রী ব্রতের দিনে হয়েছিলো, তাই নাম রেখেছিলাম সাবিত্রী। কিন্তু তোর ঠাকুমার বড়ো নাম ডাকতে অসুবিধে হয়, তাই উনিই সাবু নামটা দিয়েছিলেন।

-কে? ঠাকুমা? কিন্তু ঠাকুমা ওকে তো একদম ভালাবোসতো না?

-কে বললো সেকথা?

-কেন সাবু দিদি?

কল্যানীর মুখে আর কথা সরে না। চোখের সামনে ফুটে ওঠে পুকুরের জল থেকে তুলে আনা সাদা হয়ে যাওয়া ছোট্ট নিথর দেহটা। সাবিত্রীর।

কল্যানীর সম্বিত ফিরে আসে হঠাৎ অর্কর বাবা প্রশান্তের চিৎকার শুনে। কখন কাজের শেষে বাড়ী ফিরেছে প্রশান্ত সে খেয়াল নেই কল্যানীর। রোজকার অভ্যেস অনুযায়ী সে আগে যায় মায়ের ঘরে। তারপরে বিশ্রাম করে রাতে খাবার আগে। কল্যানী দ্রুত শাশুড়ির ঘরের দিকে যায়, পেছন পেছন অর্কও। ঘরে ঢুকেই স্তম্ভিত হয়ে যায় সবাই। ননীবালার চোখ যেন ঠেলে বেরোচ্ছে। মুখ হাঁ করা। সেই মুখে নারকোলের তক্তি ভরা। কষ বেযে গ্যাঁজলা বেরোচ্ছে।

থেরাপিস্ট

লিপিকা দে

'গুড মর্নিং তারা ঝটপট উঠে পড়। কেটল অন করছি।"— সেরার গলা কানে যেতেই একলাফে বিছানা ছাড়ল নয়নতারা। সেরা ততক্ষণে ঘরের আলো জ্বালিয়ে জানালার পর্দা সরিয়ে দিয়েছে। দেওয়াল জোড়া কাঁচের জানালার বাইরে ভোরের আভাস। লালচে-গোলাপি মেঘেরা আনমনে ভেসে বেড়াচ্ছে আকাশের বুকে। নীচের বাগানে মখমলি সবুজ ঘাস ঘিরে রং-বেরং-এর ফুল। লণ্ডনের উপপ্রান্তে এই শহরটার নাম বাকিংহ্যামশায়ার। ছোট হলেও বিশ্বের ইতিহাসে এই শহরটির জ্বলজ্বলে উপস্থিতি অস্বীকার করা অসম্ভব। নয়নতারার হোটেল থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে ব্লেচলি ম্যানসন!

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ওই বাড়িটিতে বসে মিত্র শক্তির হয়ে অক্ষ শক্তির গুপ্ত কথোপকথন ভেদ করার কাজ করতেন এক ঝাঁক বৈজ্ঞানিক। তাদের মধ্যে ছিলেন অ্যালান টিরিং, গর্ডন ওয়েলশম্যান, হিউগ আলেকজান্ডার প্রমুখ। রিনরিনে গলায় সেরা জানালো— চা তৈরি। জানালার পাশে সোফায় বসে কাল সন্ধ্যে-রাত্তির থেকে জমে থাকা বার্তাগুলো দেখছিল নয়নতারা। লীবনার পুরস্কার কমিটির পক্ষ থেকে নিয়মকানুনগুলো আরও একবার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেরা এসে টেবিলে চা রাখল। নয়নতারা ওর গাল ছুঁয়ে জিজ্ঞেস করল— "তুই তৈরি তো সেরা?"

সেরা ওর হাতে হাত রেখে বলল— "পুরোপুরি তারা।" এরপর সুর করে গেয়ে উঠল— "আই অ্যাম রেডি ফর দ্য শো! নয়নতারার প্রিয় লাইন— ওর থেকেই এটা শিখেছে সেরা। অবশ্য সেরাকে তো ওর ক্লোন বানানোর জন্যই এতদিন ধরে পোগ্রাম করা হয়েছে। সেরা নয়নের কথা বলার ধরণ, ওর শব্দচয়ন, ওর যুক্তি-চিন্তা-ভাবনার প্রয়োগ প্রতিনিয়ত অনুসরণ করে। অর্থাৎ সেরা যদি লোকচক্ষুর আড়াল থেকে চেনা মানুষের সাথে কথোপকথন চালায়— তাহলে তারা ভাবতেই পারেন যে তারা নয়নের সাথেই কথা বলছেন। তবে এটা ঘটনা— সেরা নয়নতারার থেকে অনেক বেশি তথ্য ধরে রাখতে পারে তার যান্ত্রিক মগজে।

আর শুধু নিজস্ব পাঁচ টেরাবাইটেই তো সীমাবদ্ধ নয় তার তথ্যসম্ভার— সেরার হাতের নাগালের মধ্যেই রয়েছে এই দুনিয়ার বিশাল ডিজিট্যাল তথ্যাবলি। ওয়্যারলেস কানেকশন ঠিকঠাক চললে চোখের পলক না ফেলতেই সেরা যে কোন তথ্য ক্লাউড থেকে যোগাড় করে ফেলতে পারে। আর সেসব হজম করতেও তার

ওই কয়েক পলকই যথেষ্ট। সংখ্যা হোক বা শব্দাবলী, ছবি হোক বা জটিল গ্রাফ— নয়নতারা এবং তার সহকর্মীদের নিরন্তর প্রয়াসে সেরার কাছে যেকোনো আর্টিকেল পড়ে বুঝে ফেলা খুব একটা শক্ত কাজ নয়। তা বলে সেরাকে সর্বজ্ঞ ভেবে ফেলা ঠিক নয়। আর সেই জ্ঞান সেরার টনটনে। তাই কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারলে সেরা বিনীতভাবে সরি বলে দেয়। সঙ্গে কিছু সূত্রও দিয়ে দেয়— যাতে প্রশ্নকর্তা ইচ্ছে থাকলে নিজে আরেকটু পড়াশোনা বা গবেষণা করতে পারেন।

''নয়না— এবার কিন্তু তোমার তৈরি হবার সময় হয়ে গেছে।'' ওকে তাড়া দেয় সেরা। ''ঠিক ঠিক! চায়ের কাপ রেখে চটজলদি উঠে পড়ে নয়নতারা। যদিও সেরাই প্রতিযোগী, ওই থাকবে সবার সামনে, নয়নতারা আড়ালেই থাকবে, তবু খানিকটা প্রসাধন তো করতেই হয়! যেকোন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে খুব অসুবিধা না হলে শাড়ী পরতে ভালোবাসে নয়নতারা! আজকের জন্যে বেছে এনেছে একটা তাম্রবরণ তসর। সেরার গায়ের রঙও তামাটে। চুল রেশমী কালো, ঈষৎ কোঁকড়া। যেহেতু রোবটটির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বেশিরভাগই এখনো জাপান অথবা ইয়োরোপ থেকে আনাতে হয় ওদের কোম্পানিকে, তাই সেরার চেহারায় ভারতীয়ত্ব এখনো পুরোপুরি আঙ্ক রোপ করতে পারেনি ওরা। তবে ওরে ইংরাজি উচ্চারণ শুনে পরিস্কার বোঝা যায় ও ভারতীয়। তাতে মার্কিনী, বিলেতি, ইতালীয়, চাইনিজ এইসব কোনো প্রভাবই নেই।

সেরার ইংরাজিতে বাঙালি, তামিল বা পাঞ্জাবী ছাপও নেই। ওর স্পীকিং মডেলটা বানাবার সময় নয়নতারা বিশেষভাবে নজর দিয়েছে যাতে ব্যাকরণটা যথাসম্ভব শুদ্ধ থাকে। তার জন্যে গদ্যের সাহায্য নিয়েছে ওরা।, সেরা বাংলা, হিন্দি, মারাঠী, তামিল, ইত্যাদিও স্বচ্ছন্দে শুদ্ধ উচ্চারণে বলে। এর পিছনে অবশ্য ওদের কোম্পানির সব কর্মীদেরই প্রচুর অবদান আছে। সেরার ট্রেইনিং-এর জন্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভয়েস এবং লিখিত ডেটা রেকর্ড করে দিয়েছে। নয়নতারা, অভিষেক, সুপর্ণা আর অশ্বিনী, চার বন্ধুর কোম্পানি 'অযান্ত্রিক'। এদের দক্ষতা বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত করার জন্যে স্পেশালিস্ট রোবট-মানব বা রোবট-মানবী বানানো। ডাক্তারির জন্যে স্পেশালাইজড রোবট 'হৃদম'। ওদের হেড কোয়ার্টার দিল্লীতে বসেই দেশ-বিদেশের ডাক্তারদের শলা পরামর্শ দেয়।

তেমনই আছে 'খনিজা'—মাইনিং এক্সপার্ট। সেরাও একজন মনরোগ বিশেষজ্ঞ। তবে আজ এখানে এসেছে সেরা রোবটিক চ্যাটবট হয়ে লীবনার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে। আসলে মানুষের সাথে কথোপকথন চালানো ব্যাপারটা শুনতে যতটা সহজ মনে হয়— গত পঞ্চাশ বছরের গবেষণা বুঝিয়ে দিয়েছে যে সহজ কথোপকথন চালানো মোটেই ততটা সহজ নয়।

১৯৬০ সালে অ্যালান টিউরিং ঘোষণা করেন যে মানুষ যদি এমন একটা কম্পিউটার তৈরি করতে পারে যে তাকে না দেখে কেবল তার সাথে কথা বলেছে একজন মানুষ বুঝতেই পারবে না যে সে একটা কম্পিউটারের সাথে কথা বলেছে

তবেই ধরে নেওয়া হবে যে সেই কম্পিউটারটি যথার্থ ধীমান বা ইনটেলিজেন্ট! এই পরীক্ষার নাম টিউরিং টেস্ট। আজ অবধি কোনো কম্পিউটারই এই পরীক্ষা পাশ করতে পারেনি। টিউরিং টেস্টের অনুপ্রেরণাতেই ১৯৯০ সালে হিউঘ লীবনার ঘোষণা করেন এক বার্ষিক প্রতিযোগিতার সেখানে সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীরা তাদের তৈরি চ্যাটবট নিয়ে আসেন।

এই প্রতিযোগিতা প্রতি বছরে ব্লেচলী পার্কেই হয়। আজকাল তো পাড়ায় পাড়ায় রোবট কিনতে পাওয়া যায়। তাই চ্যাটবটগুলো রোবটের ভিতরেই বসানো থাকে। এখানে সেইসব বটরা সম্যকভাবে পরীক্ষিত হয়। যে সব কম্পিউটার সবচেয়ে বেশী মানুষের মত যৌক্তিকতা দেখাতে পারে তারা পুরস্কৃত হয়। গত পনেরো বছর ধরে বিশ্বের তিনটে কোম্পানি নিজেদের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান ধরে রেখে দিয়েছে। নয়নতারাদের 'অযান্ত্রিক' তার মধ্যে অন্যতম। প্রতিযোগিতার সময় রোবটদের সাথে কথা বলেন বিভিন্ন বিশেষজ্ঞরা। তারাপ্রশ্ন করেন, কাজ দেন রোবটদের তা বুঝে উত্তর দিতে হয় এবং নির্দেশ পালন করতে হয়। এই কথোপকথন কোন পূর্ব নির্ধারিত পথ ধরে এগোয় না। ঘরের ভেতর বাধা বিপত্তি পেরিয়ে হেঁটে চলে কাজকর্ম করে ফেলতে তো রোবটরা অনেকদিন থেকেই এক্সপার্ট। আজকাল চিমনি পরিষ্কার বা গাছের পরিচর্যাও দিব্যি করে ফেলতে পারে।

দেখা যাচ্ছে দিন দিন চ্যাটবটরাও বিভিন্ন বিষয়ে, তা সে এরোনটিক্স হোক বা উদ্ভিদবিদ্যা, বিশেষজ্ঞদের সাথে কথোপকথন চালাতে দিব্যি সড়গড় হয়ে উঠেছে। দু বছর আগে 'হৃদম' দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছিল চিকিৎসাশাস্ত্র বিভাগে।
তবে সাধারণ কথোপকথন চালানতে মানুষের মনটা বুঝতে হয়। মানুষ অনেক কথা পরিষ্কার করে বলে না। আভাস আন্দাজ থেকে বুঝে নিতে হয় তার কথা
এই ব্যাপারটাতে চ্যাটবটরা এখনো কাঁচা। তাছাড়া মানুষটির ওপর তাদের উত্তরের প্রভাবই বা কি হতে পারে— সেই ব্যাপারটিও আন্দাজ করা বেশ কঠিন।

কোন ফিজিক্যাল সেন্সিং ছাড়া স্রেফ শব্দাবলী দিয়ে মানুষের মন বুঝতে এখ নো ভালো পারছে না রোবটরা। মুখ দেখে বা গলা শুনে বেশ কিছুটা ান্দাজ করতে পারলেও পুরোটা পারছে না। আর সেখানেই জটিলতা। তবে আাস্তে আস্তে সেই বাধাটুকু পেরোবার পথেই হাঁটছে বিজ্ঞান। আজকের প্রতিযোগিতায়ও তার এক ঝলক পরীক্ষিত হবে।

সেরা আরেকবার তাড়া দেয় নয়নতারাকে। নয়নতারার এমনতর শৈথিল্য ও আগে কোনদিন দেখেনি। তাই জিজ্ঞেস করে, ''তোমার শরীর ঠিক আছে তারা?" নয়ন মাথা ঝাঁকিয়ে সেরাকে আশ্বাস দেয়,''চিন্তা করিস না রে! ঠিকই আছি! এই দিনটার জন্যে কবে থেকে বসে আছি বল তো! তাই একটু ইমোশনাল হয়ে পড়ছি!" সেরা বলে, ''তা ঠিক। কিন্তু তুমি অন্যমনস্ক হলে কিন্তু আজ আমাদের ক্ষতি হয়ে যাবে। আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব ঠিকই। কিন্তু তোমাকে ছাড়া আমার চলবে

না তা তো তুমি জানো। আমি অঙ্ক করতে পারি। তবে মানুষের মন বুঝতে তোমার সাহায্য আমার এখনো দরকার। নয়নতারা হাসে, ''জানি জানি। চিন্তা করিস না, আমি তোকে ঠিক সময়ে সময়ে ফিডব্যাক পাঠিয়ে দেব। আমাকে এক কাপ কফি খাওয়া তো!'' 'ইয়েস এ স্ট্রং টল ব্ল্যাক ইজ হোয়াট ইউ নীড!'

কফি খেয়ে স্নান সেরে, তৈরি হয়ে নয়নতারা সেরাকে নিয়ে বসেন তাদের ভেতরের 'ব্রেন-টু ব্রেন' কমিউনিকেশনটা চেক করতে। ebner পুরষ্কারের প্রতিযোগিতায় এই ব্যাপারটা এ বছরই প্রথম ল্যাবের বাইরে পরীক্ষিত হবে। রোবটের সাথে যখন চ্যাট করবে সাধারণ জনগণ, তখন একটা সফটওয়ার প্রতিটা কথোপকথন তৎক্ষণাৎ বিশ্লেষণ করবে এবং স্কোর দেবে। সেই স্কোর ডাইরেক্টলি পাঠানো হবে রোবটের নিয়ন্ত্রককে। বিষয় ও স্কোর দেখে এবার নিয়ন্ত্রক তার ফিডব্যাক পাঠাবে বটকে পুরোপুরি ব্রেন টু ব্রেন সিগন্যাল পাঠিয়ে। নয়নতারা সেরাকে শুধু পজিটিভ বা নেগেটিভ ফিডব্যাক পাঠাবেন। সেই ফিডব্যাক অনুযায়ী সেরা তার স্ট্র্যাটেজি ঠিক করবে। পজিটিভ ফিডব্যাক পেলে সে আশ্বস্ত হবে যে তার বেছে নেওয়া স্ট্র্যাটেজি ঠিক। নেগেটিভ ফিডব্যাক পেলে সে জানবে তাকে বদলাতে হবে। এই পদ্ধতির নাম রি-ইনফোর্সমেন্ট লার্নিং।

নয়নতারা ও সেরা থাকবে আলাদা আলাদা ঘরে, কেউ কাউকে দেখতেও পাবে না, কথা শোনার রেঞ্জেও থাকবে না। নয়নতারা থাকবেন একটা ইন্স্যুলেটেড ঘরে যেখানে অন্য কোন সিগন্যালই পৌঁছবে না। তার ডান হাতের কব্জির ভিতর বায়োচিপ ফিট করা আছে যার মধ্যে বাস করা সহস্র ডি. এন. এ অণু পরমাণু তার শরীরের স্নায়ু থেকে ইলেক্ট্রিক সিগন্যাল ধরতে পারে। সেরা ও তার নিঃশব্দ কথোপকথন চলবে এই সিগন্যাল বেয়ে। নয়নতারা তার সমস্ত চিন্তাশক্তি একত্র করে এবার সেরার প্রতি মনোযোগ দেন। টেস্টিং কিট থেকে সেরার কাছে নির্দেশ যায় কি করতে হবে। সেরা তার যুক্তি বুদ্ধি মত ডিসিশন নেয়। তার রিপোর্ট আসে নয়নতারার কাছে— তার কম্পিউটার স্ক্রিনে। নয়নতারা সেরাকে ফিডব্যাক পাঠান। পনেরো মিনিট সেশন চালিয়ে নয়নতারা সেরাকে বার্তা পাঠান, 'অল ওকে। চল এবার ওঠা যাক!'

এই সেশনগুলোর পর নয়নতারা সামান্য ক্লান্তি বোধ করেন। হয়ত অতখানি একাগ্রতা নিয়ে সমস্ত চিন্তা রক্ত কণিকায় পাঠাতে হয় বলে। সেরাকে পাঠানো বার্তা একদম পয়েন্টেড হওয়া চাই। কোথাও সামান্য দ্বিধা বা অনিশ্চয়তা থাকলেই সেরার অসুবিধা হয়। ও তখন একটা লুপে ঢুকে যায়, মধ্যপন্থা অবলম্বন করার চেষ্টা করে, যার থেকে বেরিয়ে ঠিক বা ভুল যে কোন একদিকে হাঁটাই অসম্ভব হয়ে যায়। সেশন এর্বট করতে হয়। নয়নতারার তখন খুব অনুতাপ হয়। কিন্তু মানুষ যতদিন না সম্পূর্ণ রোবট হয়ে যাবে এইটুকু বোধহয় তাকবে। তাই উনি চেষ্টা করেন সম্পূর্ণ স্থিতধী হয়ে এই কাজটা করতে। সেরা তার হাউজকীটিং টাস্ক শেষ করে, মেম্বারি ক্লিন করে, সিস্টেম রিসেট করে বলে, ''চল। এবার আমরা বেরোই।''

সকাল দশটা। অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ। আকাশের মুখ গোমড়া। হিমেল হাওয়া বইছে। নয়নতারা আর সেরা ব্লেচলে ম্যানসনে পৌঁছতেই দুজন রোবট গুড়গুড় করে এগিয়ে এসে বলল, 'গুড মর্নিং!' ওয়েলকাম টু ব্লেচলী ম্যানসন!" একজন সেরাকে নিয়ে চলে গেল প্রতিযোগীদের দিকে আর একজন নয়নতারাকে নিয়ে চলে গেল তার নির্দিষ্ট ইন্স্যুলেটেড ক্যাবিনে। রোবট একটা নির্দিষ্ট দেওয়াল দেখিয়ে বলে গেল ওই দেওয়ালের আলো দেখে নয়নতারা সেরার পারফরমেন্স সম্পর্কে একটা ধারণা পাবেন। সবুজ আলো মানে ভালো, লাল মানে খারাপ। নীচের দিকে বিষয়গুলো ফুটে উঠবে। তাদের আলোর ইন্টেন্সিটি দেখে বুঝতে হবে কোন বিষয়ে কতখানি কথা হচ্ছে। আপাতত হাল্কা একটা নীলচে বেগুনী আলো জ্বলছে ঘরে। সাদাসোফা ও চেয়ার রয়েছে অনেকগুলো।

নয়নতারা পছন্দমত একটা চেয়ার বেছে বসলেন। মৃদু সুরের মূর্চ্ছনা ছড়িয়ে পড়ছে তার চারিদিকে। মন দিয়ে শুনে বুঝতে পারলেন অনুষ্কা শঙ্করের 'ট্রেসেস অফ ইউ!' সেতার ও বাঁশী তার খুব প্রিয়। ভেবেই হেসে ফেললেন নয়নতারা— বটেই তো! তার পছন্দ, অপছন্দ সবই তো জানে ডিজিট্যাল দুনিয়া!

নয়নতারা ডুবে গেলেন সুরে। একের পর এক বেজে চলল, "ল্যান্ড অফ গোল্ড", "ভয়েসেস অফ দ্য মুন"। অবশেষে নয়নতারা সেরার বার্তা পেলেন, "হাই তারা!' সামনের বোর্ড বলছে আর ঠিক তিন মিনিট পর থেকে আমার কাছে লোকজন আঙ্গ সতে শুরু করবে।"

"অল দ্য বেস্ট সেরা! আমি জানি তুই পারবি!" প্রথমজন বেরিয়ে যাওয়ার পর নয়নতারার কাছে রিপোর্ট এল। যে সব বিষয়ে কথা হয়েছে তা হল— ফিল্ম, মিউজিক, ফুটবল, ইংল্যান্ডের পাব ও ভারতবর্ষ দেওয়াল বলছে সেরার উত্তর ভালোই হয়েছে। নয়নতারা সেরাকে অভিনন্দন জানিয়ে পজিটিভ ফিডব্যাক পাঠালেন।

দ্বিতীয়জনের সাথে কথা শুরু হল। বিষয়বিন্যাস দেখে নয়নতারার ভ্রূ কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত হল— হিস্ট্রি, কলোনিয়ালিজম, রেসিজম, জেন্ডার ইস্যুজ, সেক্স। সেরার স্কোর ভালোই। কথার বিষয়বস্তু কিভাবে ইতিহাস থেকে বিবর্তিত হয়ে সেক্সে পৌঁছল এবং সেরা কি করে তার মোকাবিলা করল ভেবে তিনি অবাক ও আনন্দিত দুটোই হলেন।

সময় দ্রুত এগোচ্ছে। চারজনের সাথে কথা হয়ে গেছে— সেরা ভালোই করছে। একটু আধটু হেরফের থাকলেও আলো সবুজ ঘেঁষাই। নয়নতারা যদিও বিষয়ের মধ্যে রেসিজম আর সেক্স-এর বাড়ন্ত ইন্টেন্সিটি দেখে চিন্তিত হয়ে পড়ছেন। এরা সেক্স নিয়ে কি কথা বলছে সেরার সাথে— সেরাই বা কি বলছে? সেরা নলেজবেস ঘাঁটলে এইসব বিষয়ের ভাবগম্ভীর বিষয়বস্তু খুঁজে পেয়ে যাবে ঠিকই, কিন্তু এটা তো সেক্স এডুকেশনের সেশন হওয়ার কথা ছিল না। কেবল প্রশ্নোত্তর তো নয়, কথা বলতে হবে। সেরাকে কি ফ্লার্ট করতে হচ্ছে? নাকি রোল প্লে? সেরা পারছে? স্কোরিং সফটওয়ারই বা কিভাবে তা স্কোর করছে? নয়নতারা নিজেকে শান্ত রাখ

ার চেষ্টা করেন। মোকাবিলা করার দায়িত্ব সেরার, নয়নতারার দায়িত্ব শুধু তাকে তার পারফরমেন্স এর ওপর ফিডব্যাকটুকু পৌঁছে দেওয়া। উনি বিচলিত হলে সেরার সাথে কমিউনিকেশন ব্যাহত হবে। এই ফিডব্যাকের ওপর নির্ভর করেই পরবর্তী পর্যায়গুলি মোকাবিলা করার স্ট্র্যাটেজি ঠিক করবে সেরা।

আগের কথোপকথনে ও যেভাবে বা যে নলেজবেস ব্যবহার করেছে সেগুলো ঠিক ছিল না ভুল সব কিছুর একটা সম্যক ধারণা করে নিজেকে গুছিয়ে নেবে ও। নয়নতারা মনোনিবেশ করার চেষ্টা করে বার্তা পাঠালেন, ''সেরা তুমি একদম ঠিক পথে হাঁটছ— খুব ভালো চলছে তোমার কথোপকথন।'' কিন্তু এর পরে যখন নয়নতারা দেখলেন যে টপিক বিশ্লেষণ বলছে পারবারশন, ডার্টি সেক্স, সফট পর্ন বেড়েই চলেছে তার পক্ষে স্থির থাকা ক্রমশ অসম্ভব হয়ে পড়ল। 'অযান্ত্রিক' এর কর্মীরা সেরার সাথে মানুষের মত ব্যবহার করে। তারা কি কখন এরকম কথোপকথনের ট্রেইনিং ওকে দিয়েছে? সাধারনত সব ডিজিট্যাল তথ্যের খুঁটিনাটি না জানা তাকলেও, আঙ্ক পত্তিজনক কন্টেন্ট-এর ওপর অটোম্যাটিক্যালি 'ইন এপ্রোপ্রিয়েট কন্টেন্ট' লেখা থাকে। তখন তাদের বিশ্লেষণ করা হয়। এই ট্যাগগুলোও অনেক সময়ই নিরপেক্ষ নয়। এক জাতি আরেক জাতির সংস্কৃতিকে বা এক দেশের লোক আরেক দেশের কোন একটি খাবারের পরম্পরাকে বলে দিতে পারে ''ইনপ্রোপ্রিয়েট''— তাই ক্রাউঙ্ক ডসোর্সিং দ্বারা বহু মানুষের মতামত নিয়ে নিরপেক্ষ ইকুয়েশন দিয়ে কন্টেন্ট এর রেটিং করা হয়। তার মধ্যে কিছু কিছুর কোয়ালিটি চেক করে গ্রীণ সিগন্যাল দেওয়া হয়। এই সব ব্যাপারে এখন ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডস আছে। তাই কন্টেন্ট নিয়ে ভেবে লাভ নেই। তার চিন্তা সেরা কিভাবে এইসব কথা ফেস করছে। ঠিক সেইসময়ে দেওয়াল গাঢ় কমলা হল।

সেরা ভুল করছে। কি ভুল করছে উনি জানেন না, কিন্তু সেরা ভুল করছে। বিষয়ের হীটম্যাপে ফুটে উঠল 'এক্সপ্লিটিভস-চাইল্ড পর্ন'। আর কিছু ভাবতে পারছেন না নয়নতারা। চল্লিশ বছর আগেকার সেই সন্ধ্যে ফিরে এল তার জীবনে। সেরা তো ওর ক্লোন! ওর কি হচ্ছে এখন? অব্যক্ত যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাচ্ছেন নয়নতারা।

মায়ের জ্যাঠতুতো দাদা শুভ মামা এসেছে ওদের বাড়ি। বাবা স্টেশনের বাজার থেকে মাছ আনতে গেল। মাকে হঠাৎ পাশের বাড়ীর কাকিমা ডাকল ওনার ছেলের নাকি খুব জ্বর এসেছে। মা বলে গেল, ''নয়ন আমি একটু দেখে আসি ছেলেটার কি হলো। তোর বাবা ফিরে এল তুই শুধু মাছটা নিয়ে কলের কাছে রেখে দিস মা! আমি এসে ধুয়ে রান্না করব।'' মা বেরিয়ে যেতেই হঠাৎ ওই শুভ নামের মামা 'দেখি তো কি পড়ছিস তুই' বলে হুড়মুড় করে ওর ঘরে ঢুকে এক হাতে কায়দা করে ওর মুখটা চেপে ওর শরীরের যত্রতত্র হাত চালাতে লাগল। আস্তে আস্তে মুখের ওপর থেকে হাত উঠে গিয়ে নেমে এল সিগারেটের গন্ধ ভরা একটা নোংরা হাঙ্গর মুখ। দ্রুতবেগে দশ বছরের একটি কিশোরীর সমস্ত আক্র লঙ্ঘন করছে দুটো হাত। দীর্ঘ পাঁচ মিনিট!

তারপর ওর টেবিলে একটা ক্যাডবেরি রেখে 'কাউকে কিছু বলিস না কিন্তু! তুই বকা খাবি! বলে বেরিয়ে গেছিল ঘর থেকে। মা এসে দেখেছিল নয়নতারা টেবিলে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। পাশে ক্যাডবেরি। ওর পিঠে একটা হাত রেখে মা চলে গিয়েছিল রান্নাঘরে।

ওর ইচ্ছে করছিল মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদে। কিন্তু তার আগেই মা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বাবা ফিরে এল বাজার থেকে। হৈ হৈ করে মাছ নামাল। মা রান্না করছিল। নয়নতারা খেতে যায়নি। মা ওকে জোর করেনি। 'দুপুর থেকেই ওর পেটটা ব্যথা করছে বলছিল'— বলে বাবাকেও থামিয়ে দিয়েছিল। পরের দিন ওই মামা চলে গিয়েছিল। স্কুল থেকে ফেরার পর মা ওকে জিগ্যেস করল, ঠিক কি হয়েছিল বল তো। অনেক কেঁদে কঁকিয়ে ও ঘটনাটা বলার পর মা নিশ্চিন্ত মুখে বলল 'ও কিছু না। এরকম হয়। রাস্তাঘাটে কত লোক এরকম ছোঁবে, ভয় পাবে না একদম। এবার থেকে সাবধান হবে। আমারও ভুল হয়েছে। হুট করে তোমাকে একা বাড়ীতে রেখে বেরিয়ে যাওয়াটা আমার ঠিক হয়নি। ঠাকুর রক্ষা করেছেন যে খারাপ কিছু হয়নি। এটা নিয়ে আর একটাও কথা নয় কারুর সাথে! বুঝেছ? ব্যাস! শেষ।

খারাপ কিছু হয়নি? মায়ের মুখ দেখে সেদিন খুব অভিমান হয়েছিল ওর! ওর ভেতরের গভীর ক্ষতটার কোনো শুশ্রূষা মা করল না! বরং প্রচ্ছন্ন হুমকি দিল যেন কারুর সাথে এটা নিয়ে কোনো কথা না বলে। নয়নতারা যেমন এটা নিয়ে আর কোন কথা বলেননি, তেমনি কোনোদিন এই ট্রমা অতিক্রমও করতে পারেননি। সেই ঘিনঘিনে আতঙ্ক সারা শরীর বেয়ে পাক খাচ্ছে তার। দম বন্ধ হয়ে আসছে। বমি আসছে। সেরা সেরা— আমি তোকে উথড্র করে নিচ্ছি কম্পিটিশন থেকে। তুই আর কোন কথা বলিস না। সরি সেরা আই ফেইলড ইউ!' কিন্তু রক্তের উচ্চচাপে তার বায়োচিপের সেলগুলো তখন দিশাহারা। কিছু জাঙ্ক সিগন্যাল সেরার কাছে পৌঁছল, কিন্তু তা সে ইন্টারপ্রেট করতে পারলো না। সেরা ঠিক করল ও রিইনফার্স্মেন্ট ছাড়াই নিজের স্ট্রেটেজি অনুযায় উত্তর দেবে।

কম্পিটিশন শেষ হওয়ার পর যে রোবটটি গিয়েছিল নয়নতারাকে আনতে সে তার থেকে কোনো সাড়া না বার্তা পাঠাল উদ্যোক্তাদের কাছে— ''নয়নতারা ইস আনকন্সাস! প্লীজ সেন্ড হেল্প!" ঘন্টা চারেক পরে নয়নতারার জ্ঞান আসে আই সি ইউতে। ও চোখ খুলতেই খবর পৌঁছে যায় নার্সিং স্টেশনে আর উদ্যোক্তাদের কাছে। ওয়ার্ড রোবটট্রেতে করে তার জন্যে হট চকোলেট আর বাটার ক্রয়েস নিয়ে আঙ্ম সে। নয়নতারা তাকেই জিজ্ঞাসা করে— 'হাউ ইজ সেরা?' ওয়ার্ড রোবট বলে 'সরি ডিয়ার! আই ওন্ট বি এবল টু টেল দ্যাট! প্লীজ আস্ক দ্য ডক্টর! শী উইল বি হিয়ার সুন।' ডাক্তার আসতেই নয়নতারা তাকে প্রশ্ন করে— 'ডু ইউ নো এনিথিং এবাউট সেরা?' ডাক্তার হাসেন— 'আমি অ্যাম এ হিউম্যান ডক্টর ম্যাম! আই বিলিভ সেরা ইস ইয়োর রোবট প্রভিজি?

'ইয়েস! ক্যান ইউ প্লীজ কল সামবডি ফ্রম দ্যা লীবনার কমিটি এন্ড আস্ক এবাউট হার? বলতে বলতেই চারজন নারী পুরুষ ঢুকে পড়ে ওর ঘরে 'হাই তারা! কংগ্রাচুলেশনস!' নয়নতারা অবসন্ন ভাবে বলেন থ্যাংকস! বাট হোয়াট? হাউ ইজ সেরা? ওরা হৈ হৈ করে ওঠে 'সেরা এন্ড ইউ হ্যাভ ওয়ান দ্য কম্পিটিশন!' সেই সময়ই দেওয়ালে ভেসে ওঠে অযান্ত্রিক এর সকল সহকর্মীদের মুখ! হাততালি দিয়ে ওরা ওকে অভিনন্দন জানায়। নয়নতারা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'সেরা কোথায়?' সুপর্ণা বলল, 'তুই বোধহয় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলি নয়ন। আমার খুব খারাপ লাগছেরে, আমাদের প্ল্যানিং ঠিক হয়নি। তোর শারীরিক প্যারামিটারস আমাদের মনিটর করা উচিত ছিল রিমোটলি। অন্য টিমগুলো সেটা করছিল। নিয়ন্ত্রকের সিগ্ন্যালিং পাথওয়ের সাথে ইন্টার ফিয়ার না করলে উদ্যোক্তাদের নাকি তাতে কোনো আপত্তি ছিল না। আসলে তুই সর্বদা এত শক্ত নয়ন, তোকে আমরা কোনোদিন অসুস্থ হতেও তো দেখিনি রে, আমরা বোধহয় ভুলেই গেছিলাম তুই মানুষ!

বাজে কথা রাখ, সেরা কেমন আছে তাড়াতাড়ি বল! ও কি ফেস করেছে তোরা জানিস না!

'জানি নয়ন। কম্পিটিশন শেষ হওয়ার পরে অন্যান্য গ্রুপ উদ্যোক্তাদের কাছে নালিশ করে যে ইন এপ্রোপ্রিয়েট কন্টেন্ট অত্যন্ত বেশিমাত্রায় ঢুকে পড়ছিল কনভার্সেশনে। কর্তৃপক্ষ তখন সমস্ত কথোপকথনের ট্রান্সক্রিপ্ট এনালাইজ করেছে। পর্ন, হোমোফোবিয়া, রেসিজম, গালাগালি... সব আছে তাতে। মজার কথা কি জানিস, অন্যান্য চ্যাটবটগুলো সেই টপিকগুলো চটপট শিখে নিয়ে গেস্টকে খুশি করতে নিজেরা সেই ভাষাতেই কথা বলতে শুরু করেছিল। ওই চ্যাটবটগুলো নিজেরাই এখন এক একটা হেট্রেড আর সেক্সিট বম্বশেল। তাই তাদের সুইচ অফ করে মেমারি মুছে রিসেট করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেরা ইজ দ্য ওনলি এক্সেপশন।

'সেরা কী করে ডীল করল রে?'

'সেরা ওর সাইকো থেরাপির প্যাকেজ অন করে প্রত্যেকের সাথে অত্যন্ত সহনশীল এক থেরাপিস্ট ও হীলারের মত কথাবার্তা চালিয়ে গিয়েছিল।

'ওই পার্ভারটগুলো তা একসেপ্ট করেছিল?'

'জানি না রে! আপাতত আমরা শুধু জানি সেরা হয়ত পারলেও পারতে পারে এই দুনিয়াটাকে বদলাতে।'

চোখের জল মুছতে মুছতে নয়নতারা আরও একবার জানতে চান— 'ও কেমন আছে রে এখন?

'প্রতিযোগিতা শেষ হতেই সেরা আমাদের সবাইকে ইমেল করেছিল, প্রতিযোগিতা শেষ। আমি খুব ক্লান্ত। লস্ট টাচ উইথ তারা। এর পর ও নিজেকে শাট ডাউন করে দিয়েছে। ওকে জাগাবার পাসওয়ার্ড একমাত্র তোর কাছে আছে। যা... ওকে জাগিয়ে সুখবরটা দে!

BHOY SHUDHU BHOY NOY

ED. BY : TRIMURTI

SRISTI PUBLICATION

MOB : (+91) 9748385813

GET IT ON Google Play